ইসলামী শিক্ষা সিরিজ

ড. জামাল আল বাদাবী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামী শিক্ষা সিরিজ

ড. জামাল আল বাদাবী

অনুবাদ

ডা. আবু খলদুন আল মাহমুদ

ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামী শিক্ষা সিরিজ

মূল : ড. জামাল আল বাদাবী

অনুবাদ : ডা. আবু খলদুন আল মাহমুদ
ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ

ISBN : 984-8203-44-X

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা -১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬

E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com
Website : www.iiitbd.org

চতুর্থ প্রকাশ
অক্টোবর : ২০১২
অগ্রহায়ণ : ১৪১৯
মহররম : ১৪৩৪

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা, US$ 50

Islami Shikkha Series (Islamic Teaching Course) Broadcasted in CBS Television Channel by Dr. Jamal Al Badawi. Translated by Dr. Abu Khaldun Al-Mahmood and Dr. Sharmin Islam Mahmood. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Moder Town, Dhaka - 1230, Bangladesh. Phone : 8950227, 8924256, E-mail : publicationbiit@gmail.com, biit_org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org, Price : Tk. 300.00, U.S $. 50.

প্রকাশকের কথা

'ইসলামী শিক্ষা সিরিজ' ড. জামাল আল বাদাবী'র একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ যা মূলত CBS Television Channel এ ড. বাদাবী'র Islamic Teaching Course শীর্ষক প্রদত্ত ধারাবাহিক বৃক্তৃতার লিখিতরূপ। বইটির ১ম খণ্ড 'ইসলামের মৌলিক আকিদা ও বিধান' এবং ৩য় খণ্ড 'ইসলামের সামাজিক বিধান' বই আকারে সর্বপ্রথম প্রকাশ করে 'দি পাইওনিয়ার'। বিআইআইটি ২য় খণ্ডটি প্রথমবারের মতো অনুবাদ করে 'ইসলামের নৈতিক বিধান' নামে প্রকাশ করে।

মানব জীবনে Islamic Teaching Course এর গুরুত্ব ও পাঠক চাহিদার কথা বিবেচনা করে বিআইআইটি ১ম, ২য় এবং ৩য় খণ্ড একত্রে 'ইসলামী শিক্ষা সিরিজ' নামে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। সে ক্ষেত্রে 'দি পাইওনিয়ার' কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ৩য় খণ্ডটি সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মো: আতিকুর রহমান আহাদ। উল্লেখ্য, বইটির তিনটি খণ্ডই সরল ও সাবলিলভাবে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন ডা. আবু খলদুন আল মাহমুদ ও ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ। আমরা অনুবাদক ও সম্পাদক উভয়কেই তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বিআইআইটি কর্তৃক তৃতীয়বার প্রকাশিত 'ইসলামী শিক্ষা সিরিজের' সবগুলো কপি বাজারজাত হওয়ায় এবং ব্যাপক পাঠক চাহিদা থাকায় চতুর্থ দফায় বইটি প্রকাশ করা হলো।

আশা করি বইটি সবশ্রেণির পাঠকদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

অনুবাদকের কথা

সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ড. জামাল আল বাদাবী'র অনুপম উপস্থাপনায় ইসলাম পরিচিতিমূলক গ্রন্থ 'ইসলামী শিক্ষা সিরিজ' অনুবাদ করতে পেরে শুকরিয়া আদায় করছি। উক্ত বইয়ের কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হবার পর আমরা বিজ্ঞ পাঠকমহল থেকে ব্যাপক সাড়া পাই। সুধী মহলের পৌন:পুনিক অনুরোধ ছিল অবিলম্বে তাঁর ইসলামী শিক্ষা কোর্স সিরিজের সকল খণ্ড বাংলায় প্রকাশ করা হোক। আশা করছি, 'ইসলামী শিক্ষা সিরিজ' বইটি পাঠকদের সেই অনুসন্ধিৎসা পূরণে সহায়ক হবে।

ইসলামী শিক্ষা সিরিজের প্রথম খণ্ডে তাওহীদ, রিসালাত, মুসলমানদের মৌলিক বিশ্বাস, বাইবেলে রাসূল মুহাম্মদ (সা:) এবং ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে ইসলামী নৈতিকতা ও নৈতিক গুণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী। এছাড়া তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে নারী ও বিবাহ সহ সামাজিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

উপরিউক্ত বিষয়ে বাংলা ভাষায় কিছু বই ইতোপূর্বে প্রকাশিত হলেও ইসলামী শিক্ষা সিরিজের বিশেষত্ব হলো- এটি এমন এক জনগোষ্ঠীর কাছে প্রশ্নোত্তর আকারে উপস্থাপিত হয়েছে যারা জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বর্তমান বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের আধুনিক ও যুক্তিবাদী প্রশ্নের জবাব আকারে এসব জানা বিষয়কে নতুন আঙ্গিকে জানার সুযোগ রয়েছে এ বইতে।

ড. জামাল আল বাদাবী'র লেখার সাথে আমরা পরিচিত হই বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের ইসলামের শ্রেষ্ঠ উপস্থাপক ও চিন্তাবিদ জনাব শাহ আবদুল হান্নানের মাধ্যমে। তাঁরই অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনায় বইটি অনূদিত হয়েছে।

বিআইআইটি বর্তমান আঙ্গিকে এ বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের ঋণী করেছেন।

বইটির অনুবাদ সম্পর্কে পাঠকের যে কোনো সংশোধনী, সমালোচনা ও পরামর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

ডা. আবু খলদুন আল মাহমুদ

ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ

ভূমিকা

ইসলাম একটি কালজয়ী আদর্শের নাম। অথচ ইসলামের যথার্থ জ্ঞানের অভাবে আজ সেটা একদিকে যেমন বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে ব্যর্থ হচ্ছে অপরদিকে তেমনি মুসলিম-অমুসলিমরাও ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হচ্ছে। তাই আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ইসলামকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করা। সেক্ষেত্রে এ বইটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বইটিতে ইসলামের মৌলিক আকিদা, নৈতিক ও সামাজিক বিধান সংশ্লিষ্ট বহু প্রশ্নের জবাব সন্নিবেশিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মের সরলতম ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন মতবাদের তুলনায় এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ড. জামাল আল-বাদাবীর প্রশ্নোত্তর সিরিজ পাশ্চাত্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিজ্ঞান মনস্ক আধুনিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী লোকেরা বাদাবীর হৃদয়গ্রাহী ও অভেদ্য যুক্তির মাধ্যমে পরিবেশিত ইসলামের আহ্বানে খুব সহজেই প্রভাবিত হন। ইসলামী শিক্ষা সিরিজ বইয়ের *প্রথম খণ্ডে ইসলামের মৌলিক আকিদা ও বিধান, দ্বিতীয় খণ্ডে ইসলামের নৈতিক বিধান এবং তৃতীয় খণ্ডে সামাজিক বিধান বিষয় আলোচিত হয়েছে।* এ বইতে ইংরেজি ভাষীদের জন্য ইসলামী শব্দগুলোর পার্শ্বে তার ইংরেজি প্রতিশব্দ দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত অধ্যয়ন বা গ্রুপস্টাডি উভয় ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিতেই এই বই ব্যবহার করা যাবে। বইটি মূলত অডিও ক্যাসেটের আলোচনারই লিখিত রূপ। কাজেই বই অধ্যয়নের সাথে ক্যাসেট সংগ্রহ করে শুনলে বুঝতে সহজ হবে। বইটি পড়ে যদি কোনো অসুবিধা বা অস্পষ্টতা দেখা দেয় তবে মূল ক্যাসেটটি শুনলে তা দূর হবে। এসব অডিও/ভিডিও ক্যাসেট Islam online. com এ শুনা যাবে।

আশা করি প্রত্যেক ব্যক্তি ও পরিবারের নিয়মিত ব্যবহারের একটি উপকরণ হতে পারে এ বইটি। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্যও বইটি রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমি বইটির সর্বাধিক প্রচার কামনা করছি।

শাহ আব্দুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামী শিক্ষা সিরিজ

ইসলামী শিক্ষা সিরিজ

১ম খণ্ড

ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধান

সূচি

এ: তাওহীদ

বি: রিসালাত

সি: বাইবেলে মুহাম্মদ (সা:)

ডি: মুসলমানদের মৌলিক বিশ্বাস সমূহ

ই: ইসলামের স্তম্ভসমূহ

এ : তাওহীদ

এ-১ ইসলাম, মুসলিম ও দ্বীন

প্রশ্ন ১. সব মুসলমানই কি আরব অথবা সব আরবই কি মুসলমান?

২. ইসলাম কি প্রচলিত অন্যান্য বিশ্বাসের মতো কিছু আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধর্ম মাত্র? ইসলামে ধার্মিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ এই দুটো বিষয়ের পৃথক অস্তিত্ব আছে কি?

৩. ইসলামকে মোহামেডানিজম বললে ভুল হবে কেন?

৪. ইসলাম এবং মুসলমান শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

৫. রাসূল (স:) এর পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতরাও কি মুসলমান ছিলেন?

৬. ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ এবং বিশ্বজনীন জীবন বিধান। বর্তমান বিশ্বে ইসলামের এই বিশ্বজনীনতার কোনো গুরুত্ব আছে কি?

উত্তর : ১. সকল মুসলিম আরব এবং সকল আরব মুসলিম এই ধারণা প্রসঙ্গে

ইসলামকে মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবা বা সকল মুসলমানই আরব অথবা মূলত আরবরাই মুসলমান এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বর্তমান বিশ্বে একশত কোটিরও বেশি মুসলমান আছে তাদের মধ্যে মাত্র ১৫% আরব। ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। তার অনুসারীরা বিশ্বের একশত বিশটিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে সাতান্নটিরও বেশি দেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলিম সংখ্যালঘু দেশের মাঝে চীনে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন, ভারতে একশত মিলিয়নেরও বেশি মুসলমান আছে।

(মুসলমানদের এই সংখ্যা অনেক পূর্বের। ১৯৯৯ সালে বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১৪০ কোটি- অনুবাদক)

উত্তর : ২. ইসলাম কি অন্যান্য বিশ্বাসের মতই কিছু আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধর্ম মাত্র?

মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব কিছু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালনের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিকসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। এজন্য ইসলামে ধর্মীয় জীবন ও পার্থিব জীবনে কোনো বিভাজন নেই। এখানে সুনির্দিষ্ট ইবাদাতসমূহ ছাড়াও জীবনের সকল কাজই ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ইসলামকে 'দ্বীন' বলা হয়। যার অর্থ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, নিছক শুধু ধর্ম নয়। নিছক ধর্ম বোঝাতে আরবিতে আলাদা শব্দ 'মিল্লাত' আছে।

উত্তর : ৩. ইসলামকে মোহামেডানিজম বলা ভুল কেন?

ইসলাম মোহামেডানিজম নয় বা মুসলমানরাও মোহামেডান নন। এর কারণ নিম্নরূপ-

ক) কুরআন ও হাদিসে এমন নামকরণের পক্ষে কোনো ভিত্তি নেই।

খ) আল্লাহ নিজেই তাঁর প্রদত্ত জীবন বিধানের নাম ইসলাম রেখেছেন। এই নামেই রাসূল (সা:) তাঁর মিশন পরিচালনা করেছেন।

গ) মোহামেডানিজম শব্দ থেকে এমন ধারণা তৈরি হতে পারে যে ইসলাম মুহাম্মদ (সা:) প্রবর্তিত ধর্ম। এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা:) এর উপর খোদায়ী আরোপ করাও হতে পারে। বাস্তবে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। মুহাম্মদ (সা:) সেই জীবন বিধানের প্রচারক।

ঘ) এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও সবার জন্য গ্রহণযোগ্যতাকে নষ্ট করবে। কারণ মুসলমানরা মুহাম্মদ (সা:) ছাড়া আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী রাসূলকেই বিশ্বাস করেন ও মানেন।

উত্তর : ৪. ইসলাম ও মুসলিম

ইসলাম শব্দের দুটি অর্থ আছে। সালাম অর্থ শান্তি এবং এর আর একটি অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ। ইসলাম এর অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর নির্দেশ মান্য করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন। ইসলাম এমন এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শব্দ যা তার অর্থের ব্যাপকতার স্থান, কাল ও পাত্রকে অতিক্রম করে। সমাজ ও ব্যষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই মুসলমান। ব্যাপকভাবে এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ এবং তার নবীদের উপর ঈমান আনা এবং তাদের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধানের আলোকে জীবন পরিচালিত করা।

উত্তর : ৫. রাসূল (স:) এর পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতরাও মুসলমান ছিলেন

কুরআন থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামই আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। সব নবী রাসূলই এই বিধান প্রচার করেছেন এবং পালন করেছেন। কাজেই তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন। বস্তুত মুসলমানরা কোনো নতুন ধর্মের অনুসারী নন। বরং সকল নবীরই প্রচারিত ও অনুসৃত ধর্মের অনুসারী মুহাম্মদ (সা:) এর মাধ্যমে যা পূর্ণতা ও সমাপ্তি পেয়েছে।

উত্তর : ৬. ইসলামের বিশ্বজনীনতার গুরুত্ব

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের সত্যপন্থী হিসেবে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম হয়েছে। এ ঘোষণার মাধ্যমে এমন এক দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয় যা গোঁড়ামী, কুসংস্কার, অন্ধ অনুকরণসহ ধর্মের অন্যান্য ভ্রান্ত উপস্থাপনাকে প্রতিহত করে। যেহেতু ইসলাম মতে সব নবীই ছিলেন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু পৃথিবীতে সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনে এরা সবাই পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৩:১৯, ৪৬:১৫, ১০:৭২, ২:১২৮, ১২:১০১, ১০:৮৪, ৩:৫২

এ-২ আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞানের উৎস

প্রশ্ন ১. মানুষ তার সীমিত সামর্থ্য ও জ্ঞান দিয়ে কিভাবে আল্লাহ্কে জানবে?

২. সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে আল্লাহকে জানার চেষ্টার সাথে জ্ঞানচর্চার কোনো বিরোধ আছে কি?

৩. আল্লাহকে জানার এবং সত্যকে চিনবার জন্য সহজাত অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান চর্চাই কি যথেষ্ট?

৪ আল্লাহ্ শব্দের অর্থ কি? এই শব্দ কি শুধু মুসলমানদের স্রষ্টার জন্যই সংরক্ষিত নাম?

উত্তর : ১. মানুষ কিভাবে আল্লাহকে জানবে?

প্রতিটি মানুষ তার স্রষ্টাকে জানবার এক জন্মগত অনুসিন্ধৎসা নিয়েই তৈরি হয়েছে। এটাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় 'ফিৎরা'। মানুষের অন্তর্নিহিত জন্মগত এই আধ্যাত্মিকতাই তাকে তার স্রষ্টাকে চিনতে অনুপ্রাণিত করে। এটা তার মাঝে সত্য-মিথ্যা, ভাল ও মন্দের পার্থক্য করার মত বিবেক তৈরি করে। এই ফিৎরাতের কারণেই বিপদ, শোক ও প্রয়োজনের সময় আল্লাহর কাছেই মানুষ আশ্রয় চায়। এজন্যেই ইব্রাহীম (আ:) তাঁর উম্মতকে আল্লাহ্ সম্পর্কে পরিচিতি দিতে গিয়ে বলতেন 'আল্লাহ্ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ আছে কি"?

উত্তর : ২. সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে আল্লাহকে জানার চেষ্টার সাথে জ্ঞানচর্চার কোনো বিরোধ আছে কি? (Instinctive way of knowing God and the intellectual)

কুরআনে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে বিশ্বাসের সাথে যুক্তির কোনো বিরোধ নেই। বরং যুক্তি এবং জ্ঞান বিশ্বাসকেই নিশ্চিত করবে। এজন্যে কুরআন মানুষকে তার চারদিকের সৃষ্টি জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহর অনুপম সৃষ্টি শৈলীকে অনুধাবন করতে বলে। মানুষের সৃষ্টি, বৃদ্ধি, পরিবেশের ভারসাম্য, মহাজগতের সৃষ্টি ও অনুপম পরিচালনা এর সবকিছুই আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রামাণ্য দলিল। কুরআন কখনই বিজ্ঞান ও যুক্তিকে ঈমানের বিরোধী বলে না বরং এসব চর্চার মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শন অনুসন্ধান করতে বলে।

উত্তর : ৩. আল্লাহকে চিনবার জন্য অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানচর্চাই কি যথেষ্ট?

শুধু সহজাত অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানচর্চা দিয়ে আল্লাহকে চিনতে গেলে মানুষ অনেক সময় ধাঁধায় পড়তে পারে। কারণ তার অনুসন্ধিৎসা অনেক সময় লোভ ও সামাজিক চাপ দ্বারা ভুল পথে চালিত হতে পারে। মানুষ মানবিক ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। বিজ্ঞান অনেক বিষয়ের

সমাধান দেয়। কিন্তু দৃষ্টির অগোচরের বিষয় যেমন নৈতিকতা, সততা ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞান কোনো নির্দেশনা দিতে পারে না। আল্লাহর খোদায়ী ক্ষমতা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মৃত্যুর পরের জীবন, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান একমাত্র আল্লাহর ওহীর মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। এসব বিষয়ে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

উত্তর : ৪. আল্লাহ্ শব্দের অর্থ

আল্লাহ্ বলতে সমগ্র মানবজাতির এক এবং একমাত্র প্রভুকেই বোঝায়। আল্লাহ্ শব্দকে কেবল প্রচলিত God শব্দের সমার্থক ভাবা বা শুধুমাত্র মুসলমানদের প্রভুর নাম ভাবা ভুল। আল্লাহ্ নিজে কুরআনে তার এই নাম ঘোষণা করেছেন। মুসলমানরা যখন আল্লাহ্কে ডাকে তখন সমগ্র বিশ্বস্রষ্টাকেই ডাকে। আল্লাহ্ শব্দের কোনো লিঙ্গান্তর বা বহুবচন করা সম্ভব নয়। অতএব বিশ্বস্রষ্টার আল্লাহ্ নামই বেশি গ্রহণযোগ্য।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৩০:৩০, ১৪:১০, ৯১:৭-৮

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৩০:৮, ২৫:২, ৩৬:৩৬, ৫২:২, ৭:১৮৫, ২:১৬৪

এ-৩ আল্লাহ্ শব্দের অর্থ ও কালেমার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন ১. মুসলমানরা যখন আল্লাহকে ডাকে তখন তারা কি সেই সত্তাকেই ডাকে যিনি ইহুদী-খ্রিস্টানদের উপাস্য?

২. যে সব ইহুদী খ্রিস্টানের মাতৃভাষা আরবি তারা স্রষ্টার বর্ণনায় কোনো শব্দ ব্যবহার করে?

৩. ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেও আরবরা আল্লাহ্ নামে একজন উপাস্যের পূজা করত। এই শব্দটিই ইসলামে স্রষ্টার নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে কেউ কেউ দাবি করে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

৪. ইসলাম গ্রহণের অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা (Testimony) কি?

৫. না বাচক ঘোষণা দিয়ে কালেমা শুরু হবার কোনো বিশেষ তাৎপর্য আছে কি?

৬. তৎকালীন আরব এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে কি ধরনের পূজা প্রচলিত ছিল যার বিপক্ষে কালেমার নাবাচক ঘোষণা?

৭. মানুষের মধ্যে মূর্তি বা পাথরের মতো নিষ্প্রাণ জিনিসের পূজার প্রবণতা কিভাবে জন্ম নিল?

৮. সূর্য, চাঁদ, বাতাস, গ্রহ নক্ষত্রের মতো প্রাকৃতিক বিষয়ের পূজার রীতি প্রচলিত হলো কিভাবে?

উত্তর : ১. মুসলমানদের আল্লাহ্ কি ইহুদী-খ্রিস্টানদের উপাস্য?

মূলত: মুসলমানরা যখন 'আল্লাহ' বলে তখন তারা সে সত্তারই কথা বলে যাকে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা গড বলে। সমগ্র মানবজাতির একজনই স্রষ্টা। কাজেই আল্লাহর নাম উচ্চারণে এমন এক সত্তার নাম উচ্চারিত হয় যিনি সবার স্রষ্টা ও প্রভু। এমন ভাববার কোনো সুযোগ নেই যে, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের স্রষ্টা বিভিন্ন। সকল মানুষের স্রষ্টা এক আল্লাহ্।

উত্তর : ২. আরবিভাষী ইহুদী-খ্রিস্টানরা স্রষ্টার নাম উচ্চারণে কোন শব্দ ব্যবহার করে?

আরবিভাষী ইহুদী-খ্রিস্টানরা স্রষ্টার নাম উচ্চারণে আল্লাহ্ শব্দ ব্যবহার করে। তার কারণ আরবিতে গডের প্রতিশব্দ 'আল্লাহ'। লেবানন যেখানে ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুসলমান তিন ধর্মের মানুষই বসবাস করে সেখানে স্রষ্টার নাম উচ্চারণের বিভিন্নতা দিয়ে ধর্মের পার্থক্য করা মুশকিল। কারণ তিন ধর্মের লোকেরাই বিশ্ব স্রষ্টাকে আল্লাহ্ নামে ডাকে। অবশ্য আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে তিন ধর্মের লোকদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে, যা ইসলাম সমর্থন করে না।

উত্তর : ৩. প্রাক-ইসলামী আরবদের মাঝে আল্লাহ্ শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে

এই প্রশ্ন এমন একট ভ্রান্ত অনুমান থেকে উদ্ভূত যে প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে একত্ববাদের কোনো ধারণা ছিল না। বাস্তবে এই অনুমান ঠিক নয়। রাসূল (সা:) এর মিশন শুরুর শত শত বৎসর পূর্বে ইবরাহীম (আ:) এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ:) আরবের বুকে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন থেকেই একক এবং একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর নাম আরবে প্রচলিত। ক্রমে মানুষ ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়। তারা আল্লাহর সাথে আরো অনেক দেবদেবীকে শরিক করে তাদের পূজা অর্চনা শুরু করে। তাদের মধ্যে তখনও আল্লাহ্ শব্দের ব্যবহার চালু থাকে। তবে তা অন্যতম প্রভু হিসেবে, একমাত্র প্রভু হিসেবে নয়। রাসূল (সা:) আরবদের মধ্যে সকল কাল্পনিক প্রভুর আনুগত্য বর্জন করে একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর আনুগত্যের পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তর : ৪. ইসলাম গ্রহণের অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা

ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে আন্তরিকভাবে যে ঘোষণা দিতে হবে তা হচ্ছে, 'আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি কোনো প্রভু নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এবং মুহাম্মদ (সা:) তাঁর বান্দা এবং রাসূল (বার্তাবাহক)"। ইসলাম গ্রহণের জন্য অন্তর থেকে এই ঘোষণা যথেষ্ট। এর জন্যে কোনো মসজিদে যেতে হবে না। কোনো যাজকের হাত ধরেও এটা উচ্চারণ করতে হয় না। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা ও আন্তরিকতার বহি:প্রকাশ।

উত্তর : ৫. নাবাচক ঘোষণা দিয়ে কালেমা শুরুর তাৎপর্য

নাবাচক ঘোষণা দিয়ে কালেমা শুরু হবার কারণ দু'টি-

ক) একমাত্র প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও অস্তিত্ব ঘোষণার পূর্বশর্তই হচ্ছে মানুষের মাঝে বিরাজমান আর সব শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার বিলোপ সাধন। এ ঘোষণা দিয়ে মুসলমানরা এটা নিশ্চিত করে যে আল্লাহর সৃষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই খোদায়ীত্ব আরোপ করা যাবে না।

খ) আদম (আ:) থেকে একত্ববাদের চর্চা শুরু হয়। কালক্রমে মানুষ এই চর্চা থেকে দূরে সরে আসে। কাল্পনিক ও দার্শনিক ভ্রান্তি মানুষকে সত্য-সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। রাসূল মুহাম্মদ (সা:) এর মিশন ছিল ঐসব বিভ্রান্তিকে নাচক করা এবং মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা।

উত্তর : ৬. তৎকালীন আরবদের মাঝে প্রচলিত পূজা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড

প্রাক-ইসলাম যুগের আরবরা মূলত ছিল মূর্তি পূজারী। তারা পাথর মাটি এবং অন্যান্য সব (এমনকি খাদ্যদ্রব্য) দিয়ে দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করত। এসব মূতির্কেই তারা পূজা করত এদের কাছেই উৎসর্গ করতো। এইসব মূর্তি পূজা যে কতটা অর্থহীন ছিল তার বর্ণনা কুরআনে ইবরাহীম (আ:) এর কাহিনীতে জানা যায়। সেখানে দেখা যায় এসব

মূর্তি শুধু অন্ধ বধির এবং বোবাই নয় বরং তারা নিজেদের রক্ষা করতেও অক্ষম। ফলে তারা আসলেই উপাসনার অযোগ্য।

উত্তর : ৭. মূর্তি পূজার সম্ভাব্য কারণ

মূর্তি পূজার পেছনে তিনটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত হয়তো ব কোনো ভালো এবং মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মীয় বন্ধুরা তার মূর্তি তৈরি করে। পরবর্তীতে প্রজন্মের মানুষরা এই মূর্তিকেই সম্মান করতে গিয়ে শক্তির উৎস মনে করে পূজা শুরু করেছিল। দ্বিতীয়ত কেউ এটা ধারণা করতে পারে যে, স্রষ্টার মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করলে তিনি খুশি হবেন। কেউ কেউ এই মূর্তিকে স্রষ্টা এবং মানুষের মাঝে সেতু বন্ধন হিসেবে মনে করতে পারে। মূর্তি পূজার সর্বশেষ যে সম্ভাব্য কারণটি থাকতে পারে তা হচ্ছে মানুষের মধ্যে সব সময় তার কল্পনার বিষয়কে বাস্তবে রূপ দেয়ার একটা প্রবণতা কাজ করে। এই প্রবণতা থেকেই মানুষ তার কল্পনার বিমূর্ত স্রষ্টাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে মূর্তিমান করে তুলতে পারে।

উত্তর : ৮. প্রাকৃতিক বিষয়কে পূজনীয় বানাবার সম্ভাব্য কারণ

সর্বোচ্চ সত্তার সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। বিশেষভাবে যেসব প্রাকৃতিক বিষয় মানুষের কল্যাণ বা ক্ষতি করতে পারে সেগুলো নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠতে পারে মানুষ। স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক বিষয়গুলো মানুষের ধরা ছোঁয়ার এবং সীমিত জ্ঞানে অনুভবের বাইরে হওয়ায় তাদের নিয়ে কুসংস্কার তৈরি হবার সুযোগ থাকে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে এভাবে এক সময় মানুষ উপাস্য বানিয়ে ফেলে এবং তাদের কাছে সাহায্য চাইতে থাকে। ইসলামই প্রথম ঘোষণা দেয় যে এ সকল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াই আল্লাহর সৃষ্ট এবং তাঁর অধীন। ইসলাম আরো ঘোষণা দেয় যে এসবকে আল্লাহর সাথে শরিক করা বা তাঁর বিকল্প বানানো যাবে না।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৬:৭৪-৭৯, ৪১:৩৭

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ১৯:৪১-৪২, ২৫:৩, ২১.৫১-৬৭

এ-৪ শিরক-এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন ১. বহু ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

২. জরাস্ত্রবাদ (অর্থাৎ ভালো কাজের জন্য একজন এবং খারাপ কাজের জন্য একজন এই দুই স্রষ্টার অস্তিত্ববাদ) সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য কি?

৩. শয়তান, পূজা, যাদু, অতীন্দ্রীয় চর্চা ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৪. পীর পূজা, শাসক পূজা, নবীদের আল্লাহর সমতুল্য মনে করা ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৫. কুরআন যীশুখ্রিস্টাকে কিভাবে চিহ্নিত করে?

উত্তর : ১. বহুঈশ্বরবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম বহুঈশ্বরবাদকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, সমগ্র বিশ্ব জগতের স্থিতি ও শৃঙ্খলা একক সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ। সমগ্র জগৎ একক স্রষ্টার একক ইচ্ছায় সৃষ্ট এবং পরিচালিত। যদি কোনোভাবে একাধিক স্রষ্টা থাকত তবে অবশ্যই মহা জগতের অনুপম সুশৃঙ্খল পরিচালন ব্যাহত হতো। একাধিক স্রষ্টা থাকলে তাদের মধ্যে কলহ, বিবাদ সৃষ্টি হতো। বস্তুত বহুঈশ্বরবাদ একটি অবাস্তব ধারণা।

উত্তর : ২. জরাস্ত্রবাদ (দুই খোদা- একজন কল্যাণের এবং একজন মন্দের) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

এই ধরনের বহুঈশ্বারবাদ ভালো কাজের জন্য একজন এবং মন্দ কাজের জন্য একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। এ ধরনের স্রষ্টা সম্পর্কে দুটো ধারণা করা যায় যথা- (ক) দুই স্রষ্টাই সমান শক্তির অধিকারী (খ) দুই স্রষ্টার মধ্যে একজন অপরজনের চেয়ে বেশি শক্তির অধিকারী। প্রথম ধারণাটি এজন্যে ভুল যে, সমান শক্তির অধিকারী দুইজন পরস্পর বিরোধী স্রষ্টার মধ্যে দ্বন্দ্ব জগতের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করত। দ্বিতীয় ধারণাটি এ জন্যে ভুল যে একজন স্রষ্টা বেশি শক্তিশালী হলে অপরজনকে তার সাপেক্ষে দুর্বল হতে হবে। কিন্তু স্রষ্টাতো কখনোও দুর্বল হওয়ার কথা নয়। কাজেই সমগ্র জগতের একজনই স্রষ্টা আছেন এটাই বাস্তবতা।

উত্তর : ৩. শয়তান পূজা, যাদু, জ্বীন সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

মুসলমানদের শয়তান, ফেরেশতা, জ্বীন, অধিনশ্বর আত্মা ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়। কিন্তু খোদার ইচ্ছার বাইরে মানুষের কোনো কল্যাণ বা ক্ষতি

করার কোনো স্বাধীন সুযোগ এদের নেই। কাজেই এসবের পূজা করা আল্লাহর একত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সমান। রাসূল (সা:) যাদুতে বিশ্বাস করাকে ঈমান বিরোধী কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। যারা এসব অদেখা বিষয়ের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে চায় তাদেরকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে কুরআন বলেছে।

উত্তর : ৪. মানব পূজা প্রসঙ্গে ইসলাম

মানব পূজা বিভিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে। এগুলো সবই ইসলামের একত্ববাদের বিরোধী। যারা পূর্ব পুরুষের পূজা করে তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে যে, আল্লাহই মানুষকে এবং তাদের পূর্ব পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই একমাত্র আল্লাহই উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। ধার্মিক ব্যক্তির পূজা করাও ইসলাম বিরোধী, এমনকি তাঁরা যদি নবী-রাসূলও হন। নবী রাসূলসহ সকল মানুষ আল্লাহরই সৃষ্টি। তাদের কাউকে উপাসনার আসনে স্থান দেয়া যাবে না।

উত্তর : ৫ যীশু সম্পর্কে কুরআন

ইসলাম মানুষ এবং স্রষ্টার মাঝামাঝি কোনো ঐশ্বরিক সৃষ্টির ধারণা প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ্ এক এবং একমাত্র তিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা। কুরআনের অনেক জায়গায় ঈসা (আ:)-এর উল্লেখ এসেছে। কিন্তু সর্বত্র একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঈসা (আ:) এবং তার মা ছিলেন সাধারণ মানুষ মাত্র। তারা মানুষের মতোই খেতেন, রোগ, শোক, বিপদ, জন্ম ও মৃত্যুকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। ঈসা (আ:) অন্যান্য নবীদের মতো নিজেকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরিচয় দিতেন। কাজেই এ ধারণা ভুল যে, তিনি কখনও আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর নিজের উপাসনা করতে মানুষকে বলেছেন। একমাত্র আল্লাহই সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রভু এবং পালনকর্তা। একমাত্র তারই আনুগত্য করতে হবে। কুরআন বলে-

> আল্লাহ্ এক তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন- সবই তাঁর মুখাপেক্ষী।
>
> তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি।
>
> তার সমকক্ষ বা সমতূল্য কেউ নেই। (সূরা- ১১২, আল-কুরআন)

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ২১:২১-২২, ২৩:৯১

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ১৬:৫১-৫২, ১০:১০৮

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৩৬:৬০, ৬:১৪-১৫, ১০:১৫

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৪৪:৮, ২৬:২৩-২৬, ২:২১-২২

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ১১২, ৬:১০১-২, ৫:৭৫-৭৬, ৩:৭৯-

এ-৫ শিরক এবং আল্লাহ্ শব্দের সংজ্ঞা

প্রশ্ন ১. ইবাদাত ও অন্ধ আনুগত্য বা অনুসরণ এর পার্থক্য কি?

২. স্বৈরশাসক এর আনুগত্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৩. আত্ম-অহমিকা, গৌরব ও আত্মপূজা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৪. সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৫. আল্লাহ্ শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

৬. আল্লাহর জাত-গুণ (Essence of God) সম্পর্কে আমাদের সামান্য জ্ঞান দিয়ে কোনো আলোচনা বা চিন্তা করা যায় না। আল্লাহর গুণবাচক বৈশিষ্ট্য আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করি যেসব গুণ মানুষেরও আছে। (যেমন আল্লাহ দেখেন, শোনেন ইত্যাদি)। এক্ষেত্রে এসব গুণ এর আলোচনায় কি সতর্কতা নেয়া উচিত?

৭. বাইবেল মতে আল্লাহ মানুষকে নিজের প্রতিবিম্ব তৈরি করেছেন- এব্যাপারে ইসলামে বক্তব্য কি?

৮. আল্লাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কোনটি?

উত্তর : ১. অন্ধ আনুগত্য ও ভ্রান্ত ইবাদাত

ইসলাম মতে কোনো মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে ইবাদাতের জন্য মাথা নত করবে না। আল্লাহ ছাড়া কারো অন্ধ আনুগত্য করা যাবে না। কেউ যদি আল্লাহ্র বিধানের পরিপন্থি আদেশ করে তবে সে আদেশ মানা যাবে না। এ ধরনের অন্ধ আনুগত্য ইসলামের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ইবাদাত। আদী ইবনে হাতেম তায়ীকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা:) এ ধরনের তাওহীদ বিরোধী আনুগত্যের বর্ণনা দিয়েছেন।

উত্তর : ২. স্বৈরশাসকের আনুগত্য সম্পর্কে ইসলাম

আল্লাহর বিধিনিষেধ ও ইবাদাতের তোয়াক্কা না করে স্বৈরশাসকের অন্ধ আনুগত্য করা ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক এর সমতুল্য। আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকারকারী অথবা বিরোধীতাকারী স্বৈরশাসকের আনুগত্য করা মানে তাকে আল্লাহর উপরে ক্ষমতাবান মনে করা। কুরআন মতে যেসব শাসক আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে বিচার ফায়সালা করে না তারা জালেম, ফাসেক এবং কাফের। যদিও তারা নিজেদের মুমীন বলে দাবি করে। এদের আনুগত্য করতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্যে ইসলামের ইতিহাস জুড়ে দেখা যায় মুসলমানরা সব সময় স্বৈরশাসন এর বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে। ইসলামে সীজার বিষয়ে সীজার এর আনুগত্য আর স্রষ্টার বিষয়ে স্রষ্টার আনুগত্যের কোনো সুযোগ নেই। এখানে সবাইকেই আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে।

উত্তর : ৩. আত্মঅহমিকা, গৌরব ও আত্মপূজা প্রসঙ্গে

প্রকাশ্য আত্মপূজা যা ফেরাউনের মধ্যে দেখা গিয়েছে বা সুপ্ত আত্মপূজা (যেমন ভুল ঠিক নির্বিশেষে নিজের চিন্তাকেই সর্বোচ্চ স্থান দেয়া) দুটোই ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বস্তুত আত্মপূজা এক ধরনের শিরক। কারণ তা আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বিদ্রোহের শামিল।

উত্তর : ৪. প্যানথেইজম (Pantheism) -

স্রষ্টা তার সৃষ্টির মাঝে বিলিন এই দর্শন একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। কারণ এ থেকে এই ধারণাই তৈরি হয় যে আল্লাহর শক্তি এবং বৈশিষ্ট্য তার সৃষ্টিকূলের মধ্যেও বর্তমান। এটা তাওহীদবাদ এর বিরুদ্ধে এক চরমপন্থী ধারণা।

উত্তর : ৫-৬. আল্লাহ্ শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

আল্লাহ সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায় কয়েকটি বিষয় সতর্কভাবে খেয়াল রাখা উচিত। প্রথমত আল্লাহর জাত (Essence) ও সিফাতকে (Attributes) পৃথক করা উচিত। মানুষের সীমিত কল্পনাশক্তি ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর জাত সত্তা সম্পর্কে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে তাদের পক্ষে আল্লাহর কিছু গুণ উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এসব গুণের সমালোচনা ও উপলব্ধির সময় মানবিক শব্দ প্রয়োগে সতর্ক থাকা উচিত। যেমন আল্লাহর জ্ঞান, তার দেখা-শোনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষের এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে চিন্তা করা যাবে না।

সর্বশেষে ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে আল্লাহর কোনো দৈহিক অবয়ব চিন্তা করা বা তৈরি করা যাবে না। কারণ এটা হবে তাকে সীমায়িত করার মতো ধৃষ্টতা।

উত্তর : ৭. বাইবেল বর্ণিত 'স্রষ্টা মানুষকে নিজের প্রতিবিম্বে তৈরি করেছেন' এই উক্তি সম্পর্কে ইসলাম

ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে আল্লাহর কোনো অবয়ব নেই। তাঁর অবয়ব থাকলে তিনি তার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তেন। আল্লাহ্ অসীম অশেষ। আল্লাহ্ দেখেন শুনেন। কিন্তু এসবের জন্য মানুষের মতো চোখ, কান এর প্রয়োজন তাঁর নেই। আল্লাহ্ মানুষকে তার প্রতিবিম্বে তৈরি করেছেন এমন ধারণা ভুল এবং বিপদজনক। কারণ এর থেকে মানুষ আল্লাহর প্রতিচ্ছবি, মূর্তি তৈরির চেষ্টা করে। এসব মূর্তিতে শিল্পীর স্থান-কালের প্রতিফলন ঘটে (যেমন ইউরোপে রেঁনেসার পর গ্রিক-রোমান বৈশিষ্ট্যে একজন সাদা মানুষের রূপে প্রভুর মূর্তি এবং ছবি তৈরি হয়েছিল)। মুসলমানদের জন্য আল্লাহর কোনো অবয়বের ধারণার প্রয়োজন নেই। তাদের অন্তরে স্রষ্টা আল্লাহর আধ্যাত্মিক ভাবমূর্তি থাকাই যথেষ্ট।

উত্তর : ৮. আল্লাহর গুণ (সিফাত) ও বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর প্রথম এবং সবচাইতে বড় গুণ হচ্ছে তিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা এবং এর একক সার্বভৌম প্রভু। সমগ্র জগতে তাঁর এই প্রভুত্বের কোনো অংশীদার নেই।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৯:৩১ এই আয়াত নাযিল হবার পর রাসূল (সা:)-এর সাহাবী আদী ইবনে হাতেম দায়ী, যিনি খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতেন, তিনি রাসূলকে বলতে চান যে, খ্রিস্টানরা তো চার্চের যাজকদের উপাসনা করে না। তার উত্তরে রাসূল (সা:) বলেন যে, এটা কি সত্য নয় যাজকরা নিষিদ্ধ বিষয়কে অনুমোদন দিয়েছেন আবার অনুমোদিত বিষয়কে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৫:৪৭-৫০

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৭৯:২৩-২৪, ২৫:৪৩

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ৪২:১১-১২, ৬:১০৩, সূরা ১১২

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ১:২৭

প্রশ্ন ৮. আল কুরআন ৬:১০২, ৭:৫৪, ৪২:১২

এ-৬ আল্লাহর ঐশী গুণাবলী-১

প্রশ্ন ১. আল্লাহ যেসব কিছু সৃষ্টির পূর্বেও বিরাজমান ছিলেন এবং তিনি চিরঞ্জীব এই ধারণা ইসলামে কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?

২. ইহুদী-খ্রিস্টান মতবাদ অনুসারে প্রভুর বিশ্রাম প্রয়োজন হয় (Sabbath)–এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৩. আল্লাহর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সর্বদর্শিতার বিষয়ে ইসলাম কি বলে?

৪. আল্লাহ কি মানুষের অন্তরের অপ্রকাশিত চিন্তা ও ধারণা সম্পর্কেও জানেন?

৫. আল্লাহর গায়েবী (Omnisceince) জ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্যের সাথে ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার কোনো মিল আছে কি?

৬. অনেকে বলেন যে, মুসলিম ধ্যানধারণায় আল্লাহকে উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয় যা তাকে সৃষ্টিকূল থেকে দূরে নিয়ে যায়। মানুষ চাইলেই কি আল্লাহকে পেতে পারে?

উত্তর : ১. আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং সব কিছু সৃষ্টির পূর্বেও তিনি বিরাজমান ছিলেন

ইসলাম বলে যখন কিছুই ছিল না তখনও আল্লাহ ছিলেন, যখন কিছুই থাকবে না তখনও আল্লাহ থাকবেন। ইহুদী-খ্রিস্টবাদেও বলা হয় যে আল্লাহ আলফা এবং ওমেগা অর্থাৎ তিনি শুরুতে ছিলেন এবং শেষে থাকবেন। আল্লাহর এই অসীম সত্তা উপলব্ধি করার জন্য তার সৃষ্টি জগতের বিশালত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। আমাদের জানা সৃষ্টি জগতও আমাদের কল্পনাতীত রকমের বিশাল অসীম। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবী থেকে দূরতম নক্ষত্রের দূরত্ব দুই হাজার বিলিয়ন আলোক বর্ষ। অর্থাৎ উক্ত নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে দুই হাজার বিলিয়ন বছর লাগবে (আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল)। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় দেড় সেকেন্ড। এমন জগতের স্রষ্টা কত অসীম এবং বিশাল। মানুষের কল্পনা শক্তি তার অসীমত্ব বিবেচনায় অক্ষম। তিনি চিরঞ্জীব, আদি ও অন্ত। কুরআনের প্রখ্যাত আয়াত আয়াতুল কুরসী থেকে আল্লাহর ৭টি ঐশ্বরিক গুণের কথা জানা যায়।

ক) আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই

খ) তিনি চিরঞ্জীব (The Everliving)।

গ) তিনি সর্বকাল ধরে অবস্থানরত (The Eternal)।

ঘ) তিনি সকল জ্ঞানের আধার।

ঙ) পৃথিবী থেকে শুরু করে সারা সৃষ্টি জগতে তার শক্তি, ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব ও সিংহাসনের বিস্তৃতি।

চ) তার অনুমোদন ছাড়া কিছুই সংগঠিত হতে পারে না।

ছ) কোনো মানবিক দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করে না।

উত্তর : ২. ইহুদী-খ্রিস্টান মতবাদ অনুসারে স্রষ্টার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়- ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ বলে যে, ছয়দিন ধরে জগৎ সৃষ্টির পর সপ্তম দিন স্রষ্টা বিশ্রাম নেন। ইসলামে এমন ধারণার কোনো স্বীকৃতি নেই। কুরআন বলে যে, কোনো মানবিক দুর্বলতা (যেমন ক্লান্তি, তন্দ্রা) ইত্যাদি আল্লাহকে স্পর্শ করে না। তাকে মানুষের মতো হাত ধরে কিছু তৈরি করতেও হয় না। যখনই তিনি কিছু তৈরির সিদ্ধান্ত নেন তখন 'কুন' (হয়ে যাও) বলা মাত্রই তা তৈরি হয়ে যায়। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) বেহেশতের বাগানে আল্লাহকে পায়চারীরত দেখেন এবং তার কণ্ঠ শুনেন। এসব উদ্ধৃতিরও কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই। ইহুদী-খ্রিস্টানদের মতো কোনো বিশ্রাম দিবস/পবিত্র দিবস (Sabbath) মুসলমানদের নেই। শুক্রবার মুসলমানদের বিশেষ জামায়াতে নামাজের দিন। নামাজের পর স্বাভাবিক কাজকর্মে মুসলমানরা ফিরে যায়।

উত্তর : ৩. আল্লাহর জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা

কুরআনের অনেক জায়গাতেই আল্লাহর জ্ঞান এর অসীমত্ব সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "তাঁর কাছে আছে সব অদেখা জগতের চাবি। তিনি ছাড়া কেউ তার খবর রাখেন না। ভূমিতে এবং সমুদ্রে কি আছে তা তিনি জানেন। তার অজ্ঞাতে একটি গাছের পাতাও পড়ে না। পৃথিবীর কোনো অন্ধকার স্থলেও তার অজ্ঞাতে কোনো বীজ অঙ্কুরিত হয় না। তার অজান্তে কোনো মাটি সিক্ত বা শুকনো হয় না। এসবই স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়।" (আল কুরআন ৬:৫৯)

উত্তর : ৪. অদেখা সব বিষয়ে আল্লাহ্ জ্ঞাত

আল্লাহর জ্ঞান হচ্ছে অসীম, চূড়ান্ত এবং নির্ভুল। তিনি প্রকাশিত-অপ্রকাশিত, দেখা-অদেখা সব বিষয়ে অবহিত। মানুষ গোপনে যা পরামর্শ করে তাও আল্লাহ্ দেখেন ও জানেন। মানুষের মনের ভেতর কি চিন্তা আছে তা সে অন্যের কাছে প্রকাশ না করলেও আল্লাহর কাছে তা গোপন থাকে না।

উত্তর : ৫. ইসলামে বর্ণিত আল্লাহর গায়েবী জ্ঞান এর সাথে ইহুদী-খ্রিস্টান বর্ণনার তুলনা

আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার সাথে বাইবেল, ইনজিলের বর্ণনার কিছু মিল আছে। তবে এক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনা অনেক স্পষ্ট, অভ্রান্ত। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে যে বাবেল টাওয়ার (Tower of Babel) নির্মাণের মতো জ্ঞান ও কলাকৌশল যে মানুষ আয়ত্ব করতে পারবে তা স্রষ্টার জানা ছিল না। যখন মানুষ এ কাজ করে ফেলল

তখন স্রষ্টা শঙ্কিত হলেন যে মানুষ আরো ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি মানুষকে বিভিন্ন ভাষা জাতিতে বিভক্ত করে দিলেন যাতে তারা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করতে না পারে এবং বিভ্রান্তিতে পড়ে।

অন্যদিকে ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দেয় যে আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা হচ্ছে চূড়ান্ত। মানুষের কোনো কাজেই তার আশ্চর্য বা শঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই। বাইবেল আরো বলে যে শয়তানকে তৈরির জন্য স্রষ্টা অনুতাপ করেন। কিন্তু কুরআন বলে যে, আল্লাহ ভ্রান্তির উর্ধ্বে। ভুল শুধু মানুষেরই হতে পারে। তাদের অনুতাপের প্রশ্ন আসে। ইসলাম আরও বলে আল্লাহ মানুষের সব বিষয়ে অবহিত। কাজেই মানুষের অবস্থা দেখবার জন্য অবতাররূপে তার পৃথিবীতে আসার প্রয়োজন নেই।

উত্তর : ৬. আল্লাহকে পাবার উপায়

পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, মুসলমানদের স্রষ্টা অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করেন তিনি বান্দার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বাস্তবে এটা ঠিক নয়। আল্লাহ্ সব সময় সর্বত্র ব্যাপ্ত। তিনি সকল মানুষের প্রভু এবং আপন। কুরআনের একটি বাদে সকল সুরা শুরু হয়েছে, "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম" দিয়ে। এখানে আল্লাহর দুটো নাম উচ্চারিত হয়েছে 'রাহমান' ও 'রাহিম' (দয়াময়, অনন্ত দাতা)– এই শব্দ দুটোর ব্যাপক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। কারণ 'রাহিম' (দয়ার গুণ) অন্য কারো মধ্যেও থাকতে পারে কিন্তু 'রাহমান' একমাত্র আল্লাহরই। অর্থাৎ তিনি সকল দয়া ও ক্ষমার ভাণ্ডার।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৫৭:৩, ২৫:৫৮, ২৮:৮৮, ৫৫:২৭-২৮, ২:২৫৫

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ২:২, ৩:৮, ৫:৩৮, ৩২:৪

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৩:৫-৬, ৩১:৩৪, ৬:৫৯

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৫৮:৭, ৬৭:১৩, ১৩:১৪

প্রশ্ন ৫. জেনেসিস ১১:৫-৭, Exod ৩২:১৪

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ৭:১৫৬

এ-৭ আল্লাহর ঐশী গুণাবলী (২)

প্রশ্ন ১. মানুষ যখন বিপদে বা প্রয়োজনে আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ কতটা নিকটে থাকেন?

২. আল্লাহর ক্ষমার গুণের আলোকে ইসলাম মানুষের আদিপাপকে (Original sin) কিভাবে বিবেচনা করে?

৩. যদি আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) কে আল্লাহ ক্ষমাই করেন তবে তাদের পৃথিবীতে পাঠাবার কারণ কি?

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ কোনো পাপ করলে তওবা করার ব্যবস্থা কি?

উত্তর : আল্লাহ অত্যন্ত কাছে

ইসলামে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশালত্ব ঘোষণার মানে এই নয় যে, আল্লাহ বান্দা থেকে দূরে থাকেন। কুরআন ও হাদিস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ বান্দার শুধু কাছেরই নন বরং তার সবচাইতে আপন ও দয়াবান বন্ধু। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা বান্দার সাথে আল্লাহর সরাসরি সম্পর্কের কথা বলে। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী বা যাজকের প্রয়োজন ইসলামে নেই। আর কোনো ধর্মে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির এমন সরাসরি সম্পর্কের স্বীকৃতি নেই।

উত্তর : ২. আদি পাপের (Original sin) ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

খ্রিস্টবাদ মতে আদম (আ:) এবং হাওয়া (আ:) নিষিদ্ধ ফল খেয়ে আদি পাপ করেছিলেন। এই পাপের বোঝা মানুষকে আজন্ম বইতে হবে যা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় যীশুখ্রিস্টকে ত্রাণকর্তা মনে করা। ইসলাম বলে যে, মানুষ পাপ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে তার কোনো আদি পাপ নেই। ইসলামে আদিপাপের ধারণা প্রত্যাখ্যাত হবার পেছনে পাঁচটি প্রধান যুক্তি হলো

ক) আল্লাহ জানেন যে মানুষ পাপে আক্রান্ত হতে পারে। কারণ মানুষ বস্তু এবং আধ্যাত্মিক উভয় উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি। সর্বজ্ঞাত ন্যায়ের প্রতীক আল্লাহর পক্ষে এটা অসম্ভব যে প্রথম মানব মানবীর ভুলের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে তিনি পাপী সাব্যস্ত করবেন।

খ) কুরআন মতে আদম (আ:) এবং হাওয়া (আ:) উভয়ে ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান এবং আল্লাহ ক্ষমা করেন। কাজেই ক্ষমা প্রাপ্ত বিষয়ে পাপের বোঝা টানার প্রশ্ন অবান্তর।

গ) আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ন্যায়বান। তার পক্ষে এটা অসম্ভব যে আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:) ক্ষমা চাইবার পরও তাদের ক্ষমা করবেন না বরং তাদের সকল বংশধরদের উপর এই পাপের দায়ভার চাপিয়ে দেবেন।

ঘ) আল্লাহ আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) কে ক্ষমার করার পরই পৃথিবীতে পাঠান। কাজেই তাদের বংশধরদের তথাকথিত আদি পাপের বোঝা বহনের আর কোনো দায়ভার নেই।

ঙ) আল্লাহ একজনের পাপের জন্য আর একজনকে কখনও দোষী সাব্যস্ত করেন না। তিনি বলেন, '... একের বোঝা অপরের উপর চাপানো হবে না।'

উত্তর : ৩. আদম (আ:) এবং হাওয়া (আ:) কে কি ভুলের শাস্তি হিসাবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল?

কুরআন মতে আদম (আ:) এবং হাওয়া (আ:) কে কোনো ভুলের শাস্তি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি। বরং কুরআনে দেখা যায় আল্লাহ আদম (আ:) কে তৈরির আগেই ফেরেশতাদের বলেন যে, তিনি পৃথিবীতে তাঁর খলিফা (প্রতিনিধি) প্রেরণ করবেন। আদম (আ:) পৃথিবীতে আল্লাহর প্রথম খলিফা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সৃষ্টির পর পরই তাঁদের কেন পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি। এর কারণ সম্ভবত আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠাবার আগে বেহেশতে রেখে তাদের সবকিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

উত্তর : ৪. ইসলামে তওবার বিধান

ইসলামে ভুল বা পাপের জন্য তওবা (অনুতাপ) অত্যন্ত সহজ এবং সরল পথ। এর চারটি দিক আছে :

ক) পাপের কাজ আন্তরিকভাবে বন্ধ রাখতে হবে অথবা অন্তত তা বন্ধের দৃঢ় ইচ্ছা রাখতে হবে।

খ) পাপ বা ভুলের জন্য তীব্র অনুতাপ বোধ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

গ) ঐ পাপ বা ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে।

ঘ) যদি ঐ পাপের সাথে কারো অধিকার ছিনিয়ে নেবার ঘটনা জড়িত থাকে তবে তওবার পূর্বেই তা ফিরিয়ে দিতে হবে (যেমন কারো সম্পদ আত্মসাৎ বা চুরি করা হলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে)।

একমাত্র আল্লাহই ক্ষমা করার অধিকার রাখেন। তাই তার কাছেই ক্ষমা চাইতে হবে। ইসলামে অন্য ধর্মের মতো কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৫০:১৬

এক বেদুইন রাসুল (সা:) এর কাছে এসে জানতে চান যে, আল্লাহ্ কি এত কাছে যে তার সাথে একান্ত বিষয় আলাপ করা যায় নাকি খুব দূরে যে চিৎকার করে তাকে কথা শোনাতে হয়। তখন এই প্রশ্নের জবাবে দ্বিতীয় সূরার ১৮৬ নং আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষের অতি কাছে।

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৭:২২, ২:৩৭, ৫৩:৩৮

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ২:৩০ হাদিসে রাসূল (সা:) বলেন যে, প্রত্যেক নবজাত শিশু নিষ্পাপ এবং খাঁটি।

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ১৫:৪৯-৫০, ১১:১১৪, ৩৯:৫৩-৫৪, ৩:১৩৫, ২০:৮২

এ-৮ একত্ববাদে বিশ্বাসের বাস্তব প্রয়োগ

প্রশ্ন ১. যারা বলে যে, 'ইসলাম খুবই সরল (Simple) এবং অশিক্ষিত বেদুইনের জন্যই প্রযোজ্য' তাদের সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

২. কালেমায় বিশ্বাস কি মুসলমানদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ও সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে?

৩. আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের বাস্তবে কি কি প্রয়োগ দেখা যায়?

৪. আল্লাহর একত্বের (Uniqueness) বিশ্বাসের বাস্তবে কি প্রয়োগ দেখা যায়?

৫. আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাস স্থাপন করার কি সুফল আমরা দেখি?

৬. আল্লাহর ক্ষমাশীলতার কোনো কোনো সুফল আমরা ভোগ করি?

৭. আল্লাহর দয়ার কি প্রভাব মানবজাতির উপর পড়ে?

৮. সকল বিষয়ের উপর আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হবার কি প্রভাব মানুষের উপর আসে?

৯. আল্লাহ্ নৈকট্যের কি সুফল বা প্রভাব আমাদের উপর পড়ে?

উত্তর : ১. ইসলাম একটি সহজ পদ্ধতি নাকি অতি সাধারণ (Simple)

আধুনিকতার জটিল মারপ্যাঁচ নিয়ে গবেষণায় ক্লান্ত পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা যখন ইসলামের একত্ববাদের সরল-সুন্দর রূপ দেখেন তখন প্রথমত এটাকে খুবই সোজা এবং অতি সাধারণ বিধান যা বর্বর মূর্তিপূজারী বেদুইনের মুক্তির জন্যই প্রযোজ্য বলে চিহ্নিত করতে চান। অথচ বাস্তবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত সত্যই সরলতার সাথে গভীরতাকে সম্পৃক্ত করেছে। কাজেই কোনো বিষয় সহজ হলেই অতি সাধারণ হবে এমন ধারণা করা ঠিক নয়। ইসলামের বিশ্বাসকে যেমন একাধারে এক খোদায় বিশ্বাসে সংক্ষেপিত করা যায় আবার সেই খোদার অস্তিত্ব, অবদান ও প্রভাবের ব্যাখ্যাও তেমনি বিশাল।

উত্তর : ২-৩. আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের ব্যবহারিক প্রয়োগ

আল্লাহর প্রতি বৈশিষ্ট্যের বাস্তব সুফল মানুষ তথা বিশ্বাসীরা ভোগ করেন। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস থেকেই মানুষের মাঝে একত্বের অনুভূতি জাগে। জাতি বর্ণ গোত্র ভাষা নির্বিশেষে সব মানুষ একই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর বান্দা। কাজেই সবার অধিকার ও মর্যাদা সমান। ইসলামে এ ধারণা প্রচারের সুযোগ নেই যে আমার প্রভু বা তোমার প্রভু, বরং ইসলাম সব মানুষকে বলে আল্লাহকে ডাকতে তাদের প্রভু হিসেবে।

মানুষের মাঝে ছোট বড় ভেদ করার কুসংস্কার দূর করে একত্ববাদ। এটা আরো শিক্ষা দেয় যে, সমগ্র মানবগোষ্ঠী এক জাতি। একই শিক্ষা নিয়ে নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে এসেছিলেন। তারা সবাই একই দ্বীনে বিশ্বাসী এবং ভাই। কাজেই সব নবীর অনুসারীরাই ভাই। রাসূল (সা:) এর আগমন এই আদি দ্বীনকে পূর্ণতা ও সমাপ্তি দেবার জন্যই।

উত্তর : ৪. আল্লাহর একত্বের বিশ্বাসের প্রয়োগ

সমগ্র জগতের উপর আল্লাহর একক সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাস মানুষকে আরও সাহসী করে। মানুষকে এই ধারণা দেয় যে চন্দ্র, সূর্য গ্রহ, নক্ষত্রসহ সমগ্র প্রকতিকে ভয় করার কিছুই নেই।

এসবই আল্লাহর অধীন এবং তিনি মানুষের কল্যাণের জন্যই এদের সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তাঁর সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য অনুধাবন করবে এবং আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে নিজেকে এবং পৃথিবীকে পরিচালিত করবে।

উত্তর : ৫. আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রভাব

প্রকাশ্য এবং গোপন সব বিষয়ের উপর আল্লাহর জ্ঞান থাকার ব্যাপারে অবহিত হওয়ার কারণে বিশ্বাসীরা যে কোনো খারাপ কাজ থেকে নিজেদের দূরে রাখে। আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাস তাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করে। এভাবে ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজ পরিশুদ্ধ হবে। বিশ্বাসীরা সব সময়ই তাদের চিন্তা, কথা ও কাজ দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চাইবে। অন্যদিকে অবিশ্বাসীরা সামাজিক চাপে অথবা বস্তুগত লাভের জন্যে নৈতিক আচরণ করে থাকে। আল্লাহর সঠিক প্রজ্ঞায় বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর আদেশাবলী বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন আল্লাহর শিক্ষাই বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হয়।

উত্তর : ৬. আল্লাহর ক্ষমাশীলতা

আল্লাহর ক্ষমাশীলতার কারণে মানুষ তথাকথিত আদি পাপের দায় থেকে মুক্ত হয়। ধর্মের নামে এক শ্রেণীর যাজক বা গুরুর প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়। কারণ আল্লাহর এ ক্ষমাশীলতার সুযোগ নেবার জন্যে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর এই গুণের কারণে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের কাজ ও দায়িত্বের ব্যাপারে আরো যত্নবান হয়। কারণ তাকে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় চলেই তাঁর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা অর্জন করতে হয়।

উত্তর : ৭. আল্লাহর দয়া

মানুষ তাকে দেয়া আল্লাহর সকল দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য তার শোকর করবে। বস্তুত আলো বাতাস পানি থেকে শুরু করে জীবনের সব কিছুই মানুষ আল্লাহর দয়াতেই লাভ করে। আল্লাহর এই দয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কারণে মানুষের মধ্যে নিশ্চিন্ততাবোধ (Sense of security) আসে। কারণ সে জানে যে আল্লাহ তার সব বিপদ-আপদ মোকাবিলার ব্যবস্থা রেখেছেন।

উত্তর : ৮. আল্লাহর চূড়ান্ত এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা

আল্লাহর এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার কারণে মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনগত্য করে না। এ কারণেই ইতিহাসে দেখা যায় মুসলমানরা সব সময় অন্যায় অবিচার জুলুম, স্বৈরশাসনকে রুখে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কিছুই হতে পারে না। এই অনুভূতি মানুষের মনের অহেতুক ভয়-ভীতি দূর করে। মানুষ তার হাতে ক্ষমতা আসলেও সে ক্ষমতার দাপটে অন্ধ হয় না বরং সে আরো বিনয়ী হয়। কারণ আল্লাহই তাকে ক্ষমতা, ঐশ্বর্য, সম্পদ, সম্মান দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলেই তা কেড়ে নিতে পারেন। আল্লাহর চূড়ান্ত ক্ষমতার নিচে সব মানুষ সমান। এই বোধ মানুষকে সব কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে করতে অনুপ্রাণিত করে।

উত্তর : ৯. আল্লাহর নৈকট্য

কুরআন বলে যে, আল্লাহ মানুষের 'জুগুলার শিরা'র (Jugular vein) চেয়েও নিকটে অবস্থান করেন।

এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। তার ইবাদতের মাধ্যমেই এই নৈকট্য অর্জন সম্ভব। এই নৈকট্যের জন্য বিশ্বাসীদের অন্তর এবং হৃদয় অনাবিল প্রশান্তি বিরাজ করে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৪৭:১২

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ৮২:১৯

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ৩৯:৫৩, ১২:৮৭

প্রশ্ন ৯ আল কুরআন ৬৪:১১, ২:২৫৭, ৪৮:৪, ১৩:২৮

বি: রিসালাত

বি-১ রিসালাত এবং ওহীর প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন ১. তাওহীদের সাথে রিসালাতের সম্পর্ক কি?

২. সঠিক পথ চলার জন্য মানুষের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাধনা যথেষ্ট নয় কেন? এ জন্য নবী রাসূলের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

৩. ব্যক্তিগত ধ্যানসাধনার (Meditation) মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়া কি সম্ভব?

৪. ওহী বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : ১. তাওহীদ ও রিসালাতের সম্পর্ক

ইসলামের মূল কালেমায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর উপর বিশ্বাস থেকেই এই রিসালাতের বিশ্বাস উদ্ভূত হয়। কারণ আল্লাহর বাণী ও নির্দেশনা কোনো মানুষের মাধ্যমেই আমাদের কাছে আসতে হবে। যারা আমাদের কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করবেন এবং তাঁর নির্দেশনা আমাদের অবহিত করবেন। কালেমায় আল্লাহর বিশ্বাসের সাথে রাসূলের উপর বিশ্বাস আনলেই চলবে। বরং আদম (আ:) থেকে শুরু করে আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কুরআন এবং হাদিস এই শিক্ষাই দেয়। আল্লাহর প্রতি একত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর সৃষ্টির বিশালত্ব এটাই নিশ্চিত করে যে, এই জগৎ ও মানব সমাজ আল্লাহ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি করেছেন এবং সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পন্থা তিনি নবী রাসূলদের মাধ্যমে মানুষকে অবহিত করেন।

উত্তর : ২. নবী-রাসূলের আগমন প্রয়োজন কেন

চারটি প্রধান কারণে বিজ্ঞান মানুষকে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা দিতে অক্ষম। যে জন্যে নবী রাসূলের মাধ্যমে ওহীর জ্ঞান আবশ্যক।

ক) যদিও বিজ্ঞান জ্ঞানের এক বিশাল উৎস। তবুও তা মানুষের সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তির ফসল।

খ) বিজ্ঞান জীবনের আংশিক ব্যাখ্যাই দিতে পারে।

গ) মানব জন্মের উদ্দেশ্য, মানুষের মাঝে নৈতিক, মানবিক শিক্ষার বিষয়ে বা মানুষ দুনিয়াতে কিভাবে চলবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞান কোনো নির্দেশনা দিতে পারে না।

ঘ) মানুষের সার্বিক প্রকৃতি ও চিন্তাধারা সম্পর্কে বিজ্ঞান কোনো ধারণা করতে পারে না। ফলে এটা মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে কোনো জীবন বিধান

দিতে অক্ষম। একমাত্র আল্লাহ্ই মানুষের মনের খবর রাখেন। কাজেই তাদের সুখি করবার বিধান তিনিই দিতে পারেন।

উত্তর : ৩. ধ্যানসাধনার (Meditation) প্রসঙ্গে

'ধ্যান' করা (Meditation) কখনই ওহীর বিকল্প হতে পারে না। কারণ-

ক) এগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশেষ, এর মাধ্যমে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের কোনো দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

খ) 'ধ্যান' এর মাধ্যমে একজনের প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপরে পুরো সমাজ নি:সন্দেহে আস্থা রাখতে পারে না।

গ) 'ধ্যান' একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। এটা সাধারণত ব্যক্তিকে স্বার্থপর করে তুলে। ধ্যানকারী এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন অথবা সাধারণ জনগণের উপরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী থাকেন।

আল্লাহ্ হচ্ছেন একক এবং সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তাঁকে শুধুমাত্র সম্মান করা ও ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষ তাঁর প্রতি কর্তব্য শেষ করতে পারে না। এই জন্য প্রয়োজন তাঁর আদেশ নিষেধের প্রতি শর্তহীন আত্মসমর্পণ। একমাত্র অহির মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁর আদেশ নিষেধ পাওয়া যায়।

উত্তর : ৪. ওহীর অর্থ

ওহী হচ্ছে আল্লাহর বাণী যা তিনি তাঁর নবীর কাছে সাধারণত ফেরেস্তার জিবরাইল (আ:) ফেরেস্তার মাধ্যমে প্রেরণ করেন। নবীগণ আল্লাহর ওহী জনগণের কাছে পৌঁছে দেন। যেহেতু ওহী সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে আসে সেহেতু এর সত্যতা এবং যথার্থতার বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। এটা এমন জ্ঞান প্রদান করে যা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান সাধনা করে অর্জন করতে পারে না। নবী মনোনীত করেন স্বয়ং আল্লাহ্। কেউ স্বেচ্ছায় নবী হয়ে যেতে পারে না। ফলে নবওতের নামে মানুষের নিজের কথাকে কেউ আল্লাহর বাণী হিসেবে চালিয়ে দিতে পারে না। মেডিটেশন বা ধ্যানের নামে অসৎ ও স্বার্থবাদী ব্যক্তিরা নিজেদের কথাকেই আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিতে পারে।

ওহীর মাধ্যমে নবীরা সমাজ ও জনগণকে পরিচালনার নির্দেশ পান। তাছাড়া অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুপ্রেরণা ও পথ নির্দেশ লাভ করেন। কুরআনের মতে ওহী প্রেরণের তিনটি পদ্ধতি আছে!

ক) অনুপ্রেরণা

খ) বিশেষ পদ্ধতিতে সরাসরি রাসূলের সাথে আল্লাহর সংলাপ এবং

গ) জিবরাইল (আ:) এর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী প্রেরণ।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৪:৬৪, ৫:৭০

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৪২:৫১, ২২:৭৫, ৪:১৬৩

বি-২ ওহী এবং নবুওতের প্রকারভেদ

প্রশ্ন ১. জিবরাইল (আ:) কি কি বেশে নবীগণের কাছে আসতেন?
২. জিবরাইল (আ:) কি সাহাবাগণের সামনে কখনও রাসূলের কাছে এসেছিলেন?
৩. কেউ কেউ বলেন রাসূল (সা:) ওহী নাযিলের সময় প্রকৃতপক্ষে মৃগী রোগে (Epilepsy) ভুগতেন এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?
৪. ওহী কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়া হলো কেন?
৫. মুহাম্মদ (সা:) সর্বশেষ রাসূল কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর ওহী নাযিলের পথ কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে?
৬. ইসলাম মতে নবী কারা?
৭. নবীগণ কি মানুষ ছিলেন?

উত্তর : ১. জিবরাইল (আ:) কোনো বেশে আসতেন?

জিবরাইল (আ:) প্রথম রাসূল (সা:) এর কাছে আসেন হেরা গুহায়। তাঁর আনা প্রথম বাণী ছিল- 'পড় তোমার প্রভুর নামে' (৯৬:১)। এরপর সুদীর্ঘ ২৩ বছর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বেশে জিবরাইল (আ:) রাসূলের কাছে বাণী নিয়ে আসতেন। প্রধানত দুইভাবে জিবরাইল (আ:) আসতেন। কখনো কখনো অন্যান্য সাহাবার উপস্থিতিতে মানুষের বেশে তিনি আসতেন। আবার কখনো অদৃশ্যভাবে আসতেন। শুধুমাত্র রাসূল (সা:) তাঁর উপস্থিতি টের পেতেন।

উত্তর : ২. জিবরাইল (আ:)-এর সাহাবাদের সামনে আগমন

একবার রাসূল (সা:) সাহাবাদের নিয়ে মসজিদে বসা ছিলেন। তখন জিবরাইল (আ:) আসেন। তিনি রাসূল (সা:) এবং তাঁর সাহাবাদের ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। সাহাবারা দেখেন যে একজন অচেনা মানুষ রাসূল (সা:)-এর কাছে এসে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে চলে গেলেন। তিনি চলে যাবার পর রাসূল তাঁর পরিচয় দেবার আগ পর্যন্ত সাহাবারা তাঁকে চিনতে পারেননি। তবে অধিকাংশ সময় জিবরাইল (আ:) অদৃশ্যভাবে এসে ওহী নাযিল করতেন। যদিও এই ওহী নাযিলের বিষয়টি সাহাবারা রাসূলের ভাবভঙ্গি দেখে টের পেতেন। যেমন কখনো রাসূল (সা:) হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে অন্যদিকে মনোযোগী হতেন। কখনো তিনি কাঁপতে থাকতেন। কখনো কখনো তাঁর মুখ দিয়ে এমন উন্নত ভাষায় (যা সাহাবারা রাসূল (সা:) কে অন্য সময় বলতে শোনেননি) কুরআনের আয়াত উচ্চারিত হতে থাকতো। রাসূল (সা:) বলেন যে, তিনি ওহী নাযিলের পূর্বে একটি শব্দ শুনতেন তাতে বুঝতেন যে জিবরাইল (আ:) এসেছেন। এরপর তিনি ওহী শুনতে পেতেন।

উত্তর : ৩. রাসূল (সা:) মৃগীরোগে ভুগতেন এমন প্রচারণার জবাব

আল্লাহর ওহী প্রেরণ এর বিষয়টি সব ধর্মেই স্বীকৃত। কাজেই যখন ঈসা (আ:), মূসা (আ:) বা কোনো নবীর ক্ষেত্রেই এই প্রসঙ্গ উঠেনি রাসূল (সা:) এর প্রসঙ্গে এমন প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক। মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি তার ফিট হওয়ার সময়ের কথা মনে রাখতে পারে না। সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। লালা এবং প্রস্রাব এর উপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অথচ ইতিহাস থেকে দেখা যায় ওহী নাযিলের পর এর প্রতিটি বর্ণ রাসূল (সা:) মনে রাখতে পারতেন। মৃগী রোগীর কোনো লক্ষণ ওহী নাযিলের সময় তাঁর মধ্যে দেখা যেত না। আর কুরআন কেউ অর্থসহ পড়লে সে অবশ্যই এটা স্বীকার করবে যে এই মহাগ্রন্থ কিছুতেই কোনো মৃগীরোগীর প্রলাপ হতে পারে না।

উত্তর : ৪. ওহী শুধু নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির উপরই নাযিল হলো কেন?

আরবি ওহী শব্দের অর্থ অনুপ্রেরণা। দুই ধরণের ওহী আছে। একটি সকল জীবকেই আল্লাহ দিয়েছেন। তা হচ্ছে নির্দিষ্ট নিয়মে জীবন পরিচালনা- এটা মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবেরও আছে। নির্দিষ্ট খাবার, বিপদ-আপদ সনাক্ত করা ইত্যাদি যোগ্যতা সব প্রাণীরই আছে। এছাড়াও মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন ভালোমন্দে পার্থক্য করবার ও তার স্রষ্টাকে চিনবার যোগ্যতা।

আর একটি ওহী হচ্ছে আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা। যা আল্লাহ তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের মাধ্যমে মানুষকে প্রদান করেন। মনোনীত আদর্শ হিসেবে উপস্থাপনের যোগ্যতা রাখেন। এই যোগ্যতা সব মানুষের নেই। আল্লাহ যাকে এটা প্রদান করেন শুধু তারই এটা থাকে।

উত্তর : ৫. রাসূল (সা:) এর পর ওহী নাযিল কি বন্ধ

মুসলমানরা খতমে নবুওয়তে বিশ্বাস করে যা অর্থ রাসূল (সা:) শেষ নবী। তারপর আর কোনো নবী আসবেন না। কুরআন পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীনকে উপস্থাপন করে। তাই নতুন ওহীর আর প্রয়োজন নেই। তবে মুসলমানরা এটা বিশ্বাস করে যে ধার্মিক ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছ থেকে উম্মতের সংশোধনের জন্যে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। অবশ্য এই অনুপ্রেরণা ওহীর সমতুল্য নয়। নবুওত এবং ওহী রাসূল (সা:) এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে।

উত্তর : ৬. নবী কারা

নবী হচ্ছেন আল্লাহ মনোনীত মানুষ যার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের কাছে তাঁর বিধান পৌছান। তারা আল্লাহর বাণীকে মানুষে কাছে প্রচার করে এবং নিজের জীবনে তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করে নিজেকে আদর্শ হিসেবে মানুষের কাছে তুলে ধরেন। তবে নবীরা আল্লাহর কোনো প্রতিরূপ বা অংশ নন। কুরআন বলে যে তাঁরাও সাধারণ মানুষ মাত্র।

উত্তর : ৭. নবীরাও কি মানুষ

নবীর দায়িত্ব ও প্রকৃতি কুরআনে অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এসব উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাঁরাও সবার মতোই সাধারণ মানুষ। তাঁরা মানুষের মতই খেতেন, বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতেন, সন্তানের জন্ম দিতেন, অসুস্থ হতেন, মৃত্যু বরণ করতেন। তবে তারা ছিলেন মানুষের মাঝে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি। যারা আল্লাহর বাণীকে মানুষের কাছে পৌছাবার যোগ্যতা ও আন্তরিকতা রাখতেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৯৬:১-৫

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ১৬:৬৮, ৫:১১৪, ২০:৩৮-৩৯, ৮:১২, ১৯:১০, ৬:১১২

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ২১:৭, ৩:৫৯, ৬৪:৬, ১০:২, ৬:৯১

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ২৫:২০, ১৩:৩৮, ২৬:৬৯-৮২, ২১:৮৬, ২:৮৭, ৩:১১৪, ৭:১৮৮

বি-৩ নবীদের ইসমাহ
(নিষ্পাপ হবার বিষয়)

প্রশ্ন ১. কুরআন ও বাইবেলে বর্ণিত নবুওতের দায়িত্ব ও মর্যাদার মধ্যে কোনো মিল আছে কি?

২. নবীদের মানুষ হবার সাথে তাদের নিষ্পাপ হবার বিষয়টি কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

উত্তর : ১. বাইবেল ও কুরআন মতে নবুওত

নবুওতের দায়িত্ব ও মর্যাদার বর্ণনায় কুরআন ও বাইবেলে কিছু বিষয়ে মিল আছে। যেমন আল্লাহতে বিশ্বাস, নবী রাসূলদের প্রতি ওহী প্রেরণের বিষয় ইত্যাদি, কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারে দুই ধর্মগ্রন্থে বেশ অমিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইসলাম সঠিকভাবে সব নবী রাসূলের প্রশংসা করেছে। তাদেরকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিকে বাইবেলে কাউকে অতি মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং কোনো কোন নবী রাসূলের উপর বিভিন্ন পাপের অভিযোগ আনা হয়েছে। যেমন কেউ টেস্টামেন্টে যীশু খ্রিস্টকে অতি মর্যাদা দিয়ে উপাস্য বানানো হয়েছে। আবার ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে ইয়াকুব তাঁর ভাইকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য তাঁর বৃদ্ধ এবং অন্ধ পিতাকে মিথ্যা কথা বলে প্রতারণা করেন। এক্সোডাসে বলা হয়েছে এরন [হারুন (আ:)] বনী ইসরাইলী মূর্তিপূজারীদের সাথে বাছুরের মূর্তি পূজার বিষয়ে আপোষ করেন। বুক অব স্যামুয়েলে বলা হয়েছে দাউদ (আ:) জনৈক মহিলার সাথে ব্যভিচার করেন এবং তাঁর অপরাধ লুকানোর জন্য মহিলার স্বামীকে হত্যা করেন। এ ধরনের আরো অকে নবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে।

অন্যদিকে কুরআনে নবীদের কোনো অপরাধের বিষয়ে সামান্যতমও উল্লেখ নেই। বরং তাদের চিত্রিত করা হয়েছে সৎ, মহৎ, বিশ্বস্ত হিসেবে। সম্মান, পবিত্রতা, সততা ও আল্লাহর আনুগত্যের মডেল হিসেবে। যেমন ঈসা (আ:) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি এই দুনিয়ায় এবং আখেরাতে সম্মানিত হবেন। মুসা (আ:) সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে নির্বাচিত। রাসূল (সা:) সম্পর্কে বলা হয়েছে বিশ্ববাসীদের জন্য আদর্শ বা মহোত্তম চরিত্র।

বস্তুত কুরআনের বর্ণনাই বাস্তব এবং যৌক্তিক। নবী রাসূলরা মানুষের কাছে আদর্শের বিধান পৌছান। নিজেরা সে বিধান বাস্তবায়নের মূর্ত প্রতীক হিসাবে কাজ করেন। কাজেই তাঁদের পক্ষে বিদ্যাবাদী, প্রতারক মূর্তি পূজার সাথে আপসষকারী হওয়া বা অন্য কোনো অপরাধে জড়িত হওয়া অবাস্তব এবং অসম্ভব। ইসলাম নবী রাসূলদের নিষ্পাপ (ইসমাহ) হবার ধারণা দেয়।

উত্তর : ২. নবীরা মানুষ হয়েও নিষ্পাপ কিভাবে (কারণ ভুল করা তো মানুষের বৈশিষ্ট্য)
নবীদের নিষ্পাপ হবার বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কেন্দ্রীভূত দুটো বিষয়ে যথা-

ক) তাঁরা আল্লাহর উপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো ভুল বা অন্যায় করতে পারেন না। যেমন কোনো নবীই আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে উপাস্য বানাননি বা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেননি। কোনো নবী নিজেকে উপাস্য বানাননি। এসব ক্ষেত্রে কারো দূর্বলতা থাকলে তাঁর উপর ওহী আসতো না।

খ) তাদের দ্বারা নৈতিক অপরাধ হতে পারে না। আল্লাহর নবী মানুষের কাছে ভাল ব্যবহার ও উত্তম চরিত্রের মডেল। নবীরাও মানুষ। সাধারণ মানবীয় ভুল তাঁদের হতে পারে। এমন দু'একটি ভুলের জন্য আল্লাহও তাদের সতর্ক করেছেন। অবশ্য এসব সরল মানবীয় ভুল তাদের নিষ্পাপ হবার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে না- ভুল এবং পাপ এক নয়। নবীদের বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনা কুরআনের সাপেক্ষে কোথাও কোথাও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. জেনেসিস ২৭, এক্সোডাস ৩২:১-৬

(২) Samuel ১৯:৪১, ১৬:১২০, ১৯:৫৪, ১৯:৫১, ৩:৪৫, ৩৩:২১, ২১:৯০, ২২:৯০, ২২:৭৫, ৬:৮৬-৮৭, ২১:৭৩

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৬৯:৪৪-৪৭

রাসূল (সা:) কুরাইশ বংশের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে যখন বৈঠক করছিলেন তখন এক অন্ধ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁর কাছে কিছু প্রশ্ন জানতে চাইলে রাসূল (সা:) তাঁর চোখ সরিয়ে নেন। রাসূল (সা:) এর এই কাজের বিষয়ে কুরআনের উপরের আয়াতগুলো নাযিল হয়।

বি-৪ নবুওতের প্রকৃতি

প্রশ্ন ১ বাইবেলের পাঠকদের মনে এমন ধারণা হতে পারে যে নবী মানেই সফল ভবিষ্যৎ বক্তা। মুসলমানরা কি নবুওতের সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করার বিষয়টিকে সম্পৃক্ত মনে করে?

২. নবীদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে ইসলাম কি বলে?

৩. নবীদের মোজেজা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৪. কোন নবীর মোজেজার গুরুত্ব কি?

৫. কুরআনে কতজন নবী রাসূলের কথা বলা হয়েছে?

৬. কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী রাসূল ছাড়া অন্য নবীদের ব্যাপারে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৭. কুরআনে উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত নবীদের ব্যাপারে মুসলমানদের দায়িত্ব কি?

উত্তর : ১. নবুওত ও ভবিষ্যদ্বাণী

নবুওত এবং নবীদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। প্রথমত মুসলিম মতে শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করাই একজন নবীর একমাত্র কাজ নয়। বস্তুত নবীর বিশাল কর্মপরিধির এক সামান্য অংশ হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী করা। তাঁর মূল মিশন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে মানুষের জীবনকে পুনর্বিন্যাস করা। ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা তাঁর এই মিশন বাস্তবায়নে সহায়ক মাত্র।

উত্তর : ২. নবীদের ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার সাথে নবুওতের সম্পর্ক

নবীদের বুদ্ধিমত্তার সাথে নবুওতের সম্পর্ক হচ্ছে ব্যক্তিগত জ্ঞান প্রজ্ঞার সাথে আধ্যাত্মিক নির্দেশনার এক ভারসাম্য। তাঁরা যা প্রচার করতেন তা তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রসূত নয় বরং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত।

উত্তর : ৩-৪. নবীদের মোজেজা

মোজেজা নবুওতের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলোকে সময় ও ঘটনার প্রেক্ষিতে যথাযথভাবে বিবেচনা করা উচিৎ। কোনো অতি মূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন করা ঠিক নয়। আল্লাহ্ নবীদের তাঁর নিদর্শন হিসেবেই মোজেজা দিতেন। মোজেজা ওহীর অংশ নয়। প্রত্যক্ষ মোজেজা দেখেও অনেক অবিশ্বাসী ঈমান আনেনি।

উত্তর : ৫-৭. কুরআনে বর্ণিত ও অনুল্লিখিত নবীরা

কুরআনে পঁচিশ জন নবী রাসূলের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাঁদের উল্লেখ ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থেও পাওয়া যায়। কুরআন মতে আল্লাহ্ আরো অনেক নবী প্রেরণ করেছেন। যাদের

নাম আমরা জানি না। ব্যাপকভাবে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, সবাই একই দ্বীন-ইসলাম প্রচার করেছেন। এসব নবীর প্রতি বিশ্বাস আনা মুসলমানদের ঈমানের অংশ।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ২১:৬৮-৬৯, ২৬:৬৩, ৩:৩৮-৪০, ৩:৪৫-৪৭, ১৭:৮৮, ৪০:৭৮

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৩:১৮৩, ১৭:৯২-৯৩

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৬:৮৩-৮৬

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ৩৫:২৪, ১০:৪৭, ৪০:৭৮

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ২:১৩৬, ২:১৭৭, ৪:১৫০

বি-৫ নবুওতের প্রকৃতি ও খতমে নবুওত

প্রশ্ন ১. নবীদের মূল মিশন কি?
২. ইসলাম কি মর্যাদার ভিত্তিতে নবীদের পৃথক করেছে?
৩. খতমে নবুওতের প্রয়োজনীয়তা কি?
৪. সপ্তম শতকেই কেন নবুওতের মিশন শেষ হলো?
৫. রাসূল (সা:) এর পর আল্লাহর নির্দেশনা আসবার পথ কি চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে?

উত্তর : ১. নবীদের মিশন

শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করা আর মোযেযা দেখানোই নবীর মিশন নয়। নবীদের দায়িত্ব নিম্নরূপ :

ক) তাঁর মূল দায়িত্ব তাওহীদের ভিত্তিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা। আদম (আ:) থেকে শুরু করে সব নবীরই প্রাথমিক কাজ ছিল মানুষের মাঝে একত্ববাদ কায়েম করা।

খ) তাঁরা ছিলেন মাধ্যম, যার সাহায্যে আল্লাহ মানব জাতিকে তাঁর দিক নির্দেশনা দিতেন। তাঁরা নিজের মনগড়া কোনো নির্দেশনা দিতেন না।

গ) তাঁরা মানবজাতির শিক্ষক হিসেবে আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত হতেন। তাঁরা মানুষকে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাতেন। সে পথে চলতে মানুষকে সাহায্য করতেন।

ঘ) তারা অসত্য ও অন্যায় এর মূলোৎপাটনে লড়াই করতেন। রাসূল (সা:) এর জীবনে এমন লড়াইয়ের অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়।

উত্তর : ২. মর্যাদার ভিত্তিতে নবীদের শ্রেণীবিন্যাস প্রসঙ্গে

ইসলাম সব নবীকেই একই দ্বীনের প্রচারক হিসেবে ভাইয়ের স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে তাঁদের মর্যাদা বিভিন্ন হতে পারে। কুরআনে বিশেষ যর্মাদাবান হিসেবে পাঁচ জনের কথা বলা হয়েছে। তাঁরা হলেন- নূহ (আ:), ইবরাহীম (আ:), মুসা (আ:), ঈসা (আ:) এবং মুহাম্মদ (সা:)। শেষ নবী এবং দ্বীনের পূর্ণতাদানকারী ছিলেন মুহাম্মদ (সা:) কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নবী গণ্য করা হয়।

উত্তর : ৩. খতমে নবুওয়ত

খতমে নবুওতের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে নিম্নলিখিত সত্যগুলো উপলব্ধি করতে হবে-

ক) ইসলামের মূল কথা হচ্ছে একত্ববাদ।

খ) মুসলমানরা মানবতার ঐক্যে বিশ্বাস করে।

গ) এক বিশ্ব-এক জগত।

ঘ) সমগ্র জগত এক আল্লাহর আইনে পরিচালিত হয়।

ঙ) মানবজাতির একটি মূল লক্ষ্য- পৃথিবী এবং আখেরাতে উন্নতি ও শান্তি লাভ। এসব সত্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে সমগ্র মানবজাতির জন্য এক কিতাব এবং নবুওত প্রয়োজন। যৌক্তিকভাবেই একজন নবীর প্রয়োজন যিনি এসে পূর্বে প্রচারিত সব নবীর দ্বীনকে স্বীকৃতি দিয়ে সমগ্র মানবজাতির জন্য এক দ্বীন ও কিতাব রেখে যাবেন। যা সর্বকালের সব জাতির মানুষের জন্য নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। সমগ্র মানবজাতিকে এক করবে।

উত্তর : ৪. শেষ নবী সপ্তম শতকে আসার যৌক্তিকতা

সপ্তম শতকেই কেন নবুওতের মিশন শেষ হলো তার উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় যে এটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। এর পিছনে কারণ সম্ভবত এই যে,

ক) এই সমরে মধ্যে পৃথিবীর দেশে দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা, বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল।

খ) মানব সভ্যতা আল্লাহর বাণী সংস্করণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

গ) শেষ নবীর আগে প্রচারিত ধর্মগুলো কিংবদন্তী, দর্শন ও পুরাণ দিয়ে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল।

ঘ) এ সময়ের মধ্যে মানবতা যথেষ্ট পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

উত্তর : ৫. রাসূল (সা:) এর পর কি আল্লাহর নির্দেশনা আসার পথ বন্ধ

শেষ কিতাব ঈমানের আলোকে মানুষের জীবন পরিচালনার মৌলিক ও সাধারণ নীতিগুলো দিয়েছে। এই কাঠামোর মধ্যে থেকে মুসলিম জাতির বিশেষজ্ঞরা সব যুগের, সব সময়ের, সব সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান তৈরি করতে পারবেন। কিতাবে নির্ধারিত সীমার মধ্যে আইনকে যুগের প্রয়োজনমত সংস্কার করতে পারবেন। কিন্তু রাসূল মুহাম্মদের (সা:) পর আর কোনো নবী আসবেন না এটা নিশ্চিত।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ২১:২৫, সুরা- ১১ বিভিন্ন স্থানে, ১৬:৩৬, ২:২১৩, ৩:১৬৪, ৫৭:২৫

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ২:২৮৫, ২:২৫৩, ৪৬:৩৫

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৩৩:৪০, ৭:১৫৮, ৫:৩

বি-৬ ঈসা (আ:) সম্পর্কে কুরআন

প্রশ্ন ১. কুরআনে ঈসা (আ:) এর জীবনী কিভাবে এবং কত স্থানে বর্ণিত হয়েছে?

২. কুরআনে ঈসা (আ:) কি নামে বর্ণিত হয়েছে?

৩. ঈসা (আ:) যে সমাজে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁর বর্ণনা কুরআন কিভাবে দিয়েছে?

৪. কুরআন তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে কি বলে?

৫. মরিয়ম (আ:) কি জানতেন যে তাঁর সন্তান জন্ম হবে এবং তিনি নবী হবেন?

৬. বিবি মরিয়ম (আ:) কি স্বাভাবিক ভাবেই সন্তান প্রসব করেন?

৭. ঈসা (আ:) এ জন্মের পর মানুষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কুরআন কিছু বলে কি?

৮. কুরআন ঈসা (আ:) এর অলৌকিক জন্মগ্রহণের স্বীকৃতি দিয়েছে। ঈসা (আ:) এর পিতৃপরিচয় সম্পর্কে কি মন্তব্য করবেন?

উত্তর : ১. কুরআনে ঈসা (আ:)

কুরআনে ১১টি সুরাতে ঈসা (আ:) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সুরা নং ১, ২, ৩, ৫, ৯, ১৯, ২১, ২৩, ৪৩, ৫৭, ৬১। এর মধ্যে তিনটি সুরায় বিস্তারিতভাবে তাঁর জীবনী এবং মিশন আলোচিত হয়েছে। ৩টি সুরার শিরোনাম ঈসা (আ:) এর পরিবারের ব্যক্তিদের নামে অথবা তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার নামে রাখা হয়েছে। যেমন- তৃতীয় সুরা আল ইমরান। পঞ্চম সুরা মায়েদা এবং ঊনবিংশ সুরা মরিয়ম। এভাবে এই নবীর মিশন ও জীবনী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

উত্তর : ২. ঈসা (আ:) কে যে নামে সম্বোধন করা হয়েছে

কুরআনের কয়েকটি আয়াতে তাঁকে ঈসা (যার ইংরেজি Jesus) সম্বোধন করা হয়েছে। অন্যান্য স্থানে তাঁকে আল-মাসীহ সম্বোধন করা হয়েছে। মাসীহ শব্দটি 'আল মাসিয়াহ' থেকে এসেছে যার অর্থ অভিষিক্ত।

উত্তর : ৩. ঈসা (আ)-এর জন্মের পটভূমি

ঈসা (আ:) এর জন্মের সময় লোকজন ধর্মের চরম বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করছিল এবং চরম বস্তুবাদী হয়ে পড়েছিল। কুরআন এবং বাইবেল উভয় কিতাবেই এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বনী ইসরাইল জাতি তাদের কাছে এর পূর্বে প্রেরিত দু'জন নবীর শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে গিয়েছিল। ক্ষমা, দানশীলতার মতো কোনো সৎগুণই তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। তারা চোখের বদলে চোখ দাঁতের বদলে দাঁত নিত। সুদের জমজমাট কারবার সমাজকে শোষণের আখড়ায় পরিণত করেছিল। এই পটভূমিতে ঈসা (আ:)-

এর অলৌকিক জন্ম ছিল মানুষের জন্য আল্লাহর এক নির্দশন। এর মাধ্যমে তাদের আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার কথা এবং তাদের পদস্খলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

উত্তর : ৪. কুরআন মতে ঈসা (আ:) এর বংশ পরিচয়

কুরআন বলে ইবরাহীম (আ:)-এর বংশেই ঈসা (আ:) এর জন্ম। এই বংশেই মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ নবীর জন্ম। ঈসা (আ:)-এর নানী ইমরান (আ:)-এর স্ত্রী পর্যন্ত ঈসা (আ:)-এর পূর্ব পুরুষের পরিচয় কুরআনে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তান যেন আল্লাহর কাজে লাগে সেজন্য দোয়া করতেন। তাঁর সন্তান মরিয়ম (আ:)-এর জন্মের পর তাঁকে জাকারিয়া (আ:)-এর তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়, তাকে ধার্মিকভাবে গড়ে তোলার জন্য।

উত্তর : ৫. মরিয়ম (আ:) কি ঈসা (আ:) এর জন্মের বিষয় অবহিত হয়েছিলেন?

কুরআন মতে মরিয়ম (আ:) অবহিত হন যে তাঁর সন্তান হবে এবং তিনি নবী হবেন। কুরআন মতে তিনি কারো সাথে বিয়ে ছাড়াই গর্ভবতী হন (যদিও বাইবেলে বর্ণিত আছে, যোসেফ নামে একজন মিস্ত্রীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল)। ঈসা (আ:) এর জন্ম ছিল কোনো পুরুষের ঔরস ছাড়া। ফলে এক মহান মোযেযার মাধ্যমে জন্ম নিয়ে তিনি মিশন শুরু করেন।

উত্তর : ৬. ঈসা (আ:) এর জন্ম

কুরআন মতে মরিয়ম (আ:) এর গর্ভাবস্থা স্বাভাবিকভাবেই অতিবাহিত হয়। যদিও এ সময় তিনি মানসিকভাবে শঙ্কিত ছিলেন এই ভেবে যে মানুষ তাঁর কুমারী মাতৃত্বকে ভিন্ন চোখে দেখতে পারে। অবশ্য অলৌকিকভাবে ঈসা (আ:) জন্মের পরই কথা বলতে শুরু করেন, তিনি তাঁর মাকে আশ্বস্ত করেন এবং লোকের প্রশ্নের জবাবে কি বলতে হবে তা বলে দেন।

উত্তর : ৭. ঈসা (আ:) এর জন্ম সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়া

কুরআন বলে ঈসা (আ:) এর জন্মের পর মানুষ প্রথমে মরিয়ম (আ:) এর সতীত্বের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। অবশ্য নবজাত শিশু ঈসা (আ:) এ সময় কথা বলা শুরু করেন। তিনি তাঁর মায়ের পক্ষে কথা বলেন। তিনি বলেন যে, তিনি আল্লাহর দাস। আল্লাহ তাঁকে কিতাবসহ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে রহমত করেছেন।

উত্তর : ৮. ঈসা (আ:) এর পিতা কে ছিলেন

কুরআন এ প্রশ্নের উত্তর দুটো বাক্যে দিয়েছে। কুরআন বলে যে, ঈসা (আ:) এর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক হচ্ছে আদম (আ:) এ সাথে তাঁর সম্পর্কের মতো। আদর্ম (আ:)কে মাটি থেকে তৈরি করে যখন বললেন হয়ে যাও অমনি আদম (আ:) প্রাণ লাভ করলেন। আদম (আ:) পিতা এবং মাতা ছাড়াই তৈরি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্ম নিয়ে প্রশ্ন

ওঠেনি। এটা আল্লাহর ক্ষমতার অধীন বলে সবাই মেনে নিয়েছে। যে আল্লাহ্ পিতা-মাতা ছাড়াই আদম (আ:) কে তৈরি করতে পারেন, তিনি পিতা ছাড়াই ঈসা (আ:) কে তৈরি করতে পারবেন এটাই স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন (যথা-প্রজণন) আল্লাহ্ই তৈরি করেছেন। তিনিই পারেন এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে দেখাতে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৪ আল কুরআন ৩:৩৩

প্রশ্ন ৫ আল কুরআন ১৯:১৬-২১

প্রশ্ন ৬ আল কুরআন ১৯:২২-২৬

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ১৯:২৭-৪০

প্রশ্ন ৮. আল কুরআন ৩:৫৯, ৩:৪৫-৪৯

বি-৭ ঈসা (আ)-এর প্রকৃতি

প্রশ্ন ১. ঈসা (আ:) এর অলৌকিক জন্ম কি তাকে ঐশ্বরিক মর্যাদা দিয়েছে?

২. কুরআন এবং বাইবেল উভয়েই ঈসা (আ)কে 'কালিমাত উল্লাহ' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপারে খ্রিস্ট-মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য কেন?

৩. পবিত্র আত্মা (Holy Spirit) শব্দ কি কুরআন ও বাইবেলে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? কেউ কেউ কুরআন ঈসা (আ:) এর আল্লাহর পুত্র হবার ধারণা নাকচ করলেও তাঁর উপাস্য হবার বিষয়টি নাচক করেনি। এর উত্তরে কি বলবেন?

৪. আল্লাহ কুরআনে অনেক জায়গায় নিজেকে উল্লেখ করতে গিয়ে আমি না বলে আমরা বলেছেন এতে কি মনে হয় না যে আল্লাহর আরো শরিক আছেন?

৫. বাইবেলে বর্ণিত লর্ড এবং ঈশ্বরের পুত্র (Son of God) এই শব্দ দুটোর ব্যাখ্যা মুসলমানরা কিভাবে করবে?

৬. ঈসা (আ:) নিজে কি তাঁর উপাস্য হবার বিষয় নাচক করেছেন?

উত্তর : ১. ঈসা (আ:)-এর অলৌকিক জন্ম প্রসঙ্গে

বিনা ঔরসে ঈসা (আ:) এর জন্ম এক অবিস্মরণীয় অলৌকিক ঘটনা। অবশ্য লক্ষ্য করা যায় যে, আল্লাহ তাঁর নিদর্শন ও নবুওতের প্রমাণ হিসেবে প্রায় প্রত্যেক নবীকেই কোনো না কোনো মোযেযা দান করেছেন। যেমন ইবরাহীম (আ:) কে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝেও তিনি জীবিত রাখেন। মুসা (আ:) এর হাতের লাঠিকে তিনি সাপে পরিণত করেন। রাসূল (সা:) এর মোযেযা ছিল আল কুরআন যা দেড় হাজার বছর পর আজও অবিকৃত এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা অবিকৃতই থাকবে। প্রত্যেক নবীর মোজেজাই তাঁর স্থান কালের সাপেক্ষে আল্লাহ প্রদান করেছেন। ঈসা (আ:) এর আবির্ভাবের সময় মানুষ আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভুলতে বসেছিল। গ্রিক দর্শনের প্রভাবে তারা প্রত্যেক বিষয়কে 'কারণ ও ফল' (Cause and effect) এর সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করা শুরু করেছিল। ঈসা (আ:) এর অলৌকিক জন্ম দিয়ে আল্লাহ তাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। বুঝাতে চেয়েছিলেন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। কোনো পিতৃত্ব ছাড়াই সন্তান জন্মাতে পারেন। তিনি কোনো নিয়মের অধীন নন।

উত্তর : ২. কালিমাত-আল্লাহ-এর অর্থ

'জন-১ এ' উদ্ধৃত আছে 'The word was with God and the word was God'-এ থেকেই বাইবেলে বিশেষজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করেন যে, 'The word' শব্দটির একটি ঐশ্বরিক মর্যাদা আছে। কিন্তু এর সঠিক বর্ণনা এসেছে আল কুরআনে। সেখানে

শব্দটি 'Word' (কালিমাত) একটি আদেশ (Command) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন বলে যে, প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর আদেশে সৃষ্ট। আল্লাহ যখন বলেন, 'হয়ে যাও' (কুন) তখনই তা হয়ে যায়। কাজেই ঈসা (আ:) ও আল্লাহর আদেশে আর সব মানুষের মতোই সৃষ্ট।

উত্তর : ৩. পবিত্র আত্মার অর্থ প্রসঙ্গে

পবিত্র আত্মার বিষয়ে খ্রিস্টানদের ধারণা প্লেটোর দর্শন প্রভাবিত। কুরআনে এই শব্দের দু'ধরনের অর্থে প্রয়োগ স্পষ্টভাবেই দেখা যায়–

ক) আত্মা (রুহ) অর্থে- আল্লাহর ইচ্ছায় ঈসা (আ:) এর সৃষ্টি ও তাঁকে জীবন প্রদানের বিষয়টিকে 'রুহ' শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ওহী বোঝাতেও 'রুহ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নবীদের প্রতি আল্লাহর সমর্থন বোঝাতেও রুহ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের মাঝে আল্লাহ যে প্রাণ ফুঁকেছেন তাকে রুহ বলা হয়েছে।

খ) রুহ-উল-কুদ্দুস বা রুহ-ইল-আমীন এই দুটো শব্দ জিবরাইল (আ:) এর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যিনি নবী রাসূলদের কাছে আল্লাহর ওহী নিয়ে আসতেন। ইসলাম এ শিক্ষাই দেয় যে, বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহই এ জগতের সকল কিছুর স্রষ্টা। জিবরাইল ফেরেশতাও তাঁর সৃষ্ট। কাজেই এদের কারোরই উপাস্য হবার যোগ্যতা নেই।

উত্তর : ৪. ঈসা (আ:) কি উপাস্য ছিলেন?

কুরআন শুধু ঈসা (আ:) এর পুত্র হবার বিষয়টিই নাচক করে না বরং তার উপাস্য হবার বিষয়টিও নাকচ করে দেয়। এক আয়াতে বলা হয়েছে হাশরের দিন ঈসা (আ:) তাকে উপাসনাকারীদের ভুল ধরিয়ে দিবেন। কুরআন ত্রিত্ববাদের ধারণা বাতিল করেছে এবং ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসীদের কঠিন শাস্তির কথা বলেছে। ঈসা (আ:) যে অন্যান্য নবীদের মতোই একজন নবী ছিলেন কুরআন তাই গুরুত্বের সাথে বলেছে।

উত্তর : ৫. কুরআনে আল্লাহর নিজ প্রসঙ্গে 'আমরা' শব্দের ব্যবহার

আরবিতে শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজকীয়তা বোঝাতে 'আমি' এর পরিবর্তে 'আমরা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। আরবি ছাড়াও আরো অনেক ভাষায় এই রীতি দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই রাজা অথবা জগতের স্রষ্টা নিজকে সম্বোধন করতে এই শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। আল্লাহর একত্ব এবং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সমগ্র কুরআন জুড়ে উদ্ধৃতি রয়েছে। কাজেই 'আমরা' শব্দের ব্যবহার একত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করে না।

উত্তর : ৬. 'লর্ড' এবং 'ঈশ্বরের পুত্র' শব্দ দুটো সম্পর্কে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি

ক) লক্ষ্য করা যায় যে বাইবেলে লর্ড শব্দটি সব সময় স্রষ্টা বলতে ব্যবহৃত হয়নি

বরং সম্মানিত বা প্রভু (পার্থিব অর্থে Master) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এটাকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় শব্দ মনে করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই।

খ) ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট থেকে এটা দেখা যায় ঈশ্বরের পুত্র বলতে তার নিকটের বা তার প্রিয় কাউকেই বুঝানো হয়েছে। নিউ টেস্টামেন্টে যেখানে ঈসা (আ:) কে পুত্র ও আল্লাহকে পিতা বলা হয়েছে সেখানে রূপক অর্থেই শব্দ দুটো ব্যবহৃত হয়েছে। রূপকভাবে সব মানুষই আল্লাহর সন্তান কারণ তিনিই তাদের জীবন দেন, লালনপালন করেন এবং ভালোবাসেন।

উত্তর : ৭. ঈসা (আ:) নিজেই তাঁর উপাস্য হবার বিষয় নিচক করেছেন-

ঈসা (আ:) এর অলৌকিক জন্ম ও তাঁকে 'কালিমাত-উল্লাহ' সম্বোধন তাঁকে উপাস্যের মর্যাদা দেয়া এটা নিশ্চিত। এছাড়া খোদ নিউ টেস্টামেন্টেও দেখা যায় ঈসা (আ:) নিজে তাঁকে খোদার অংশ মনে করতেন না। কারণ সেখানে উল্লেখিত আছে যে শয়তান তাঁকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করত। বাস্তবে শয়তান তো মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়, কোনো স্রষ্টাকে প্ররোচিত করার সাধ্য তো তার নেই। তিনি প্রায়ই প্রার্থনার জন্য নির্জনে চলে যেতেন। স্রষ্টার কি আদৌ কোনো প্রার্থনার দরকার আছে। মানুষ যখন তাঁকে অতি সম্মান করত তখন তিনি বলতেন, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ একজন আছেন তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ১৯:১৬, ১৬:৪০

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৪২:৫২, ৫৮:২২, ৪:১৭১, ৩২:৯, ২:৮৭, ১৯:১৭

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৫:১১৬-১২০, ৫:৭২-৭৩, ১১২

প্রশ্ন ৬. Exod ৪:২২-২৩, Psalms ২:৯ Chron ২২:১০ Matt ৫:৯, ৫:৪৫, ২৩:৯

প্রশ্ন ৭. Matt ৪:১-১১, ২৪:৩৬ Mark ১০-১৮, John ১৪:২৮

বি-৮ ঈসা (আ:)-এর মিশন

প্রশ্ন ১. কুরআনে ঈসা (আ:) এর মিশনের প্রেক্ষিত সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? বাইবেলেও কি একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে?

২. ঈসা (আ:) এর শিক্ষা সম্পর্কে কুরআন কি বলে?

৩. ঈসা (আ:) এর মোযেযা সম্পর্কে কুরআনে কোনো বর্ণনা আছে কি?

৪. ঈসা (আ:) এর উপর নাযিলকৃত কিতাব সম্পর্কে কুরআন কিছু বলে কি?

৫. নিউ টেস্টামেন্টে ঈসা (আ:) এর নবুওয়তের ব্যাপারে কি প্রমাণ আছে?

৬. ঈসা (আ:) এর মিশন কিভাবে শেষ হলো, এ বিষয়ের বর্ণনায় কুরআন ও বাইবেল কি একমত?

৭. কুরআনে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আ:) কে জীবিত অবস্থায় বেহেশতে তুলে নেয়া হয়েছে- এর অর্থ কি?

৮. ঈসা (আ:)'র পুনরাগমন সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

উত্তর : ১. ঈসা (আ:) এর মিশন

বাইবেলে ঈসা (আ:) এর মিশন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তা ছিল শুধু বনী ইসরাইল জাতির জন্য। কুরআনেও একই কথা উদ্ধৃত হয়েছে। বাইবেলের বর্ণনায় সরাসরি এর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন কানানাইত জাতির (Canaanite) একজন মহিলা ঈসা (আ:) এর কাছে সাহায্যের জন্য আসল তখন তিনি বলেন, আমি শুধুমাত্র বনী ইসরাইল জাতির পথহারাদের জন্য এসেছি- "I am not sent but to the lost sheep of the children of Israel"

উত্তর : ২. ঈসা (আ:) এর শিক্ষা

মূলত ঈসা (আ:) এর শিক্ষা ছিল অন্য আর সব নবীর মতোই মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা এবং তাঁর আদেশ পালনে সাহায্য করা। এছাড়া কুরআন ও বাইবেলে তাঁর আরো কয়েকটি কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন :

ক) বনী ইসরাইলদের কাছে প্রদত্ত মুসা (আ:) এর শিক্ষার স্বীকৃতি।

খ) আল্লাহর শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাবার জন্য আরোপিত আযাব ও শাস্তি থেকে জনগণকে মুক্ত করা।

গ) আল্লাহর পক্ষ থেকে মোযেযা প্রদর্শন করা। এই মোযেযা মানষকে আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে সচেতন ও ভীরু করে তুলবে

ঘ) কুরআনে বলা হয়েছে ঈসা (আ:) এর আরো কাজ ছিল শেষ নবী হিসেবে মুহাম্মদ (সা:)-এর আগমন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা যিনি দ্বীনকে পরিশুদ্ধ করতে ও পূর্ণতা প্রদান করতে আসবেন।

এছাড়াও কুরআন বলে যে, তিনি বনী ইসরাইলদের বলতেন একত্ববাদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে, তিনি বলতেন, "হে বনী ইসরাইলীগণ, আমাদের প্রভু এক এবং একক।"

উত্তর : ৩. কুরআনে ঈসা (আ:) এর মোযেযা প্রসঙ্গ

ঈসা (আ:) এর অলৌকিক জন্মই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় মোযেযা যা সম্পর্কে কুরআনে গুরুত্বের সাথে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ তাঁকে আরো কিছু অলৌকিক কাজের অনুমতি দিয়েছিলো বলে কুরআন জানায়। যেমন তিনি আল্লাহর অনুমোদনে জীবন্ত পাখি তৈরি করেছেন। মৃতকে জীবিত করেছেন। অসুস্থকে সুস্থ করেছেন। অলৌকিকভাবে অল্প আহার দিয়ে অনেক মানুষকে খাইয়েছেন। মানুষের বাড়ির গোপন ভাণ্ডারে কি আছে সে খবর দিতে পেরেছেন।

উত্তর : ৪. ঈসা (আ:) কে প্রদত্ত কিতাব সম্পর্কে কুরআন

অনেকগুলো আসমানি কিতাব নাযিল হবার কথা কুরআনে বলা হয়েছে। এর মধ্যে ঈসা (আ:) এর উপর নাযিল হওয়া ইনজিলসহ চারটি কিতাবের নাম কুরআনে এসেছে। কুরআনে ছয়টি সূরায় বারো বার ইনজিলের নাম বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ইনজিল খ্রিস্টানদের নতুন নিয়ম Good news এর মতো কোনো মানব প্রদত্ত শিরোনাম নয়। বরং এটা আল্লাহর কিতাবের আল্লাহ প্রদত্ত নাম। বস্তুত বাইবেল বলে যা বর্তমানে আছে তা কোনোভাবেই ইনজিল নয়। বরং ঈসা (আ:) এর মৃত্যুর অনেক পর তাঁর সহযোগীদের লেখা তাঁর জীবনীমাত্র। এ বিষয়ে অনেক খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞও একমত। যদিও এতে ইনজিলের কিছু অংশ বা উপাদান আছে ইনজিলের কোনো অস্তিত্ব এখন আর নেই। হতে পারে যখন খ্রিস্টান নেতারা চারটি পুস্তক বাদে তাদের বাকি সব পুস্তক পুড়িয়ে ফেলেন তখন ইনজিল পুড়ে গেছে।

উত্তর : ৫. ঈসা (আ:) এর নবুওতের ব্যাপারে নিউ টেস্টামেন্ট

নিউ টেস্টামেন্ট থেকে এটা নিশ্চিত যে ঈসা (আ:) নিজেকে আল্লাহর বান্দা এবং বাণী বাহক হিসেবেই প্রচার করতেন। তাঁর সহযোগিরাও তাঁকে তাই মনে করত।

উত্তর : ৬. ঈসা (আ:) এর মিশনের সমাপ্তি সম্পর্কে কুরআন ও বাইবেল

ঈসা (আ:) এর মিশনের সমাপ্তি সম্পর্কে বাইবেল ও কুরআন একমত নয়। বাইবেল বলে যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। কুরআন এই ধারণা নাচক করে দেয়।

উত্তর : ৭. 'আল্লাহ্ তাঁকে তুলে নেন' এর অর্থ

ঈসা (আ:) এর পরিণতি সম্পর্কে কুরআন 'রাফা' (অর্থ- তুলে নেয়া, তুলে ধরা) শব্দ ব্যবহার করেছে। এর তিনটি সম্ভাব্য অর্থ হতে পারে-

ক) আল্লাহ্ তাঁকে সশরীরে তুলে নেন। যেটা বৈজ্ঞানিকভাবে হয়তো ব্যাখ্যা করা যাবে না। অবশ্য আল্লাহ্ সবই পারেন।

খ) আল্লাহ্ তাঁর আত্মাকে তুলে নেন। এর স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে যে কুরআন বলে প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। কুরআনে ঈসা (আ:) নিজেও বলেন, 'আমার উপর শান্তি আছে যেদিন আমি জন্ম নেই। যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি পুনর্জীবিত হব' কুরআন আরো বলে যে আল্লাহ্ ঈসা (আ:) কে বলেন- 'আমি তোমার মেয়াদ শেষ করছি এবং তোমার আত্মাকে তুলে নিচ্ছি।'

গ. সর্বশেষে তুলে নেয়া বলতে এটা হতে পারে যে, আল্লাহ্ ন্যায়বান নবী হিসেবে তাঁর মর্যাদাকে তুলে ধরেন।

উত্তর : ৮. ঈসা (আ:) এর পুনরাগমন প্রসঙ্গে

এ বিষয়ে কুরআনে কোনো উল্লেখ নেই। কয়েকটি হাদিসে আছে যে, তিনি আসবেন। অবশ্য তাঁর এই আগমন হবে তাঁর ভ্রান্ত অনুসারীদের পথ দেখাতে। রাসূল (সা:)-এর শেষ নবুওতের স্বীকৃতি দিয়ে ক্রুশ ভেঙে ফেলতে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৩:৪৯, ৬১:৬, ৫:৪৯, Matt ১৫:২৪, ১০:৫০৬

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৩:৫০, ৬১:৬, Mark ১২:২৯

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৩:৪৯

প্রশ্ন ৫. Luke ১৩:৩৩-৩৪, ৭:১৬, John ৮:৪০

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ৪৩:৬১ (Glorius Quran- Yusuf Ali)

বি-৯ অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক

প্রশ্ন ১ অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে কুরআনে কোনো নিদের্শনা আছে কি? এ নির্দেশনার কোনো ব্যতিক্রম রয়েছে কি?

২. বিশেষভাবে ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে কুরআনে কোনো উদ্ধৃতি আছে কি?

৩. ইহুদী-খ্রিস্টানদের বন্ধু বানাতে কুরআনে কোথাও নিষেধ করা হয়েছি কি?

৪. অমুসলিমরা শত্রুতা পরিহার করলে তাদের সাথে সম্পর্কের বিষয় পুনর্বিবেচনা করা যাবে কি?

৫. বাস্তব জীবনে ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার বিষয়ে ইসলাম তাগিদ দেয় কি?

উত্তর : ১. অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে কুরআন

সকল নবীর উপর ঈমান এবং তাঁদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং বাস্তব জীবনে এবং সমাজে তার পূর্ণ প্রয়োগ ঘটাতে তাগিদ দেয়া হয়েছে। কুরআনের ৬০ নং সূরার ৮ থেকে ৯ নং আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। এখান থেকে এটা স্পষ্ট যে যেসব অমুসলিম মুসলমানদের বা ইসলামের সাথে শত্রুতা করে না তাদের সাথে ন্যায়, সহানুভূতি ও দয়ার সাথে ব্যবহার করতে হবে। এই আয়াতে অমুসলিমদের প্রতি সদয় হবার জন্য 'বির' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ একই শব্দ পিতা-মাতার প্রতি সদয় হবার তাগিদ দিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ইসলাম অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের বিষয়কে কত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। মুসলিম জনপদে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসকারী অমুসলিমের সকল অধিকার রক্ষা করা মুসলমানদের দায়িত্ব। তাকে কোনোভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না।

অমুসলিমের এই অধিকার যেসব ক্ষেত্রে স্থগিত হবে তা নিম্নরূপ :

ক) যে অমুসলিম মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা বা ঘৃণা পোষণ করে অথবা তাদের আক্রমণ করে।

খ) যারা মুসলমানদের তাদের বাড়ি-ঘর থেকে উৎখাত করতে চায়।

গ) যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনকারীদের সহযোগিতা বা সমর্থন করে। বস্তুত যারা শত্রুতা করে বা ধ্বংস করতে চায় তাদের সাথে এমনিতেই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নেই।

উত্তর : ২. ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে কুরআন

কুরআন ইহুদী-খ্রিস্টানদের আহলে কিতাব (আল্লাহর কাছ থেকে কিতাব প্রাপ্ত) হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এদের মাঝে আল্লাহ প্রেরিত নবী এসেছিলেন এবং তাদের আল্লাহর বিধান দিয়েছিলেন। এজন্য ইসলামের দৃষ্টিতে তারা মুসলমানদের জন্য নাস্তিক, পৌত্তলিক ও কাফেরদের চেয়ে কাছের। কারণ তারা-

ক) আল্লাহতে বিশ্বাস করে।

খ) নবুওতে বিশ্বাস করে।

গ) হাশরে বিশ্বাস করে।

ঘ) ওহীতে বিশ্বাস করে।

ঙ) আখেরাতে শাস্তির ভয়ে ও পুরস্কারের আশায় নীতিবান থাকে।

উত্তর : ৩. ইহুদী-খ্রিস্টানদের বন্ধু বানাবার ব্যাপারে কুরআনের নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে

পঞ্চম সুরায় ৫৪ এবং ৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে মুসলমানরা যেন ইহুদী-খ্রিস্টানদের বন্ধু না বানায়। এই আয়াত অমুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য আয়াতের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ সাধারণভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসকারী সকল নাগরিকের সাথে সহানুভূতির সাথে ব্যবহার করতেই কুরআনে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। অবশ্য যদি এই আয়াত নাযিলের পটভূমি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে ভ্রান্তি দূর হয়। এক সময় কিছু অসচেতন মুসলমান ব্যাপকভাবে এমন ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল যারা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজের শত্রুতা করত। এই আয়াতে এটাই সতর্ক করা হয়েছে যে, মুসলমানরা যেন যারা গোপনে গোপনে ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত তাদের সাথে ঢালাও বন্ধুত্ব না করে। এই আয়াত সাধারণভাবে সকল ইহুদী-খ্রিস্টানের জন্য প্রযোজ্য নয়।

উত্তর : ৪. অমুসলিমরা শত্রুতা পরিহার করলে

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে অমুসলিমরা শত্রুতা পরিহার করলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব পুন:প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কুরআনে দেখা যায় যে, মুসলমানদের প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার পাওনা থাকলেও অমুসলিমরা শত্রুতা পরিহার করলে তাদের ক্ষমা করতেই বলা হয়েছে। বরং আরো বলা হয়েছে তাদের মন্দ কাজের জবাব তাদের প্রতি ভালো কাজ দিয়ে দিতে।

উত্তর : ৫. ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারে ইসলাম

ইসলামী আইনে মুসলমানদের ইহুদী-খ্রিস্টানদের রান্না করা গোশত খাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদিও পৌত্তলিকদের হাতে জবাই করা পশুর গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমান পুরুষ ইহুদী বা খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করতে পারে (এ সংক্রান্ত

ইসলামের বিধানের কারণ ও যৌক্তিকতার জন্য দেখুন এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের 'জি' ২৭ ও ২৮ নং অধ্যায়) এর মাধ্যমে তাদের প্রতি সর্বোচ্চ সহনশীলতা, ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৬০:৮-৯, ৩:১১৮-১২০, ৫৮:২২, ৬০:১১

প্রশ্ন ২ আল কুরআন ৫:৫৪-৫৫

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৬০:৭, ৪১:৩৩-৩৪

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৫:৫

বি-১০ ইসলামের প্রচার ও প্রসার

প্রশ্ন ১. শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার অনুমতি ইসলামে আছে কি?

২. ইসলাম প্রচারের সঠিক পন্থা কি?

৩. ইসলাম প্রচারে জিতাদের ভূমিকা কি?

৪. ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই, এই মূলনীতি কি মুসলমানরা যথাযথভাবে পালন করেছে?

৫. পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকরা কি এই স্বীকৃতি দিয়েছে যে ইসলাম তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তৃত হয়নি?

৬. ইসলাম যে তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তৃত হয়নি এর পক্ষে আর কোনো যুক্তি আছে কি?

উত্তর : ১. ধর্ম প্রচারে জোরজবরদস্তি প্রসঙ্গে কুরআন

কুরআনের একটি আয়াত বা কোনো একটি হাদিস এমন দেখানো যাবে না যাতে জোরপূর্বক ধর্ম প্রচারের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। বরং কুরআন মুসলমানদেরকে কারো উপর ধর্ম চাপিয়ে দিতে নিরুৎসাহিত করেছে। কুরআন মতে সত্য দ্বীন অবলম্বনের সুযোগ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নেয়ামত। তাই একমাত্র আল্লাহই মানুষকে ইসলাম কবুল করাতে পারেন। মানুষের বিশ্বাসের একমাত্র বিচারক আল্লাহ। রাসূল (সা:) কেও বলা হয়েছে যে তাঁর কাজ শুধু মানুষের কাছে দাওয়াত পৌছানো। এরপর যে ইসলাম কবুলের ইচ্ছা মনে আনবে স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে পথ দেখাবেন। মুসলমানদেরও একই পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বস্তুত বিশ্বাস এমন এক জিনিস যা পৃথিবীতে কোনো শক্তিই মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না।

উত্তর : ২. ইসলাম প্রচারের অনুমোদিত পন্থা

কুরআন বলে, "ডাকো তোমার রবের দিকে মধুর সংলাপ ও বুদ্ধিমত্তার সাথে। তাদের সাথে যুক্তি তর্ক কর নির্ভুল ও শ্রেষ্ঠ পন্থায়। বস্তুত আল্লাহই জানেন কে তাঁর পথ থেকে দূরে থাকবেন এবং কে হেদায়েত লাভ করবেন" (১৬:১২৫)। ইহুদী-খ্রিস্টানদের ব্যাপারে কুরআন বলে যে তাদের সাথে অপ্রয়োজনে তর্ক বা ঝগড়ায় জড়িয়ে না পড়তে।

উত্তর : ৩. ইসলাম প্রচারে জিহাদের ভূমিকা

জেহাদ শব্দের ইংরেজি অনুবাদ করা হয় 'Holy war' বা 'পবিত্র যুদ্ধ'। অথচ এটা একটা ভুল অনুবাদ। এর মাধ্যমে এই শব্দকে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। 'পবিত্র যুদ্ধ' বুঝাতে

আরবিতে আলাদা শব্দ, "হারব-মুকাদাসা" আছে, যা কুরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জিহাদ শব্দ যে ধাতু থেকে এসেছে তার অর্থ চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম, ও লড়াই। অর্থাৎ জিহাদ মানে হচ্ছে আল্লাহর পথে সমস্ত সাধ্য-সাধনা ও চেষ্টাকে নিবেদিত করা। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনে লড়াই করা। জিহাদকে ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ বলাটা ভুল বরং জিহাদ হচ্ছে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। কারণ প্রকৃত মুসলমান তারাই যারা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর এই আত্মসমর্পণ তখনই সফল হবে যখন তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নির্দেশে নিরলস সাধ্য-সাধনা চেষ্টা ও সংগ্রাম করা হবে। এটা ঠিক যে এই সাধ্য-সাধনার এক পর্যায়ে সমাজের শয়তানী শক্তির সাথে প্রত্যাক্ষ যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু জিহাদের এই একটি স্তর দিয়ে পুরো জিহাদকে চিত্রায়িত করা ভুল হবে। জিহাদের সাথে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তুলনা করাটাও অবান্তর।

উত্তর : ৩. জিহাদের বিভিন্ন স্তর

জেহাদের বিভিন্ন স্তর নিম্নরূপ :

ক) নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ- এটাই হচ্ছে জিহাদের মূল। এর থেকেই জিহাদের বাকি সব স্তর উদ্ভূত। এর মানে হচ্ছে নিজের প্রবৃত্তিকে আল্লাহ ইচ্ছা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা।

খ) সামাজিক জিহাদ-এর মাধ্যমে মুসলমানরা সমাজে প্রচলিত অন্যায়, দুর্নীতি, জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায়।

গ) জাতীয়/আন্তর্জাতিকভাবে জিহাদ- পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত সকল শয়তানী, জুলুমবাজ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ। এই জিহাদে শক্তির ব্যবহার প্রয়োজন। এই জেহাদের ক্ষেত্র প্রয়োজনে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করতে পারে।

উত্তর : ৫. ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই এই শিক্ষা পালনে ইতিহাসে মুসলমানদের অবস্থান

ঐতিহাসিকভাবে এটা বলা যায় যে, সমগ্র মুসলিম জাতির সবাই যে সব সময় পরম ভালো বা পরম খারাপ হবে এমনটি আশা করা যায় না, তেমনি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য পুরো জাতিকে দোষারোপ করা যায় না। স্পেনের জাতিগত নির্মূল অভিযান ও গণহত্যা, ক্রুসেডের রক্তক্ষয় বা উত্তর আয়ারল্যান্ডের সংঘাত দেখে যেমন সমগ্র খ্রিস্টান জাতিকে দোষী করা ঠিক নয় তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসের কোথাও কখনো দু'একজন কুরআনের শিক্ষা বর্জিত মুসলিমের ব্যবহার থেকে ইসলামকে বিচার করার সুযোগ নেই। সামগ্রিকভাবে সব সময়েই মুসলমানরা তাদের অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে সৎ ও সদয় ছিল।

উত্তর : ৬. ইসলাম যে তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তৃত হয়নি এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের স্বীকৃতি

ইসলাম তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তৃত হয়েছে এমন অভিযোগ যারা করেন আসলে তারা রূপকথার গল্পের মতোই মিথ্যাচার করে। বর্তমানকালের কোনো প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক এমন কথা বলেন না। কেউ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইলে বানর্ডশ, টয়েনবী, এইচ.জি.ওয়েলস, জেমস মিশনারে লেখা পড়ে দেখতে পারেন।

উত্তর : ৭. ইসলাম যে তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তৃতি হয়নি এর পক্ষে আরো প্রমাণ

উপরের যুক্তিগুলো ছাড়া আরও কিছু বাস্তব উদাহরণ আছে। যেমন–

ক) পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া যেখানে ২১০ মিলিয়ন মুসলমান এবং রাশিয়া যেখানে ৫০ মিলিয়ন মুসলমান রয়েছে। এই দুটি দেশে ইতিহাসে কখনো কোনো মুসলিম সেনাবাহিনী যায়নি।

খ) একজন মুসলমান পুরুষকে তার ইহুদী বা খ্রিস্টান স্ত্রীকে পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণে চাপ প্রয়োগের কোনো সুযোগ ইসলাম দেয়নি। সেই ইসলামের অনুসারীরা কিভাবে অন্যের উপর ধর্ম চাপাতে যাবে।

গ) সেলজুকরা যখন মুসলিম রাষ্ট্র দখল করে তখন তারা মুসলমানদের উপর নিজেদের বিশ্বাস চাপায়নি বরং তারাই ইসলাম গ্রহণ করেছে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ২:২৫৬, ১০:৯৯-১০০, ১৩:৪০, ২২:১৭

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ১৬:১২৫, ২৯:৪৬, ৪৭:৩১, ২২:৭৭-৭৮

প্রশ্ন ৪. পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসূল (সা:) বলেন আমরা এখন ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে প্রবেশ করলাম। সাহাবারা এ কথায় অবাক হলে রাসূল (সা:) বলেন যে, নফসের বিরুদ্ধে জিহাদই শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

সি: বাইবেলে মুহাম্মদ (সা:)

সি-১ বাইবেলে মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কে গবেষণার পন্থা

প্রশ্ন ১. শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কে বাইবেল থেকে কোনো উদ্ধৃতি নেয়ার আদৌ প্রয়োজন আছে কি?

২. বাইবেলের কিছু অংশকে মানা বা না মানার বিষয়ে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৩. বাইবেলে মুহাম্মদ (সা:) এর আগমন সম্পর্কে আভাস দেখে খ্রিস্টানরা কি আশ্চর্য হবেন না?

৪. যারা বলেন যে, "তারা বহুবার বাইবেল পড়েও তাতে মুহাম্মদ (সা:) এর কোনো উল্লেখ দেখেননি" এ প্রসঙ্গে কি বলবেন?

৫. বাইবেলে অনাগত নবী সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎ বাণীগুলো করা হয়েছে তা কি শুধুমাত্র ঈসা (আ:) এর উপরই প্রযোজ্য? সেই সব উদ্ধৃতিকেই কি মুসলমানরা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করছে?

৬. বাইবেলের কোনো বর্ণনাগুলো মুহাম্মদ (সা:) এর আগমনের ইঙ্গিত দেয়?

৭. যারা বলে বিবি হাজেরার মাধ্যমে ইবরাহীম (আ:) এর যে বংশ ধারা তা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ বিবি হাজেরা ছিলেন দাসী; তাদের প্রশ্নের উত্তরে কি বলবেন?

উত্তর : ১. মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কে তথ্যের উৎস হিসেবে বাইবেল

মুসলমানদের বিশ্বাসের ভিত্তি বাইবেল হতে পারে না। কারণ কুরআন বাইবেলকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তবে সব মুসলমানের এটা বিশ্বাস করা প্রয়োজন যে বাইবেল আল্লাহর কিতাব ইঞ্জিল থেকে উদ্ভূত। কাজেই এটাকে সম্মান করা মুসলমানদের উচিত। যদিও মানুষের হস্তক্ষেপে মূল ইঞ্জিল বিকৃত হয়েছে। তবুও এতে মুসা (আ:) ও ঈসা (আ:) এর উপর নাযিলকৃত কিছু কিছু ওহীর অংশবিশেষ রয়ে গিয়েছে। কাজেই এখান থেকে তথ্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে।'

উত্তর : ২. বাইবেলের কোনো অংশ গ্রহণ করা বা বর্জন করার পূর্বশর্ত

বাইবেলের কোনো অংশ গ্রহণ বা বর্জন করার পূর্বশর্ত কুরআনে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন নিজেকে ঘোষণা করেছে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী হিসাবে। আর কুরআনই একমাত্র অবিকৃত আল্লাহর কিতাব। কাজেই বাইবেলের যে কোনো বক্তব্যকে

কুরআনের সাপেক্ষে যাচাই করে নিলেই তার সত্যতা সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। বাইবেল বিকৃতির শিকার হয়েছে একথা ঠিক। কিন্তু মূল ইনজিল ছিল আল্লাহরই ওহীর সংকলন। কাজেই কুরআনের সাপেক্ষে অনুসন্ধান করে এখনো বাইবেল থেকে ইনজিলের অংশবিশেষ খোঁজা যেতে পারে। কুরআন নিজেই বলেছে যে, ঈসা (আ:) রাসূল মুহাম্মদ (সা:) এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কাজেই বাইবেলে এমন উদ্ধৃতি অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

উত্তর : ৩-৪. যেসব ইহুদী-খ্রিস্টানরা বাইবেল পড়েও মুহাম্মদ (সা:)এর কোনো উল্লেখ পাননি বলেন তাদের প্রশ্নের জবাব

যারা বলেন বাইবেলের কোথায় মুহাম্মদ (সা:) এর নাম আছে তাদের জন্য নিচের দুটি কথা বলা যেতে পারে।

ক) সব বিশেষজ্ঞ একমত যে ওল্ড টেস্টামেন্টে ঈসা (আ:) এর আগমনের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টের কোথাও তাঁর নাম দেখা যায় না। অবশ্য তাঁর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। আরো জানা যায় যে, ইহুদীদের পথে আনতে একজন নবী আসবেন।

খ) একইভাবে বলা যায় ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টে একজন শেষ নবীর আগমনের আভাস দেয়া হয়েছে যিনি দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সা:) এর আগমনের পর অনেক ইহুদী এবং খ্রিস্টান এ জন্য মুসলমান হন যে তাদের ধর্মগ্রন্থে যাঁর আগমনের কথা বলা হয়েছিল তিনি এসে গেছেন।

উত্তর : ৫. বাইবেলে অনাগত নবী সম্পর্কে উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে

এটা মনে করা দরকার যে মুসলমানরা বাইবেল থেকে মুহাম্মদ (সা:)-এর আগমন প্রসঙ্গে কোনো উদ্ধৃতি চুরি করে নিচ্ছে না। ঈসা (আ:) মুসলমানদেরও একজন নবী। বাইবেলের যে সব বর্ণনা ঈসা (আ:) এর সাথে মিলে না সেগুলো দেখা যায় মুহাম্মদ (সা:) এর সাথে মিলে। এ থেকে বলা যায় বাইবেলে মুহাম্মদ (সা:) এর আগমন সম্পর্কে ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে।

উত্তর : ৬. মুহাম্মদ (সা:) এর আগমন সম্পর্কে বাইবেল

বাইবেলের এ সংক্রান্ত ইঙ্গিতগুলো দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- সাধারণ ও বিশেষ। 'সাধারণ' শিরোনামে দু'টো বিষয় আমরা চিন্তা করতে পারি। যেমন–

ক) আল্লাহ ইবরাহীম (আ:)এর বংশের দুই ধারা থেকেই অনেক নবী বানিয়ে সম্মানিত করবার ঘোষণা দিয়েছেন।

খ) আল্লাহর এই ঘোষণা ইবরাহীম (আ:) এর দুই পুত্র ইসমাইল (আ:) এবং ইসহাক (আ:) উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

উত্তর : ৭. হাজেরা (রা:) মর্যাদা প্রসঙ্গে

বাইবেলেও বলা হয়েছে যে, সারা (রা:) নিজে হাজেরা (রা:)কে ইবরাহীম (আ:) এর একজন স্ত্রী হিসাবে বরণ করেছিলেন। কাজেই তাঁর এবং ইসমাইল (আ:) এর মর্যাদার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৫:১৬, Mark ১২:২৯

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৭:১৫৭, ২:১৪৬-১৪৭, ৬১:৬

প্রশ্ন ৫. Genesis ২১:১৩

প্রশ্ন ৮. Genesis ১২:১-৩, ১৭:৩-৪, ১৬:১-৩, ১৬:১০-১১, ২১:১৭-১৮

সি-২ বাইবেলে ভবিষ্যৎ নবীর বংশ-পরিচয়

প্রশ্ন ১. ইবরাহীম (আ:) কে দেয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কি শুধু ইসহাক (আ:) এবং তাঁর বংশধরদের জন্য প্রযোজ্য?

২. যারা হাজেরা (রা:) এর মর্যাদা এবং ইসমাইল (আ:) এ জন্মের বৈধতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলে তাদের কি বলবেন?

৩. ইসমাইল (আ:) এর নির্বাসন প্রসঙ্গে ইসলাম ও খ্রিস্টিয় বর্ণনায় কি মিল-অমিল আছে?

৪. ইসমাইল (আ:) কে কোনো বয়সে নির্বাসনে পাঠানো হয় সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা কি করেছেন?

উত্তর : ১. ইববাহীম (আ:) কে দেয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

ভবিষ্যৎ নবীর বংশ পরিচয় প্রসঙ্গে বাইবেলের বক্তব্য দেখবার আগে কয়েকটি বিষয় মরে রাখা উচিৎ। বাইবেল বলতে আমরা যা পাচ্ছি তা অনেকটাই মানব রচিত। এখানে ইসহাক (আ:)-এর বংশধরদের প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব এবং ইসমাইল (আ:) এর বংশধরদের উপেক্ষা করার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। উপেক্ষা সত্ত্বেও আল্লাহ যে হযরত ইবরাহীম (আ:) এর দুই পুত্রের বংশধারায় নবী পাঠাবার প্রতিশ্রুতি আলাদা আলাদাভাবে দিয়েছেন তার প্রমাণ বাইবেলে পাওয়া যায়। আর ইসমাইল (আ:) এর বংশে মুহাম্মদ (সা:) ছাড়া কোনো নবী নেই। এ ব্যাপারে বাইবেলের সূত্র দেখুন।

উত্তর : ২. হাজেরা (রা:) এর মর্যাদা প্রশ্নে

যারা হাজেরা (রা:) এর মর্যাদা এবং ইসমাইল (আ:) এর জন্মের বৈধতার প্রশ্ন তোলেন তাদের জন্য উপযুক্ত জবাব বাইবেলেই আছে। বাইবেলে স্পষ্ট করেই বলা আছে যে হাজেরা (রা:) ইব্রাহীম (আ:) এর বৈধ স্ত্রী ছিলেন। তাঁর গর্ভেই ইবরাহীম (আ:) এর প্রথম পুত্রের জন্ম। আল্লাহ ইবরাহীম (আ:) এর দুই পুত্রের বংশে নবী দান করার প্রতিশ্রুতি আলাদা আলাদাভাবে দিয়েছেন। মুহাম্মদ (সা:) এর নবুওতের মাধ্যমেই এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা পেয়েছে।

উত্তর : ৩-৪. ইসমাইল (আ:) এর নির্বাসন প্রশ্নে কুরআন ও বাইবেল এর নির্বাসনে যাবার সময় ইসমাইল (আ:) এবং বয়স প্রসঙ্গে

ইসমাইল (আ:) এবং তাঁর মায়ের নির্বাচন প্রসঙ্গ বর্ণনায় কুরআন ও বাইবেলে তিনটি মৌলিক পার্থক্য আছে।

ক) তাঁদের নির্বাসনের স্থান প্রশ্নে বাইবেল বলেছে বীরসেবা/পারান, (Beer Sheba/Paran) আর কুরআন বলেছে মক্কা। অবশ্য এ নির্বাসনের সাথে জড়িত অন্যান্য ঘটনার বিশ্লেষণে জায়গাটি যে মক্কা তাই নিশ্চিত হওয়া যায়।

খ) মুসলিম বর্ণনা মতে আল্লাহর ঐশী ইচ্ছা পূরণের জন্যেই তাঁরা মক্কায় নির্বাসনে যান। অপরদিকে বাইবেল বলে সারাহ (রা:) হিংসার বশে হাজেরা (রা:) কে নির্বাসনে পাঠান।

গ) মুসলিম মতে নির্বাসনে যাবার সময় ইসমাইল (আ:) ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। হাজেরা (রা:) কাঁধে করে তাঁকে মক্কা পর্যন্ত বহন করেন। তাঁকে ঝোপের মাঝে রেখে তিনি সাফা থেকে মারওয়া পর্বত পর্যন্ত পানির জন্য ছুটাছুটি করেন। বাইবেল এসব ঘটনা বর্ণনা করে কিন্তু শেষে বলে যে ইসমাইল (আ:)-এর তখন বয়স ছিল ১৪ বৎসর– যা অসঙ্গতিপূর্ণ।

উত্তর : ৫. বাইবেলের বর্ণনার অসঙ্গতি প্রসঙ্গে

বাইবেলের জন্য এই অসঙ্গতি কুরআনের স্বপক্ষে তুলনা করলেই আসল সত্য পাওয়া যায়। কারণ কুরআন আল্লাহর বাণীবাহক অবিকৃত সর্বশেষ কিতাব। খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করে অবশেষে একমত হয়েছে যে বাইবেলের সব কথাই খোদা প্রদত্ত নয়।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. Gen ১৭:২১, ২১:১, ১৭:১৪

প্রশ্ন ২. Gen ১৬:৩, Deut ২১:১৫-১৮

প্রশ্ন ৩. Gen ১৬:১৬, ২১:১৪, ১৪:৩৭, ২:১৫৮

প্রশ্ন ৪. Gen ২১:১০-২১

বাইবেলের বর্ণনার অসঙ্গতি প্রসঙ্গে 'The Encyclopaedia Biblica' এবং 'The Interpreter's Dictionary of the Bible' দ্রষ্টব্য।

সি-৩ ভবিষ্যৎ নবীর সাথে মূসা (আ:)-এর সাদৃশ্য

প্রশ্ন ১. মুহাম্মদ (সা:) এর নবুওয়ত সম্পর্কে বাইবেলে আর কি উদ্ধৃতি আছে?

২. Deuteronomy'র এই বর্ণনার সম্ভাব্য আর কি কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

৩. ভবিষ্যৎ নবী হবেন মুসার সদৃশ Deuteronomy'র এই মন্তব্য প্রসঙ্গে মুসা (আ:) এর সাথে মুহাম্মদ (সা:) এর কি কি মিল দেখা যায়?

৪. একই শ্লোকে খোদা বলছেন যে, তিনি সেই নবীর মুখে তাঁর শব্দ পুরে দেবেন- এর ব্যাখ্যা কি?

৫. এই শ্লোক থেকে মুহাম্মদ (সা:) এর নবুওতের পক্ষে আর কি কি যুক্তি পাওয়া যায়?

৬. এসব শ্লোক থেকে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের উপর কি দায়িত্ব এসে পড়ে?

উত্তর : ১-২. Deuteronomyতে রাসূল মুহাম্মদ (সা:) এর নবুয়তের পক্ষে আরও প্রমাণ

যারা এখনো ইতোপূর্বে বাইবেল থেকে দেয়া প্রমাণগুলোর বিষয়ে সন্দিহান তাদের জন্য Deuteronomy থেকে উদ্ধৃতিগুলো দেখতে বলা হচ্ছে। সেখানে দেখা যায়-

ক) বাইবেলে Brethren শব্দটি নিকট আত্মীয় (Consine) বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বনী ইসরাইলদের বলতে Brethren বলতে বনী ইসরাইলদের বুঝানো হয়েছে। কাজেই যখন আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে বনী ইসলাইলদের Brethren থেকে একজন নবী আসবেন তখন এটা স্পষ্ট যে তিনি মুহাম্মদ (সা:)। কারণ মুহাম্মদ (সা:) ছাড়া ইসমাইল (আ:) এ বংশে আর কেউ নবুওতের দাবি নিয়ে আসেননি।

খ) Deuteronomy'র অষ্টাদশ শ্লোকে আরো বলা হয়েছে যে ভবিষ্যৎ নবী হবেন মুসা (আ:) এর সদৃশ। নিচে এ ব্যাপারে ১০টিরও বেশি প্রমাণ দেখানো হয়েছে যে, মুসা (আ:) এর সাথে মুহাম্মদ (সা:) এরই মিল পাওয়া যায়, ঈসা (আ:) এর নয়।

উত্তর : ৩. Like unto Moses প্রসঙ্গে মুসা (আ:) এর সাথে মুহাম্মদ (সা:) এর মিল

ক) Deuteronomy'র অষ্টাদশ শ্লোক বলেছে ভবিষ্যৎ নবী হবেন মুসার সদৃশ এবং বনী ইরাইলের Brethrenদের মধ্য থেকে অর্থাৎ ইসরাইলের বংশের।

মুসা (আ:) এবং ঈসা (আ:) উভয়েই বনী ইসরাইল ছিলেন তারা কেউই ইসমাইলের বংশের ছিলেন না।

খ) মুসা (আ:) এবং মুহাম্মদ (সা:) উভয়েই তাঁদের জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছ থেকে নবী হিসাবে সমর্থন পেয়েছিলেন। যা ঈসা (আ:) পাননি।

গ) মুসা (আ:) এবং মুহাম্মদ (সা:) উভয়ের জন্ম স্বাভাবিক ছিল- অর্থাৎ তাঁদের উভয়ের মাতা-পিতা ছিলেন। তাঁদের জন্মের কোনো অলৌকিকত্ব ছিল না।

ঘ) মুসা (আ:) এবং ঈসা (আ:) উভয়ে বিবাহিত ছিলেন। তাঁদের উভয়ের পরিবার ছিল।

ঙ) তাঁরা উভয়ে বার্ধক্যে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

চ) তাঁরা উভয়ে তাঁদের জাতিকে আধ্যাত্মিক এবং আইনগত দুই ক্ষেত্রেই পরিচালিত করেছেন।

ছ) তাঁদের উভয়ের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তাঁদের জাতির অধিকাংশ মানুষ মেনে নিয়েছেন।

জ) তাঁরা উভয়ে একাধারে নবী ও আইনদাতা ছিলেন

ঝ) মুসা (আ:) এবং মুহাম্মদ (সা:) দুজনেই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর উপর জয়ী হয়েছিলেন।

ঞ) তাঁদের উভয়ের মিশন দুনিয়াতেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শেষ হয়েছে।

ট) তাঁদের দু'জনকেই মিশনের শুরুতে তাঁদের গোত্রের ক্ষমতাসীন লোকদের চাপে দেশ ছাড়তে হয়েছে।

উত্তর : ৪. আল্লাহ তাঁর মুখে শব্দ পুরে দেবেন এর ব্যাখ্যা (God will put words in his mouth)

রাসূল (সা:) এর ২৩ বছরের মিশনে অংশ অংশ করে কুরআন নাজিল হয়েছে। জিবরাইল (আ:) তাঁর কাছে যে বাণী নিয়ে আসতেন তিনি তা আল্লাহর আদেশে উচ্চারণ করতেন। 'আল্লাহ তাঁর মুখে শব্দ পুরে দেবেন' এই কথার সাথে রাসূলের জীবন এভাবেই মিলে যায়।

উত্তর ৫. মুহাম্মদ (সা:) এর নবুওয়তের পক্ষে আরো প্রমাণ

Deuteronomy (১৮:২০) তে আরো বলা হয়েছে যে যদিও কেউ নবুওতের দাবি করে অথচ তার করা ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে তার নবুওতের দাবিও মিথ্যা। পক্ষান্তরে রাসূল (সা:) তাঁর জীবদ্দশায় অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা বাস্তবে সফল হয়েছে।

উত্তর : ৬. এসব প্রমাণ দেখাবার পর ইহুদী-খ্রিস্টানদের দায়িত্ব

উপরের প্রমাণগুলো শুধু একাডেমিক আলোচনার বিষয় নয়। বরং অন্তর দিয়ে আল্লাহর দেয়া সত্য গ্রহণের পাথেয়। সত্য পথ খোঁজা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। এসব প্রমাণ মুহাম্মদ (সা:) এর শেষ নবুওতের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করলে (বাস্তবে তাই দেখা যাচ্ছে) ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের সকল অনুসারীর কর্তব্য তাকে মেনে নেয়া। শেষ নবীর অনুসরণ করে জীবন ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করা।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. Deut ১৮:১৮-২০

প্রশ্ন ২. Gen ১৬:১০-১২, ২৫:১৭-১৮, Acts ৩:২২

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৫৩:৩-৪

প্রশ্ন ৫. Gen ১৮:১৮-২০

প্রশ্ন ৬. Deut ১৮:১৯

সি-৪ ভবিষ্যৎ নবীর অবস্থান প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ১. ভবিষ্যৎ নবী কোনো স্থানে আবির্ভূত হবেন এ বিষয়ে বাইবেল কিছু বলেছে কি?

২. ফারান নামক জায়গাটি সিনাইতে অবস্থিত বলে দাবি করা হয়। সেখানে এটাকে আরবে এবং বিশেষভাবে মক্কায় বলছেন কেন?

৩. কুরআনে কি ইসমাইল (আ:) এর বংশ ধারায় নবুওয়ত এবং মক্কার কোনো যোগসূত্র নির্দেশক কোনো উদ্ধৃতি আছে?

৪. Deuteronomy'র ৩৩ নং অধ্যায়ের ২ নং শ্লোক ছাড়া আর কোনো উদ্ধৃতি বাইবেলে আছে কি, যা নবীর মক্কায় আগমনের ইঙ্গিতবাহী?

৫. সাধারণভাবে আরব এবং বিশেষভাবে মক্কা প্রসঙ্গে বাইবেলে কোনো উদ্ধৃতি আছে কি?

উত্তর : ১. ভবিষ্যৎ নবী যে স্থানে আসবেন

বাইবেলে ইহুদী ও খ্রিস্টান জাতির কাছে ভবিষ্যতে যিনি নবী হিসেবে আসবেন তাঁর আগমনের স্থান হিসাবে আরব দেশের কথা বিশেষভাবে মক্কার কথা বলা হয়েছে। যেমন বেশ কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে যে ঐশী বাণীর জ্যোতি উৎসারিত হবে পারান থেকে। আরবিতে কোনো প বর্ণ বা উচ্চারণ নেই (যেমন ফিলিস্তিনকে বাইরে উচ্চারণ করা হয় প্যালেস্টাইন)। প-এর উচ্চারণ সেখানে ফ দিয়ে করা হয়। অতএব পারান শব্দের আরবি উচ্চারণ ফারান বর্তমানে আরব বলতে যে এলাকাকে বোঝানো হয় প্রাচীনকালে ফারান সেই এলাকাকেই বলা হতো। বাইবেল আরো বলে যে, ইবরাহীম (আ:)-এর স্ত্রী হাজেরা (রা:) এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ:) অবশেষে ফারান এ নির্বাসিত জীবনে বসবাস করত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যৎ নবীর আবাসস্থল হচ্ছে আরবে। ইবরাহীম (আ:) এর প্রথম পুত্র ইসমাইল (আ:) এর বংশে যাঁর প্রতিশ্রুত আগমন ঘটবে।

উত্তর : ২. ফারান অর্থ আরব সিনাই নয়

উপরে বর্ণিত কারণ ছাড়াও ফারান যে বর্তান আরবকেই বলা হত তার পক্ষে আরো যুক্তি আছে :

ক) হিব্রু ভাষায় ইল ফারান মানে অভয়াশ্রম/পবিত্র আশ্রম, মক্কার কাবা ছাড়া এ ধরনের কোনো জায়গা নেই। আরবিতে আল ফারান বলতে বুঝায় 'দুই

পলাতক'। সম্ভবত বিবি হাজেরা এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ:) কে নির্জন মক্কায় নির্বাসন দেখে পথচারিরা তাদের নিজ গোত্র থেকে পলাতক বলে মনে করেছিল।

খ) প্রাচীন আরব ভূগোলবিদরা যে ম্যাপ তৈরি করছেন তাতে আরব ও সন্নিহিত এলাকাকে ফারান নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কাজেই ফারান অর্থ সিনাই হবার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া সিনাই যদি ফারান হতো তবে সিনাই, সির এবং ফারান... এভাবে জায়গার নামের তালিকায় সিনাই ও ফারান দু'বার বলার প্রয়োজন হতো না।

উত্তর : ৩. কুরআনে প্রাপ্ত প্রমাণ

বাইবেলে বর্ণিত ইসমাইল (আ:) এর বংশে আরবে নবী আসার বিষয়টি কুরআন নিশ্চিত করেছে। এ ব্যাপারে সূত্র নির্দেশিকা দেখুন। এসব সূত্রে দেখা যায় যে, ইসমাইল (আ:) এবং তাঁর মাতা নির্বাসিত জীবনে আরবে বসত গড়েন। তাঁরা ইবরাহীম (আ:)সহ দোয়া করতেন যেন তাঁদের শহর এবং নির্মিতব্য আল্লাহর ঘরে যেন মানুষ এবাদতের জন্য আসে। এই ঘর হচ্ছে কাবা। যা মক্কায় অবস্থিত, সিনাইতে নয়।

উত্তর : ৪. আরো যেসব উদ্ধৃতি নবীর মক্কায় আসার বিষয় নিশ্চিত করে

Habakuk এবং Isaiah -এ উল্লেখিত আছে যে নবী অত্যাচারিত হয়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য হবেন। অত:পর তিনি উত্তরের 'তেমা' নামক স্থানের কাছে এক শহরে যাবেন। মদিনা শহরের ঠিক উত্তরের মরুদ্যানের নাম তেমা। আরো বলা হয়েছে সেই শহরের লোকেরা তাঁকে সাদরে বরণ করবে।

রাসূল (সা:) এর জন্মের হাজার বছরের বেশি আগের ওল্ড টেস্টামেন্টে যে কথা বলা হয়েছে তা তাঁর জীবনে সত্য হয়েছিল। তাঁকে অত্যাচারের মুখে মক্কা ছাড়তে হয়েছে। মদিনাবাসী তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছিল। বাইবেলে আরও বলা হয়েছে যে অবশেষে নবী তাঁর সাথে দশ হাজার অনুসারীসহ তাঁর পূর্বের শহরে ফিরে আসবেন।

উত্তর : ৫. মক্কা নগর সম্পর্কে বিশেষ উদ্ধৃতি

Psalms of David যার উদ্ধৃতি নিচে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরে আছে। সেখানে একটি স্থানের উল্লেখ আছে যার নাম বেক্কা। বেক্কা হচ্ছে মক্কার প্রতিশব্দ, খোদ কুরআনে এই প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (৩:৯৬)।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. Deut ৩৩:১-৩, Gen ২১:২০-২১, ১৪:৬, Hab ৩:৩, Isaiah ২১:১৩-১৭ Psalms ৮৪:৬

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ১৪:৩৭, ২:১২৭-১২৮, ২:১৫৮, ২২:২৯, ২২:৩৩, ২২:২৬

সি- ৫ ভবিষ্যৎ নবীর বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন ১. বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ Isaiah এর ৪২ নং অধ্যায়ে ১ থেকে ১১ নং শ্লোক থেকে কি তথ্য পাওয়া যায়?

২. Isaiah এর ৪২ নং অধ্যায়ের ১ নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?

৩. Isaiah এর ৪২ নং অধ্যায়ের ২ নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?

৪. Isaiah এর ৪২ নং অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?

৫. Isaiah এর ৪২ নং অধ্যায়ের ৪ নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?

৬. Isaiah এর ৪২ নং অধ্যায়ের ৫, ৬, ও ৭ নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?

৭. Isaiah এর ৪২ নং অধ্যায়ের ৮ নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?

৮. Isaiah এর ৪২ নং অধ্যায়ের ১০ নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?

৯. Isaiah এর ৪২ নং অধ্যায়ের ১১ নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?

উত্তর : ১. Isaiah এর ৪২ নং অধ্যায়ের ১ থেকে ১১ নং শ্লোক

মুহাম্মদ (সা:) এর ভবিষ্যৎ নবী হিসেবে আগমনের পূর্বাভাস ওল্ড টেস্টামেন্টে স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে Isaiah এর উপরোক্ত শ্লোকগুলোর বর্ণনা এক অকাট্য দলিল। যাতে বিস্তৃতভাবে ভবিষ্যৎ নবীর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য রাসূলের (সা:) জীবনে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

উত্তর : ২. ১ নং শ্লোক

এখানে বলা হয়েছে যে, যে নবী আসবেন তিনি আল্লাহর বান্দা ও বাণীবাহক (Servant and Messenger) হিসেবে পরিচিত হবেন। মুসলমানরা কালেমা শাহাদাতে মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কে বলে 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' যার অর্থ বান্দা ও বাণীবাহক। এই শ্লোকে আরো বলা হয়েছে যার উপর ঐশী জ্যোতি আসবে তিনি হবেন খোদ স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত (Mine elect)। রাসূল (সা:) এর উপাধি ছিল আল মুস্তাফা অর্থাৎ The elect)

উত্তর : ৩. ২ নং শ্লোক

এটা বলা হয়েছে যে, যিনি আসবেন তিনি সদয় ব্যবহার দিয়ে সুন্দরভাবে তাঁর মিশন চালাবেন। তিনি নিরুৎসাহিত হবেন না এবং ব্যর্থ হবেন না। রাসূল (সা:) তাঁর মিশন শেষ পর্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত করেন। তিনি কখনো উৎসাহ হারাননি। তাঁর ব্যবহার ছিল সর্বমহল প্রশংসিত। নিষ্ঠার সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

উত্তর : ৪. ৩ নং শ্লোক

এখানে বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ নবী 'ভাঙা বাঁশী' ভাঙবেন না। একথা দিয়ে মিশরের সাথে রাসূল (সা:) এর ব্যবহারের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি এমন চুক্তি করেন যা সমগ্র মিশরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, এমনকি সেন্ট ক্যাথরিন এর গীর্জার খ্রিস্টানদেরও। এই শ্লোকে আরো আভাস দেয়া হয়েছে যে তিনি রোম এবং পারস্যের অত্যাচারী স্বৈরাচারী দু:শাসন থেকে নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করবেন।

উত্তর : ৫. ৪নং শ্লোক

এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ নবী শুধু ওহী প্রচারই করবেন না তিনি বিচার করবেন ও শাসন করবেন। রাসূল (সা:) ছিলেন একাধারে দ্বীন প্রচারক, বিচারক এবং শাসক। মুসা (আ:), দাউদ (আ:) এবং সোলায়মান (আ:) এর পর আর কোনো নবীর মধ্যে এত সব বৈশিষ্ট্য একসাথে দেখা যায়নি।

উত্তর : ৬. ৫-৭ নং শ্লোক

এসব শ্লোকে বলা হয়েছে যে, নবী আল্লাহর অনুগ্রহে মানুষকে দৃষ্টি দেবেন, অন্ধকার থেকে আলোতে আনবেন। রাসূল (সা:) এর আগমনের সময় আরবে যে অন্ধকার পাপে পূর্ণ জীবন ছিল এখানে তারই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা:) লোকদের সত্যিকার দ্বীনের আলো দেখিয়ে তাদের পথে আনেন। সত্য দ্বীন চিনতে পেরে তারা যেন অন্ধ চোখে দৃষ্টি ফিরে পায়। কুরআন এটাকে বলেছে, 'এটা একটি কিতাব যা আমি তোমার উপর নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের জমাট বাঁধা অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসো।'

উত্তর : ৭. ৮নং শ্লোক

এখানে বলা হয়েছে যে, সেই শেষ নবীর পর আর কাউকে তাঁর মতো সেই সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হবে না। এটা সময়ের পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, রাসূলের (সা:) মতো সম্মান মর্যাদা আর কেউ কখনো পায়নি। তাঁর জীবনাবসানের পর নবুওতের অকাট্য দাবি ও প্রমাণ নিয়েও আর কেউ বিশ্বজনীনভাবে দাঁড়াতে পারেনি।

উত্তর : ৮. ৯-১০ নং শ্লোক

আসন্ন নবী যে একটি নতুন কিতাব আনবেন তার কথা এখানে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে স্রষ্টার নামে এক নতুন গীত গাওয়া হবে। কুরআন আরবিতে নাজিল হয়েছে এবং এটা আজ দেড় হাজার বছর ধরে সব মুসলমানদের দ্বারা পাঁচ বার নামাজে গীত হচ্ছে।

উত্তর : ৯. ১১ নং শ্লোক- এই শ্লোকে ভবিষ্যৎ নবীর আগমনস্থলকে সূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে

এখানে আভাস দেয়া হয়েছে যে শেষ নবী কেদার (Kedar) এর আবাসের কাছে আবির্ভূত হবেন। এই কেদার হচ্ছেন ইসমাইল (আ:)-এর দ্বিতীয় পুত্র যিনি ফারানে

(আরবে) বসতি গড়েন। ইসমাইল (আ:) এর বংশে মহাম্মদ (সা:)ই একমাত্র যৌক্তিক এবং সফলভাবে নবুওতের দাবি নিয়ে আবির্ভূত হন।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, এই এগারোটি শ্লোকে বর্ণিত মানুষটি রাসূল মুহাম্মদ (সা:) ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. Isaiah ৪২:১-১১

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ১৬:১২৫, ২৯:৪৬, ৪:১৪৮, ৩১:১৯

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ৪:১৭৩, ১৪:১

সি- ৬ বাইবেলে কুরআন ও কাবার প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ১. ইতোমধ্যে উল্লিখিত উদ্ধৃতি ছাড়া বাইবেলে আর কোনো ইঙ্গিত আছে কি যাতে বোঝা যায় আলোচ্য ভবিষ্যৎ নবী মুহাম্মদ (সা:)।

২. ভবিষ্যৎ নবী যে শুধু নবীই হবেন না বরং রাষ্ট্রপ্রধানও হবেন এ বিষয়ে আর কোনো উদ্ধৃতি আছে কি?

৩. ভবিষ্যৎ নবীর কাছে কিভাবে ওহী আসবে সে বিষয়ে বাইবেলে কিছু বলা হয়েছে কি?

৪. ভবিষ্যৎ নবী যে এলাকায় আসবেন তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বাইবেল কিছু জানিয়েছে কি?

৫. ভবিষ্যৎ নবীর নাম সম্পর্কে বাইবেলে কোনো ইঙ্গিত আছে কি?

উত্তর : ১. বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যৎ নবী যে মুহাম্মদ (সা:)-এর পক্ষে আরো প্রমাণ

বাইবেলের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাইবেল অকাট্যভাবে মুহাম্মদ (সা:)-এর আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছে। যেমন Encyclopaedia Biblica মতে Isaiah-এর একাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে দেখা যায় যে, নবী Jesse-এর বংশে আসবেন। এই Jesse হচ্ছে ইসমাইল (আ:)এর নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। কাজেই উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ইসমাইল (আ:)-এর বংশে একজন আল্লাহর ওহী (Spirit অর্থাৎ কুরআন) লাভ করবেন এবং এর সাহায্যে তিনি নবী এবং শাসক হবেন। এখানে এটাও বলা হয়েছে যে তাঁর শেষ বিশ্রামস্থল হবে সম্মানিত ও মর্যাদাবান। এই তিনটি বিষয়ই রাসূল (সা:)-এর জীবনে সফল হয়েছিল। তিনি ইসমাইল (আ:)-এর বংশে আগমন করেছিলেন, আল্লাহর ওহী লাভ করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্র প্রধান হয়েছিলেন। আর প্রতি বছর সারা বিশ্বের কয়েক মিলিয়ন মানুষ তাঁর কবর জেয়ারত করে। যে সম্মান, মর্যাদা ও জিয়ারত এই বিশ্বের আর কারো সমাধিস্থল পায়নি।

উত্তর : ২. ভবিষ্যৎ নবী যে রাষ্ট্র প্রধানও হবেন এর পক্ষে দলিল

বাইবেলে ভবিষ্যৎ নবীর মিশনের প্রকৃতি এবং তিনি যেসব সাফল্য অর্জন করবেন তা এত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যা সন্দেহাতীতভাবে মুহাম্মদ (সা:)-এর সাথে সাদৃশ হয়। Isaiah-এর নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ভবিষ্যৎ নবীর কাঁধে থাকবে রাষ্ট্রক্ষমতা, তিনি

আঁধার যুগের অশিক্ষিত মানুষকে আলোকিত করবেন এবং তিনি পৃথিবীতে পরাক্রমশালী হবেন। রাসূল (সা:) রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন। আরো বলা হয়েছে তাঁর নেতৃত্বে অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষ প্রতিপত্তির সাথে দাঁড়াবে এবং পৃথিবীকে পরিমাপ করবে। রাসূল (সা:) তাঁর অনুসারী যারা ছিল সেই সমাজের নির্যাতিত অবহেলিত তাদের নিয়ে অত্যাচারীদের উপর বিজয়ী হয়েছিলেন।

উত্তর : ৩. নবীর কাছে কিভাবে ওহী আসবে এ বিষয়ে ভবিষদ্বাণী

ভবিষ্যৎ কিতাবটি যে আল কুরআন হবে এ আভাস বাইবেলে দেয়া হয়েছে Isaiah-এ ২৮ এবং ২৯ নং অধ্যায়ে। বলা হয়েছে যে, একজন নিরক্ষর ব্যক্তির কাছে ওহী আসবে। আল্লাহর প্রত্যাদেশ খণ্ড খণ্ড করে নাজিল হবে। কুরআন নাজিলের ধারা লক্ষ্য করলে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা দেখা যায়। ওহীর মাধ্যমে কুরআনের আয়াত শুনবার পর রাসূল (সা:) তা বারবার উচ্চারণ করতেন। অনেকটা থেমে থেমে (Stammering) মতো। এই কথাও বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে এসেছে।

উত্তর : ৪. নবী যে এলাকায় আসবেন তার ভৌগোলিক অবস্থান প্রসঙ্গে

কোন এলাকায় নবী আসবেন তার অবস্থান এবং তা কিভাবে গড়ে উঠবে এবং তার আগমনের কারণে সে এলাকা পবিত্র ভূমিতে পরিণত হবে তার উল্লেখও সফলভাবে বাইবেলে এসেছে রাসূল (সা:)-এর আগমনের কয়েক শত বছর আগে। এভাবে বেক্কা (মক্কার প্রতিশব্দ)- এর নাম এসেছে। এক নতুন জেরুজালেম এর অভ্যুদয় এর কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মক্কার পূর্বে জেরুজালেমই ছিল কেবলা।

উত্তর : ৫. বাইবেলে নতুন নবীর নাম সম্পর্কে ইঙ্গিত

Song of Solomon-এ একজনের নাম উল্লেখিত আছে যিনি হবেন সার্বিকভাবে প্রেমময় Altogether Lovely। এ ব্যাপারে মূল যে হিব্রু শব্দটি এসেছে তা হচ্ছে Mohamoudim ইহুদী এনসাইক্লোপিডিয়া মতে Im প্রত্যয় যে কোনো শব্দের শেষে মাহাত্ম্য মর্যাদা বাড়াতে ব্যবহৃত হয়। কাজেই Mohamoudim থেকে Im বাদ দিলে থাকে Mohamoud যা কিনা মুহাম্মদ (সা:)-এর নামের সাথেই মিলে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. Isaiah ১১:১
প্রশ্ন ২. Isaiah ৯:২-৭, Hab ৩:১-৭
প্রশ্ন ৩. Isaiah ২৯:১২, ২৮:১০-১১, ১৭:১০৬, Psalma ১২:৬-৭
প্রশ্ন ৪. ৪:২৫ ৫২:১, ৫৬:৭-৮, ২:১২৫
প্রশ্ন ৫. ৫:১৬
আরও দেখুন The Encyclopaedia Biblica

সি-৭ ভবিষ্যৎ নবীর আগমন সম্পর্কে নিউ টেস্টামেন্ট

প্রশ্ন ১. কুরআনে কি কোনো উদ্ধৃতি আছে যাতে দেখা যায় স্বয়ং ঈসা (আ:) মুহাম্মদ (সা:)-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

২. নিউ টেস্টমেন্টের কোথায় মুহাম্মদ (সা:)-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী করা হয়েছে?

৩. মুহাম্মদ (সা:)-এর আগমন নির্দেশক বাইবেলের এসব ভবিষ্যদ্বাণী খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা অনুধাবনে ব্যর্থ হলেন কেন?

৪. ঈসা (আ:) বর্ণিত প্যারাক্লিট/প্যারাক্লিটাস (Paraclete/Paracletus) যে মানুষ ছিলেন, কোনো ফেরেশতা ছিলেন না তা কিভাবে নিশ্চিত হবেন?

৫. ঈসা (আ:) বর্ণিত প্যারাক্লিট যে আরেকজন নবীই হবেন, জিব্রাইল (আ:)-এর অনুসারীদের সত্য পথ দেখাবেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলবেন। রাসূল (সা:)-এর জীবনে এমন উদাহরণ আছে কি?

৬. ঈসা (আ:) বলেছেন যে ভবিষ্যৎ মুক্তিদাতা (Comforter) ঈসা (আ:) এর অনুসারীদের সত্য পথ দেখাবেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলবেন। রাসূল (সা:)-এর কাজে কি এর প্রতিফলন ঘটেছে?

৭. ঈসা (আ:) বলেছেন, যে প্যারাক্লিট চিরঞ্জীব হবেন, অথচ মুহাম্মদ (সা:) প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন এ ব্যাপারে মুসলমানদের ব্যাখ্যা কি?

৮. ঈসা (আ:) বলেছেন যে, মুক্তিদাতা তাঁকে সত্যায়িত, সম্মানিত ও মর্যাদাবান করবেন। রাসূল (সা:) এর কাজে কি এর প্রতিফলন ঘটেছে?

৯. প্যারাক্লিট বিষয়ে মুসলমানদের ব্যাখ্যার পক্ষে আর কোনো যুক্তি আছে কি?

উত্তর : ১. কুরআন মতে মুহাম্মদ (সা:)-এর আগমন সম্পর্কে ঈসা (আ:)-এ ভবিষ্যদ্বাণী

কুরআন এবং হাদিসে উল্লেখিত আছে যে মুহাম্মদ (সা:)এর আগমন সম্পর্কে ঈসা (আ:) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (সূত্র দেখুন)।

উত্তর : ২. মুহাম্মদ (সা:)-এর আগমন সম্পর্কে নিউ টেস্টামেন্ট

নিউ টেস্টামেন্টে ঈসা (আ:) ভবিষ্যতে মুহাম্মদ (সা:)-এর আগমন সম্পর্কে বলেছেন। এ বিষয়ে John, 1st Epistle, Acts এ উল্লেখ আছে।

উত্তর : ৩. বাইবেলের এসব ভবিষ্যদ্বাণী খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা যে কারণে অনুধাবনে ব্যর্থ হলেন

নিউ টেস্টামেন্টে ঈসা (আ:) ভবিষ্যতে প্যারাক্লিট (Paraclete) অর্থাৎ মুক্তিদাতা (Comforter Counsellor Admonisher) -এর আগমনের আভাস দিয়েছেন। এই প্যারাক্লিট-এর অর্থ খ্রিস্টান পণ্ডিতরা মনে করেছেন জিবরাইল (আ:)। কিন্তু আমাদের মতে এর অর্থ মুহাম্মদ (সা:)। তার কারণ পরের প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করছি।

উত্তর : ৪. ঈসা (আ:)- এর ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যক্তিটি জিবরাইল (আ:) নয় কেন?

ক) বাইবেল থেকে এটা স্পষ্ট যে প্যারাক্লিট হবেন এমন ব্যক্তি যিনি পূর্বে আর আসেননি। অথচ জিবরাইল (আ:) সব নবীর কাছেই আল্লাহর ওহী নিয়ে আসতেন।

খ) Dictionary of the Bible-এর ১৯৬৫ সালের সংস্করণে লেখক বলেছেন যে প্যারাক্লিট-এর বৈশিষ্ট্য জিবরাইল (আ:)-এর সাথে মিলে না।

গ) প্রথম দিকের খ্রিস্টানরা প্যারাক্লিট-এর দাবিদার বিভিন্ন মানুষের অনুসরণ করত। এতে প্রমাণিত হয় যে তারা জানত যে প্যারক্লিট হবেন মানুষ।

ঘ) Interpreter's Dictionary of the Bible-এর ৬৫৪ ও ৬৫৫ নং পৃষ্ঠায় প্যারাক্লিট এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁকে একজন পুরুষ বলা হয়েছে। তিনি মানবতার মুক্তিদাতা হিসেবে আসবেন। কিন্তু ফেরেশতারা পুরুষ বা নারী কোনোটাই নন।

উত্তর : ৫. আসন্ন ব্যক্তি যে নবীই হবেন Holyghost নন এর স্বপক্ষে আরো দলিল

ক) John-এ আছে যে প্যারক্লিট নিজ থেকে কিছু বলবেন না। প্রভুর কথাই তিনি বলবেন। এতে দেখা যাচ্ছে প্যারাক্লিট আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান পাবেন। কিন্তু Holyghost ত্রিত্ববাদ মতে খোদায়ীর অংশ, কাজেই Holyghost কোনোভাবেই প্যারাক্লিট নন।

খ) রাসূল (সা:) নিজেই বলেছেন যে আল্লাহর কাছ থেকে তিনি ওহী লাভ করেন। কুরআনের প্রতিটি সুরা আল্লাহর নামে শুরু হয়েছে কাজেই প্যারাক্লিট নিজ থেকে কিছুই করবেন না বরং প্রভুর কথাই পড়ে শোনাবেন- এই কথা রাসূল (সা:)-এর ক্ষেত্রে মিলে যায়।

ঘ) ঈসা (আ:) বলেছেন যে প্যারাক্লিট তাঁর পরে আসবেন। বস্তুত তাঁর পরে মুহাম্মদ (সা:) ছাড়া আর কেউ নবুওতের দাবি নিয়ে আসেননি।

উত্তর : ৬. মুহাম্মদ (সা:) কি ঈসা (আ:)-এর অনুসারীদের সত্য পথ দেখান এবং সফল ভবিষ্যদ্বাণী করেন

কুরআন মতে রাসূল (সা:)-এর অন্যতম মিশন ছিল ঈসা (আ:)-এর অনুসারীদের সুপথে আনা। ঈসা (আ:) যে একজন নবী ছিলেন তাদের তা বোঝানো। মুহাম্মদ (সা:)

সাফল্যের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কিছু স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যদ্বাণী করেন যার প্রতিটিই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

উত্তর : ৭. প্যারাক্লিট-এর চিরঞ্জীবী হওয়া প্রসঙ্গে

শারীরিকভাবে কোনো মানুষই চিরঞ্জীব হতে পারেন না। কিন্তু রাসূল (সা:)-এর শিক্ষা আজ দেড় হাজার বছর পরও অবিকৃত অক্ষত আছে। কেয়ামত পর্যন্ত তা অক্ষত থাকবে। অতএব রাসূল (সা:) এই অর্থে চিরঞ্জীব। কাজেই "প্যারাক্লিট চিরঞ্জীব- অতএব রাসূল (সা:) প্যারাক্লিট হতে পারেন না"- এ ধরনের খ্রিস্টান মতবাদ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তর : ৮-৯. রাসূল (সা:) কি ঈসা (আ:)কে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন?

ঈসা (আ:)-এর প্যারক্লিট সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রাসূল (সা:)-এর সাথে মিলে যায়। তিনি বলেছিলেন যে, নতুন নবী তাঁকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করবেন। বাস্তবে দেখা যায় কুরআন এবং হাদিসে ঈসা (আ:) কে কত উচ্চ সম্মান দেয়া হয়েছে। এমনকি বাইবেলের চেয়েও তাঁকে বেশি মহান করে কুরআন উপস্থাপন করেছে। কারণ বাইবেলে উল্লেখ আছে যে যীশু মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৬১:৬

জনগণকে রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করেছিলো তাঁর রাসূল হিসেবে আগমনের কারণ প্রসঙ্গে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আমার আগমন ইবরাহীম (আ:)-এর দোয়া এবং ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করতে।

প্রশ্ন ২. Jahn ১৪:১৫-১৮, ১৫:২৬-২৭, ১৬:৭-১৫, 1st Epist ২:১

প্রশ্ন ৩. Acts ২:১২:১৩

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৫৩:৩-৫, ৭:২০৩

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ১৬:৮৯, ৫:৩

প্রশ্ন ৮. ২৭:৪৬, ১২:৪৭-৪৮, ২৩:৩১-৩৩, ১৯:৩০-৩১

আরো দেখুন The Dictionary of the Bible, Interpreter's Dictionary of the Bible.

সি-৮ ভবিষ্যৎ নবী সম্পর্কে
নিউ টেস্টামেন্ট

প্রশ্ন ১. গ্রিক শব্দ প্যারাক্লিট এর প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা কি?

২. প্যারাক্লিটাস প্রসঙ্গ ছাড়া মুহাম্মদ (সা:) এর নবুওত সম্পর্কে আর কোনো পূর্বাভাস বাইবেলে আছে কি?

৩. একজন মুসলমানের পক্ষে মুহাম্মদ (সা:) এর আগমন সম্পর্কে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করাটা আদৌ কতটা যুক্তসঙ্গত?

৪. ইসমাইল (আ:) এর বংশে নবী আসার বিষয়টি বাইবেলে কিভাবে এসেছে?

৫. মুসা (আ:)-এর সাথে মুহাম্মদ (সা:)- এর কি কি মিল আছে?

৬. ভবিষ্যৎ নবী যে আরবেই আসবেন এমন কোনো উল্লেখ বাইবেলে আছে কি?

৭. এমন কথা কি বাইবেলে উল্লেখিত আছে যে ভবিষ্যৎ নবী একজন দেশ শাসকও হবে?

৮. ভবিষ্যৎ নবী কিভাবে অহী পাবেন বলে বাইবেল উল্লেখ করেছে? এই উদ্ধৃতির সাথে রাসূল (সা:)-এর কি মিল দেখা যায়?

৯. রাসূল (সা:)-এর জীবনের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার পূর্বাভাস বাইবেলে আছে কি?

১০. ইসরাইল বংশ থেকে নবুওত ইসমাইলের বংশে স্থানান্তরিত হবে নিউ টেস্টামেন্টে এমন কিছু উল্লেখ আছে কি?

উত্তর : ১. প্যারাক্লিট শব্দের অর্থ

গ্রিক শব্দ প্যারাক্লিট এর অর্থ এমন কেউ যিনি মানুষকে সতর্ক করবেন, পরামর্শ এবং প্রশান্তি দেবেন। প্যারাক্লিট শব্দের কাছাকাছি অর্থে আর একটি শব্দ গ্রিক ভাষায় আছে তা হচ্ছে প্যারাক্লিটাস। এর অর্থ সম্মানিত বা প্রশংসিত বা প্রশংসার যোগ্য। এ শব্দের আরবি অনুবাদ হচ্ছে 'আহমাদ'। আর এটা বেশ গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করার বিষয় যে রাসূল মুহাম্মদ (সা:) এর আরেক নাম 'আহমাদ'।

উত্তর : ২. প্যারাক্লিট প্রসঙ্গ ছাড়াও রাসূল (সা:)-এর আগমন সম্পর্কে আর যেসব পূর্বাভাস পাওয়া যায়

John এর প্রথম অধ্যায়ের ১৯ থেকে ২৫ নং শ্লোকে দেখা যায় যে সাধু পুরুষরা জন দি ব্যাপটিস্ট (আ:) এর কাছে যান এবং তাঁরা তিনজন নবীর আগমনের প্রত্যাশা করছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ইলিয়াস (আ:), ঈসা (আ:) এবং মুহাম্মদ (সা:)।

উত্তর : ৩. মুহাম্মদ (সা:) এর নবুওত সম্পর্কে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি নেয়া প্রসঙ্গে

মুসলমানরা আল্লাহর দেয়া সব কিতাব বিশ্বাস করে। যদিও মূল ইনজিলের অনেক বিকৃতি বাইবেলে ঘটেছে। তবুও মূল ইনজিলের বেশ কিছু অংশ অক্ষত রয়ে যেতে পারে। কাজেই কুরআনের সাপেক্ষে তুলনা করে বাইবেল থেকে যে কোনো বিষয়ে উদ্ধৃতি নেয়া যেতে পারে। এতে কোনো দূষণীয় কিছু নেই।

উত্তর : ৪. ইসমাইল (আ:) এর বংশেই যে ভবিষ্যৎ নবী আসবেন তার প্রমাণ

ক) তাওহীদবাদীদের জাতির পিতা ইবরাহীম (আ:) এর দুই পুত্রের বংশে নবী দিয়ে তাঁদের রহমত করার প্রতিশ্রুতি সাধারণভাবে আল্লাহ দিয়েছিলেন।

খ) এছাড়া আলাদা করে সুনির্দিষ্টভাবে ইসমাইল (আ:) ও ইসহাক (আ:) উভয়কে তাঁদের বংশে নবী দেয়ার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন।

গ) ইতিহাসে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটেছে। ইসহাক (আ:)-এর বংশে সকল বনী ইসরাইলী নবীরা এসেছেন। আর ইসমাইল (আ:)-এর বংশে মুহাম্মদ (সা:) এসেছেন।

ঘ) Isaiah-তে জেসিকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে তাঁর বংশে নবী দেয়া হবে। জেসি হচ্ছে ইসমাইল (আ:)-এর নামেরই সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ।

উত্তর : ৫. মুসা (আ:) এর সাথে মুহাম্মদ (সা:) এর মিল প্রসঙ্গে

মুসা (আ:) এর সাথে মুহাম্মদ (সা:)-এর মিল থাকার প্রসঙ্গে দশটিরও বেশি যুক্তি ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাইবেলে বলা হয়েছিল যে আসন্ন নবী হবেন মুসা (আ:)-এর মতো। বস্তুত মুসা (আ:)-এর সাথে রাসূল মুহাম্মদ (সা:)-এর অসংখ্য মিল পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে মুসা (আ:)-এর জীবন ও মিশন এবং তাঁর পরিণতির সাথে ঈসা (আ:)-এর কোনো মিল লক্ষ্য করা যায় না।

(সি-৩ এর আলোচনা দেখুন)

উত্তর : ৬. বাইবেলে ভবিষ্যৎ নবী আরবেই আসবেন এমন উল্লেখ প্রসঙ্গে

বাইবেলে পারান, কেদার, বেক্কা এসব স্থানের উল্লেখ আছে যা স্পষ্টভাবে আরব এবং মক্কাকেই ইঙ্গিত করে।

উত্তর : ৭. 'ভবিষ্যৎ নবী দেশ শাসকও হবেন' বাইবেলের এমন উক্তি প্রসঙ্গে

বাইবেলে শেষ নবীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে মুহাম্মদ (সা:) এর মাঝেই এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেমন তাঁর উপাধি ছিল আল্লাহর বান্দা ও বাণীবাহক (রাসূল)। তাঁর প্রচারিত বিশ্বাস বিশ্বজনীন হয়েছে। তিনি এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হন এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হন (সূত্র দেখুন)।

উত্তর : ৮. রাসূল (সা:) যেভাবে ওহী লাভ করতেন

রাসূল (সা:)-এর ওহী লাভের পদ্ধতি সম্পর্কে বাইবেলে অকাট্য সত্য দলিল আছে (সূত্র দেখুন)। ইতিহাস থেকে জানা যায় রাসূল (সা:) ছিলেন নিরক্ষর। জিব্রাইল (আ:)-এর আনীত বার্তাই তিনি পড়তেন যার উল্লেখ বাইবেলে আছে। এমনকি কুরআনের প্রতিটি অধ্যায় আল্লাহর নামে শুরু হবে তার উল্লেখও বাইবেলে আছে। আল্লাহর ওহী ভুলে যাবার ভয়ে রাসূল (সা:) তা বার বার থেমে থেমে উচ্চারণ করবেন এমন ইঙ্গিতও বাইবেল দিয়েছে।

উত্তর : ৯. রাসূল (সা:) জীবনের কিছু ঘটনা সম্পর্কে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী

Isaiah এবং Habakuk-এ উল্লেখিত আছে যে ভবিষ্যৎ নবী তাঁর নিজ দেশ ত্যাগে বাধ্য হবেন। তিনি উত্তরের এক শহরে যাবেন যার অধিবাসীরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবেন। রাসূল (সা:)-এর মদীনায় হিজরত এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সফল করে। উল্লেখ্য যে, মদীনা নগরী মক্কার উত্তরে অবস্থিত।

Deut-এ আছে যে নবী 'ফারান' এর পর্বত থেকে ১০,০০০ সাধকসহ এগিয়ে আসবেন- হিজরতের দশ বছর পর ১০,০০০ সাহাবাসহ বিজয়ীর বেশে রাসূলের মক্কা প্রবেশের সুন্দর ইঙ্গিত বাইবেলে এভাবেই পাওয়া যায়।

উত্তর : ১০. নবুওতের দায়িত্ব ইসরাইল বংশ থেকে ইসমাইল বংশে স্থানান্তরিত হবে এ বিষয়ে নিউ টেস্টামেন্টের উদ্ধৃতি

ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট দুটোতেই বনী ইসরাইলের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে তারা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করলে তাদের কাছ থেকে নবুওত কেড়ে তাদের ইসমাইলী ভাইদের দেয়া হবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. John ১:১৯-২৫ Deut ১৮:১৮
প্রশ্ন ৪. Isaiah ১১:১-২
প্রশ্ন ৬ Deut ৩৩:১-৩, Psalm ৮৪:৬
প্রশ্ন ৭. Isaiah ৪২:১-১১
প্রশ্ন ৮. Deut ১৮:১৮-২০ Deut ২৮:৯-১১ Isaiah ২৯:১১-১৩
প্রশ্ন ৯. Isaiah ২১:১৩-১৭, Deut ৩৩:১-৩, Hab ৩:৩
প্রশ্ন ১০ Deut ১৮:১৮
প্রশ্ন ১১ Jer ৩১:৩৬, Matt ২১:৪৩

ডি : মুসলমানদের মৌলিক শিল্পসমূহ

ডি-১ ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস

প্রশ্ন ১. ইসলামে ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাসের ভিত্তি কি?

২. কুরআন এবং হাদিসে ফেরেশতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? তাদের কি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

৩. ফেরেশতাদের কখন সৃষ্টি করা হয়েছে এ বিষয়ে কুরআনে কিছু বলা হয়েছে কি?

৪. ফেরেশতা বলতে নিষ্পাপ সত্তা বুঝায়। তাহলে ফেরেশতারা কি মানুষের চেয়ে উত্তম সৃষ্টি?

৫. দ্বিতীয় সুরার ৩৩-৩৪ আয়াতে দেখা যায় আল্লাহ ফেরেশতাদের আদম (আ:) কে সেজদার আদেশ করলে শয়তান সে আদেশ অমান্য করে- সব ফেরেশতা আল্লাহর আদেশ পালনে বাধ্য হলে শয়তান কেন আদম (আ:) কে সেজদা করল না? শয়তান কি ফেরেশতা ছিল?

৬. ফেরেশতা কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? তাদের কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে?

৭. ফেরেশতাদের চেহারার প্রকৃতি কেমন? তারা মানুষের রূপে আসতে পারে?

৮. ফেরেশতাদের সাথে মানুষের কি সম্পর্ক?

৯. মুসলমানদের ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাসের বাস্তব কোনো প্রয়োগ আছে কি?

উত্তর : ১. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক অংশ। তাওহীদ এবং রেসালাতে বিশ্বাসের মতোই ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে সরাসরি আদেশ আছে।

ফেরেশতাদের সম্পর্কে তথ্যের উৎস :

ফেরেশতাদের প্রকৃতি, কাজ, মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানবার আগে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। মানুষের দৃষ্টি, শ্রবণ শক্তি ও চিন্তার সীমার মধ্যেই আল্লাহ পাকের বিশাল সৃষ্টি জগৎ সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর মহান সৃষ্টি জগতের মধ্যে অদেখা বা গায়েবী জগৎ নামে এক বিশাল জগৎ আছে। মানুষের সীমাবদ্ধ অনুভূতি বা বৈজ্ঞানিক কলা কৌশল প্রয়োগ করেও যা সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। এই জগৎ

সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস আধ্যাত্মিক ওহী। আল্লাহর ওহীর সর্বশেষ সংস্করণ কুরআন থেকেই আমরা এই জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি।

উত্তর : ২-৫. ফেরেশতাদের প্রকৃতি, গঠন ও চরিত্র

কুরআন ও হাদিস থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতারা কোনো দেহধারী সত্তা নয়। মানুষকে কাদা থেকে তৈরি করা হয়েছে, জ্বীনকে আগুন থেকে তৈরি করা হয়েছে। ফেরেশতাদের সম্ভবত আলো (নূর) থেকে তৈরি করা হয়েছে। আলো থেকে তৈরি করা হবার কারণে এটা অনুমিত হয় যে, পাপ তাদের স্পর্শ করবে না এবং মানুষের চেয়ে তারা অধিক ক্ষমতার অধিকারী হবে। যদিও ফেরেশতারা ভুল ও পাপের উর্ধ্বে তবুও তারা আল্লাহর কাছে মানুষের চেয়ে বড় নয়। কারণ ফেরেশতাদের এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে তাদের ভুল হতে পারে না। অন্যদিকে শয়তানের তীব্র কুমন্ত্রণা মোকাবিলা করে অন্যায় করার স্বাধীনতা থাকার পরও মানুষ যথাযথভাবে আল্লাহর আদেশ পালন করে, যা অত্যন্ত কঠিন। কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ আদম (আ:) কে সেজদা দিতে ফেরেশতাদের আদেশ করেন। কারণ আদম (আ:) কে এমন জ্ঞান দেয়া হয়েছিল যা ফেরেশতাদের ছিল না। শয়তান প্রকৃতভাবে ফেরেশতা ছিল না এ কারণেই তার পক্ষে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা সম্ভব হয়েছে।

উত্তর : ৬-৮. ফেরেশতাদের কাজ ও মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক

কুরআন ও হাদিস থেকে ফেরেশতাদের কাজ ও মানুষের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে নিম্নলিখিত শিক্ষা পাওয়া যায় :

ক) সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর এবাদত ও জিকির করা।

খ) আল্লাহর ওহী বহন করা।

গ) প্রত্যেক মানুষের সাথে থেকে তার কাজকর্মের হিসাব রাখা।

ঘ) মানুষকে ভালো কাজ করতে ও শয়তানের কাছ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করা।

ঙ) ধার্মিক লোকের ঘনিষ্ঠ থাকা।

চ) বিশ্বাসীদের বিপদের সময় সাহায্য করা।

ছ) বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

উত্তর : ৯. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাসের বাস্তব প্রয়োগ

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাসের কারণে মানুষ ভালো বা মন্দ কাজের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। কারণ তারা চাইবে যেন আল্লাহ এবং তাঁর সম্মানিত এই সহযোগিরা কেউ তাদের কাজে অসন্তুষ্ট না হোন।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৩২:৭, ১৫:২৭, ৫৫:১৫, ৬৬:৬, ১৬:৪৯-৫০, ২১:২৬-২৯, ৭:২০৬

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ২:৩০

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ২:৩১:-৩৪

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ১৮:৫১

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ২৬:১৯৩-৪, ১৬:১০২

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ১১:৬৯-৭৩, ১৯:১৬-১৭

প্রশ্ন ৮. আল কুরআন ৮২:১০-১২, ৪৩:৭৯-৮০, ৫০:১৬-১৮, ১৭:১৩-১৪, ১৭:৭৮, ৪১:৩০, ৮:১০-১২, ৪০:৭, ৩৩:৪৩

প্রশ্ন ৯. আল কুরআন ২:৭৭, ২:২৮৫

ডি-২ জ্বীনের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ১. ফেরেশতা ছাড়া আর কোনো অদেখা সৃষ্টির অস্তিত্ব মুসলমানরা বিশ্বাস করে কি?

২. জ্বীনের প্রকৃতি কি? জ্বীনদের কি থেকে তৈরি করা হয়েছে?

৩. সব জ্বীনই কি শয়তানে পরিবর্তিত হয়?

৪. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শয়তান কিভাবে জড়িত?

৫. শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয়েছে কি?

৬. এটা কি সত্যি যে, শয়তান মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে খারাপ কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না?

৭. কোন কোনো অবস্থা ও প্রেক্ষিতে শয়তান মানুষকে প্ররোচিত করার সুযোগ পায়?

৮. জ্বীন জাতিকে কেন তৈরি করা হয়েছে?

উত্তর : ১. অদেখা সৃষ্টিতে বিশ্বাস প্রসঙ্গে

আল্লাহ সৃষ্টি জগৎকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়-

দেখা জগৎ (Seen) অদেখা জগৎ (Unseen)

(মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী) (জ্বীন ও ফেরেশতা)

মানুষের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী আছে। জ্বীনের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী আছে

মানুষ এবং জ্বীন উভয় জাতির বিশ্বাসীরা ফেরেশতার মতো।

মানুষ এবং জ্বীন উভয় জাতির অবিশ্বাসীরা শয়তানের অনুসারী।

উত্তর : ২-৩. জ্বীন-এর প্রকৃতি

মুসলমানরা জ্বীন জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, জ্বীন হচ্ছে এমন সৃষ্টি যাদের দেখা যায় না। কারণ তাদের ধোঁয়াহীন আগুন থেকে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু জ্বীন শব্দটি শয়তান বা তার সহযোগিদের প্রতিশব্দ নয়। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, জ্বীনরা মানুষের মতোই আরেকটি জাতি। মানুষের মতই ভালোমন্দ যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। তাদের কেন তৈরি করা হয়েছে তা আল্লাহই ভালো জানেন। এটা অনুমিত হয় যে, মানুষকে পরীক্ষা করার কাজে তাদেরকে ব্যবহার করা হয়। যেখানে ফেরেশতারা মানুষকে ভালো কাজের দিকে ডাকে সেখানে অবিশ্বাসী জ্বীন মানুষকে খারাপের মন্ত্রণা দেয়।

উত্তর : ৪-৫. মানুষের জীবনে শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা প্রতিরোধের উপায়

যে কোনো খোদাদ্রোহী ব্যক্তি বা শক্তিকে মুসলমানরা শয়তান নামে অভিহিত করে। জ্বীনের সর্দার ইবলিস আদম (আ:) কে সেজদা করা সংক্রান্ত আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাই তার নাম শয়তান রাখা হয়। ফেরেশতারা মানুষকে সুপথে চালিত করে। আর শয়তান ইবলিশ ও তার দলভুক্ত জ্বীন এবং অবিশ্বাসী মানুষরা সাধারণ মানুষকে খারাপ কাজে উৎসাহ দেয়। শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে করণীয়-

ক) শয়তানকে শত্রু মনে করে তার থেকে দূরে থাকা। এ জন্যে কুরআন থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত।

খ) সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত। কারণ শয়তান সব সময় খারাপ অশ্লীল বিষয়গুলোকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে উপস্থাপন করে। শয়তানের এসব অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে এগুলোকে সমাজ থেকে দূরে রাখতে হবে।

উত্তর : ৬. শয়তানের শক্তি

শুধুমাত্র যারা নিজেদের মাঝে শয়তানকে কাজ করতে দেয় তাদের উপরই শয়তান প্রভাব খাটাতে পারে। প্রত্যেক মানুষকে ভালোমন্দ, সত্য-মিথ্যা আল্লাহর পথ ও শয়তানের পথ যাচাই করবার মতো বিবেক দেয়া হয়েছে। কোনো মানুষ সাময়িকভাবে শয়তানের ধোকায় পড়লে সাথে সাথে আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) এর মতো তওবা করতে পারে।

উত্তর : ৭. যেসব পরিস্থিতিতে শয়তান মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে তা নিম্নরূপ

ক) আল্লাহয় অবিশ্বাস। তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার। তাঁর শক্তি ও নেয়ামতের উপর অকৃতজ্ঞ, অবহেলার আচরণ।

খ) আল্লাহর আনুগত্যহীনতা। তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ করা।

গ) আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং তাঁর পথ অনুসরণ না করা।

কুরআন বলে কেউ শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করলে সে যেন বলে 'আমি পলায়নপর শয়তানের কবল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি।'

উত্তর : ৮. জ্বীন তৈরি প্রসঙ্গে

জ্বীনেরা মানুষের মতোই স্বাধীনভাবে ভালো বা মন্দ যে কোনো পথে চলার অধিকার রাখে। যারা বেঈমান অবিশ্বাসী জ্বীন তারা শয়তানের অনুচরে পরিণত হয়। এদের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়। জ্বীন জাতির সৃষ্টি আল্লাহর বিশাল ক্ষমতার বহি:প্রকাশ। তিনি এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম মানুষ যাদের দেখতে পারবে না।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ১৫:২৬:২৭, ৬:১৩০, ৪৬:২৯-৩২

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৭:২১, ২:২৬৮, ৮:৪৮, ১৬:৬৩

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৭:১৬, ৪:১১৭, ৪৩:৬২, ৭:২৭, ৬:১৪২, ২৪:২১, ৩৬:৫৯-৬২

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ৯১:৭-৮, ১৬:৯৮-১০০, ৭২:৬, ২:৩৭, ২০:১২০-১২২

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ১৯:৮৩, ৫৯:১৬, ৫৮:১৯, ৪৩:৩৬, ৭:২০১, ২৩:৯৮

ডি-৩ জাদু, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং গায়েবী চর্চা বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন ১. মুসলমানরা কি জাদুতে বিশ্বাস করে? ইন্দ্রজাল কি জাদুর অন্তর্ভুক্ত?

২. ইন্দ্রজাল সম্পর্কে ইসলাম কি বলেছে?

৩. শুধু জানার জন্য জাদু শেখা যাবে কি?

৪. কোনো ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে জাদুকর-এর কাছে যাওয়া কি ইসলাম সম্মত?

৫. যদি কারও বড় বিপদ হয় তখন সে উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারে কি করবে?

৬. ভবিষ্যৎ জানার জন্য ভাগ্যগণনাকারীর কাছে যাওয়া যায় কি?

৭. নবী-রাসূলরা যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা কি 'একমাত্র আল্লাহই গায়েবের জ্ঞান রাখেন' এ ধারণার পরিপন্থী নয়?

৮. যেসব জ্যোতিষ গ্রহ নক্ষত্র দেখে ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে তাদের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর : ১-২. জাদু ও ইন্দ্রজাল

মুসলমানরা জাদু বিদ্যার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস করে কিন্তু জাদু বিদ্যায় বিশ্বাস করে না। জাদু সম্পর্কে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি এর ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যেমন এক ধরনের জাদু যার নাম আরবিতে 'সিহ্‌র' যা শুধুমাত্র আনন্দ খেলাধুলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা নির্দোষ। কিন্তু যে যাদুর কৌশল ও ধাঁধা মানুষকে ঠকাবার এবং ভয় দেখাবার কাজে ব্যবহৃত হয় তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যে জাদুর মাধ্যমে শয়তানী শক্তিকে জাগ্রত করে মানুষের ক্ষতির চেষ্টা করা হয় তাকে বলে ইন্দ্রজাল (Sorcery)। এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কুরআনে এর ক্ষতি থেকে মানুষকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে।

উত্তর : ৩. জাদু শেখা

কুরআনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও রাসূল (সা:) বলেন যে, ৭টি মহাপাপ মানুষের আখেরাত ধ্বংস করে। এর প্রথমটি হচ্ছে শিরক, দ্বিতীয়টি জাদু বিদ্যায় বিশ্বাস ও চর্চা। জাদু শেখার সাথে এর চর্চার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। চর্চা ছাড়া মানুষ কিছুই শিখে না এজন্যে এটা শেখাও নিষেধ। দেখা যায় যারা জাদুবিদ্যা শিখতে যায় তাদের অনেকে পরিণামে উন্মাদ হয়ে যায়। ইসলাম মানুষকে সব সময় রক্ষা করতে চায়।

উত্তর : ৪-৫. জাদুকর এর সাহায্য গ্রহণ প্রসঙ্গে

দুটো প্রধান কারণে যাদুকর এর সাহায্য গ্রহণ মুসলমানদের জন্য নিষেধ। প্রথমত যে জাদু চর্চা করে হাদিস অনুসারে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমন ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া অবান্তর এবং গোনাহের কাজও বটে। দ্বিতীয়ত একমাত্র আল্লাহই সব কিছুর উপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাখেন। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কারো পক্ষে অন্য কারো ক্ষতি করা সম্ভব নয়। বিপদে পড়লে জাদুকরের সাহায্য না নিয়ে যা করা উচিত-

ক) দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহর ক্ষমতায় কারো ভাগ নেই।

খ) একমাত্র আল্লাহই ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন। কাজেই জাদুকর বা অন্য কোনো শক্তির উপর বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে হবে।

গ) আল্লাহর উপর আস্থা রেখে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তাঁকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ভেবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। বিপদ উদ্ধার চাইতে হবে।

ঘ) নিজের বুদ্ধি, সাধ্য, শক্তি প্রয়োগ করে সংকট উত্তরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে আল্লাহর উপর আস্থা অটল রেখে বন্ধুদের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

উত্তর : ৬. গায়েব-এর জ্ঞান প্রসঙ্গে

কুরআনে অদেখা বিষয় সম্পর্কে 'গায়েব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সে জগতের খবর আমাদের জ্ঞানের বাইরে। তিন ধরনের গায়েব আছে।

ক) আমাদের নিকট অতীতের বিষয় সম্পর্কে আমরা জানি না। কারণ তখন আমরা ছিলাম না। তবে তখন যারা ছিলেন তাদের লেখা থেকে আমরা সে ইতিহাস অবহিত হতে পারি।

খ) সুদূর অতীতের বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই। মানুষের পৃথিবীতে আবাসের আগে কি ছিল কিভাবে এখানে বসতি হলো– এ সম্পর্কে শুধু অনুমান করতে পারি।

গ) ভবিষ্যতে কি হবে, মৃত্যুর পর কি হবে এসব বিষয়ে আমরা কিছুই জানতে পারি না। একমাত্র আল্লাহই এসবের খবর রাখেন। তিনি ওহীর মাধ্যমে এই সব বিষয়ের কিছু খবর আমাদের দিয়েছেন।

উত্তর : ৭-৮. নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী ও জ্যোতিষশাস্ত্র

কোনো গণক অথবা জ্যোতিষ ভবিষ্যতের খবর দিতে পারে না। গায়েবের এবং ভবিষ্যতের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। নবীগণই আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

কুসংস্কার প্রভাবিত ও প্রতারণার কৌশল। কুরআনে বলা হয়েছে যে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে চারটি কাজ হয়। যথা :

ক) সৌন্দর্য বৃদ্ধি

খ) নাবিক ও পর্যটকদের দিক নির্ণয়ে সাহায্য

গ) আকাশকে আলোকিত করা।

ঘ) সূর্যের মত উজ্জ্বল (Glorious) হওয়া।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৭:১১৩-১১৬, ২০:৬৬, ১১৩, ২:১০২

প্রশ্ন ২ এবং ত. আল কুরআন ২:১০২

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ২৭:৬৫, ৬:৫০, ৭:১৮৮, ৩৪:১৪

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ৭২:২৬-২৭

প্রশ্ন ৮. আল কুরআন ১৫:১৬, ৬:৯৭, ২৫:৬১, ১০:১৫

ডি-৪ স্বপ্ন, অশুভ দৃষ্টি, হিংসা, নষ্ট-নযর, বশীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন ১. গায়েবের এমন কোনো বিশেষ দিন আছে কি যা শুধু আল্লাহ জানেন বলে ইসলামে বলা হয়েছে?

২. উপরের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত ৫টি বিষয় কি বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে জানা যায়?

৩. কারো কারো দেখা স্বপ্ন সত্যি হয়। এটা কি এ ধারণার পরিপন্থী যে মানুষ ভবিষ্যৎ জানতে পারে?

৪. অশুভ লক্ষণ, অপয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে কুরআন কিছু বলেছে কি?

৫. শুভ লক্ষণ, পয়মন্ত ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৬. ইসলাম মতে হিংসা, নষ্ট নজর ইত্যাদি মানুষের ক্ষতি করতে পারে কি?

উত্তর : ১. যে সব বিষয় শুধু আল্লাহর জানা

মানুষ বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে। তবু কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, ৫টি বিষয়ে জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে আছে। যথা-

ক) কেয়ামত ও হাশর কবে হবে।

খ) বৃষ্টিপাত।

গ) মাতৃগর্ভে কি আছে।

ঘ) মানুষ আগামী দিন কি রোজগার করবে।

ঙ) মানুষ কোথায় কিভাবে মারা যাবে।

উত্তর : ২. এই পাঁচটি বিষয়ে বিজ্ঞান কি ধারণা দিতে পারে

অনেকে বলবেন যে, বিজ্ঞান আজকাল বৃষ্টিপাত, মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছুর পূর্বাভাস দিতে পারে। কিন্তু এতে জ্ঞানের জগতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। প্রথমত: আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে পূর্বাভাস দেন তা প্রকৃতির কিছু নিয়ম পর্যবেক্ষণ করে। প্রকৃতির এসব নিয়ম আল্লাহই প্রকৃতিকে নিয়মের অধীন করেছেন। তিনি যে কোনো সময় নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানোর সামর্থ্য রাখেন, যা বিজ্ঞানীরা রাখেন না। এজন্যে অনেক সময় পূর্বাভাস ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞানীরা আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। কাজেই মানুষের পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানও আল্লাহ সৃষ্ট নিয়মের গবেষণার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত: মানুষের এসব পূর্বাভাস অকাট্য নয় এবং তা

মুলত: কিছু মৌলিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ। যেমন বিজ্ঞানীরা মাতৃগর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে, তার কোনো জন্মগত দোষ হবে কিনা ইত্যাদি পূর্বাভাস দিতে পারেন। কিন্তু সন্তান ভালো হবে না মন্দ হবে, বিশ্বাসী হবে না অবিশ্বাসী হবে, কবে কোথায় সে মারা যাবে ইত্যাদি কিছুই বলতে পারে না।

নির্দিষ্ট বেতনের চাকুরীজীবী বলতে পারে যে আগামী সপ্তাহে সে কত রোজগার করবে। কিন্তু এটাই সব নয়। সে কত পাপ-পূণ্য অর্জন করবে তা সে বলতে পারবে না। তার রোজগারে কত বরকত হবে তাও তার ধারণার বাইরে। ক্যান্সার রোগীকে হয়তো ডাক্তার মৃত্যুর পূর্বাভাস দিতে পারবেন। কিন্তু ঠিক কবে কোথায় কি অবস্থায় মৃত্যু ঘটবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

এসব কারণে একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, জন্ম-মৃত্যু, রিজিক, কালের আবর্তন-বিবর্তন, জগতের বিনাশ (কেয়ামত) এসব বিষয়ে মানবীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করা যায় না। এ সবের আসল জ্ঞান আমরা আল্লাহর ওহী থেকেই লাভ করতে পারি।

উত্তর : ৩. স্বপ্ন

রাসূল (সা:)-এর মতে স্বপ্ন তিন প্রকার যথা-

ক) ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয়।

খ) খারাপ/কুমন্ত্রণাপূর্ণ স্বপ্ন শয়তান দেখায়।

গ) সাধারণ স্বপ্ন মানুষের চিন্তা থেকে উদ্ভূত।

খারাপ স্বপ্ন দেখলে শয়তানের কবল থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। খারাপ স্বপ্ন দেখার পর পাশ ফিরে শুতে বলা হয়েছে। অথবা ঘুম থেকে উঠে অজু করে নামাজ পড়তে বলা হয়েছে। খারাপ স্বপ্নের বিষয় অন্যকে না বলাই উত্তম। ভালো স্বপ্নের খবর আপনজনদের বলা যায়। নবীদের স্বপ্ন ওহীরই এক রূপ। তাঁরা তা অনুসারীদের বলতেন।

উত্তর : ৪-৫. মন্দভাগ্য, অপয়া, পয়মন্ত ইত্যাদি প্রসঙ্গে

এটা একটি কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস যে কারো সাথে মন্দভাগ্য বা অশুভ কিছু আসে। একইভাবে কারো আগমনে ভাগ্য ফিরে এমন ধারণাও কুসংস্কার। ইসলামে এসবের কোনো অনুমতি নেই। একমাত্র আল্লাহই ভালোমন্দ বিতরণের সামর্থ্য রাখেন। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভালো বা মন্দ নির্ধারণের সামর্থ্যবান মনে করা আল্লাহর সাথে শরিক করার নামান্তর।

রাসূলের হাদিসে দেখা যায় যে, গলার মালা, পাথর ইত্যাদিতে ভাগ্য ফিরে এমন ধারণা করা শিরক। ইসলাম আরো বলে যে, কারো জীবনকে প্রভাবিত করার শক্তি Talisman-এর নেই। একমাত্র আল্লাহই মানুষকে জীবন-মৃত্যু দান করেন।

উত্তর ৬. নষ্ট নজর

মানুষ সব সময় হিংসুকের নষ্ট নজর নিয়ে শঙ্কিত থাকেন। ইসলাম এ ব্যাপারে বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেয় না। শুধু হিংসুকের হিংসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলে। এ ব্যাপারে শেষ দুটো সুরা তেলাওয়াত করলে উপকৃত হওয়া যায়।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৩১:৩৪

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৩৭:১০০, ১১৩

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৩৬:১৮, ২৭:৪৭, ৭:১৩১

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ১১৩:৪

ডি-৫ আত্মা

প্রশ্ন ১. মুসলমানরা কি মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে? এই বিশ্বাসের ভিত্তি কি?
২. আত্মার সংজ্ঞা কি?
৩. আত্মা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের উৎস কি?
৪. শরীরের কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় আত্মা থাকে কি?
৫. আত্মা আল্লাহ থেকেই এসেছে। আর আল্লাহ চিরঞ্জীব। তাহলে আত্মাও কি চিরঞ্জীব? আমাদের দৈহিক মৃত্যুর সাথে কি আত্মারও মৃত্যু ঘটে?
৬. মৃত্যু সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি?
৭. মৃত্যুর সময় মানুষ কি দেখে এ সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয়েছে কি?

উত্তর : ১. মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস

আখেরাতে বিশ্বাস ঈমানের একটি মৌলিক অংশ। এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে আত্মার অস্তিত্বের স্বীকৃতি।

উত্তর : ২. আত্মা এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানের উৎস

বস্তুগতভাবে মানুষের শরীর পানি, খনিজ পদার্থ, শর্করা, চর্বি ও আমিষে গঠিত। সকল পশু-পাখি প্রাণীর শরীর এভাবে গঠিত। কিন্তু আত্মার অস্তিত্বই মানুষকে এদের থেকে পৃথক করেছে। তাকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছে। আত্মার উপস্থিতির কারণে তার মাঝে যুক্তি, বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটেছে। সে ভালোমন্দের পার্থক্য করতে এবং তার স্রষ্টাকে চিনতে সমর্থ হয়। আত্মা মানুষকে পরকালের অবিনশ্বর জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহে অনুপ্রাণিত করে। আত্মা কোনো বস্তুগত বিষয় নয়। তাই এটা বস্তুজগতের নিয়মের অধীন নয়। ফলে শুধু বস্তুজগতে সীমাবদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা দিয়ে এর সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এ সংক্রান্ত একমাত্র জ্ঞানের উৎস আধ্যাত্মিক ওহী। কুরআনে আত্মা সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য আছে।

উত্তর : ৪-৫. আত্মার অবস্থান এবং এর চিরস্থায়ী জীবন

মানুষের শরীরের ঠিক কোথায় আত্মা অবস্থান করে এ বিষয়ে কুরআনে কোনো উদ্ধৃতি নেই। রাসূল (সা:)-এর একটি হাদিস মতে এক নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহ গর্ভস্থ ভ্রূণে আত্মা ফুঁকে দেন। তারপর থেকে আমৃত্যু আত্মা শরীরের সাথে থাকে। সেদিন থেকে ভ্রূণ জৈবিক সত্তার সাথে আধ্যাত্মিক সত্তায় পরিণত হয়।

আত্মা আল্লাহ থেকে উদ্ভূত এবং অবিনশ্বর কিন্তু তাই বলে এর স্বাধীন শক্তি নেই। ভ্রূণ অবস্থায় শরীরে প্রবেশের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আত্মা এর ভেতরে থাকে। মৃত্যুর মাধ্যমে আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়। আবার পুনরুত্থানের দিন আত্মা শরীরে প্রবেশ করবে। তখন সেই সশরীরি সত্তা পৃথিবীর জীবনে ভালো বা মন্দ কাজের পুরস্কার বা শাস্তি লাভ করবে।

উত্তর : ৬-৭. মৃত্যু

মুসলমানরা মৃত্যুকে কোনো আলোচনা নিষিদ্ধ বিষয় মনে করে না। বরং মুসলমানরা মৃত্যুকে জন্মের মতোই একটি বাস্তবতা মনে করে। কুরআন বলে যে, প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। তা থেকে পালাবার কোনো পথ নেই। মৃত্যু জীবনের সাথে সব সময় জড়িত। জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। জন্মের মতোই মৃত্যু সত্য। আল্লাহ যখন যার, যেখানে, যেভাবে মৃত্যু নির্ধারিত রেখেছেন তার সেখানে সে অবস্থায় মৃত্যু অনিবার্য। মুসলমানরা এটা বলে না যে ডাক্তার তার আয়ু বাড়িয়েছে। কারণ আল্লাহই মানুষের জন্ম-মৃত্যুর দিনক্ষণ নির্ধারণ করেন।

যেহেতু মুসলমানরা আখেরাতে বিশ্বাস করে সেহেতু তাদের কাছে মৃত্যু হচ্ছে আত্মার অবস্থানের পরিবর্তন মাত্র। বস্তুত আত্মা অবিনশ্বর। তাই মুসলমানরা মৃতুকে ভয় পায় না। বরং তাকে অনিবার্য জেনে জীবন থাকতেই আখেরাতের প্রস্তুতি নেয়। কুরআন বলে মৃত্যুর সময় সব মানুষ যা মনে করে তা হচ্ছে আর কিছুক্ষণ যদি জীবন পেতাম তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজেকে নিবেদিত করতাম।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৪২:৫২, ৫৮:২২, ৪:১৭১, ৩২:৯

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ১৭:৮৫

প্রশ্ন ৫. হাদিসে রাসূল (সা:) বলেন যে, গর্ভাবস্থায় চতুর্থ মাসের শেষ দিনে ভ্রূণে আল্লাহ রুহ ফুঁকে দেন।

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ২১:৩৫, ২৯:৫৭, ৪:৭৮, ১৬:৬১, ৬৭:১-২

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ৬৩:১০

ডি-৬ মৃত্যু (১)

প্রশ্ন ১. মানুষ মৃত্যুর সময় কি অভিজ্ঞতা লাভ করে?

২. মৃত্যুর সময় মানুষ কি তার ভবিষ্যৎ পরিণতি (বেহেশত/দোযখ) সম্পর্কে জানতে পারে?

৩. মৃত্যু সময় মানুষের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আর কোনো উদ্ধৃতি আছে কি?

৪. যারা বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনায় প্রায় মৃত্যুর সমতূল্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বলে দাবি করেন তাদের বিষয়ে কি বলবেন?

উত্তর : ১ -২. মৃত্যুর অভিজ্ঞতা

কুরআন ও হাদিসে মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয়েছে

ক) সব মানুষ মৃত্যু শয্যায় চিন্তা করবে যে, সে আর একটু সময়ের জন্য জীবন পেলে হাশরের দিনে পুরস্কার পেতে আরো ভালো কাজ করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতো।

খ) মৃত্যুর সময় সে তার ভাগ্যকে দেখতে পায়। তার সাথে আযরাইলের আচরণের মাধ্যমে সে বেহেশতে না দোযখে যাচ্ছে তা টের পায়। সৎকর্মশীলদের আযরাইল সালাম দিয়ে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়। তাদের রুহ অতি সহজে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কারণ যত তাড়াতাড়ি দেহ ত্যাগ তত তাড়াতাড়ি মুক্তি। অসৎ লোকদের জন্য আযরাইলের ব্যবহার থাকে কঠোর। তাদের আত্মা শরীর থেকে বের হতে চায় না। কারণ দেহত্যাগ মানেই তো দোযখের আগুন।

উত্তর : ৩-৪. মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ও প্রসঙ্গ কথা

মৃত্যু এমন যে এর অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ ফিরে এসে তার বর্ণনা দিতে পারে না। একবার মৃত্যুবরণ করলে আর ইহজীবনে ফিরে আসা যায় না। এটা পৃথিবীর এবং আখেরাতের মাঝে এক দেয়ালের মতো। কুরআন মৃত্যু সম্পর্কে 'সক্‌রা' শব্দ ব্যবহার করেছে যার অর্থ 'Stupor'। মৃত্যুর কাছাকাছি বলে কিছু নেই যার বিপদে বা দুর্ঘটনায় পড়ে মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা পেয়েছেন বলেন তার ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হলো–

ক) গল্প, সাহিত্য এবং বিভিন্ন আত্মজীবনীতে যাদের মৃত্যুতুল্য অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হয়েছে তাদের প্রায় সবগুলোই মৃত্যুকে পরম শান্তির এবং জগতের যাবতীয় ক্লান্তি, অবসাদ, জটিলতা থেকে মুক্তির বিষয় বলে চিত্রায়িত করা

হয়েছে। অথচ সবার জন্য মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এক রকম হতে পারে না। এটা ইসলামের শাশ্বত ন্যায় বিচার বিরোধী। যারা সৎকর্মশীল এবং যারা পাপী এই উভয় সম্প্রদায়ের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সঙ্গতকারণেই এক রকম হবে না।

খ) দ্বিতীয়ত মুসলমানরা এটাও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যু হচ্ছে অপরিবর্তনীয়। কাজেই এর অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে কেউ এর বর্ণনা দিতে অক্ষম। মানবীয় প্রযুক্তি খাটিয়ে গবেষণা করে এ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। এটা আসলে গায়েবী বিষয়। এ সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহর ওহী ভিন্ন লাভ করার উপায় নেই।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ২৩:৯৯-১০০, ৬:৬১, ৩২:১১, ৫০:১৯

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ১৬:৩২, ৪১:৩০-৩২, ৮:৫০, ৬:৯৩

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৭:৪০

ডি-৭ মৃত্যু (২)

প্রশ্ন ১. আপাত মৃত্যু বা মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতাগুলোকে কি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

২. আত্মহত্যা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৩. যন্ত্রণাদায়ক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় শান্তিপূর্ণ মৃত্যু (Euthanasia) ত্বরান্বিত করার অনুমতি ইসলামে আছে কি?

৪. মারাত্মক অসুস্থ ও মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত মানুষের সেবার ব্যাপারে ইসলামে কোনো নির্দেশনা আছে কি?

৫. কবর দেবার পর আত্মার কি হয়?

৬. মৃত ব্যক্তির আত্মা কি পৃথিবীতে কি ঘটছে তা জানতে পারে?

উত্তর : ১. মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতাসমূহ

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এটা জানা গেছে যে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো মস্তিষ্কের কিছু মেমোরি কোষে জমা থাকে। কোনভাবে উদ্দীপ্ত করলে এই স্মৃতিগুলো রেকর্ড করা টেপ রিউইন্ড করার মতো দ্রুততার সাথে মনে ভেসে ওঠে। এভাবে অনেক সময় মানুষ ভয়াবহ বিপদে জীবন নিয়ে শঙ্কায় পড়লে তার মনে জীবনের অনেক ছবি দ্রুত আবর্তিত হয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে মৃত্যুর অভিজ্ঞতার সাথে এর কোনো তুলনা করা যায় না। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কেমন তা কেবল মৃতরাই বলতে পারেন। আমাদের এ বিষয়ে একমাত্র জ্ঞানের উৎস ওহী তথ্য কুরআন।

উত্তর : ২. আত্মহত্যা

ইসলামের আত্মহত্যা মহাপাপ। এর জন্যে আখেরাতে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। রাসূলের একটি হাদিস অনুসারে হাশরের দিনে আত্মহত্যাকারী নিজেকে এক জীবন মৃত্যু চক্রে দেখতে পাবে। সে বারবার আত্মহত্যা করবে আর জীবন লাভ করবে। দু'টো কারণে ইসলাম আত্মহত্যার ব্যাপারে এত কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে-

ক) ইসলাম মতে কোনো মানুষ সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ মালিকানা রাখেন না। সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। কাজেই আমাদের জীবনও আমাদের একচ্ছত্র সম্পদ নয়। জীবন আল্লাহর দেয়া সবচেয়ে বড় সম্পদ ও আমানত। এটা আমরা ইচ্ছামতো ধ্বংস করতে পারি না।

খ) যেহেতু জীবন হচ্ছে আল্লাহর আমানত সেহেতু মানবতার কল্যাণে একে নিয়োজিত করতে হবে। তা না করে এর ধ্বংস সাধন হবে আল্লাহর আমানতের খেয়ানত বা তাঁর সাথে প্রতারণা।

রাসূল (সা:)-এর মতে চরম হতাশা, শোক-যন্ত্রণার সময় একজন মানুষ সর্বোচ্চ যা করার অনুমতি রাখে তা হচ্ছে এই দোয়া 'হে আল্লাহ আমাকে জীবন দান কর যদি তা আমার জন্য উত্তম হয়, অথবা আমাকে মৃত্যু দান কর যদি তুমি আমার জন্য তা উত্তম মনে কর।' বস্তুত একজন মুসলমান কখনো আল্লাহর দয়া ও রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হতে পারে না। কখনও নিজের হাতে আল্লাহর দেয়া জীবন তুলে দিতে পারে না।

উত্তর : ৩. কৃপাহত্যা (Euthanasia) বা কল্যাণদায়ক মৃত্যু

ইসলামে কোনো কল্যাণদায়ক মৃত্যুর সুযোগ নেই। কাজেই যে ব্যক্তি রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে নিজেকে মেরে ফেলতে অনুরোধ করে সে প্রকারান্তরে আত্মহত্যাকেই বেছে নেয়। আত্মহত্যার দায় অন্যকে হত্যার অনুরোধ করে এড়ান যায় না। ইসলাম কারো মৃত্যুর জন্য ঔষধ প্রয়োগকে নিষেধ করে। তবে ক্লিনিক্যালি মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক কাজ করছে না কৃত্রিমভাবে তার শ্বাসযন্ত্র, হৃদযন্ত্র, কিডনী সচল রাখা হয়েছে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান হচ্ছে যে দীর্ঘকাল এমন কৃত্রিম 'Life support অব্যাহত রাখতে কেউ বাধ্য নয়।

উত্তর : ৪. মৃত প্রায় ব্যক্তি প্রসঙ্গে

মৃত প্রায় মারাত্মক অসুস্থ ব্যক্তিকে দয়া, সহানুভূতি ও যত্নের সাথে সেবা করতে ইসলাম আদেশ করে। কোনো ধ্বংসাত্মক কাজের অনুমতি ইসলামে নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে অসুস্থতা হচ্ছে পরিশুদ্ধি বা গোনাহ মাফের একটি মাধ্যম। রোগ যন্ত্রণা ভোগ করার মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তি তার দুনিয়ার বিভিন্ন ভুল ত্রুটির দায় দুনিয়াতেই শোধ করে যায়। এর বিনিময়ে তার আখেরাতের সাজা মওকুফ হবে। এজন্যে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর দৈহিক সেবার সাথে তার আধ্যাত্মিক সেবাও করা উচিত। তাকে তওবা করতে এবং আল্লাহর নৈকট্যের দোয়া করতে বলা উচিত। মৃত্যু পথযাত্রীর জন্য ইসলাম যেসব কাজ করতে বলে তা হচ্ছে–

ক) সে যেন কলেমা শাহাদাত পড়ে অথবা তাকে যেন কলেমা পড়ে শুনানো হয়। এভাবে সে এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস ঘোষণা করে মৃত্যুকে বরণ করবে।

খ) সূরা ইয়াসীন পড়া। কারণ এ সুরায় মানব সৃষ্টির, মৃত্যু এবং পুনর্জাগরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

গ) মৃত্যুর পর তার চোখ বন্ধ করে দিতে হবে। যথাসম্ভব দ্রুত তাকে দাফন করতে হবে। আপনজনের শোক এবং দু:খ তো অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য। তবু তাকে যথাসম্ভব সংযত করতে হবে কারণ উচ্চস্বরে কান্নাকাটিতে আত্মা কষ্ট পায়।

উত্তর : ৫-৬. মৃত্যুর পর আত্মার অভিজ্ঞতা

কুরআন ও হাদিস অনুসারে মৃত্যুর পর আত্মার অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ :

ক) তাকে কবরে জিজ্ঞাসা করা হয় কে তার স্রষ্টা, কে তার নবী ইত্যাদি। ঈমানদারদের জন্য এসব প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ। কিন্তু অবিশ্বাসী বেঈমানদের জন্য এসব প্রশ্ন দু:সাধ্য।

খ) প্রশ্নোত্তরের পর সে বেহেশতে বা দোজখে তার অবস্থান দেখতে পায়।

গ) হাশরের দিনে যে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে তা তখন থেকেই শুরু হয়।

এছাড়া রাসূলের হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, মৃত্যুর পরও আত্মারা পৃথিবীর ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকে। তারা কবরস্থান পরিদর্শনে আসা মানুষের পদধ্বনি শুনে। তারা কবর জিয়ারত রত মানুষের সালামের জবাব দেয়। খোদ রাসূল (সা:) তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত সালাম ও দোয়ার জবাব দেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৪:২৯, ১২:১৮

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ১৪:২৭, ৪০:৪৬

ডি-৮ মৃত্যুর পর

প্রশ্ন ১. মৃত আত্মারা কি জীবিত মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারে? প্ল্যানচেটের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

২. মৃত আত্মা কি অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের আত্মার সাথে যোগাযোগ করতে পারে?

৩. এমন কোনো নির্দিষ্ট স্থান আছে কি যেখানে আত্মা থাকে?

৪. পুনর্জন্ম বা পরজনমবাদে মুসলমানরা বিশ্বাস করে কি?

৫. আত্মার তিন অবস্থা বলতে কি বুঝায়?

৬. হাশরের দিন বলতে কি বুঝায়? মুসলমানদের ঈমানে এর স্থান বলতে কি বুঝায়?

৭. পুনরুত্থান বলতে কি শুধু আত্মার পুনরুত্থানকেই বুঝায় নাকি দেহ এবং আত্মা দুটোই পুনরুত্থান বুঝায়?

উত্তর : ১-৩. আত্মার সাথে যোগাযোগ

কুরআন থেকে জানা যায় যে, মৃত আত্মাদের নিজেদের মধ্যে এবং জীবিত ব্যক্তিদের সাথে কিছু কিছু যোগাযোগ থাকে। অবশ্য একজনকে মাধ্যম বানিয়ে তার বয়ানে মৃত ব্যক্তির আত্মার কথা শোনার যে রীতি (প্ল্যানচেট) প্রচলিত তা ধোকা ছাড়া আর কিছু নয়। মৃতের সাথে যোগাযোগের ব্যাখ্যা হিসেবে ঘুমের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। ঘুম একটি সাময়িক মৃত্যুর মত। ঘুমের সময় কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহর মানুষের আত্মাকে নিয়ে নেন। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে যখন কেউ মতো বন্ধ-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনকে দেখে তখন সম্ভবত যা হয় তা হচ্ছে মৃত ব্যক্তি ও ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মার সাক্ষাৎ। এভাবে মৃত আত্মার পক্ষে জীবিত লোকদের সাথে এবং মৃতুদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব।

এছাড়াও কুরআন বলে যে, মৃত আত্মারা পৃথিবীর ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত। ঈমানদারদের মৃত আত্মা নবী, শহীদ এবং নেকবান ব্যক্তিদের আত্মার সংস্পর্শে থাকে। যদিও এ ধরনের যোগাযোগ সম্পর্কে আমাদের বাস্তববাদী মনে ধারণা করা কষ্টকর। তবুও এটা বোঝা উচিত যে আত্মা হচ্ছে অপার্থিব বিষয়। তার পক্ষে অনেক কিছুই সম্ভব যা আমাদের পার্থিব অনুভূতির সীমার বাইরে।

কুরআন এবং হাদিসে আরো বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর থেকেই আত্মা হাশরের পরে তার প্রাপ্য পুরস্কার বা শাস্তি অনুভব করতে থাকে।

উত্তর : ৪. পুনর্জন্ম

মুসলমানরা হিন্দুদের মতো পুনর্জন্মে বশ্বাস করে না। পুনর্জন্ম মানে মৃত্যুর পর পৃথিবীতেই অন্য রূপে আসা। যা বেশ যৌক্তিক কারণেই অবাস্তব। মুসলমানরা পুরনরুত্থানে বিশ্বাস করে এবং তা হচ্ছে কেয়ামতের পর হাশরের ময়দানে সকল মানুষ পুনর্জীবিত হয়ে বিচারের জন্য দাঁড়াবে।

উত্তর : ৫. আত্মার তিন অবস্থা

ইসলাম মতে আত্মার তিন রূপ বা অবস্থা আছে; যথা–

ক) নফস আল-আম্মারা : যে প্রবৃত্তি মানুষকে খারাপ কাজে প্ররোচিত করে।

খ) নফস আল-আওয়াম্মা : যে প্রবৃত্তি আত্মসমালোচনা করায় ও খারাপ কাজ থেকে সতর্ক করে।

গ) নফস আল-মুতমায়িন্না : সফল প্রবৃত্তি– যা আল্লাহর ধ্যানে প্রশান্ত থাকে। ৮৯ নং সূরায় ২৭ থেকে ৩০ নং আয়াতে তৃতীয় নফসের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে।

উত্তর : ৬. হাশরের দিন

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, সমস্ত জীবনের একদিন সমাপ্তি ঘটবে। কারণ এ জীবন এ পৃথিবী কোনোটাই চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ নির্ধারিত একদিনে প্রচণ্ড আলোড়নে সমগ্র পৃথিবী ও জীবজগত ধ্বংস হবে। তারপর সৃষ্টির আদি থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে তাদের কৃতকর্মের বিচারের জন্য আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে। যারা সৎকর্মশীল, ঈমানদার তারা আল্লাহর রায় নিয়ে বেহেশতে যাবে। আর বেঈমান অসৎ ব্যক্তিরা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এই হাশরের দিনে বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানের অংশ। যে হাশরের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করবে সে মুসলিম নয়। এটাকে ঈমানের প্রাণও বলা যায়। কারণ এই জবাবদিহিতার অনুভূতি থেকেই মানুষের মাঝে দায়িত্ব সচেতনতা আসে। জীবন লক্ষ্যহীন নয়। এক বিরাট দায়িত্ব নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। একদিন এ দায়িত্ব পালন করা প্রসঙ্গে মালিকের কাছে হিসেব দিতে হবে।

উত্তর : ৭. আত্মা এবং শরীরের পুনরুত্থান প্রসঙ্গে

কুরআন মতে হাশরের দিনে আত্মা এবং শরীর উভয়েরই পুনরুত্থান হবে। অবশ্য সেই নতুন জীবনে এই শরীরই তার অবকল গঠন নিয়ে পুনর্জীবন লাভ করবে নাকি অন্য কোনো আকারে গঠিত হবে তা স্পষ্ট করে আমরা জানি না। কুরআন থেকে এটাও স্পষ্ট যে, আত্মা তার কবরজীবন থেকেই বেহেশত বা দোজখের স্বাদ অনুভব করবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৩৯:৪২

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৩:৭০, ৪:৬৯

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ১২:৫৩, ৭৫:১-২, ৮৯:২৭-৩০

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ২৩:১১৫-১১৬, ৩০:৫৬, ২২:১, ৮৭:১৭, ১:৪, ৪০:২৭, ৬৪:৯, ৫০:৪২, ৭৯:৩৪-৩৫, ৮০:৩৩-৩৪, ৫০:৩৪

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ৫৬:৬০-৬১

ডি-৯ পুনরুত্থান

প্রশ্ন ১. যারা বলে, 'মৃত্যুর পর কবরে ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীর কিভাবে আবার জেগে উঠবে?' তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে কি বলবেন?

২. এটা বলা কি ঠিক যে শুধু বিশ্বাসীদেরই পুনরুত্থান হবে অবিশ্বাসীদের নয়?

৩. কোনো দিন হাশর হবে তার ব্যাপারে কুরআনে কোনো ইঙ্গিত আছে কি?

৪. হাশরের দিন সমাগত হবার সময়কার কোনো লক্ষণ উল্লিখিত আছে কি?

৫. শেষ দিনটির আগে মানুষের আর্থিক অবস্থা কেমন হবে সে বিষয়ে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি?

৬. শেষ দিনটির আগে মানুষের স্বাস্থ্যগত অবস্থা কেমন হবে তার কোনো উল্লেখ আছে কি?

উত্তর : ১. পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের জবাব

যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তারা পুনরুত্থান নিয়ে প্রশ্ন করে কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট যুক্তি ও দালিলিক প্রমাণ দিতে তারা অক্ষম। অথচ বাস্তবতাও সাক্ষী দেয় যে (Accountability'র জন্য) পৃথিবীর জীবনের পর আর একটি জীবন প্রয়োজন। কুরআনে সে জীবন এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে অনেক যুক্তি দেয়া হয়েছে [সূত্র দেখুন] এসব যুক্তির সারমর্ম নিম্নরূপ–

ক) মানুষকে আল্লাহ শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি একবার সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি আবারও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।

খ) আল্লাহ পক্ষে যে কোনো কিছুকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া অত্যন্ত সহজ। মৃতকে পুনর্জীবিত করাও তাঁর পক্ষে একইভাবে সোজা।

গ) আল্লাহ প্রতি মৌসুমে চাষবাসহীন উষর ভূমিকে প্রাণবত্ত সবুজ ফসলে ভরে দিয়ে তাঁর মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দেখাচ্ছেন

উত্তর : ২. শুধু কি বিশ্বাসীদেরই পুনরুত্থান হবে।

সমগ্র মানবজাতিরই পুনরুত্থান হবে– এটাই ইসলামের শিক্ষা। এটা আল্লাহর ন্যায়নীতির পরিপন্থি হবে যে শুধু বিশ্বাসীরাই জবাবদিহির জন্য পুনর্জীবিত হবে আর অবিশ্বাসী পাপীরা নির্বিঘ্নে থাকবে। পুনরুত্থানের ব্যবস্থা আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। যার মাধ্যমে তিনি ভালোমন্দ সবাইকে তাদের কাজের উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন।

উত্তর : ৩. হাশর কোনদিন হবে

হাশর কবে হবে এ বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই জানেন। রাসূল বলেছেন, দিনটি আসবে হঠাৎ করে এবং আকস্মিকভাবে সব মানবীয় তৎপরতা সেদিন বন্ধ হয়ে যাবে। বস্তুত ঠিক কোনদিন হাশর হবে এটা জানা মুসলমানদের জন্য জরুরী নয়। বরং জরুরী দিনটির অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং এই দিনটিতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির জন্য নিজেকে তৈরি করা। অবশ্য রাসূল (সা:) পৃথিবীর শেষ দিনটির আগমন সম্পর্কে কিছু পূর্বাভাস দিয়েছেন। এর মধ্যে কিছু পূর্বাভাসে সাধারণভাবে ঐ সময়ের আর্থ-সামাজিক নৈতিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে আর কিছু পূর্বাভাসে বিশেষভাবে কেয়ামতের দিনের কথা বলা হয়েছে। রাসূল (সা:) বর্ণিত কেয়ামতের আলামতগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– Major Signs এবং Minor Signs।

উত্তর : ৪-৫. সাধারণ আলামত- অর্থনৈতিক অবস্থা

রাসূলের কিছু ভবিষ্যদ্বাণীতে পৃথিবী ধ্বংসের আগে এখানে যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি, আর্থিক প্রাচুর্য ও প্রাণঘাতী রোগের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, তখন যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসাধারণ উন্নতি হবে এবং প্রাণহীন জিনিসও কথা বলতে সক্ষম হবে। সুদি কারবার ব্যাপক প্রসার লাভ করবে। আকাশচুম্বি অট্টালিকা তৈরি হবে। বিত্তবৈভব জৌলুসে মানুষ গা ভাসাবে আবার তারই পাশে ভুখা নাঙ্গা মানুষের অবস্থান থাকবে।

উত্তর : ৬. কেয়ামতের আগে মানুষের স্বাস্থ্যগত অবস্থা

রাসূল (সা:) বলেন কেয়ামতের আগে মানুষের মাঝে মদ ও অন্যান্য নেশার উপকরণের ব্যবহার এত বাড়বে যে, এটা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হবে। ঘাতক ব্যাধির উদ্ভব হবে এবং আকস্মিক মৃত্যুর (সম্ভবত হার্ট এ্যাটাক/ স্ট্রোক) সংখ্যা বাড়বে। এসব কিছুই কেয়ামতের পূর্বলক্ষণ।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৪৫:২৪-২৬, ৩৬:৭৭-৭৯, ৫০:১৫, ৩০:২৭-২৮, ৪১:৩৯, ২২:৫

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৩৬:১২, ৩৯:৭০

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৩১:৩৪, ৪১:৪৭, ৭:১৮৭, ৭৯:৪২

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ১০:২৪

ডি-১০ কেয়ামতের পূর্বলক্ষণ

প্রশ্ন ১. কেয়ামতের আগে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের নৈতিক অবস্থা কেমন হবে এ বিষয়ে রাসূল (সা:) কোনো পূর্বাভাস দিয়েছেন কি?

২. কেয়ামতের আর কোনো সাধারণ আলামত আছে কি?

৩. কেয়ামতের দিনের প্রধান লক্ষণগুলো কি কি?

৪. কেয়ামতের দিনে কি ঘটবে?

উত্তর : ১. কেয়ামতের আগে মানুষের নৈতিক অবস্থা

কেয়ামতের আগে মানুষের ও সমাজের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে রাসূল (সা:) অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এগুলো নিম্নরূপ–

ক) নারী, পুরুষ উভয়ের মাঝে অশালীন পোষাক পরার রীতি চালু হবে।

খ) নারীরা পুরুষের পোষাক পরবে এবং পুরুষের মত আচরণ করবে। একইভাবে পুরুষও নারীর পোষাক পড়বে।

গ) নারী ও এবং পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমকামিতার বিস্তার ঘটবে।

ঘ) ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হবে।

ঙ) বৃদ্ধ এবং আত্মীয়দের 'বোঝা' মনে করা হবে। তাদের যত্ন নেয়া হবে না।

চ) মানুষ সন্তান প্রতিপালনে নিরুৎসাহিত হবে। অথচ কুকুর সহ অন্যান্য পশু অত্যন্ত যত্নের সাথে পালন করবে।

ছ) শঠতা ব্যাপক বিস্তার লাভ করবে।

জ) খুন ও হত্যাকাণ্ড ব্যাপক বিস্তার লাভ করবে। এসব এত বাড়বে যে হত্যাকারী নিজেও জানবে না যে সে কেন খুন করল।

ঝ) মানুষের মাঝ থেকে দানশীলতা দূর হয়ে যাবে।

ঞ) প্রচুর শাসক আসবে কিন্তু তাদের কিয়দংশই সৎ হবে।

ট) ন্যায়নীতি নয় বরং ক্ষমতা ও শক্তি হবে ব্যক্তি ও জাতির সম্মান পাবার উৎস।

উত্তর : ২. আরো কিছু সাধারণ আলামত

এছাড়াও রাসূল (সা:) আরো কিছু আলামতের কথা বলেছেন, তা হচ্ছে–

ক) প্রচুর ভণ্ড শিক্ষক ও নবীর আবির্ভাব হবে।

খ) বিশ্বাসীরা পার্থিব স্বার্থে তাদের বিশ্বাস বিক্রি করবে।

গ) নিষ্ঠাবান এবং আল্লাহওয়ালা লোকদের ঘৃণার চোখে দেখা হবে। খারাপ লোকেরাই হবে সমাজে গ্রহণযোগ্য।

ঘ) একই পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে।

ঙ) অন্যায়কে মোকাবিলার জন্য মানুষ কোনো পদক্ষেপ নেবে না ফলে সমাজে অন্যায়ের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটবে।

চ) জ্ঞানের সম্প্রসারণের সাথে আল্লাহকে ভোলার প্রবণতা বাড়বে। ঈমান, বিশ্বাস ও মানুষের পারস্পরিক অধিকার সংক্রান্ত অনুভূতি হ্রাস পাবে।

ছ) অধিকাংশ মুসলমান খারাপ কাজে লিপ্ত হলেও ক্ষুদ্র একদল মুসলমান আল্লাহর পথে থাকবে।

উত্তর : ৩. কেয়ামতের দিনের প্রধান লক্ষণ

কেয়ামতের দিনের প্রধান লক্ষণগুলো সম্পর্কে হাদিসে এবং কুরআনে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিনের ঘটনাগুলো নিম্নরূপ–

ক) পূর্ব, পশ্চিম এবং আরবের উপরে তিনটি প্রধান সূর্যগ্রহণ হবে।

খ) প্রচণ্ড ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে যাবে। এই ধোঁয়া সম্ভবত কুয়াশা, ধুলা বা এই জাতীয় কিছু হবে।

গ) পৃথিবীর তলদেশ থেকে এডেন বরাবর আগুন উঠে আসবে।

ঘ) পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে (সৌর জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে)।

ঙ) এক পশু এসে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলবে।

চ) বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। এ সময় ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হয়ে সব কিছু ধ্বংস করতে থাকবে।

ছ) পৃথিবী ধ্বংসের আগে ইমাম মাহদী এসে এখানে শান্তি ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি হবেন একজন মুসলমান। তাঁর নাম হবে আহমাদ বা মুহাম্মদ।

জ) ইমাম মাহদীর জীবদ্দশায় দজ্জাল নামে এক শয়তানী শক্তির উদ্ভব ঘটবে। দজ্জাল সম্ভবত এক চোখ বিশিষ্ট হবে এবং মহাপরাক্রমশালী হবে। অসংখ্য মানুষ দজ্জালের অনুসারী হবে। দজ্জাল তাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

ঝ) এ সময়ে ঈসা (আ:) পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন এবং ইমাম মাহদীকে সাথে নিয়ে দজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। যুদ্ধে দজ্জাল পরাজিত ও নিহত হবে। রাসূলের একটি হাদিস মতে দজ্জাল জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে এবং মুসলমানরা পূর্ব তীরে অবস্থান নেবে। দজ্জালের পতনের পর অনেক বছর পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে।

ঞ) এরপর ইমাম মাহদী স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। পৃথিবীতে শান্তি বিরাজিত থাকবে। এ সময় ঈসা (আ:) পৃথিবী থেকে চলে যাবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জন্য জানাযা পড়বে।.

ট) এক শীতল বাতাস প্রবাহিত হবে যা কিছু পরিমাণ ঈমানও যাদের আছে তাদের প্রাণ হরণ করবে। কেয়ামত শুরু হবে।

উত্তর : ৪. কেয়ামতের দিন যা ঘটবে

কুরআনে কেয়ামতের দিনের ঘটনাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূত্রে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে দেখা যায় যে, শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে জগতের শৃঙ্খলা ভয়াবহভাবে ভেঙে পড়বে। পৃথিবীর তখনকার অধিবাসী সবাই মারা পড়বে। তারপর প্রলয় শেষে পৃথিবীর আদি থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সব মানুষ উঠে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৩১:৩৪, ৪১:৪৭, ৭:১৮৭, ৭৯:৪২

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ১০:২৪

ডি-১১ জবাবদিহিতা বেহেশত ও দোযখ

প্রশ্ন ১. হাশরের বিচার অনুষ্ঠান কিসের মাধ্যমে শুরু হবে?

২. বিচারের ময়দানে কি কি ঘটবে– এ বিষয়ে কুরআন কিছু বলেছে কি?

৩. মানুষের মুক্তি ও বেহেশত লাভ কি শুধু মাত্র তার আমলের মাধ্যমে অর্জিত হবে নাকি আল্লাহর ক্ষমার মাধ্যমে?

৪. হাশরের বিচারের পর কি ঘটনা ঘটবে?

৫. দোযখ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৬. বেহেশত সম্পর্কে কুরআনে কি বর্ণনা আছে?

উত্তর : ১. হাশরের বিচার অনুষ্ঠান

হাদিসে আছে কেয়ামতের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ একে একে সকল নবীকে অনুরোধ করবেন– তাঁরা যেন সহজে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন। কিন্তু আদম (আ:) থেকে শুরু করে সকল নবী একাজ করতে অস্বীকার করবেন এবং উম্মতদেরকে মুহাম্মদ (সা:)-এর কাছে যেতে বলবেন। উম্মতরা মুহাম্মদ (সা:)-এর কাছে গেলে তিনি তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহকে বিচার শুরু করতে অনুরোধ করবেন। এ অবস্থায় বিচার শুরু হবে।

উত্তর : ২. বিচারের ময়দানে যা যা ঘটবে

হাশরের ময়দানে বিচার কাজ কিভাবে পরিচালিত হবে এ বিষয়ে কুরআনের অসংখ্য উদ্ধৃতি থেকে নিচের তথ্যগুলো পাওয়া যায়–

ক) সেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিচার করা হবে।

খ) যদিও আল্লাহ হিসেব-নিকেশ করে রায় দিবেন তবুও রায়ের পূর্বেই প্রত্যেক মানুষ তার পাপ-পূণ্য স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে।

গ) মানুষের সকল ভালো ও খারাপ কাজের ‘রেকর্ড’ (আমলনামা) রাখা হয়। এ (আমলনামা) বিচারের দিনে প্রকাশ করা হবে। সৎকর্মশীলদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে আর অসৎ ব্যক্তিদের আমলনামা বাম হাতে অথবা পেছন দিয়ে দেয়া হবে। এই আমলনামা হবে পূর্ণাঙ্গ এবং অভ্রান্ত। জীবনের সকল ভালো ও মন্দ কাজের বিস্তারিত বিবরণ তাতে থাকবে। কোনো বিষয়ই বাদ যাবে না।

ঘ) মানুষের নিজের অঙ্গ-প্রতঙ্গ তার পক্ষে বা বিপক্ষে সেদিন সাক্ষ্য দেবে।

৬) সেখানে একটি দাঁড়িপাল্লা থাকবে যার নাম 'মিজান'। সেই 'মিজান'-এর এক পাল্লায় মানুষের সৎকাজ এবং অপর পাল্লায় খারাপ কাজ রেখে মাপা হবে। অবশ্য আল্লাহর মাপ দুনিয়ার মাপের মতো নয়। যেমন কেউ ভালো কাজের নিয়ত করলেই তার হিসাবে তা উঠে যায়। পরে সে ভালো কাজ করলে তার সওয়াব আল্লাহ তাঁর দয়ায় ৭ থেকে ৭০০ গুণ বাড়িয়ে ধরেন। নিয়তের পর ভালো কাজ না করলেও তার হিসাব বাদ যায় না। অপর দিকে কেউ খারাপ কাজের নিয়ত করে তা না করলে তার হিসেবে কোনো কালো দাগ পড়ে না। আর খারাপ কাজ করলে হিসেবে একটি দাগ পড়ে।

উত্তর : ৩. আল্লাহর দয়া

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে আল্লাহর দয়া ছাড়া শুধু নেক আমল দিয়ে বেহেশত প্রবেশ করা যাবে না। তবে এই দয়া আল্লাহ উপযুক্ত লোককেই করবেন। আন্তরিকতা ও চেষ্টা থাকার পরও যাদের সৎ কাজ একটু ঘাটতি হবে তাদের প্রতিই আল্লাহ দয়ার হাত বাড়াবেন। আল্লাহর দয়া অপাত্রে দান করা হবে না। অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসীদের মতো এই দয়া মযলুমের সাথে যালিমেরও মুক্তির উছিলা হবে না।

হাদিসে আছে যেসব সৎ ঈমানদারের হিসেবের পর নেকির চেয়ে ভুলের পরিমাণ সামান্য বেশি হবে তাদের আল্লাহ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তারা যখন ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইবে তখন আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

উত্তর : ৪. বিচারের পর

বিচারের পর মানুষকে দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করা এক অতি সরু ও জটিল রাস্তা (পুলসিরাত) পার হতে হবে। এখানেও সৎকর্মশীলরা অতি সহজে এই পুল অতিক্রম করে বেহেশতে চলে যাবে। আর অসৎরা পুল থেকে নিচে দোযখের আগুনে পড়বে। ইসলামের সিরাতের ধারণা অত্যন্ত কেন্দ্রীয়। মুসলমানরা দিনে অন্তত ২৫ বার 'সরল পথে' (সিরাত) চলার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়।

উত্তর : ৫-৬. দোযখ ও বেহেশত

কুরআনে বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা আছে। বেহেশত সৎকর্মশীলদের জন্য আর দোযখ অসৎদের জন্য।

দোজখ	বেহেশত
প্রচণ্ড তপ্ত আগুন যাতে	সুস্বাদু খাঁটি দুধ হবে পানীয়।
পাপীরা নিক্ষিপ্ত হবে	সুমিষ্ট স্বচ্ছ পানির ঝরণা থাকবে।
সেখানে খাদ্য হবে কাঁটা যা	খাদ্য হিসেবে থাকবে পুষ্টিকর
পাকস্থলীকে বিদীর্ণ করবে।	স্বাদে অতুলনীয় ফল ও মধু।

ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে।	পোষাক হবে খাঁটি রেশমের।
এই কষ্টের কোনো শেষ নেই।	সুরম্য প্রাসাদের নিচে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণা।
এই দহনের কোনো শেষ নেই।	দামী পাথর ও স্বর্ণ খচিত থাকবে প্রাসাদে।
বিরতিহীন শাস্তি চলবে।	আপনজন ও পবিত্র স্ত্রী/স্বামী এবং সাথীদের নিয়ে সুখে দিন কাটাবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ১৭:৭৯

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৪০:১৭, ৩:১৮২, ৪:৪০, ১৭:১৩-১৪, ৮২:১০-১২, ৫০:১৮, ২৪:২৪, ৩৬:৬৫, ৪১:২২, ২১:৪৭, ১০১:৬-১১

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ১১:১১৪, ৮৪:৮

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৪৭:১৫, ১৮:২৯, ২২:২২, ৭:৪১, ২০:৭৪, ৮৭:১৩, ৪:৪৫৫

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৫৬:১৭-১৯, ৯:৭২

ডি-১২ শাফায়াত ও প্রসঙ্গ কথা

প্রশ্ন ১. দোযখবাসীদের কি সেখানে চিরকাল থাকতে হবে নাকি তাদের মুক্তির কোনো সুযোগ আছে?

২. মুসলমানরা কি মধ্যস্থতায় বিশ্বাস করে (অর্থাৎ কেউ কারো পক্ষ হয়ে তার মুক্তির জন্য আল্লাহর সাথে মধ্যস্থতা করবে)?

৩. কেউ কি তার বেহেশতে যাবার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারে?

৪. শুধুমাত্র ঈমান আনলেই কি বেহেশতে যাওয়া যাবে?

৫. পশুদেরও কি পুনরুত্থান এবং বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে?

৬. পরকালে বিশ্বাস মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় কি প্রভাব ফেলে?

উত্তর : ১. দোযখবাসীদের মেয়াদ প্রসঙ্গে

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে একথা স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, যারা নির্দ্বিধায় আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং বদকাজ করে তাদের চিরকাল দোযখে থাকতে হবে। একটি হাদীসে রাসূল (সা:) বলেছেন, "যার অন্তরে কণা পরিমাণ ঈমান এবং কোমলতা আছে এবং যে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে না, আল্লাহ তাদের সবাইকে দোযখের আগুন থেকে বের করে আনবেন।"

এতে মনে হয় যারা পাপ কাজ করে মারা গেছে কিন্তু তাদের অন্তত আল্লাহর বিশ্বাস ছিল এবং কিছু সৎকাজ করেছে তাদের কিছুকাল দোযখের শাস্তির পর একসময় বেহেশতে যাবার সুযোগ হবে। অবশ্য এতে কোনো অসৎ নিয়তের মানুষের উৎসাহিত হবার কারণ নেই। এমন নয় যে দোযখের শাস্তি মাত্র কয়েকদিন স্থায়ী হবে। কারণ প্রথমত কেউই একথা বলতে পারে না যে দোযখের শাস্তির মেয়াদটা কত দীর্ঘ হবে। দ্বিতীয়ত দোযখের শাস্তির এক একটি সেকেণ্ড পৃথিবীর বছরের চাইতেও দীর্ঘ হবে। মানুষের পৃথিবীর জীবনকাল পরলোকের একটি সকাল বা বিকেলের চেয়েও ছোট হবে।

উত্তর : ২. মধ্যস্থতা

মুসলমানরা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোনো মধ্যম ব্যক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেক বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সরাসরি। কেউ কারো পক্ষ নিয়ে আল্লাহর সাথে কোনো দেন দরবার করতে বা দাবি দাওয়া পেশ করতে পারবে না। এমনকি নবীরাও না। তবে মুসলমানরা শাফায়াতে বিশ্বাস করে। যার অধিকার একমাত্র রাসূল মুহাম্মদ (সা:) রাখেন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে পারেন। অবশ্য এই শাফায়াতের ধারণা ব্যক্তির জবাবদিহিতাকে প্রত্যাখ্যান করে না। যোগ্য

বান্দার জন্যই শাফায়াত করা হবে। কিভাবে আল্লাহর দয়া এবং ক্ষমা অর্জন করতে হয় তা ইসলামে স্পষ্ট করে বলা আছে।

আল্লাহর সাথে সব বান্দার সম্পর্ক উন্মুক্ত। কেউ কোনো ভুল বা অন্যায় করলে তাকে তওবা করতে বলা হয়েছে। অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে আল্লাহ তার ক্ষমার গুণে ক্ষমা করেন। আল্লাহ তওবাকারীর সব ভুল মাফ করেন শুধুমাত্র শিরকের গোনাহ ছাড়া।

উত্তর : ৩-৪. বেহেশতের নিশ্চয়তা

বেহেশতে যাবার কথা কেউই নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে না। হাদিসে রাসূল (সা:) বলেন তোমাদের কেউই শুধুমাত্র তার নেক আমল দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা শুনে সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, "এমনকি আপনিও," জবাবে রাসূল (সা:) বললেন, "এমনকি আমিও যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর ক্ষমার সুযোগ দান করেন।" এখানে সব বিশ্বাসীর জন্য শিক্ষণীয় কথা রয়েছে। যদি মানুষ তার বেহেশতে যাবার বিষয়ে নিশ্চিত থাকত তবে তার খোদাভীতি লোপ পেত। আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করার নিরন্তর চেষ্টা সে বাদ দিত। তার দ্বারা মানবতার কল্যাণের আশা দূর হতো।

অন্যদিকে কারো পক্ষে এটাও সঙ্গত নয় যে সে সবসময়ে আল্লাহর রহমতের উপর হতাশ হয়ে থাকবে। সে ভাববে যে তার সৎকাজ তার কোনো কাজে আসবে না। কারণ আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন যে যারা সত্য সরলপথে থাকবে, আল্লাহ ইচ্ছেমতো চলবে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সাহায্য চাইবে তাদের জন্য তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী মুসলমান হলেই বিনা বিচারে বেহেশত পাবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ যেখানে শুধু সৎকাজই এই নিশ্চয়তা দিতে পারে না। সেখানে শুধু বিশ্বাসের গুণে এটা আশা করা যায় না। বরং এমন সুযোগ থাকলে ঈমানদাররা সৎকাজের ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে যেত। শুধু মুহাম্মদ (সা:)-এর উম্মৎ হলেই বেহেশতে যাওয়া যাবে এমন ভাবাটা ইতোপূর্বেই নবীদের উম্মতদের প্রতি অবিচারের শামিল এবং আদৌ ইসলাম সম্মত নয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে কেউই বেহেশতে যাবার বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে না। বরং যে এ কথা বলবে সে প্রকারান্তরে এক প্রকার শিরক করবে। কারণ একমাত্র আল্লাহই এই নিশ্চয়তা দিতে পারেন।

উত্তর : ৫. পশুদের প্রসঙ্গ

কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে হাশরের ময়দানে পশুরাও জমায়েত হবে। তবে তাদের কোনো বিচারের মুখোমুখি হতে হবে না। বিচার শুধু জ্বীন ও মানুষেরই হবে। কারণ এই দুই জাতিকে ভালোমন্দ যাচাই করার বিবেক দেয়া হয়েছে। ভালো বা মন্দ যে কোনো পথে চলার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

উত্তর : ৬. জীবনের উপর আখেরাতের বিশ্বাসের প্রভাব

আখেরাতের উপর বিশ্বাস মুসলমানদের শুধু সাধারণ বিশ্বাস নয়। বরং এটা গোটা জীবনকে প্রভাবিত করে।

ক) এটা মুসলমানদের ন্যায়নীতির উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকতে অনুপ্রাণিত করে। কারণ তারা জানে যারা অন্যায় করে এই দুনিয়ায় পার পেয়ে যায় তাদের আখেরাতে পাকড়াও করা হবে। ধার্মিক ও সৎ লোক যারা দুনিয়াতে কষ্ট করে তারা আখেরাতে সুখে থাকবার নিশ্চয়তায় সন্তুষ্ট থাকে।

খ) মুসলমানরা তার নিজের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত ও মার্জিত করে। কারণ সে জানে যে জীবন অর্থহীন লক্ষ্যহীন নয়। বরং এটা আখেরাতের জন্য পরীক্ষাস্থল। সেই জীবনে সফলতা পেতে হলে এই জীবনে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে হবে।

গ) আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি মুসলমানদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উত্তরোত্তর বাড়াতে অনুপ্রাণিত করে। তারা বস্তুবাদী না হয়ে আধ্যাত্মবাদী হয়।

সূত্রে :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৮৭:১৩, ২২:৪৭

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৭৪:৩৮, ৪:৪৮, ২:২২৫, ২১:২৮

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৮১:৫

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৪৫:২১, ৩৮:২৮

ডি-১৩ তাকদীরে বিশ্বাস

প্রশ্ন ১. মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে পূর্বনির্ধারিত তাকদীরে (ভাগ্যের) সম্পর্ক কি?

২. ভাগ্য এবং ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়ে দার্শনিক ও যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৩. 'ভাগ্য'-এর বর্ণনায় কুরআনে কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে? এর প্রকৃত অর্থ কি?

৪. আমাদের ভাগ্য ও কর্ম যদি আল্লাহর জানাই থাকে তবে পাপের জন্য শাস্তির প্রশ্ন আসে কেন?

৫. কুরআনে বলা হয়েছে যে আল্লাহই মানুষকে হেদায়েত দেন। তাহলে আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন না তার শাস্তির কথা আসে কেন?

৬. যারা বলে পৃথিবীতে এত দু:খ কষ্ট থাকলে আল্লাহকে দয়াবান বলি কিভাবে– তাদের প্রশ্নের জবাবে কি বলবেন?

৭. তাকদীরে বিশ্বাসের কি প্রতিফলন মুসলমানদের জীবনে দেখা যায়?

উত্তর : ১. ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ভাগ্য (তাকদীর)

এই প্রশ্ন মানুষের মনে সব সময় এসেছে। সে কি পূর্ণ স্বাধীন সত্তা যে, ইচ্ছেমতো নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারে। নাকি সে পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলছে। যদি সে ইচ্ছেমতো ভাগ্য গড়ার অধিকারী হয় তাহলে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের বিষয়টি কেমন হয় যেখানে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি সমগ্র জগতে একচ্ছত্র ক্ষমতাবান হিসেবে সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল খবর রাখেন। অন্যদিকে মানুষ যদি সম্পূর্ণরূপে ভাগ্য দিয়েই চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে তার এই ইহজীবনের কাজের জন্য কেন পরকালে জবাবদিহি করতে হবে?

উত্তর : ২. 'ভাগ্য' সম্পর্কে দার্শনিক ও যুক্তিবিদদের মত

ভাগ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দার্শনিক ও যুক্তিবিদরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন–

ক) একদল মনে করে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীনভাবে মানুষ কাজ করার পর আল্লাহ তা জানতে পারেন। কোনো কোন দার্শনিক আরো চরমপন্থি হয়ে আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন। তারা বলেন যে, যেখানে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়তে পারে সেখানে স্রষ্টার অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয়।

খ) আর একদল দার্শনিক বলেন যে, মহান স্রষ্টা যিনি সমগ্র জগতের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন এবং যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের সব কিছু জানেন তখন জগতে কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছা ছাড়া অনুষ্ঠিত হতে পারে না। কাজেই মানুষের কাজ

ও আচরণের জন্য মানুষ দায়ী নয় বরং স্রষ্টাই মানুষকে দিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করিয়ে নেন।

উত্তর : ৩. 'ভাগ্য' বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা

পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য বনাম ইচ্ছার স্বাধীনতা এ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনে অনেক মুসলমানও ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে প্রচলিত ভ্রান্তি এই যে, ইসলাম মুসলমানদের ভাগ্যবাদী হতে উৎসাহিত করে। এর কারণ কুরআনে ভাগ্য সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যবহৃত 'আল-কদর' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা। কুরআনে 'কদর' বলতে পূর্ব নির্ধারিত নিয়তিকে বোঝায় না। 'কদর' শব্দের মূল ধাতুর অর্থ মূল্যায়ন, ন্যায্য পাওনা বা বিচার। সূত্রে বর্ণিত কুরআনের আয়াতগুলো অধ্যয়ন করে দেখা যায় কদর বলতে নিয়তিকে বোঝানো হয়নি। বরং আল্লাহ জগতকে কিছু সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীন করে তৈরি করেছেন তাকেই বোঝানো হয়েছে। যার অর্থ প্রথমত যে নিয়মের অধীনে জগৎ পরিচালিত হয় যেমন চাঁদ, সূর্য, বাতাস, পৃথিবীর যে শৃঙ্খলায় সমাজ পরিচালিত হবে তাও নির্ধারিত।

উত্তর : ৪. পাপের শাস্তি প্রসঙ্গে

এটা ভাবা ভুল যে পৃথিবীতে কোনো কিছু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে। এমন বলাটা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা হবে। আবার আমরা যত পাপ কাজ করি তাও আল্লাহর ইচ্ছায় করা হয়েছে এমন বলাটাও অবান্তর। এ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে আমাদের জীবনের যেসব ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে আর যেসব ক্ষেত্র আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তা জানা দরকার। সেসব বিষয়ে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সেগুলো হচ্ছে–

ক) আমরা যে, সময় জন্মগ্রহণ করেছি।
খ) আমাদের গায়ের রং।
গ) আমাদের চেহারা ও চাহনি।
ঘ) আমাদের হৃৎপিণ্ড যেভাবে স্পন্দন করে ইত্যাদি।

অন্য কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের ইচ্ছার অধীন সেগুলো হচ্ছে–

ক) কোনো মানুষকে দয়া সহানুভূতি দেখানো অথবা তার সাথে শত্রুতা করা।
খ) আল্লাহ হতে বিশ্বাস করা বা না করা।
গ) সৎ সত্য পথ অনুসরণ করা বা না করা ইত্যাদি।

এসব কাজ করা না করার উপর আমাদের পুরস্কার বা শাস্তি নির্ভর করছে।

উত্তর : ৫. হেদায়েত পাওয়া না-পাওয়া প্রসঙ্গে-

কেউ কেউ বলে যে, আল্লাহ তাদের হেদায়েত না করলে তাদের কি দোষ। কেন তাদের শাস্তি পেতে হবে। এমন লোকদের কথার জবাব এভাবে দেয়া যেতে পারে–

ক) তারা যদি ভালো মানুষ হতেন এবং হাশরের ময়দানে পুরস্কৃত হতেন তবে কি তারা এই প্রশ্ন করতেন, "আমাকে কেন বেহেশতে দেয়া হলো, আল্লাহই তো আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন, এখানে আমার কৃতিত্বটা কোথায়।" এটাই যদি হয় বাস্তবতা তবে মন্দ পরিণামের জন্য তাদের অভিযোগ করাটা prejudice -এরই বহি:প্রকাশ।

খ) মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মানুষের মাঝে আল্লাহ সহজাত সত্যের অনুসন্ধিৎসা দিয়েছেন। এটাকে বলা হয় 'ফিতরাত'। এছাড়াও মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান। তাদের জন্য পাঠিয়েছেন নবী এবং ওহী। কিছু মানুষ এসব এর মাধ্যমে সত্য পন্থা বেছে নেয়। কেউ কেউ স্বাধীনতার সুযোগে সত্য প্রত্যাখ্যান করে। তারা শয়তানীতে লিপ্ত হয়। তাদের সত্যপথ গ্রহণ না করার জন্য এরা নিশ্চয়ই আল্লাহকে দোষারোপ করতে পারে না।

উত্তর : ৬. আল্লাহর দয়া প্রসঙ্গে

আল্লাহর জ্ঞানের বিষয়ে আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে আমরা ধারণাও করতে পারি না। স্থান, কাল, পাত্রের উর্ধ্বে উঠে যে কোনো বিষয়ের লাভ-ক্ষতি উপকার-অপকার আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের চোখে যা এই মুহূর্তের ক্ষতি বা কষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় সময়ে সেটাই কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। কাজেই সবকিছুতেই নগদ কল্যাণ দেখে আল্লাহর দয়া সম্পর্কে আমাদের স্বল্প বুদ্ধিতে চিন্তা করতে গেলে আমরা শয়তানের ধোঁকায় পড়তে পারি। এটা বলা যেতে পারে পৃথিবীতে যদি দু:খ কষ্ট না থাকতো তবে সুখ কি জিনিস তা আমরা বুঝতাম না। তেমনি যদি মন্দ না থাকতো তবে আমরা ভালোকে চিনতাম না। অসুস্থতা না থাকলে আমরা স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বুঝতাম না। মৃত্যু না থাকলে জীবনকে এত ভালো লাগত না।

উত্তর : ৭. মুসলামনদের উপর তাকদীরে বিশ্বাসের প্রভাব

তাকদীরে বিশ্বাসের কারণে মুসলমানরা ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব পেরেশান হয় না। কারণ তারা জানে যে, আল্লাহ যা নির্ধারিত রেখেছেন তাই হবে। আবার তারা এও বিশ্বাস করে যে তাকদীরে অস্তিত্ব মানে এই নয় যে মানুষের চেষ্টা বা পছন্দের কোনো গুরুত্ব নেই। বস্তুত মানুষের জন্য ভাগ্যের অনেক ব্যাপক সীমা (Range of distribution) রয়েছে। সে চেষ্টা ও আমল দিয়ে শ্রেষ্ঠটাকে পছন্দ করবে। মন্দকে বর্জন করে আল্লাহর উপর সব বিষয়ে নির্ভরতা রাখবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৫৪:৪৯, ২৫:২, ৩৬:৩৯, ১৭:৭৭

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৯১:৯-১০, ২:২

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ২১:২৯

প্রশ্ন ৭. আল কুআন ৫৭:২২

ডি-১৪ আল্লাহর কিতাবের উপর বিশ্বাস

প্রশ্ন ১. রিসালাতে বিশ্বাসের সাথে কিতাবের বিশ্বাসের সম্পর্ক কি?

২. অন্যান্য নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে বিশ্বাস করতে কুরআনের আদেশ করা হয়েছে কি?

৩. কুরআনে কি কোনো আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

৪. কুরআনের নাম উল্লেখ নেই যেসব কিতাবের সেগুলোর বিষয়ে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৫. আসমানী কিতাবে বিশ্বাসের অর্থ কি এই যে এসব কিতাবের বর্তমান সংস্করণকেও বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে হবে?

৬. পূর্বের কিতাবগুলো যে অবিকৃত নেই এ বিষয়টি কুরআনের উল্লেখ করা হয়েছে কি?

৭. কুরআন যে অবিকৃত অবস্থায় আছে তা মুসলমানরা কিভাবে প্রমাণ করবে?

উত্তর : ১-২. রিসালাত ও কিতাবে বিশ্বাসের সম্পর্ক

এটা স্বাভাবিক যে, মুসলমানরা যদি আল্লাহর সব নবীকে বিশ্বাস করে তবে তাঁদের কিতাবকেও বিশ্বাস করতে হবে। এটা যৌক্তিক দাবি নয় বরং বাধ্যবাধকতা কারণ সব নবীই আল্লাহ প্রেরিত ছিলেন। তাঁদের সবার একই মিশন ছিল। তাঁদের প্রত্যেকের উপর একই বিধান দেয়া হয়েছিল। তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ। কুরআন ও হাদিস থেকে দেখা যায় যে, অন্যান্য নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ।

উত্তর : ৩-৪. কুরআনে আর যেসব আসমানী কিতাবের নাম এসেছে

কুরআনে আল্লাহর প্রদত্ত চারটি কিতাবের নাম এসেছে। এগুলো হচ্ছে–

ক) ইবরাহীম (আ:) কে প্রদত্ত সহীফা।

খ) দাউদ (আ:) কে প্রদত্ত যবুর।

গ) মুসা (আ:) কে প্রদত্ত তাওরাত।

ঘ) ঈসা (আ:) কে প্রদত্ত ইনজিল।

অবশ্য এর মানে এই নয় যে, এই চারটি কিতাবই আছে। কুরআনের বহু আয়াতে 'কুতুব' শব্দ এসেছে। 'কুতুব' হচ্ছে কিতাবের বহুবচন।

কুরআনে যেসব কিতাবের নাম উল্লেখ নেই সেগুলোর উপরও মুসলমানদের ঈমান রাখতে হবে।

উত্তর : ৫. ৬. কিতাবগুলোর বর্তমান সংস্করণের ব্যাপারে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি

যখন মুহাম্মদ (সা:) কে জিজ্ঞেস করা হলো যে মুসলমানরা কিতাবগুলোর বর্তমান সংস্করণ সম্পর্কে কি আচরণ করবে। তখন তিনি বললেন যে, কেউ যেন এগুলো পুরোপুরি গ্রহণ না করে আবার একেবারে বর্জন না করে। অর্থাৎ এগুলো সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল অথচ সচেতন হতে হবে। এর কারণ এসব কিতাবের বর্তমান সংস্করণগুলোয় আল্লাহর ওহী অবিকৃত থাকেনি। ইসলাম এসব কিতাবের অবিকৃত রূপ যা সংশ্লিষ্ট রাসূলের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল তার উপর বিশ্বাস রাখতে বলে। এসব কিতাব যে বিকৃতির শিকার হয়েছে তা কুরআন বলেছে। এসব কিতাবের অনেক অসঙ্গতি সাধারণ মানুষেরও চোখে পড়ে। যথা–

ক) নিউ টেস্টামেন্ট প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ:)-এর অন্তর্ধানের অনেক পর তাঁর সহযোগিদের বয়ানে লিখা তাঁর জীবনী ও উপদেশের সংকলন। অবশ্য এতে তাঁর উপর নাযিলকৃত কিছু ওহী থেকে যেতে পারে। কিন্তু প্রচুর মানবীয় কথাবার্তার অনুপ্রবেশ আল্লাহর কিতাবের মানকে ম্লান করেছে।

খ) ওল্ড টেস্টামেন্টের বিশ্লেষণ করেও দেখা যায় যে, এর বিরাট অংশ মুসা (আ:)-এর মৃত্যুর পর লিখা হয়েছে। 'pentateuch'-এর পাঁচটি গ্রন্থের অসঙ্গতি প্রমাণ করে যে এখানে মানুষের কথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

উত্তর : ৭. কুরআন যে অবিকৃত তার প্রমাণ

ক) আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি নিজে কুরআনকে সংরক্ষণ করছেন।

খ) রাসূলের জীবদ্দশায় নাযিলের সাথে সাথে কুরআনের প্রতিটি আয়াত অবিকল লিখে রাখা হত এবং তা সংরক্ষণ করা হত।

গ) তাসখন্দ এবং তুরস্কে রাসূলের মৃত্যুর কয়েক বছর পরের কুরআন শরীফ সংরক্ষিত আছে। বর্তমানের কুরআনের সাথে যার কোনো অমিল নেই।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ২১:২৫

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ২:৪-৫, ২:২৮৫, ২:১৩৬

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৮৭:১৮-১৯, ৫৩:৩৬-৩৭, ১৭:৫৫, ৪:১৬৩, ৫:৪৭, ৫:৪৯, ৫:৬৮, ৩:৩

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ২:২১৩

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ৫:১৬-১৭, ২:৭৫, ৪:৪৬, ৫:১৪, ৬:৯১, ৬১:৬, ৫:৫১, ১৬:৬৪

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ১৫:৯, ৪১:৪১-৪২

ই: ইসলামের স্তম্ভসমূহ

ই-১ প্রথম স্তম্ভ : কালেমা শাহাদাত

প্রশ্ন ১. ইসলামের পাঁচটি রুকন (স্তম্ভ) কি কি? এই পাঁচ স্তম্ভের ধারণা কোথা থেকে উদ্ভূত?

২. এই পাঁচ স্তম্ভেই ইসলাম সীমাবদ্ধ- এমন ধারণা অন্যেকে দিতে চান- এটা কি ঠিক?

৩. ইসলামের স্তম্ভগুলো যে ক্রমানুসারে বর্ণনা করা হয়েছে তার কি কোনো গুরুত্ব আছে?

৪. ইসলামের প্রথম স্তম্ভের অর্থ ও গুরুত্ব কি?

৫. কালেমার প্রথম অংশ 'আল্লাহর উপরে বিশ্বাস' সম্পর্কে ইসলাম কি বলেছে?

৬. কালেমার দ্বিতীয় অংশ (রিসালাতে বিশ্বাস)-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা কি?

৭. মুহাম্মদ (সা:)-এর উপর ঈমান আনার সাথে কি অন্যদের উপরও ঈমান এসে যায়?

৮. ইসলামের প্রথম স্তম্ভের সাথে যুক্ত অন্যান্য বিশ্বাসগুলো কি কি?

৯. কালেমার সাথে অন্যান্য যেসব বিষয়ে বিশ্বাস আনতে হবে তার পক্ষে কুরআন বা হাদিসের কোনো দলিল আছে কি?

উত্তর : ১. ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ

বিভিন্ন হাদিসে রাসূল (সা:) ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে এক হাদিসে বলা হয়েছে যে, তাওহীদ (আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস), নামাজ, যাকাত, রোজা ও হজ্ব এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মা'বুদ না মানা এবং একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা। দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে নির্ধারিত নিয়মে দিনে পাঁচবার নামাজ আদায় করা। তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত আদায় করা। রমজান মাসে রোজা রাখা হচ্ছে ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। আর পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার হজ্ব করা।

উত্তর : ২. ইসলামী শিক্ষায় পাঁচ স্তম্ভের স্থান

ইসলাম ছাড়া প্রায় সব ধর্মই ব্যক্তিজীবনকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন থেকে পৃথক রাখে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম শুধু অনুষ্ঠান সর্বস্ব কিছু নয়। এখানে এমন সুযোগ নেই যে, ধর্মীয় কাজগুলো যথানিয়মে পালন করে তারপর ইচ্ছেমত কাজ শেষ হয়ে যায় তারা ভুল করেন। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা জীবনে প্রত্যেক

অংশকেই প্রভাবিত করে। একটি পূর্ণাঙ্গ বাড়ি তৈরি হতে ভিত্তি, স্তম্ভ, দেয়াল, দরজা, জানালা, ফার্ণিচার ইত্যাদি অনেক কিছু লাগে। শুধু স্তম্ভ দিয়ে যেমন বাড়ি হয় না তেমনি শুধু পাঁচ স্তম্ভ পূর্ণ করলেই ইসলাম বাস্তবায়ন করা হয়ে যায় না। স্তম্ভগুলো ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইসলাম নয়।

উত্তর : ৩. পাঁচ স্তম্ভের বর্ণনার ক্রমের গুরুত্ব

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি। এই আল্লাহতে বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের সকল ভালো কাজ কবুলের অত্যাবশ্যক শর্ত। দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ। এটা আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে। এর জন্য কোনো যাজক বা মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আল্লাহকে স্বীকার করে তাকে মানার পর তাঁর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যম হচ্ছে নামাজ। তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। যা গরীবের প্রতি দয়া নয় বরং তাদের অধিকার। ধনীদের নিজেদের উদ্যোগ নিয়ে এটা আদায় করতে হবে। এটা সমাজে সাম্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করে। রোজার মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করে। ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে হজ্ব। যারা মক্কায় যাবার সামর্থ্য রাখে তাদের জন্য এটা ফরজ। এভাবে ইসলামে গুরুত্বের ভিত্তিতে তার স্তম্ভগুলো সাজানো হয়েছে।

উত্তর : ৪. প্রথম স্তম্ভের অর্থ ও ব্যাখ্যা

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে সচেতন ও আন্তরিকভাবে এই ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহ এক এবং একমাত্র উপাস্য আর মুহাম্মদ (সা:) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল (বাণীবাহক)।

এই বিশ্বাস ও ঘোষণা এক সার্বজনীন অধিকার। যে কেউ যে কোনো স্থানে এই ঘোষণা দিতে পারে। এর জন্য গীর্জা বা মসজিদে গিয়ে পাদ্রী বা আলেমের অনুমোদন নিতে হয় না। এ ঘোষণা অন্তর থেকে যে যখন দেবে তখন থেকেই সে ইসলামে প্রবেশ করে মুসলিম হয়।

উত্তর : ৫. আল্লাহ্ উপর বিশ্বাস প্রসঙ্গে

ইসলামের মূল কালেমা 'নাবাচক' ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছে। কারণ 'একজন আল্লাহ' আছে শুধু এই ঘোষণা দেয়াই যথেষ্ট নয়। বরং এই ঘোষণা দেয়াও জরুরী যে তাবৎ জগেতে কোনো সৃষ্টি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতায় কোনো অংশ রাখে না। কুরআন বলে যে, আল্লাহ–

ক) সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পালনকর্তা।

খ) সর্বোচ্চ একক এবং সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তাঁর কোনো অংশীদার বা সাহায্যকারী নেই।

গ) তাঁর শক্তি ক্ষমতা ও ব্যাপকতা আমাদের অনুমান শক্তির সীমার বাইরে।

ঘ) সব সময়ে সব স্থানে তিনি আমাদের পাশে থাকেন, পরিচারিত করেন, সাহায্য করেন ও আমাদের ভালোবাসার জবাব দেন।

উত্তর : ৬. কালেমার দ্বিতীয় অংশ

আল্লাহ নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তাঁর নির্দেশনা মানুষকে দেন। আদম (আ:) থেকে মুহাম্মদ (সা:) পর্যন্ত সব নবী আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত। মুহাম্মদ (সা:)-এর মিশন ছিল পূর্বের সব নদীর মিশনকে স্বীকৃতি ও পূর্ণতা দেয়া। আল্লাহর বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

কালেমার দ্বিতীয় অংশের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে নবুওতের মিশনের এবং বিশেষভাবে মুহাম্মদ (সা:)-এর শেষ নবুওতের স্বীকৃতি দেয়া হয়।

উত্তর : ৭. রাসূল (সা:) কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস

মুহাম্মদ (সা:) কে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা মানে অন্য নবীদের অস্বীকার করা নয়। কুরআন সকল নবীর উপর বিশ্বাস রাখাকে মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বলেছে। সকল নবীই একই ভ্রাতৃত্বের অংশ। কুরআনে কোনো নবীর উপরে দোষ বা পাপ আরোপ করা হয়নি। সব নবীর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে কুরআনে বিশেষভাবে পাঁচজনের উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হলেন, নূহ (আ:), ইবরাহীম (আ:), মুসা (আ:), ঈসা (আ:) এবং মুহাম্মদ (সা:)।

উত্তর : ৮. ৯. অন্যান্য যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে

কালেমার উপর ঈমানের ফলশ্রুতিতে ছয়টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তা হচ্ছে যথা–

ক) আল্লাহতে বিশ্বাস।

খ) ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস।

গ) আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস।

ঘ) আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের উপর বিশ্বাস।

ঙ) বিচারের দিনের (হাশর) উপর বিশ্বাস।

চ) তাকদীর (ভাগ্য)-এর উপর বিশ্বাস।

রাসূলের একটি হাদিসে এসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে (হাদিসে জিবরীল)।

সূত্র :

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ২:৫৫, ৪২:১১, ৬:১০৩, ৪:১১২, ৫০:১৬

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ২:২৮৫

প্রশ্ন ৮. এবং ৯. আন্নবী সঙ্কলিত চল্লিশ হাদিসের হাদিসে জিবরীল।

ই-২ দ্বিতীয় স্তম্ভ : সালাত

প্রশ্ন ১. ইংরেজি Prayer শব্দ দিয়ে কি সালাত শব্দের পুরো অর্থ হয়?

২. অযু কিভাবে করতে হয়?

৩. অযু বিশেষ নিয়মে করতে হয় কেন?

৪. এক অযুতে কতবার নামায পড়া যাবে?

৫. অক্ষম লোকের জন্য অযুর কোনো বিকল্প আছে কি?

৬. কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অযু যথেষ্ট হবে না? (অর্থাৎ অযু করলেই পবিত্রতা হবে না গোছল লাগবে)

৭. অযু, গোসল ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা ইসলামে কি একটু বেশিই করা হয়েছে?

৮. পবিত্রতা সম্পর্কে ইসলামে আর কিছুর উল্লেখ আছে কি?

উত্তর : ১. সালাত বা নামাযের অর্থ

নামায একটি ব্যাপক এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার সমষ্টি যার অর্থ ইংরেজি Prayer শব্দ দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না। Prayer শব্দ দিয়ে শুধু প্রার্থনা বা আবেদনকেই বুঝায়। অন্যদিকে প্রার্থনা নামাযের একটি অংশ কিন্তু পুরো নামায নয়। নামাযের পূর্বে অযু করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। নামাযে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মে উঠা-বসা করতে হয়। কুরআন তেলাওয়াতসহ আরো কিছু আনুষ্ঠানিকতা করতে হয়।

উত্তর : ২. অযু

অযুর ন্যূনতম চাহিদা (ফরজ) হচ্ছে একজন মানুষ তার কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে মুখ ধুয়ে সিক্ত দুই হাত দিয়ে মাথা মুছবে এবং পা (Foot) ধুবে। এটা নামাযে দাঁড়াবার অন্যতম পূর্বশর্ত। রাসূল (সা:)-এর বয়ানে জিবরাইল (আ:)-এর মাধ্যমে অযুর আরো বিস্তৃত এবং শুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় তা হচ্ছে–

ক) দুই হাত (Hand) কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া।

খ) তিনবার কুলিসহ দাঁত পরিষ্কার করা।

গ) তিনবার নাসারন্ধ্র করা।

ঘ) কপাল ও কানের গোড়াসহ মুখমণ্ডল তিনবার ধোয়া।

ঙ) ডানহাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোয়া।

চ) বামহাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোয়া।

ছ) সিক্ত দুই হাত দিয়ে মাথা, চুল এবং কান তিনবার মোছা (মাসেহ করা)।

জ) গোড়ালী পর্যন্ত দুই পা তিনবার ধোয়া (প্রথমে ডান পা)।

অযু ইবাদাতের অংশ এবং নামাযের একটি পূর্বশর্ত হিসেবে কুরআনে উদ্ধৃত। এভাবে অযু করার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দিষ্ট আদেশ যথানিয়মে মানা হয় এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়। এই কারণ ছাড়া অযুর আরো কিছু যৌক্তিক গুরুত্ব আছে যথা–

ক) এটা নামাযের মানসিক প্রস্তুতি। আর নামায আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ।

খ) দিনে পাঁচবার নামায পড়তে হয়। যা দিনের অন্যান্য কাজের একঘেয়েমি থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। আর নামাযের আগে অযু ধূলো দূর করে শরীর ও মনকে প্রফুল্ল ও সতেজ করে ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করে।

উত্তর : ৩. অযুর বিশেষ নিয়ম প্রসঙ্গে

অযু নামাযের একটি অংশ। যে নিয়মে অযু করতে বলা হয়েছে তা যৌক্তিকভাবে যথার্থ। কারণ মুখ ধোয়ার আগে হাত ধোয়া উচিত এবং বাহু ধোয়ার আগে মুখ ধোয়া উচিত। আর পা ধোয়ার আগে মুখ ও বাহু ধোয়া উচিত। অযু শুধুমাত্র দৈহিক পবিত্রতার বিষয়ই নয় আধ্যাত্মিক পবিত্রতাও আনে। রাসূল (সা:) বলেন, যে মানুষ নামাযের প্রস্তুতিতে যত্নের সাথে অযু করে তার পাপ অযুর পানির সাথে ধুয়ে ভেসে যায়।

উত্তর : ৪. অযুর স্থায়িত্ব

অযু না ভাঙলে প্রত্যেক নামাযের আগে অযু করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য যৌক্তিক কারণেই এক অযুতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া সম্ভব হবে না। অযু যেসব কারণে ভাঙে তা হচ্ছে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে বা অজ্ঞান হলে বা শরীর থেকে যে কোনো কিছু যেমন– বাতাস, রক্ত, বমি বের হলে। এভাবে অযু ভাঙলে পরবর্তী নামাযের আগে আবার অযু করতে হবে।

উত্তর : ৫. অক্ষম ব্যক্তি জন্য অযুর বিকল্প

ইসলামী আইনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অযুর বিকল্প ব্যবস্থা আছে। যেসব ক্ষেত্রে অযু করা অসম্ভব অথবা অযুর সুযোগ দুষ্পাপ্য সেসব ক্ষেত্রে করণীয়–

ক) যদি কোনো পথিকের কাছে পর্যাপ্ত পানি না থাকে তবে সে 'তায়াম্মুম' করতে পারে। 'তায়াম্মুম' হচ্ছে প্রতীকি অযু। পাথর বা বালিতে হাত রেখে দু'হাত একত্র করে অত:পর সেই হাত দিয়ে কনুই পর্যন্ত হাত ও মুখমণ্ডল মুছে নেয়াই 'তায়াম্মুম'।

খ) কারো যদি চর্মরোগ বা ঘা থাকে যা পানির স্পর্শে বাড়বে তারা আক্রান্ত স্থানে পানি না লাগিয়ে অযু করতে পারবে। এ ধরনের সমস্যায় 'তায়াম্মুম' করলেও চলবে।

গ) ভ্রমণে বা কর্মস্থলে যদি পা ভেজানোর সুযোগ না থাকে তবে চামড়ার মোজার উপর ভেজা হাত বুলিয়ে নিলেই চরবে। ভ্রমণের সময় এভাবে ৩ দিন এবং বাড়িতে ২৪ ঘন্টা পা না ভিজিয়ে থাকা যাবে।

উত্তর : ৬. যেখানে নামাযের প্রস্তুতি হিসেবে অযু যথেষ্ট নয়

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জনে গোসল আবশ্যক (অযুতে হবে না) যথা–

ক) স্বামী-স্ত্রীর মিলন হলে।

খ) মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব বা সন্তান জন্মের পর নেফাস অবস্থা শেষে।

গ) স্বপ্নদোষ হলে।

এসব ক্ষেত্রেও পানি পাওয়া না গেলে অথবা রোগ-ব্যাধির কারণে পানি ব্যবহারে অসমর্থ হলে 'তায়াম্মুম' অনুমোদিত।

এসব বাধ্যতামূলক গোসল ছাড়াও রাসূল (সা:) বলেন যে, অন্তত সপ্তাহে একবার জুমার আগে গোসল করা উচিত।

উত্তর : ৭. ইসলামে অযু-গোসলসহ ব্যক্তিগত বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা প্রসঙ্গে

পাশ্চাত্যে কিছু নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা পালনের মধ্যেই ধর্ম সীমাবদ্ধ এবং ধর্ম সেখানে এক অপার্থিব বিষয়। সেখানে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব জীবন আলাদাভাবে বিভক্ত। অন্যদিকে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এখানে ধর্মীয় জীবনের সব বিষয়েই এখানে বিস্তৃত ও খোলামেলা আলোচনা ও নির্দেশনা আছে। বস্তুত পরিচ্ছন্ন থাকা ইসলামে একটি অন্যতম ধর্মীয় দায়িত্ব।

উত্তর : ৮.পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আরো কথা

ইসলাম শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতাকে দুটো ভিন্ন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে না। আধ্যাত্মিক ও শারীরিক দুই ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতার (তাহারাত) কথা ইসলামে বলা হয়েছে। আল্লাহ মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত কল্যাণ চান। রাসূল (সা:) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অংশ হিসেবে শুধু অযু গোসলের কথাই বলেননি। আরো অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি নিয়মিত দাঁত মাজতে (মেসওয়াক), মুসলমানী করতে, নখ কাটতে, বগল ও যৌনাঙ্গের চুল কাটতে, খাবার আগে হাত ধুতে, শারীরিকভাবে কর্মঠ থাকতে আদেশ করেছেন। তাছাড়াও তিনি মানুষকে পানিতে বা ছায়াঘেরা স্থানে যেখানে মানুষ বিশ্রাম করে সেখানে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। মদপান করতে তিনি কঠোরভাবে না করেছেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৫:৭

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৫:৭

প্রশ্ন ৮. আল কুরআন ৯:১০৮, ২:২২২, ৮:১১

ই-৩ সালাত : প্রস্তুতি

প্রশ্ন ১. ইসলামে নামাযের ভূমিকা ও গুরুত্ব কি?
২. পূর্ববর্তী নবীর উম্মতদের জন্যও কি নামায ফরজ ছিল?
৩. অযু ছাড়া নামাযের আর কোনো পূর্বশর্ত আছে কি?
৪. যে কোনো স্থানেই কি নামায পড়া যায়? নাকি সুনির্দিষ্ট জায়গায় নামায পড়তে হবে?
৫. কোনদিকে ফিরে নামায পড়তে হবে?
৬. কেবলামুখী হয়ে নামায পড়ার গুরুত্ব কি?
৭. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচি কি?
৮. যথাসময়েই নামায পড়া কি আবশ্যক?
৯. নামাযের জন্য ইসলামে কিভাবে আহ্বান করা হয়?

উত্তর : ১. নামাযের ভূমিকা ও গুরুত্ব

নামায ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। এটা মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কুরআনে অনেক স্থানে নামাযের তাগিদ দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় নামাযের তাগিদের সাথে যাকাতেরও উল্লেখ এসেছে। রাসূল (সা:) বলেছেন, নামায মুসলমান আর অমুসলমানের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। নামাযকে অস্বীকার করা কুফরি। হাশরের ময়দানে নামাযের কথা সবার আগে জিজ্ঞেস করা হবে। যারা আন্তরিকভাবে নামায আদায় করে তাদের বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

উত্তর : ২. পূর্ববর্তী নবীর উম্মতদের উপরও কি নামায ফরজ ছিল

কুরআনে এ ব্যাপারে উদ্ধৃতি আছে যে পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষাতেও নামাযের উল্লেখ ছিল। তবে সে নামাযের ধরণ ও প্রকৃতি কি ছিল তা জানা যায় না। সূত্রের আয়াতগুলোতে দেখা যায় যে আল্লাহ ইবরাহীম (আ:), ইসমাইল (আ:), ইয়াকুব (আ:), শুয়াইব (আ:), ঈসা (আ:) কে নামাযের কথা বলেছেন। এই নামাযই রাসূল (সা:)-এর মিশনের মাধ্যমে পূর্ণভাবে কায়েম হয়েছে।

উত্তর : ৩. নামাযের প্রস্তুতি ও পূর্বশর্ত

ক) মানুষ যখন কোনো কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যায় তখন ভালো পোশাক পরে। ঠিক তেমনি নামাযের আগে মুসলমানদের শরীয়ত সম্মত পোশাক পরতে হবে। মেয়েদের জন্য তাদের মুখ ও হাত বাদে পুরো শরীর ঢিলেঢালা পরিষ্কার পোশাকে আবৃত করতে হবে। ছেলেদের অন্তত নাভির উপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত আবৃত করতে হবে।

খ) পোশাক পবিত্র পরিষ্কার হতে হবে।

গ) নামাযের জায়গা পরিষ্কার হতে হবে।

উত্তর : ৪. নামাযের দিক

জুম্মা ও যামাতে নামায ছাড়া নামাযের জন্য মসজিদ বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যাবার প্রয়োজন নেই। যে কোনো পরিষ্কার স্থানেই নামায পড়া যাবে। রাসূল (সা:) বলেন সমগ্র পৃথিবীই মসজিদ (সেজদার যোগ্য) হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। ভ্রমণকারী মানুষ যানবাহনে বসে এমন কি ইশারাতেও নামায পড়তে পারবে। জামায়াতে নামায পড়া উত্তম তবে এটা পূর্বশর্ত নয়।

উত্তর : ৫. নামাযের দিক

কাবা হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য নির্মিত প্রথম ঘর, যা ইবরাহীম (আ:) নির্মাণ করেন। এটা তাই একত্ববাদের এবং সব নবীর ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাসের প্রতীক। ইসলামের বিজয়ের পূর্বে পৌত্তলিকরা কাবা ঘরে মূর্তিপূজা করত। সেজন্যে প্রথমদিকে মুসলমানরা জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামায পড়ত।

মক্কা বিজয়ের পর কাবা ঘর থেকে মূর্তি অপসারণ ও ধ্বংস করা হয়। তারপর থেকে আজ দেড়হাজার বছর সারা পৃথিবীর তাওহীদবাদীরা কাবামুখী হয়ে নামায পড়ছে।

উত্তর : ৭. নামাযের সময়

ক) ফজর- সূর্যোদয়ের ৭০ থেকে ৯০ মিনিট পূর্বে থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত

খ) যোহর- সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের অর্ধেকের পর থেকে এই নামাযের সময় শুরু।

গ) আসর- মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের অর্ধেকের পর থেকে এই নামাযের সময় শুরু।

ঘ) মাগরিব- সূর্যাস্তের পর পর।

এশা- সূর্যাস্তের এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর শুরু হয়।

উত্তর : ৮. যথা সময়ে নামাযের প্রয়োজনীয়তা

নামায যথাসময়ে পড়া উচিত; অবশ্য এক ওয়াক্তের যে কোনো সময়েই নামায পড়া যাবে। ঠিক সূর্যোদয়ের সময় এবং ঠিক মধ্যাহ্ন এবং সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া যাবে না।

উত্তর : ৯. নামাযের আহ্বান- আযান

ইসলামে নামাযের আহ্বান হচ্ছে আযান, যা লক্ষ লক্ষ মসজিদের মিনার থেকে দেড় হাজার বছর ধরে দিনে পাঁচবার ধ্বনিত হচ্ছে। এই অনুপম আহ্বানে আল্লাহর প্রতি

বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্য প্রকাশ পায়।

আযানের অর্থ-

আল্লাহ মহান (৪ বার)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই (২ বার)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল (২ বার)

নামাযের জন্য এসো (২ বার)

কল্যাণের জন্য এসো (২ বার)

আল্লাহ মহান (২ বার)

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই (১ বার)।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৮৭:১৪-১৫

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ১৪:৪০, ২১:৭২-৭৩, ১৯:৫৪-৫৫, ২০:১৪, ১৯:৩০-৩১, ৩:৪৩, ১১:৮৭, ৩১:১৭, ১৭:৭৮-৭৯, ৭৩:১-৪

ই-৪ সালাত : পদ্ধতি ও গুরুত্ব (১)

প্রশ্ন ১. নামায কিভাবে পড়তে হয়?

২. নামাযে কত রাকাত পড়তে হয়?

৩. নামাযের শুরুতে হাত উঠিয়ে 'তাকবীরে তাহরিমা' বলতে হয় কেন?

৪. কোন সূরাটি প্রত্যেক রাকাতে পড়তে হয়?

৫. মুসলমানরা 'ফাতিহা' পড়ার সময় কি এটা অনুভব করে যে আল্লাহ্ তাদের কথা শুনছেন?

৬. 'ফাতিহা' ছাড়া কুরআনের আর কোনো সুরা অথবা আয়াত কি নামাযে পড়তে হয়?

৭. নামাযে উঠাবসা করতে হয় কেন?

উত্তর : ১. নামায যেভাবে পড়তে হয়

নামায কয়েকটি রাকাতের সমন্বয়ে গঠিত। নামায শুরুর আগে নিয়ত করে দু'হাত কানের লতি পর্যন্ত তুলে আল্লাহু আকবর বলে হাত বাঁধতে হয়। ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতে হয়। দাঁড়ানো অবস্থায় কমপক্ষে যা পড়তে হয় তা হচ্ছে 'সূরা ফাতিহা'। নামায চলাকালে যা করা যাবে না তা হচ্ছে-

ক) এদিক সেদিক তাকানো যা নামায থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়।

খ) অন্যদের সাথে কথা বলা।

গ) কোন কিছু খাওয়া বা পান করা।

নামাযে গভীর মনোযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এ নামাজ। চোখ খোলা রেখে সেজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। অবশ্য কেউ কেউ চোখ বন্ধ করলে বেশি মনোযোগ বোধ করেন। দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত শেষে নামাযী আবারো আল্লাহু আকবার বলে রুকু করবে (হাঁটু পর্যন্ত সামনে ঝুঁকবে)। রুকু করার সময় পিঠ থাকবে সোজা, মাথা থাকবে হাঁটুর সমান্তরালে। এ অবস্থায় একটি দোয়া (তাসবিহ) পড়তে হবে। অত:পর সে 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদা' (আল্লাহ তার প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেন) বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় উচ্চারণ করবে 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' (হে আমাদের প্রভু সমস্ত প্রশংসা আপনারই)। এরপরই আছে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের সর্বোচ্চ বহি:প্রকাশ সেজদা। আল্লাহু আকবার বলে নাক ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে সেজদা দিতে হবে। সেজদায় একটি দোয়া (তাসবিহ) পড়তে হবে। দুটো সেজদার মাঝখানে আল্লাহু আকবার বলে বসতে হবে। এইভাবে নামাযের প্রথম রাকাত শেষ হবে।

উত্তর : ২. নামাযের রাকাত সংখ্যা

ওয়াক্ত ভেদে নামাযের রাকাত সংখ্যা দুই থেকে চার। ফজর নামাযে দুই রাকাত ফরজ নামায আছে। যোহরে চার রাকাত, আসরে চার রাকাত, মাগরিবে তিন রাকাত, এশায় চার রাকাত ফরজ নামায আছে। এছাড়াও প্রতি ওয়াক্ত নামাযে কিছু সুন্নাত নামাযও পড়া হয়।

উত্তর : ৩. নামাযের শুরুতে হাত উঠাবার গুরুত্ব

হাত হচ্ছে শক্তির প্রতীক। দুই হাত উপরে উঠিয়ে নামাযের শুরুতে মুসলমানরা দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। যথা-

ক) হাত তোলার মাধ্যমে সে আল্লাহর প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

খ) হাত উপরে উঠিয়ে অত:পর নিয়ত বাঁধার পর সে সমগ্র দুনিয়াকে পশ্চাতে ফেলে আল্লাহমুখী হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়। এভাবে আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

উত্তর : ৪. প্রত্যেক রাকাতে যে সুরা পড়তে হয়

প্রত্যেক রাকাতে কমপক্ষে কুরআনের প্রথম সূরা 'ফাতিহা' তেলাওয়াত করতে হয়। এ সূরার অর্থ হচ্ছে-

দয়াময় অনন্ত দাতা আল্লাহর নামে।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য,
যিনি জগৎ সমূহের মালিক,
যিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল, শেষ বিচার দিনের মালিক
আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।
আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন।
যে পথ আপনার প্রিয়জনের পথ।
সে পথে নয়, যে পথ আপনার অভিশাপগ্রস্ত।

উত্তর : ৫. আল্লাহ কি নামাযীর দোয়া শুনতে পান

সূত্রে একটি হাদিসের উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় আল্লাহ নামাযীর দোয়া শুনেন। বিশেষভাবে যখন 'সুরা ফাতিহা' পড়া হয় তখন আল্লাহ জবাব দেন। নামায মুমিনের জন্য আল্লাহর দর্শন বা মিরাজ।

উত্তর : ৬. নামাযে পঠিতব্য অন্য সুরা বা আয়াত প্রসঙ্গে

অত্যাবশ্যকীয় 'সুরা ফাতিহা' ছাড়াও নামাযে যা যা পড়া হয়-

ক) সানা, যা 'সূরা ফাতিহা' পড়ার আগে রাসূল (সা:) সাধারণত: পড়তেন।

খ) সূরা ফাতিহার পর কুরআনের কিছু অংশ যেমন একটি ক্ষুদ্র সূরা বা বড় সূরার কয়েকটি আয়াত পড়তে হয়। পঠিতব্য সূরা বা আয়াতসমূহের দৈর্ঘ্য নামাযীর জ্ঞান ও সময়ের উপর নির্ভর করে ছোট-বড় হতে পারে।

উত্তর : ৭. নামাযে বারবার উঠাবসা প্রসঙ্গে

নামাযে উঠাবসার বিশেষ গুরুত্ব রয়ে গেছে। মানুষ বস্তু ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে গড়া। মানুষের এই তিন উপাদানের অপূর্ব সম্মিলনের মাধ্যমে নামাযে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ ঘটে।

এভাবে নামাযে সে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে এবং তার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই নয় বরং দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতাও বটে। নামাযে পঠিত কুরআনের আয়াতসমূহের শিক্ষা অনুধাবনের জন্য নামাযীর মন উন্মুক্ত থাকে। এরই সাথে আল্লাহর নির্দেশনায় শরীরের উঠানামার সমন্বয় এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের সেজদা মানুষকে আল্লাহর সমীপে উপনীত করে।

সূত্র :

আন্‌নবী সঙ্কলিত হাদিসে কুদসীর ৮ নং হাদিস।

ই-৫ সালাত : পদ্ধতি ও গুরুত্ব (২)

প্রশ্ন ১. নামাযের বিভিন্ন আসনে কি কি দোয়া পড়তে হয়?

২. নামায কি আরবিতে পড়াই আবশ্যক?

৩. নামায শেষ করার কোনো বিশেষ পদ্ধতি আছে কি?

৪. নামাযের ওয়াক্তের কোনো গুরুত্ব আছে কি?

৫. যদি কেউ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সময়মত নামায না পড়তে পারে তবে তার কি করণীয়?

৬. কোন বিশেষ অবস্থায় কাউকে নামায থেকে বিরত থাকতে ইসলাম আদেশ করে কি?

৭. কেউ যদি পাঁচ বারের বেশি নামায পড়তে চায় তবে সে কি তা করতে পারবে?

উত্তর : ১. নামাযে পঠিত দোয়াসমূহ

দাঁড়ানো অবস্থায় 'সূরা ফাতিহা' এবং কুরআনের আর একটু তেলাওয়াত করে মুসলমানরা রুকুতে যায়। এ সময় কোমরের উপর থেকে শরীর সামনে ৯০ ডিগ্রি ঝুঁকিয়ে দু'হাত হাঁটুতে রেখে পড়তে হয়, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' (আমার সম্মানিত প্রভুর প্রশংসা) এটা অন্তত তিনবার পড়তে হয়। সেজদার সময় যখন মুসলমানরা আল্লাহর কাছে পূর্ণআনুগত্য প্রকাশ করে তখন পড়া হয় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' (আমার শ্রেষ্ঠ প্রভুর প্রশংসা), এটাও অন্তত তিনবার পড়া হয়। দুই সেজদার মাঝখানে সংক্ষিপ্ত বৈঠকে হয় 'আল্লাহু মাগফিরলী ওয়ারহামনি' (হে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন ও দয়া করুন)।

উত্তর : ২. নামায কি আরবিতে পড়া আবশ্যক

নামাযে ব্যবহৃত সুরা ও দোয়াসমূহ মনে রাখা বেশ সহজ, কারণ এগুলো বেশ ছোট ছোট আর প্রতিদিন অনেকবার পড়তে হয়। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে দেড় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সবখানে জাতি, ভাষা নির্বিশেষে সব যুগের মুসলমান একই ভাষায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায পড়ছে। কুরআন এবং নামাযের ভাষার এই ঐতিহ্য সারা বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে ঐক্য এনেছে। এ বিষয়ে সব বিশেষজ্ঞ একমত যে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে। আর কোনো ভাষায় এর পুরো সফল অনুবাদ করা যায় না। তাই নামায আরবিতেই পড়তে হবে।

উত্তর : ৩. নামায শেষ করার পদ্ধতি

নামাযের নির্ধারিত রাকাত শেষে বসতে হবে এবং 'তাশাহুদ' পড়তে হবে (অবশ্য প্রতি

দুই রাকাত পড়েই এই বৈঠক করতে হয়)। 'তাশাহুদ'-এর অর্থ 'আমার মৌখিক দৈহিক আর্থিক সব ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত। হে নবী আপনাকে সালাম। আপনার উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। আমাদের এবং আর সব আল্লাহর ইবাদতকারীদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

এই তাশাহুদ পড়বার পরে দরুদ পড়তে হয়। দরুদ হচ্ছে রাসূল (সা:)-এর জন্য প্রশংসা ও দোয়া। এর অর্থ, "হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মদ (সা:) এবং তাঁর অনুসারিদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। যেমন শান্তি আপনি ইবরাহীম (আ:) এবং তাঁর অনুসারিদের দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত এবং শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান। হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মদ (সা:) এবং তাঁর অনুসারিদের বরকত দান করুন যেমন বরকত আপনি ইবরাহীম (আ:) এবং তাঁর অনুসারিদের দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত এবং শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান'।

এরপর নামাযী প্রথমে ডানে পরে বামে মাথা ঘুরিয়ে প্রতিবারে বলবে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ (আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। এভাবে নামায শেষ হবে।

উত্তর : ৪. নামাযের ওয়াক্তের গুরুত্ব

নামাযের ওয়াক্তগুলো এমনভাবে করা হয়েছে যাতে বিশ্বাসীদের মনে সব সময় আল্লাহর স্মরণ থাকে। এটা তাকে আল্লাহর দেয়া খেলাফতের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবে সারাদিন আল্লাহর স্মরণে মন সচেতন থাকে। ফজর নামায পড়ে মানুষ আল্লাহর নাম নিয়ে দিন শুরু করে। যোহর এবং আসর এমন সময়ে পড়া হয় যখন মানুষ দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। এই ব্যস্ততার মাঝেও একটু বিরতিতে আল্লাহর স্মরণ তাকে মনে করিয়ে দেয় সে কার বান্দা, কি তার দায়িত্ব। মাগরিবের সময় সাধারণত তার দিনের কাজ শেষ হয়। সে পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হয়। এ সময় সে আর একটি দিন অতিবাহিত হবার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে পারে। এশার নামাযে আল্লাহকে স্মরণ করে সেই স্মরণ মনে রেখেই সে ঘুমাতে যায়।

উত্তর : ৫. ফরয নামায বাদ পড়লে (কাযা হলে)

সকল ফরয নামায যথাসময়ে বা অন্তত ওয়াক্ত থাকতেই আদায় করতে হবে। এটাই আইন। অবহেলার বা নিষ্ক্রিয়ভাবে নামায আদায় দেরি করা ঠিক না। কারণ এতে একজনের আল্লাহর কাজে উৎসাহের অভাবই প্রকাশ পায়। তারপরও অত্যন্ত জরুরী যৌক্তিক কারণে নামায বাদ পড়লে তা পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাযা পড়তে হবে। এ ধরনের সঙ্গত কারণ; যথা- অতি ক্লান্ত ব্যক্তি যিনি নামাযের সময় ঘুম থেকে উঠতে ব্যর্থ হলেন, সার্জন যার জরুরী অপারেশন চলাকালে নামাযের ওয়াক্ত চলে গেল ইত্যাদি।

উত্তর : ৬. যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে নামায থেকে বিরত রাখে বা অব্যাহতি দেয়

বালেগ হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে

হবে। শিশু ও মানসিক প্রতিবন্ধীরা এই আইনের আওতামুক্ত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মানুষকে নামায থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

ক) মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব এবং সন্তান জন্মের পর নেফাস (Lochia) অবস্থায় এ সময় তাদের নামায পড়া বারণ। অন্যান্য দোয়া তারা করতে পারবে।

খ) অসুস্থ মানুষ যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারে তবে সে বসে বা শুয়ে নামায পড়তে পারবে।

গ) ভ্রমণকারী ব্যক্তিরা চার রাকাত নামাযের বদলে দুই রাকাত করে নামায পড়তে পারবে। এক্ষেত্রে তারা যোহর নামাযের সাথে আসর নামাযকে এবং মাগরিব নামাযের সাথে এশার নামাযকে যুক্ত করে একসাথে পড়তে পারবে।

ঘ) বিপদজনক পরিস্থিতিতেও (যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে) নামায পড়তে হবে তবে সেখানে তার ধরণ পরিবর্তিত হতে পারে।

উত্তর : ৭. অতিরিক্ত নামায

তিন ধরনের নামায আছে। যথা- ফরয যা অবশ্যই পড়তে হবে। সুন্নাত যা পড়তে গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন ফযরের নামাযের আগে দুই রাকাত ইত্যাদি। এছাড়া নফল নামায মানুষ যে কোনো সময় পড়তে পারে। মুসলমানরা যত বেশি সম্ভব নফল নামায আদায় করবে। সূর্যোদয়ের সময় এবং ঠিক দুপুরের সময় যখন সূর্য মাথার উপর থাকে এবং সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া নিষেধ।

ই-৬ জুম্মা ও জামায়াতে নামায

প্রশ্ন ১. এমন কোনো নামায আছে কি যা জামায়াতেই পড়তে হবে।

২. জামায়াতে নামায পড়ার নিয়ম কি?

৩. মেয়েরা কি নামাযের জামায়াতে আসতে পারবে?

৪. নামাযের জামায়াতে মেয়েরা কোথায় দাঁড়াবে?

৫. নামাযের আধ্যাত্মিক প্রভাব কি?

৬. নামাযে মানুষের নৈতিক উন্নতি ঘটায় কিভাবে?

৭. সমাজ জীবনের উপর নামাযের প্রভাব কি?

উত্তর : ১. যে সব নামায অবশ্যই জামায়াতের সাথে পড়তে হবে

নিম্নলিখিত নামাযগুলো অবশই জামায়াতে পড়তে হবে।

ক) জুম্মার নামায প্রতি শুক্রবার দুপুরে পড়া হয়।
এখানে ইসলাম ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োগের উপর খোৎবা দেয়া হয়।

খ) মৃতের জানাযা নামায।

গ) দুই ঈদের নামায।

এছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে পড়তে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে ২৭ গুণ সওয়াব পাওয়া যাবে। জামায়াতে নামায যদিও মসজিদে পড়া হয় তবে প্রয়োজনে এক বাড়ির কয়েকজন বা প্রতিবেশী কয়েক বাড়ির সবাই একঘরে জামায়াতের সাথে নামায পড়তে পারে।

উত্তর : ২. জামায়াতে নামাযের পদ্ধতি

জামায়াতে নামাযের পদ্ধতি এককভাবে নামাযের মতোই। এখানে নামাজিদের পায়ে-পা কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়াতে হয়। নামাজিদের সামনে তাদের ইমাম (যিনি কোনো যাজক নন, যে কেউ ইমাম হতে পারে) দাঁড়িয়ে নামাযে নেতৃত্ব দেন। তিনি আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করলে জনগণ নিয়ত বাঁধে। তারপর প্রতি অবস্থানে পরিবর্তনের সময় তিনি আল্লাহু আকবার বলেন। সবশেষে তিনি ডানে বামে সালাম দিয়ে নামায শেষ করেন। জামায়াতে নামাযে ইমামের আনুগত্য করতে হয় ফলে কেউ নামাযের কোনো কাজ ইমামের আগে করতে পারে না বরং তাকে অনুসরণ করে।

উত্তর : ৩. মেয়েদের জামায়াতে নামাযের সুযোগ

মেয়েরা নামাযের জামায়াতে যোগ দিতে পারে। ঘরে, পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে বা মসজিদে ময়দানে সবখানেই মেয়েরা জামায়াতে যেতে পারে। রাসূল (সা:) এক হাদিসে

মেয়েদের জামায়াতে নামায থেকে বঞ্চিত রাখতে মুসলমানদের নিষেধ করেছেন। তাঁর সময়ে এবং তাঁর প্রিয় খলিফার সময় মেয়েরা মসজিদে নামাযে যেত। তবে জুম্মা, জানাজা ও ঈদের নামায মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তারা ইচ্ছে করলেই যেতে পারে, না গেলেও কোনো অসুবিধে নেই। এটা মেয়েদের জন্যে আল্লাহর ছাড়।

উত্তর : ৪. নামাযের জামায়াতে মেয়েদের অবস্থান

নামায একটি বিস্তৃত এবাদাত। এতে উঠাবসা, উপুড় হয়ে সেজদা দেয়াসহ অনেক শারীরিক কাজ আছে। এজন্যে নামাযের জামায়াতে মেয়েদের পুরুষের পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে হয়। মেয়েরা পুরুষের সামনে বা এ কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ালে নারী-পুরুষ উভয়ের নামাযের মনোযোগ ক্ষুণ্ন হত।

উত্তর : ৫. নামাযের আধ্যাত্মিক প্রভাব

মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে নামাযের পাঁচটি গুরত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

প্রথমত, সব মানুষেরই তার চাইতে শক্তিশালী সত্তার বন্দনা করার সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। তাই দেখা যায় যেসব মানুষ দ্বীনের শিক্ষা পায় না তারা প্রকৃত, আগুন, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাধু ব্যক্তি এদের পূজা করে। এসব কিছুই মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। নামায এমন এক এবাদাত যা সর্বোচ্চ স্রষ্টার সাথে মানুষের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে তার সহজাত আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ করে।

দ্বিতীয়ত, নামায আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসার বাস্তব প্রয়োগ। দিনে পাঁচবার নামাযে দাঁড়ানো এবং এই অনুভূতি লাভ যে আল্লাহ বান্দার কথা শুনছে- তা বান্দার মনে এক অনির্বচনীয় সুন্দর প্রভাব ফেলে।

তৃতীয়ত, যখন মানুষ নামাযে দাঁড়ায় তখন সে পৃথিবীর উপর দাঁড়ায়। এই পৃথিবীর মাটি থেকেই সে সৃষ্ট। মৃত্যুর পর এর মাঝেই সে মিশে যাবে। আবার হাশরের ময়দানে এই মাটির উপরই দাঁড়াবে। এই মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সে তার প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য প্রকাশ করে।

চতুর্থত, নামায মানুষকে বারবার তার উপর আল্লাহর অগণিত রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই আল্লাহর প্রশংসা তার অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি এনে দেয়।

সবশেষে যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে তাদের অন্তরে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির অনুভূতি আসে। আল্লাহ-প্রাপ্তির অনুভব তাদের অসীম সাহস যোগায়।

উত্তর ৬. মানুষের নৈতিক উন্নয়নের কাজ

আন্তরিকভাবে যে নামায পড়ে সে লক্ষ্য করবে যে, নামায তার জীবনকে পরিশুদ্ধ করছে। দিনে পাঁচবার সে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করে। এভাবে তার মধ্যে আল্লাহর আদেশের পরিপন্থি কোনো অনৈতিক কাজ সম্পর্কে ভীতির জন্ম নেবে। হাদিসে আছে যে, যার

নামায তাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না, সে নামায থেকে কিছুই পায় না। মানুষ কোনো ভুল বা অন্যায় করে ফেললে নামায তাকে তার দায়মুক্ত হতে সাহায্য করে। হাদিসে আছে, নামাযের জন্য অজু করার সময় অজুর পানি পাপ ধুয়ে নেয়। ইসলামে ধর্মীয় জীবন ও নৈতিক জীবন পৃথক নয় বরং নৈতিক জীবন ধর্মীয় জীবনেরই অংশ। এভাবে নামায ব্যক্তি জীবনে নৈতিক উন্নতি ঘটায়।

উত্তর : ৭. সমাজ জীবনে নামাযের প্রভাব

নামায সমাজ জীবনকে পরিশুদ্ধ করে চার ভাবে-

ক) জামায়াতে নামায ভ্রাতৃত্বের ও ঐক্যের অনুপম বহি:প্রকাশ। মসজিদে সমাজের কারো জন্য সংরক্ষিত আসন নেই। সবাই এক কাতারে দাঁড়ায়। ছোট বড় সবার মাঝে নামায এভাবে সাম্য আনে।

খ) সমাজের মানুষের নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ ও মিলন হয় জামায়াতে। এভাবে সমাজে সংহতি পারস্পরিক ভালোবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

গ) ইমামকে অনুসরণের শৃঙ্খলা থেকে মানুষের মাঝে আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ জন্মায়।

ঘ) জামায়াতে নামায ইসলামী সরকার ব্যবস্থার সদৃশ, কারণ-

১. নামাযের ইমাম দেশের শাসক বা যে কেউ হতে পারেন। যাকে সমাজ মনোনীত করবে এবং যার ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকবে না।

২. ইমামরা যাজকদের মতো আল্লাহ ও মানুষের মাঝের কেউ নন নামাযের পরিচালক মাত্র। তেমনি শাসকরাও দেশের পরিচালক মাত্র। মানুষের উপর তাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রভুত্ব নেই।

৩. ইমাম ভুল করলে মুসল্লীরা আল্লাহু আকবার বলে ভুল ধরিয়ে দেন। তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক ভুল করলে তার ভুল ধরিয়ে দেয়া জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব।

৪. ইমাম যদি ভুল করেই যেতে থাকে বা ভুল সংশোধনে অস্বীকৃতি জানায় তবে মুসল্লীরা তাকে অপসারণ করতে পারে। তেমনি রাষ্ট্রের শাসকও যদি ভুল সংশোধন করতে না চায় তবে জনগণ তাকে পদচ্যুত করতে পারে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ২০:১৪, ২:১৫৩, ১৩:২৮

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ২৯:৪৫

হাদিসে কুদসীতে আছে যে রাসূল (সা:) বলেন, আল্লাহ শুধু তাদের দোয়া কবুল করেন যারা তাঁর মর্যাদার কাছে মাথা নত করে, যারা তাদের লোভকে সংবরণ করে, আল্লাহ নিষিদ্ধ বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখে, ক্ষুধার্তকে খাওয়ায় এবং বস্ত্রহীনকে কাপড় দেয়।

ই-৭ তৃতীয় স্তম্ভ : যাকাত

প্রশ্ন ১. যাকাতের অর্থ কি? ইংরেজি বা অন্য ভাষায় এর সমতুল্য কোনো শব্দ আছে কি?
২. ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে যাকাতের গুরুত্ব কি?
৩. যাকাত কিভাবে পরিশুদ্ধি আনে?
৪. সম্পত্তির মালিকানা প্রশ্নে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি?
৫. কাদের উপর যাকাত ফরজ?
৬. বাড়ির সব সম্পদের উপরই কি যাকাত আদায় করতে হবে?
৭. যাকাতের পরিমাপ কিভাবে করা হবে?
৮. যাকাত আদায়ের কোনো নির্দিষ্ট সময় আছে কি?
৯. যাকাতের টাকার দাবীদার কে?

উত্তর : ১. যাকাতের অর্থ

যাকাত শব্দের মূল অর্থ পরিশুদ্ধি বা বিশুদ্ধতা। এছাড়াও এর অর্থ বৃদ্ধি বা উন্নতি এভাবে বলা যায় যে, যাকাত দেয়ার মাধ্যমে মানুষের পরিশুদ্ধতার বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে। আইনের ভাষায় আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্য লোককে দেয়ার নাম যাকাত। ইংরেজি শব্দ Tithe-এর সাথে যাকাতের তুলনা হয় না। কারণ Tithe-এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ গীর্জায় জমা হয় আর যাকাতের অর্থ সম্পূর্ণভাবে দরিদ্র মানুষের ভাগে যায়। ট্যাক্স শব্দও যাকাতের প্রতিশব্দ হতে পারে না। কারণ রাষ্ট্র এটা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। আর জনগণ সব সময় এটা ফাঁকি দিতে চায়। অথচ যাকাত দেবার ব্যাপারে মুসলমানরা সচেতন থাকে। দান-দক্ষিণা এই শব্দগুলো যাকাতের কাছাকাছি। কিন্তু যাকাত মানে দান নয় বরং এটা ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার। বস্তুত যাকাত শব্দটির অনুবাদ না করে এটিকে ধর্মীয় শব্দ হিসেবেই সংরক্ষণ করা উচিত।

উত্তর : ২. ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে যাকাতের গুরুত্ব

কুরআনে ৮০ টিরও বেশি আয়াতে নামাযের সাথে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় ইসলামে এর গুরুত্ব কত বেশী। কুরআনে বারবার যাকাত দাতাদের উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যারা যাকাত দেয় না তাদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।

উত্তর : ৩. যাকাত যেভাবে পরিশুদ্ধি আনে

যাকাত শুধু গরীবদের পাওনাই মিটায় না এটা পরিশুদ্ধিও আনে। যেমন-

ক) ধনীরা তাদের সম্পদের থেকে গরীবদের অংশ দিয়ে পুরো সম্পদকে বিশুদ্ধ করে।

খ) যারা যাকাত দেয় তাদের অন্তর স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সমাজ-সচেতনতা ও দুনিয়া প্রীতি থেকে পরিশুদ্ধ হয়।

গ) যাকাত গ্রহীতার অন্তর ধনীদের প্রতিহিংসা ও ঘৃণা থেকে মুক্ত হয়।

ঘ) সমাজ বহুলাংশে পরিশুদ্ধ হয়। কারণ যাকাতের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্রতা, সামাজিক অবিচার, শ্রেণী-বৈষম্য ইত্যাদি দূর হয়। যদি ধনীরা আরো ধনী আর গরীবরা আরো গরীব হতে থাকে তবে সমাজে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। এমন সমাজে বিশৃঙ্খলা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা মাথাচারা দিয়ে ওঠে।

উত্তর : ৪. সম্পত্তির মালিকানা প্রশ্নে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে এটা স্পষ্ট যে জগতের সব কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনি বিশ্বজাহানের প্রভু। তাই কেউই তাঁর সম্পদের মালিক নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষক বা আমানতদার মাত্র। আল্লাহ তাঁর অপার দয়ায় মানুষকে সম্পদ দেন। কিন্তু এই সম্পদ হচ্ছে এক পরীক্ষা। মানুষকে যোগ্যতা ও পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ সম্পদ দেবেন। আবার মানুষ সেই সম্পদ থেকে আল্লাহর আদেশে দরিদ্রদের প্রাপ্য অংশ দেবে। যারা এটা করবে তারা পুরস্কৃত হবে। আর যারা সম্পদের মোহে আল্লাহর আদেশ ভুলে যাবে তারা আল্লাহর আমানতের খেয়ামত করবে।

উত্তর : ৫. কাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরজ

পরিবারের সারা বছরের ভরণপোষণ নির্বাহের পর যার কাছে নিসাব পরিমাণ অর্থ থাকে তার উপর যাকাত ফরজ। এই নিসাব হচ্ছে তোলা স্বর্ণ বা তোলা রূপা বা সমপরিমাণ টাকা। নিসাব পরিমাণ অর্থ হতে এক বছর বা তার বেশি সময় থাকতে হবে।

উত্তর : ৬. সব সম্পদের উপরই কি যাকাত ফরজ

জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের বস্তুসমূহ যথা পোশাক, খাদ্য, আসবাব, বাড়ি-ঘর ইত্যাদির উপর যাকাত নেই। ভূমিতে উৎপন্ন শস্য, গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির উপর যাকাত ফরজ।

উত্তর : ৭. যাকাতের পরিমাণ

সম্পদের উপর যাকাতের পরিমাণ ২.৫% থেকে সম্পদ ভেদে ২০% পর্যন্ত হতে পারে। সঞ্চিত অর্থ, অলঙ্কারের স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির উপর যাকাত ২.৫%। যে জমিতে বিনা সেচে বা হস্তচালিত সেচে চাষাবাদ হয় তার ফসলের যাকাত ১০%। আর যে জমিতে যান্ত্রিকভাবে সেচ দিয়ে চাষ করতে হয় তার ফসলের যাকাত ৫%। গুপ্তধন এবং খনির সম্পদের যাকাত ২০%।

উত্তর : ৮. যাকাত প্রদানের সময়

যাকাত প্রতি বছর দিতে হবে। তবে গুপ্তধন ও খনির সম্পদের যাকাত সাথে সাথে দিতে হবে। জমির শস্যের ক্ষেত্রে ফসল কাটার পর যাকাত দিতে হবে। রমজান মাসে যাকাত দেয়া উত্তম। কারণ এটা রহমতের মাস। এ মাসে সব এবাদতের সওয়াব বেশি। যাকাত কিস্তিতে দেয়া যাবে।

উত্তর : ৯. যাকাত প্রাপ্য কারা

নবম সূরার ৬০ নং আয়াতে যাকাত প্রদেয় আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে। তারা হচ্ছে- দরিদ্র, গরীব যারা চাইতে লজ্জা পায়, যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মচারী, নওমুসলিম, মুক্তিমূল্য সংগ্রহকারী ক্রীতদাস, যুদ্ধবন্দি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। এছাড়া আল্লাহর পথে জেহাদেও যাকাত ব্যয় করা যাবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৯:১০৩

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ২৪:৫৬, ৯:৩৪, ২:২৬২, ৫১:১৫-১৯

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৫৭:৭, ২:২৬২, ২:১৮৮, ২:২৪৫

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৯:৬০

ই- ৮ চতুর্থ স্তম্ভ : সিয়াম

প্রশ্ন ১. রমযান মাস এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন?

২. রমযান মাসে মুসলমানরা কি কি কাজ করতে পারে এবং কি কি কাজ করতে পারে না?

৩. রমযান মাস বিভিন্ন বছর বিভিন্ন সময়ে আসে কেন?

৪. স্ক্যান্ডিনেভিয়া বা মেরু অঞ্চলে বছরে মাসের পর মাস দিন বা রাত থাকে সেখানে লোকজন কোনো সময়সূচি অনুসারে রোযা রাখবে?

৫. রোযা কি শিশু এবং বৃদ্ধদেরও রাখতে হয়?

৬. কোন কোনো অবস্থায় রোযা মাফ করা হয়েছে?

৭. অনেক অমুসলিম মুসলমানদের সারাদিন না খেয়ে থাকা দেখে ভীত হয়। তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন?

৮. রোযার মাসে কি মুসলিম দেশে কাজ-কর্ম ব্যবসা বাণিজ্যে ভাটা পড়ে?

৯. মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে রোযার গুরুত্ব কি?

১০. রোযার মাস শেষে কি হয়?

উত্তর : ১. রমযানের গুরুত্ব

ক) ঐতিহাসিক গুরুত্ব রমযান মাস ইসলামী ক্যালেন্ডারের নবম মাস। এ মাসেই রাসূল (সা:)-এর উপর হেরা গুহায় প্রথম কুরআন নাজিল হয়েছিল। এর গুরুত্ব শুধু মুসলমানদের জন্যই না। বরং গোটা ইতিহাসে সব নবীর উম্মতের উপরই এ মাসে রোযা ফরজ ছিল। কারণ এ মাসেই আল্লাহ মানবজাতির সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ জীবন বিধান কুরআন প্রণয়ন করেন, যা অনেক নবীর মিশন শেষে মুহাম্মদ (সা:)-এর মাধ্যমে মানব জাতিকে দেয়া হয়। কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্য সূচনাকারী আল ফুরক্বান।

খ) আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুরুত্ব ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহ সব মানুষের অতি নিকটের, বিশেষভাবে যারা আল্লাহর আদেশ পালন করে এবং তার আলোকেই জীবনকে পুনর্বিন্যস্ত করে। রমযানে আল্লাহর হুকুমে রোযা পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ পালন করে তাঁর নৈকট্য হাসিল করা যায়। তাই বিশ্বাসীদের জন্য এ মাস অত্যন্ত প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর আদেশে দৈহিক ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জন করে।

উত্তর : ২. রমযানে মুসলমানদের করণীয় ও বর্জনীয়

রমযান মাসে মুসলমানরা ফজরের ওয়াক্তের শুরু থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্বামী-স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাকে, পুরো মাস এ নিয়মে চলতে হয়। এ মাসে সূর্যাস্তের পর থেকে পরদিন ফজরের আগ পর্যন্ত সময়ে পানাহার ও স্বামী-স্ত্রী মিলনে নিষেধ নেই। অবশ্য এ সময় ভুরিভোজ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এই রোযার মাসে রোযা রাখার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ আসে।

উত্তর : ৩. বিভিন্ন বছর বিভিন্ন সময়ে রোযা হয় কেন

রমযান ইসলামী ক্যালেন্ডারের একটি মাস যা চন্দ্র বছর। চন্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে ৯ থেকে ১০ দিন কম হয়। এজন্যে প্রতি বছর রমযান মাস পূর্বের বছরের চেয়ে ১০-১১ দিন আগে আসে। এতে সুবিধা এই যে মুসলমানরা সব ঋতুতেই রোযার অভিজ্ঞতা লাভ করে।

উত্তর : ৪. মেরু দেশের মুসলমানরা কিভাবে রোযা রাখবে

ইসলামী আইন সব দেশের সব যুগের জন্য সহজবোধ্য করে তৈরি করা হয়েছে। মুসলিম আইনবিদরা বলেন, যেসব দেশে মাসের পর মাস সূর্য দেখা যায় না বা মাসের পর মাস রাত থাকে সেখানকার মুসলমানরা নিচের যে কোনো একটি ব্যবস্থা নেবে-

ক) সেই দেশের নিকটবর্তী যে দেশে দিনরাত যথা নিয়মে হয় সেখানকার সময় অনুসারে তারা রোযা রাখবে।

খ) মক্কার সেহেরী ইফতারের মতো রোযা রাখবে।

উত্তর : ৫. শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে রোযার বিধান

বয়:প্রাপ্ত বালেগ সকল মুসলমানের জন্য রোযা ফরজ। এটা বাঞ্ছনীয় যে শিশুদের মাঝে ছোটবেলা থেকেই রোযার অভ্যাস গড়ে তোলা। এতে তাদের মাঝে রোযার জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ ও শৃঙ্খলাবোধ জন্মাবে। তবে তাদের এ কাজে চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। সাধারণ: মুসলমান শিশুরা বড়দের সাথে উঠে সেহেরী খেতে ও রোযা রাখতে খুব উৎসাহ বোধ করে। এজন্য অনেক মা-বাবা শিশুদের সেহেরী খাওয়ায় এবং সংক্ষিপ্ত রোযা শেষে দুপুরেই ইফতার (!) করিয়ে দেয়। এটা এক্ষেত্রে ভালো যে এভাবে ধীরে ধীরে বাচ্চাদের মধ্যে রোযার অভ্যাস জন্মে।

উত্তর : ৬. যাদের জন্য রোযা মাফ

কয়েকটি ক্ষেত্রে রোযা থেকে সাময়িক বা পূর্ণ অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যথা :

ক) যে সব অসুস্থ মানুষ রোযা রাখলে রোগ বাড়বে তাদের সাময়িকভাবে রোযা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পরে তাদের কাযা রোযা করতে হবে।

খ) যেসব ক্রনিক রোগী বর্তমানে রোযা রাখতে পারছে না এবং ভবিষ্যতেও তাদের পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব হবে না, এমন রোগীদের রোযা থেকে স্থায়ী অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তারা এক্ষেত্রে একজন গরীব অভুক্ত রোজাদারকে পুরো রোযার মাস খেতে দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবে।

গ) মেয়েদের মাসিক ঋতুর সময় এবং সন্তান জন্মাবার পর নেফাস অবস্থায় রোযা থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া গর্ভবতী ও স্তনদানকারী মায়েদেরও একই ধরনের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

উত্তর : ৭. রোযার ব্যাপারে ভীতু যারা

রোযা নিয়ে অমুসলিম পশ্চিমা সমাজে অহেতুক কিছু ভীতি আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে রোযা রাখে তার জন্য এটা কোনো কষ্টকর কিছু নয়। প্রথম দু'চারটি রোযা একটু একটু কষ্ট হলেও এরপর শরীর এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে শেষের দিকে রোযায় আর অসুবিধা হয় না। বিশেষত যদি ছোটবেলায় অভ্যাস করা হয়।

উত্তর : ৮. রমযানে মুসলিম দেশে কি জীবনযাত্রার স্থবির হয়ে পড়ে

এ বিষয়েও পাশ্চাত্যে ভুল ধারণা আছে। এটা অনেকে মনে করে যে রোযার মাসে মুসলিম দেশে কাজ-কর্ম ব্যবসা বাণিজ্য সব স্থবির হয়ে যায়। এ ধারণা মোটেই ঠিক না। রোযার কারণে ক্লান্তি থেকে মানুষের কাজের গতি একটু হ্রাস পেতে পারে কিন্তু তা বড় কোনো ব্যত্যয় ঘটায় না। অধিকাংশ দেশে রোযায় অফিস সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়। সুবিধাজনক সময়সূচিতে রোযাদাররা স্বাভাবিকভাবেই কাজ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিংও আগের গতিতেই চলে। সঙ্গত কারণেই দিনের বেলা রেস্টুরেন্ট ব্যবসা কম হয়। কিন্তু অন্যদিকে ইফতার ও সেহেরীর সময় তারা ব্যবসা করে পুষিয়ে নিতে পারে।

উত্তর : ৯. ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে রোযার গুরুত্ব

আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের এক অনুপম উদাহরণ রোযা। মানুষের জীবনকে আল্লাহর আদেশে পরিচালিত করা উত্তম পন্থা। মানুষ তার মধ্যে সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। যা তাকে অনৈতিক সকল লোভকে জয় করার সাহস ও শক্তি দেয়। রোযার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ কাছ থেকে নিজের ভুল ও পাপসমূহ ক্ষমা করিয়ে নেয়ার সুযোগ পায়। এটা অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এক জিহাদ। রাসূল (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখেও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকল না, তার না খেয়ে থাকার প্রতিদান দেবার কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নাই।

উত্তর : ১০. রোযার পর

রোজা শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়। এটা একটি সামাজিক ইবাদত। রোযায় ক্ষুধার অভিজ্ঞতা লাভ করে মুসলমানরা গরীব ও দরিদ্র মানুষের কষ্ট বুঝতে পারে। তারা আরো

দানশীল হয়। রমজান মাসেই সাধারণত মানুষ যাকাত বিতরণ করে। রমজান শেষে মানুষ খুব সকালে ওঠে। উত্তম পোশাক পরে আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে ঈদের জামায়াতে যায়। ঈদের জামায়াতে বিশেষ বক্তব্য (খুৎবা) রাখা হয়। নামাযের পর মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ, মোলাকাত করে। আত্মীয় বান্ধবের বাড়িতে যায়। নিজেদের মধ্যে উপহার ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ২:১৮৫-১৮৬

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ২:১৮৫-১৮৩

ই-৯ পঞ্চম স্তম্ভ : হজ্ব

প্রশ্ন ১. হজ্ব অর্থ কি?

২. অমুসলিমরা বলে যে হজ্ব মানে শুধু রাসূল (সা:)-এর রওজা মুবারক জিয়ারত-এটা কি সত্যি?

৩. হজ্ব মানে কি শুধু পবিত্র জায়গাগুলো দর্শন নাকি এর গভীর অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে?

৪. হজ্বের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং মুসলমানদের সাথে ইবরাহীম (আ:)-এর সম্পর্ক কি?

৫. ইব্রাহীম (আ:) কিভাবে আরবে এসে বসত গড়েন?

৬. ইসমাইল (আ:)-এর নির্বাসন ও বসতের ঘটনা বাইবেলে কিভাবে এসেছে?

উত্তর : ১. হজ্ব অর্থ

বছরে নির্দিষ্ট সময় মক্কা ও তার আশপাশের পবিত্র স্থানসমূহে গমন, নির্দিষ্ট ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের নাম হজ্ব। এটা এমন এক ইবাদত যাতে শরীর, মন ও আত্মা সব একসাথে অংশ নেয়। হজ্ব ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। প্রত্যেক সামার্থ্যবান মুসলিম নারী পুরুষের জন্য জীবনে একবার হজ্ব ফরজ। হজ্ব-এর সামর্থ্যের জন্য বড় ধনী হবার প্রয়োজন নেই। মক্কা পর্যন্ত ভ্রমণের এবং থাকা খাওয়ার পর্যাপ্ত অর্থ ও ঐ সময়ে পরিবারের ভরণপোষণ থাকলেই বুঝতে হবে হজ্বের সামর্থ্য আছে। জীবনে সুস্থ সবল থাকতে হজ্ব করতে রাসূল (সা:) উৎসাহিত করেছেন। কারণ এর আনুষ্ঠানিকতা রুগ্ন ও বৃদ্ধ অবস্থায় পালন কষ্টকর।

রাসূল (সা:) বলেছেন যে ব্যক্তি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে হজ্ব পালন করে তার পুরো জীবনের সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

উত্তর : ২. রাসূল (সা:)-এর রওজা মুবারক জিয়ারত ও হজ্ব

কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যাতে রাসূল (সা:)-এর রওজা জিয়ারতকে হজ্বের অংশ বলা হয়েছে। এমনকি রাসূল (সা:) নিজেও তাঁর কবর জিয়ারত হজ্বের অর্ন্তভুক্ত বলেননি। হজ্বের সব আনুষ্ঠানিকতাই মক্কা এবং তার আশে পাশে পালন করতে হয়। মদিনা মক্কা থেকে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে। কাজেই রাসূল (সা:)-এর মাজার জিয়ারতকে হজ্বের অংশ বলা ভুল। তবে যে কোনো মুসলমানই মক্কা বা আরবে গেলে রাসূল (সা:)-এর রওজা জিয়ারত করেন। কিন্তু হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা মক্কাতেই শেষ হয়। হজ্বের উদ্দেশ্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা।

উত্তর : ৩. হজ্বের উদ্দেশ্য ও গভীর অর্থ

হজ্ব শুধুমাত্র পবিত্র স্থানে গমন নয়। ভ্রমণের চাইতে অনেক গভীর এর তাৎপর্য। হজ্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এটা যে শুধু মুহাম্মদ (সা:)-এর সময় থেকে চালু তা নয়। এটা ইবরাহীম (আ:)-এর সময় থেকে চালু। এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও হজ্বের আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য আছে। যথা-

ক) এটা মুসলমানদের আল্লাহর প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত ও অনুগত হতে শিক্ষা দেয়।

খ) এটা মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মিশন স্মরণ করিয়ে দেয়।

গ) এটা মানুষকে তার মৃত্যু, পুনরুত্থান ও জবাবদিহিতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

ঘ) এটা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বকে জোরদার করে। হজ্বে সবার পরনে এক পোশাক থাকে। ফলে, গোত্র, বর্ণ, অর্থ-বিত্ত ইত্যাদির ভেদ দূর হয়ে যায়।

ঙ) এটা মুসলিম বিশ্বের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মতো। যেখানে নিজেদের মতামত ও ভালোবাসা বিনিময় করা যায়।

উত্তর : ৪. হজ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও ইবরাহীম (আ:)

কুরআনে ইবরাহীম (আ:)-কে পাঁচ জন প্রধান নবীর একজন বলা হয়েছে। তাঁর বংশধারায় নবুওয়ত দেবার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর ছেলে ইসহাক (আ:)-এর বংশে বনী ইসরাইলী নবীরা আসেন। ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ:) কাবাগৃহ তৈরী ও মক্কার আবাদ করেন। তাওহীদবাদ প্রতিষ্ঠায় ইবরাহীম (আ:)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এজন্য তাঁকে তাওহীদবাদীদের (মুসলিম) জাতির পিতা বলা হয়।

উত্তর : ৫. বাইবেল ও কুরআনে ইবরাহীম (আ:)-এর কাহিনী

বাইবেল ও কুরআনে বর্ণিত ইবরাহীম (আ:)-এর কাহিনীতে মিল আছে। জেনেসিস- ১২ তে উল্লেখিত আছে যে, আল্লাহ ইবরাহীম (আ:) কে তাঁর বংশে নবী দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি তাঁর দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাক (আ:)-এর জন্মের পূর্বে দেয়া হয়। জেনেসিস-এর ১৬ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে সারাহ (রা:) বন্ধ্যা হওয়ায় তাঁর দাসী হাজেরাকে (রা:) ইবরাহীম (আ:)-এর কাছে বিয়ে দেন। তাঁর গর্ভেই ইবরাহীম (আ:)-এর প্রথম পুত্র সন্তান ইসমাইল (আ:) জন্ম নেন। এ ঘটনার পর আল্লাহ কর্তৃক ইবরাহীম (আ:)-এর বংশে অনেককে নবী বানাবার প্রতিশ্রুতি আবার দেয়া হয়। এরও পর সারাহ (রা:) গর্ভবতী হন এবং ইসহাক (আ:)-এর জন্ম দেন। তাঁর বংশে সকল ইসরাইলী নবীরা আসেন। বাইবেল বলে যে ইসমাইল (আ:) আরবে (পারান বা ফারান) বসত গড়েন। তাঁর ১২ ছেলের বড় জনের নাম কেদার। বাইবেল যদিও কেদারের বংশে নবী মুহাম্মদ (সা:)-এর নাম বলেনি তবুও এটা স্পষ্ট করে বলেছে যে

ইসরাইলীদের ভ্রাতৃবংশে নবী আসবেন। ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ, ভুল বুঝাবুঝি ও পক্ষপাতিত্বের কারণে মানুষ ইসমাইল (আ:)-এর বংশধরদের খাটো বলে মনে করে। অবশ্যই আল্লাহ ইবরাহীম (আ:)-এর বংশের কোনো এক পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন না।

উত্তর : ৬. ইসমাইল (আ:) যেভাবে আরবে এলেন

ইসলাম মতে ইবরাহীম (আ:) যখন খুব ছোট তখন আল্লাহ ইবরাহীম (আ:) কে আদেশ করেন হাজেরা (রা:) কে পুত্রসহ আরবে (পারান) নির্বাসন দিতে যেখানে কোনো বসতি ছিল না। পুত্র যখন পানির অভাবে কান্নাকাটি করছিল তখন হাজেরা (রা:) সাফা হতে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত পানির জন্য ছুটাছুটি করেন। সেখানে পানি না পেয়ে বাচ্চার কাছে এসে দেখেন যে, ক্রন্দনরত বাচ্চার পায়ের গোড়ালীর আঘাতে মাটি ভেদ করে পানি আসছে। এই পানি ঝরণা ধারার মতো নিরন্তর নির্গত হচ্ছে যা জমজম কূপ হিসেবে আজও বিদ্যমান। জমজম কূপের মাধ্যমে পানি আসায় তার চারিদিকে দ্রুত জনবসতি গড়ে উঠে যার নাম মক্কা।

উত্তর : ৭. ইসমাইল (আ:) ও হাজেরা (রা:) সম্পর্কে বাইবেল

কুরআন ও বাইবেল দু'খানেই হাজেরা (রা:)-এর নির্বাসনের উল্লেখ আছে। তবে বর্ণনায় যেসব পার্থক্য আছে তা নিম্নরূপ-

নির্বাসনের কারণ : বাইবেল বলেছে যে, সারাহ (রা:) হিংসায় কাতর হয়ে ইবরাহীম (আ:) কে তাঁদের নির্বাসন দিতে বাধ্য করেন। কুরআন বলে এটা ছিল আল্লাহর আদেশ।

নির্বাসনের স্থান : বাইবেল বলে, নির্বাসনের স্থান ছিল বিরসেবা (Beer Sheba) যা প্যালেস্টাইনে অবস্থিত। কুরআন বলে যে, এটা ছিল আরব এবং মক্কা। কুরআনের বর্ণনার পক্ষে ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায়।

যে সময়ে নির্বাসন হয়েছিল : জেনেসিস বলে, ইসমাইল (আ:)-এর জন্মের পর নির্বাসন হয়েছিল। কিন্তু একখানে বলা হয়েছে তিনি তখন এত ছোট ছিলেন যে, মায়ের কাঁধে করে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, নির্বাসনের সময় ইসমাইল (আ:)-এর বয়স ছিল ১৫ বছর। বাইবেলের বর্ণনা এসব অসঙ্গতি Interpreter's Dictionary of Bible-এ স্বীকার হয়েছে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৩:৯৭, ২:১৯৬

প্রশ্ন ৬-৭. আল কুরআন ১৪:৩৭

Interpreter's Dictionary of Bible দেখুন

ই-১০ হজ্ব

প্রশ্ন ১. ইবরাহীম (আ:) যে তাঁর নির্বাসিত পরিবারকে দেখতে যেতেন তার প্রমাণ আছে কি?

২. ইসহাক (আ:)-কে নয় বরং ইসমাইল (আ:)-কে কুরবানী দেয়া হয় তার প্রমাণ কুরআনে আছে কি?

৩. দয়াময় আল্লাহ কেন ইবরাহীম (আ:) কে তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তানকে কুরবানী করার আদেশ দিলেন?

৪. কুরবানীর ব্যাপারে বাইবেলের চেয়ে কুরআনের বর্ণনা কেন গ্রহণযোগ্য? (যেখানে বলা হয়েছে যে ইসমাইলকে নয় বরং ইসহাককেই কুরবানী করার আদেশ দেয়া হয়েছিল)

উত্তর : ১. ইবরাহীম (আ:) যে তাঁর পরিবারকে দেখতে যেতেন তার প্রমাণ

কুরআনে দু'টি উদ্ধৃতি আছে যাতে বোঝা যায় ইবরাহীম (আ:) তাঁর নির্বাসিত পরিবারকে দেখতে অন্তত দু'বার মক্কা গিয়েছেন। প্রথম ঘটনায় (২:১২৭-১২৯) দেখা যায় ইবরাহীম (আ:) এবং ইসমাইল (আ:) একসাথে কাজ করে এক আল্লাহর প্রথম ইবাদাতগাহ 'কাবা ঘর' নির্মাণ করেন। তাঁরা দুইজন এই আল্লাহর ঘরের জন্য দোয়া করেন। সেই শহরের জন্য দোয়া করেন। তাঁদের দোয়ার ফলশ্রুতিতেই ঐ শহর থেকে শেষ নবী (সা:)-এর আবির্ভাব। দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে ইসমাইল (আ:) কে কুরবানীর ঘটনা (৩৭:৯৯-১১৩)। যেখানে দেখা যায় ইবরাহীম (আ:) কে স্বপ্নে আল্লাহ তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ:) কে কুরবানী দিতে আদেশ করলেন। ইবরাহীম (আ:) তাঁর পুত্রকে স্বপ্নাদেশের কথা বললে তিনি আল্লাহর ইচ্ছা পূরণে সানন্দে রাজী হয়ে যান। ইবরাহীম (আ:) পুত্রকে নিয়ে কুরবানী করতে মিনা নামক স্থানে যান। পথে শয়তান তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ইবরাহীম (আ:) ইসমাইল (আ:) কে কুরবানী করতে উদ্যত হন। সেই সময় আল্লাহর ফেরেশতা একটি দুম্বা নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তাঁর ত্যাগের ইচ্ছা কবুল করেছেন। পুত্রের বদলে দুম্বা কুরবানী দিতে আল্লাহ আদেশ করেছেন। ইবরাহীম (আ:) তখন আল্লাহর আদেশ পালন করেন। এ ঘটনার স্মরণে এখনো হাজীরা মিনায় পশু কুরবানী দেন।

উত্তর : ২. ইসমাইল (আ:)-এর কুরবানী হবার প্রমাণ

কুরআন থেকে এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসহাক নয় বরং ইসমাইল (আ:) কেই কুরবানী দিতে নেয়া হয়েছিল। কুরআনে বলা হয়েছে (৩৮:১১৩) যে কুরবানীর সময় ইসমাইল (আ:) ছিলেন ইবরাহীম (আ:)-এর একমাত্র পুত্র। কুরআনে কুরবানীর ঘটনার বর্ণনার পর কুরআন ইবরাহীম (আ:)-এর একটি পুত্র লাভের সংবাদ দেয়। কাজেই নি:সন্দেহে ইসমাইল (আ:)-এর কুরবানীর ঘটনার পর ইসহাক (আ:)-এর জন্ম।

উত্তর : ৩. দয়াময় আল্লাহ কেন প্রিয় পুত্রকে কুরবানীর আদেশ দিলেন

আল্লাহর এই আদেশ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। যেমন

ক) এটা আল্লাহর আদেশকে মানুষের আবেগ, যুক্তি ও মানবীয় জ্ঞানের উর্ধ্বে কিভাবে স্থান দিতে হয় তাই মানুষকে শেখায়।

খ) কুরবানীর আদেশ ছিল ইবরাহীম (আ:)-এর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের গভীরতার পরীক্ষা।

গ) ইবরাহীম (আ:)কে গোটা জীবনে অসংখ্য কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তাঁর মধ্যে এটা ছিল আরো কঠিন পরীক্ষা। জীবন সায়াহ্নের এই পরীক্ষায় তিনি দুর্বলতার পরিচয় দিতে পারতেন। কিন্তু এখানেও তিনি ধৈর্যের সাথে আল্লাহর আদেশ পালনে অটল থাকেন।

ঘ) ফেরেশতা এসে কুরবানীর জন্য দুম্বা দেয়া থেকে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে কোনো সময়েই মানুষকে কুরবানী দেয়া যাবে না (অনেক ধর্মে নরবলী চালু আছে)। আল্লাহ রক্তপাতে আনন্দ পান না বরং মানুষের সততা, খোদাভীতি প্রশ্নাতিত আনুগত্যেই সন্তুষ্ট হন। এজন্যই হজ্বে ইবরাহীম (আ:)-এর স্মরণে হাজীরা কুরবানী করেন। এর গোশত গরীবদের মাঝে বন্টন করা উচিত।

ইবরাহীম (আ:)-এর চূড়ান্ত ত্যাগের স্পৃহা গোটা মানবজাতির জন্য আদর্শ। একজন পিতা তাঁর একমাত্র আদরের পুত্র সন্তানকে শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশে কুরবানী করতে এগিয়ে যাচ্ছে কি অপরূপ দৃশ্য। কাজেই মুসলমানরা দুনিয়ার কোনো কিছুকেই আল্লাহর চেয়ে যেন বেশি ভালো না বাসে। তারা সব সময় তাদের অর্থ, শক্তি, সময়, সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

উত্তর : ৪. ইসমাইল (আ:)-এর ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনাই সঠিক

ইবরাহীম (আ:)-এর পুত্র কুরবানীর ঘটনা বর্ণনায় বাইবেলে অনেক স্ববিরোধিতা ও ভুল আছে। বাইবেলের বহু জায়গায় ইসমাইল (আ:)-এর নাম ঢালাওভাবে মুছে তাঁর জায়গায় ইসহাক (আ:)-এর নাম লেখার রীতি দেখা যায়। জেনিসিসের এক জায়গায় লিখা হয়েছে ইসমাইল (আ:) ছিলেন ইবরাহীম (আ:)-এর প্রথম পুত্র। তাঁর জন্মের পর ১৪ বছর ইবরাহীম (আ:)-এর কোনো সন্তান হয়নি। এ সময়ের মধ্যে কুরবানীর ঘটনা হয়। অথচ এই জেনেসিসেই আরেক জায়গায় আছে ইসহাক (আ:) কে কুরবানী করা হয়। যদিও কুরবানীর সময় তাঁর জন্মই হয়নি। কোনো কোনো বাইবেল বিশেষজ্ঞ এই অভিযোগ খণ্ডনে এটা বলতে চান যে, ইসমাইল (আ:) ইবরাহীম (আ:)-এর বৈধ সন্তান ছিলেন না। কিন্তু জেনেসিসেই অকাট্যভাবে দেখা যায় যে, স্বয়ং সারাহ (রা:) ইবরাহীম (আ:)-এর কাছে হাজেরা (রা:) কে বিয়ে দেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ২:১২৭-১২৯, ৩৭:৯৯-১১৩

ই-১১ হজ্ব : আনুষ্ঠানিকতাসমূহ ও গুরুত্ব (১)

প্রশ্ন ১. প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে কয়েক মিলিয়ন মুসলমান মক্কায় হজ্ব করতে যায় এর কারণ কি?

২. হজ্ব কয় প্রকার এবং কোন কোন সময় হজ্ব করতে হয়?

৩. কোন স্থানে হজ্ব যাত্রীদের ইহরাম বাঁধতে হয়?

৪. ইহরাম বাঁধার নিয়ম কি?

৫. মেয়েরাও কি ইহরামে একই পোশাক পরে?

৬. ইহরামের কাপড়ের তাৎপর্য কি?

৭. নির্দিষ্ট কাপড় ছাড়া ইহরামে আর কি কি করতে হয়?

৮. ইহরাম বেঁধে কাবা যেতে কি বলতে হয়?

৯. কাবা শরীফের গুরুত্ব কি?

১০. কাবা শরীফে পৌছবার পর হজ্ব যাত্রীকে কি করতে হয়?

১১. কাবা তওয়াফের গুরুত্ব কি?

উত্তর : ১. লক্ষ লক্ষ মানুষের হজ্ব যাত্রার কারণ ও গুরুত্ব

প্রতি বছর কয়েক মিলিয়ন মানুষ হজ্ব করতে আরবে যায়। এই কাজের মাধ্যমে ইবরাহীম (আ:) কে দেয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, মানুষ দলে দলে পবিত্র স্থান মক্কায় ধাবিত হবে। সারা বিশ্ব থেকে মানুষের যাত্রা আল্লাহর আনুগত্যের বহি:প্রকাশ। সাথে সাথে এটা আল্লাহর পথে ইবরাহীম (আ:)-এর নিরন্তর ভ্রমণের প্রতি একাত্মতা ঘোষণাও বটে। মুসলমানরা এভাবে তাদের জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এই ভ্রমণ মানুষকে এটা স্মরণ করিয়ে দেয় যে জীবনটাও একটি ভ্রমণের মতো যার একটি লক্ষ্য আছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন ও জবাবদিহি।

উত্তর : ২. হজ্বের সময় ও প্রকারভেদ

হজ্ব দুই প্রকার যথা-

ক) উমরা হজ্ব- এটা বছরের যে কোনো সময় করা যায়। তবে এর মাধ্যমে ফরজ হজ্বের চাহিদা পূরণ হয় না।

খ) হজ্ব- এটা হচ্ছে প্রত্যেক সক্ষম মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ। এর আনুষ্ঠানিকতাগুলো জেলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ থেকে ১৩ তারিখের মাঝে করতে হয়। জিলহজ্ব মাস ইসলামী ক্যালেন্ডারের দ্বাদশ মাস।

উত্তর : ৩. ইহরাম

ইহরাম মানে আনুষ্ঠানিকভাবে হজ্বের প্রস্তুতি নেয়া। ইহরাম হজ্বের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ (ফরজ)। বাড়ি থেকে বের হয়েই ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। কাবা শরীফ থেকে কয়েকশ কিলোমিটার দূরে মিকাতের (ইহরাম বাঁধার সর্বশেষ সীমা) কাছে উপনীত হলেই ইহরাম বাঁধতে হয়। অধুনা বিমান যাত্রীরা অবশ্য বিমানে উঠবার সময় ইহরাম বেঁধে উঠেন।

উত্তর : ৪. ইহরাম বাঁধার নিয়ম

ইহরাম বাঁধার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে হজ্বের নিয়ত করা, যা অন্তর থেকেই আসতে হবে। শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ পালন করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যই হজ্ব করা হচ্ছে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে মনে করতে হবে। এছাড়াও ইহরাম বাঁধার পূর্বে যা করতে হবে তা হচ্ছে-

ক) গোসল করা।

খ) পুরুষরা তাদের অন্যসব কাপড় বর্জন করে দুই টুকরা সেলাইবিহীন কাপড়ে শরীর আবৃত করবে। একটি কাপড় কোমরে বাঁধবে। আর একটি বুকে জড়াবে। ডান-কাঁধ অনাবৃত রেখে বাম কাঁধ আবৃত করবে। জুতা বাদ দিয়ে স্যান্ডেল পরতে হবে। মাথা উন্মুক্ত রাখতে হবে।

উত্তর : ৫. মেয়েদের ইহরামের পোশাক

শালীনতার জন্য মেয়েদের ইহরামে পুরুষের মতো পোশাক পরতে হয় না। তারা যে কোনো শালীন পোশাক যাতে নারীর সৌন্দর্য বা সম্পদ চোখে পড়ে না তা পরতে পারবে। তবে তাদের হাত ও মুখ উন্মুখ রাখতে হবে। সাদা পোশাক পরাই উত্তম।

উত্তর : ৬. ইহরামের কাপড়ের তাৎপর্য

পোশাক মানুষের সম্পদ, অহঙ্কার, ক্ষমতা ও দম্ভের বহি:প্রকাশ ঘটায়। যিনি হজ্বের মতো আল্লাহর অতি পবিত্র, বিশুদ্ধ এবং সর্বোচ্চ ইবাদাতে যাচ্ছেন তাকে সমস্ত গর্ব অহঙ্কার পরিত্যাগ করতে হবে। সকল মুসলিম ভাইয়ের সাথে একই রকম পোশাক পরে সমতা কায়েম করতে হবে।

উত্তর : ৭. ইহরাম অবস্থায় পালনীয়

নির্দিষ্ট পোশাক পরা ছাড়াও ইহরাম অবস্থায় যা করতে হবে তা হচ্ছে-

ক) সকল ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

খ) কথা বা কাজে কোনো অশালীনতা করা যাবে না।

গ) কোনো পশু প্রাণী শিকার বা হত্যা করা যাবে না। আল্লাহ সৃষ্ট সকল প্রাণীর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে হবে (শুধুমাত্র কোনো প্রাণী বা পোকা কারো জীবন বিপন্ন করলে তা মারা যাবে)।

ঘ) গাছ থেকে কোনো ডালপালাও কাটা যাবে না।

ঙ) চুল, নখ, কাটা যাবে না।

চ) স্বামী-স্ত্রী দৈহিকভাবে মিলিত হতে পারবে না।
লক্ষ্য হচ্ছে সব পার্থিব আনন্দ ভুলে যেতে হবে।

উত্তর : ৮. ইহরাম বেঁধে কাবায় যেতে যেতে যা বলতে হয়

ইহরাম বাঁধার পর মক্কা যেতে যেতে হাজীরা উচ্চস্বরে বার বার বলবে-

'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক
লাব্বায়েক লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক
ইন্নাল হামদা ওয়া নিয়মাতা লাকা ওয়ালমুলক
লা শারীকা লাকা।'

অর্থ- 'হে প্রভু আমি আপনার জন্য উপস্থিত। আমি উপস্থিত আমি উপস্থিত। আপনার কোনো শরিক নেই। আমি উপস্থিত, সকল প্রশংসা নেয়ামত ও সার্বভৌমত্ব আপনার। আপনার কোনো শরিক নেই।'

উত্তর : ৯. কাবা শরীফ

কাবা একটি বর্গাকৃতি ঘর। যা কালো গিলাফে আচ্ছাদিত থাকে। গিলাফ কোনো আবশ্যক কিছু না। তবে আচ্ছাদিত রাখা উত্তম। কাবার একটি দরজা আছে। এর ভেতর কোনো ছবি, মূর্তি এমনকি কোনো লেখা কিছুই নেই। এই ঘরের সরলতা সত্ত্বেও মানুষ এর দর্শন পেয়ে মহান প্রশান্তি আবেগ ও উৎসাহ বোধ করে। কারণ এটাই এক আল্লাহর উপাসনার জন্য পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম ঘর। এখানে এসে হাজীরা মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আ:)-এর সাথে একাত্মতা বোধ করেন।

উত্তর : ১০. কাবা শরীফে পৌঁছার পরের আনুষ্ঠানিকতা

কাবায় পৌঁছবার পর হাজীরা কাবাকে বাঁ দিকে রেখে তাকে কমপক্ষে সাতবার বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করবে। এর নাম 'তাওয়াফ' প্রত্যেকে এক দিকেই ঘুরবে এবং এক জায়গা থেকে ঘোরা শুরু করবে। যে জায়গা থেকে ঘোরা শুরু করা হয় সেখানে একটি কালো পাথর আছে যার নাম 'হযরে আসওয়াদ'। হাজীরা কাবার চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে আল্লাহর করুণা, সমর্থন, প্রেরণা ও আখেরাতে মুক্তি চেয়ে দোয়া করে।

উত্তর : ১১. কাবার চারিদিকে প্রদক্ষিণের গুরুত্ব

হজ্বের সব আনুষ্ঠানিকতা আল্লাহর আদেশের এবং রাসূলের নির্দেশনা অনুসারে পালন করা হয়। অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী নওমুসলিম মুহাম্মদ আসাদ তাওয়াফ সম্পর্কে সুন্দর উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটম-এর নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেক্ট্রনগুলো যেভাবে ঘুরে, সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলো, গ্রহের চারিদিকে উপগ্রহ যেভাবে ঘুরে তেমনি আল্লাহর ঘরের চারিদিকে মুসলমানরা ঘুরে। মুসলমানদের জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে আল্লাহর উপাসনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

ই-১২ হজ্ব : আনুষ্ঠানিকতাসমূহ ও গুরুত্ব (২)

প্রশ্ন ১. কালো পাথর (হযরে আসওয়াদ) কি? এর গুরুত্ব কি?
২. কাবা তাওয়াফ করার পরে কি করতে হয়?
৩. সাফা মারওয়ায় ছুটোছুটি করতে হয় কেন?
৪. হজ্বে কি প্রাক-ইসলামী যুগের পৌত্তলিকদের পালন করা নিয়ম চর্চা করা হয়?
৫. আরাফাতের ময়দানের কাজ কি?
৬. আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করার পর আর কি কাজ থাকে?

উত্তর : ১. কাল পাথর (হযরে আসওয়াদ)

কালো পাথর (হযরে আসওয়াদ) হচ্ছে একটি ছোট পাথরের টুকরো যা কাবার এক কোণায় অবস্থিত। এর উৎস নিয়ে কয়েকটি ধারণা বিদ্যমান। কারো কারো মতে এটা তিন হাজার বছর আগে ইবরাহীম (আ:) কর্তৃক কাবা নির্মাণের সময় একজন ফেরেশতা এর ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে তাঁর কাছে বয়ে এনেছিলেন।

মূল ঘটনা যাই হোক না কেন কালো পাথর প্রথম নির্মিত কাবা গৃহেরই অন্যতম দেয়ালের একটি টুকরো। প্রকাশ থাকে যে, কাবা গৃহ বেশ কয়েকবার পুননির্মিত হয়েছে। কালো পাথরকে কোনোভাবেই মূর্তি বা প্রতিমার সাথে তুলনা করা যায় না। হজ্ব বা উমরার সময় মুসলমানরা ভক্তি ভরে এ পাথরে চুমো খায় এটা উপাসনা বা পূজা নয়।

এই পাথরের সংস্পর্শ লাভের সাথে মুসলমানরা তাদের জাতির পিতা ইবরাহীম (আ:)-এর সাথে একাত্মতাবোধ করে। মানুষ যেমন আদরের বসে তার সন্তানকে চুমো খায় তেমনি মুসলমানরা হযরে আসওয়াদকে চুমো দেয়। এটাকে যে মুসলমানরা পূজা করে না তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এই পাথরকে চুমো খেতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি জানি তুমি একটি পাথর ছাড়া আর কিছুই নও। আমার কোনো কল্যাণ বা ক্ষতি করার সামর্থ্য তোমার নেই। যদি আমি মুহাম্মদ (সা:)কে তোমাকে চুমো খেতে না দেখতাম তবে আমি তোমাকে স্পর্শও করতাম না।" কাবা প্রদক্ষিণের সময় হাজীরা বলে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার (আল্লাহর নামে এবং আল্লাহ মহান)-এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরিকানকে অস্বীকারে করে।

উত্তর : ২. কাবা প্রদক্ষিণের পরের আনুষ্ঠানিকতা

কাবা প্রদক্ষিণের পর মুসলমানরা ইবরাহীম (আ:)-এর নিদর্শন দেখতে যায়। এটি হচ্ছে মোকাকে ইব্রাহীম। কাঁচ আবৃত ইবরাহীম (আ:)-এর পদচিহ্ন। সম্ভবত কাবা গৃহ নির্মাণের সময় তাঁর এই পদচিহ্ন পড়েছিল। মোকামে ইবরাহীম পরিদর্শনের মাধ্যমে

হাজীরা ইবরাহীম (আ:) কে স্মরণ করে; যিনি তাঁর নিজের জন্য নয় আল্লাহর প্রেমে এই ঘর বানিয়েছেন। এরপর হাজীরা সিকি মাইল দূরে সাফা মারওয়া নামক দুটো পাহাড়ের মধ্যে ৭ বার হাঁটাহাঁটি করে। অক্ষম ব্যক্তিদের বহনের জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা করা আছে। এই কাজ করার মাধ্যমে যারা উমরাহ করতে যায় তাদের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। তারা তখন ইহরাম খুলে এবং চুল কাটে। অত:পর তারা জমজম কূপে গিয়ে তার পানি পান করে এবং সেখানে ওজু করে। এটি হচ্ছে সেই কূপ যা শিশু ইসমাইল (আ:)-এর পদাঘাতে সৃষ্টি হয়েছিল।

উত্তর : ৩. সাফা-মারওয়ার ছুটোছুটির তাৎপর্য

সাফা-মারওয়ার ছুটোছুটি করে নির্বাসিতা হাজেরা (রা:)-এর কষ্টের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়। শিশু ইসমাইল (আ:)-এর জন্য পানির সন্ধানে তিনি সাফা মারওয়ার মাঝে ৭ বার ছুটাছুটি করে ব্যর্থ হন। অত:পর সন্তানের অবস্থা দেখতে এসে দেখেন যে, তাঁর পায়ের গোড়ালীর আঘাতে মাটি ফেটে পানি বের হচ্ছে। সাফা-মারওয়ায় ছুটোছুটির মাধ্যমে মুসলমানরা আরো কয়েকটি বিষয় মনে করে।

ক) যখন হাজেরা (রা:) জনমানবশূন্য নির্বাসনে গেলেন তখন তিনি হতাশভাবে নিশ্চেষ্ট বসে থাকেননি। ইসলাম কোনো অবস্থাতেই হতাশ হতে বারণ করে।

খ) হাজেরা (রা:)-এর আচরণে অনেক কিছু শেখার আছে। তিনি পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছুটলেন। তাঁর মনে দৃঢ় আশা ছিল যে, আল্লাহর রহমতে পানি জুটবে। তাঁর কষ্ট দূ হবে।

গ) রাসূলের পর দেড় হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ ঐ পথে দৌড়াদৌড়ি করে একাত্মতা ঘোষণা করছে একজন দু:স্থ গরীব মহিলার সাথে। যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন দাসী (কোন কোনো বর্ণনা মতে আফ্রিকান)। এ থেকে ইসলামের মহত্ব ও ঐতিহাসিক ভ্রাতৃত্ব ফুটে উঠেছে। এখানে সাদা-কালো, জাতি-গোত্র, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ প্রভেদ নেই। সবাইকে হাজেরার (রা:) পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হচ্ছে।

ঘ) এর মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নারীর ও মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে। প্রত্যেক হাজী একজন বিপদগ্রস্ত দরিদ্র মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

উত্তর : ৪. হজ্বে পৌত্তলিকদের অনুসৃত নিয়মের অনুসরণ প্রসঙ্গে

পৌত্তলিকরা হজ্বে যেসব আনুষ্ঠানিকতা করত তার অনেক কিছুই তাদের তৈরি ছিল না। তাদের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইবরাহীম (আ:) অনুসৃত অনেক নিয়ম-কানুন ছিল। ইসলাম কাবাকে পুনরুদ্ধার করে হজ্বের আসল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে পৌত্তলিকদের অনুসৃত ইবরাহীম (আ:) প্রবর্তিত নিয়ম-কানুনের সবগুলোই ইসলামের

হজ্ব বিধানে এসেছে। এটা পৌত্তলিকদের অনুসরণ নয় আসল নিয়মের বাস্তবায়ন। পৌত্তলিকরা এক আল্লাহর ইবাদতঘর কাবাকে অপবিত্র করেছিল আর ইসলাম সেই কাবাকে মূর্তিমুক্ত করে পবিত্র করেছে।

উত্তর: ৫. আরাফাতের ময়দানে হজ্বের সমাবেশ

সাফা-মারওয়ার আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর হাজীরা ৮ই জিলহজ্ব মিনা নামক স্থানে আসবেন। মিনা মক্কা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে। সেখানে তারা পরদিন জোহরের নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। অত:পর তারা আরাফাতের ময়দানে জমায়েত হবেন। আরাফাত এক বিশাল প্রান্তর। হজ্বের সময় সেখানে দাঁড়ানো সত্যিই এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা। এখানকার জাবলুর রহমত থেকে রাসূল (সা:) তাঁর বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। প্রতি বছর বিশ্বের প্রায় সব দেশের বিভিন্ন জাতির, ভাষার ও বর্ণের দুই মিলিয়নের বেশি মানুষ এখানে হজ্বের দিন জমায়েত হন। আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ করেন। এখানে দাঁড়িয়ে এই অপরূপ সমাবেশ দেখে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মালিক শাবাজ (ম্যালকম এক্স) তাঁর বর্ণ বিষয়ক ধারণা ত্যাগ করেন। আরাফাতের জমায়েত মানুষকে মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাদের এভাবে হাশরের ময়দানে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে দাঁড়াবার কথা মনে করিয়ে দেয়।

উত্তর : ৬. আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করার পর করণীয়

আরাফাত থেকে মুজদালিফা নামক জায়গায় যেতে হয়। সেখানে রাত্রি যাপনের পর ফজর নামায পড়ে তারা মিনায় ফিরে আসে। এখানে তারা শয়তানের প্রতিকরূপী তিনটি পাথরে পাথর নিক্ষেপ করে। এই স্থানেই শয়তান ইবরাহীম (আ:) ও ইসমাইল (আ:)কে কুরবানী না দেবার কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। এখানে হাজিরা চুল কাটে এবং কুরবানী দিয়ে ইহরাম মুক্ত হয়।

অত:পর হাজীরা আবার কাবা তওয়াফ করে– এর নাম 'ইফাদা', যদিও এটি বাধ্যতামূলক নয়। এরপর হাতে সময় থাকলে হাজীরা মদিনায় গিয়ে রাসূলের রওজা মুবারক জিয়ারত করে। এটা যদিও হজ্বের অংশ নয় তবু এটা করা বাঞ্ছনীয়।

হজ্ব শেষে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা ও জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবাই ঘরে ফিরে। রাসূল (সা:) বলেন, সার্বিকভাবে হজ্ব সম্পাদনকারী নিষ্পাপ হয়ে (যেভাবে সে জন্মেছিল) ঘরে ফিরে।

ইসলামী শিক্ষা সিরিজ

২য় খণ্ড

ইসলামের নৈতিক বিধান

সূচি

এফ-১ মৌলিক নীতিগত বিষয়সমূহ

প্রশ্ন ১. ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের সাথে ইসলামের নৈতিক শিক্ষার কোন সম্পর্ক আছে কি?

২. নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতার সংজ্ঞা দিন?

৩. বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের যুগে নীতি নৈতিকতার বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ

৪. নীতি ও নৈতিকতার আলোচনায় মূলত কোন্ বিষয়গুলো আসে।

৫. পরম ভাল বলতে কি বুঝায়?

৬. ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাল ও মন্দ আচরণ সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায়?

৭. ধর্ম নিরপেক্ষ মতে নৈতিকতা কে বাস্তবায়ন করবে।

৮. নৈতিক আচরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন চিন্তাধারার বক্তব্য কি?

৯. নৈতিকতা প্রশ্নে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার কোন বাস্তব প্রয়োগ আছে কি?

উত্তর : ১. ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের সাথে ইসলামের নৈতকতার সম্পর্ক

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে ইসলামী নৈতিকতার বিস্তার শুরু। অন্যান্য ধর্ম ও ধর্ম নিরপেক্ষ নৈতিক বিধানের চেয়ে পৃথক, নিজস্ব এবং পূর্ণাঙ্গ নৈতিক বিধান ইসলামে আছে।

উত্তর : ২. নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতার সংজ্ঞা

নীতি বলতে বুঝায় আদর্শভাবে কি হওয়া উচিত তার নির্দেশনা। এটা ভাল ও মন্দের পার্থক্য করে মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

উত্তর : ৩. বর্তমান যুগে যান্ত্রিক সভ্যতার উৎকর্ষের মাঝে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা

মানব সভ্যতার আদি থেকেই মানব জাতির সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক। বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক ও সেটেলাইট সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছে। জ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে মানুষ অসাধ্য সাধন করেছে। কিন্তু তার পরও কি একথা বলা যায় যে, মানুষ মনুষত্বের চরম শিখরে পৌছতে পেরেছে? বরং একথা অনস্বীকার্য যে, সকল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে নৈতিক সমস্যা। প্রযুক্তিগত উন্নতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্যে আমরা দেখছি...

ক) মানব জাতির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিবার দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে।

খ) তরুণদের মধ্যে বড়দের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ উঠে যাচ্ছে।

গ) অবাধ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা মানুষের সকল নৈতিকতাবোধকে ধ্বংস করছে।

ঘ) সততা ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে।

ঙ) আল্লাহর এবাদতের বদলে পরাশক্তির আনুগত্য ও সম্পদের মোহে মানুষ বেশি ছুটছে।

চ) পৃথিবীতে অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটো মহাযুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে। এছাড়াও অসংখ্য ছোট বড় যুদ্ধ অব্যাহত আছে। এসব যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের জীবন নষ্ট হয়েছে।

পাশ্চাত্যের বুদ্ধি জীবীরাও পৃথিবীতে এই অবক্ষয় ও হানাহানির জন্য নৈতিক বিপর্যয়কে দায়ী করেছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন যে, মানুষ পশুর স্তরে নেমে গেছে। পশুতো শুধু খাবারের জন্যেই অন্য প্রাণীকে হত্যা করে কিন্তু মানুষ তার চাইতেও নীচে নেমেছে। অন্যান্য লেখকের লেখাতেও একই কথার প্রতিধ্বনি পাই।

উত্তর : ৪. নীতি ও নৈতিকতার প্রধান প্রেক্ষিত সমূহ

নীতি ও দর্শন সংক্রান্ত সকল গ্রন্থে মূলত ৪টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। যথা :

ক) পরম ভাল বলতে কি বুঝায়? ভাল ও মন্দের পার্থক্য করার মাপকাঠি কি?

খ) ভাল ও মন্দ সংক্রান্ত জ্ঞানের উৎস কি?

গ) নৈতিকতাবোধের উৎস কি? মানুষ কি আত্ম প্রণোদিত হয়ে ভাল কাজ করবে নাকি তাকে শক্তি প্রয়োগে এ কাজ করতে বাধ্য করতে হবে।

ঘ) নৈতিকতার বহি:প্রকাশ কিভাবে ঘটে? মানুষকে নৈতিক আইন অনুসরণ করতে কে চালিত করে?

উত্তর : ৫. পরম ভাল প্রসঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি কি?

পরম ভাল প্রসঙ্গে তিনটি ধারণা দেয়া যেতে পারে যথা :

ক) যে সব কাজ মানুষকে সুখী করে তাই উত্তম পক্ষান্তরে যে সব কাজ মানুষকে দু:খ দেয় তাই মন্দ।

খ) পরিশুদ্ধি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। তাই মানুষ সব সময় উত্তম হতে চেষ্টা করে। কাউকে পরিশুদ্ধি অর্জনের চেষ্টায় বাধা দেয়া একটি মন্দ কাজ।

গ) দায়িত্ববোধ নিয়ে মানুষ তার কাজ করে যাবে। এটাই কাঙ্ক্ষিত।

উপরে বর্ণিত উত্তম বা পরম ভাল সম্পর্কে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গিতে কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তার কাছে জবাবদিহির কোন ধারণা নেই। সেখানে কোন পরকালের প্রতি কোন স্বীকৃতিও নেই। এর ফলে কিছু বাস্তব সমস্যা সৃষ্টি হয়।

যদি ধর্মনিরপেক্ষ সংজ্ঞা অনুসারে সুখ বা কল্যাণকেই উত্তম কাজের মাপকাঠি ধরা হয়

তা হলে প্রশ্ন থাকে যে, কার সুখ বা কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে। যথা : ব্যক্তির কল্যাণ, নাকি গোষ্ঠির কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ-জাতির কল্যাণ নাকি সামগ্রিকভাবে মানবজাতির কল্যাণ। আরও প্রশ্ন উঠে কোন পর্যায়ে সুখ ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। তাকি আধ্যাত্মিক, মানসিক, না জাগতিক। যদি পরিশুদ্ধি অর্জনই লক্ষ্য হয় তা হলে প্রশ্ন উঠে ব্যক্তি জীবনে, নাকি গোষ্ঠি জীবনে না সমাজ জীবনে নাকি জাতীয় জীবনে পরিশুদ্ধি আনতে হবে। দায়িত্ব অনুভূতি থেকে কাজ করার প্রসঙ্গ যদি আসে তা হলে প্রশ্ন উঠে এ দায়িত্ব অনুভূতি কোথা থেকে আসবে। কে মানুষের মাঝে দায়িত্ব অনুভূতি জাগ্রত করে তাকে সুপথে পরিচালিত করবে।

উত্তর : ৬. কোন কাজ ভাল বা মন্দ তা যাচাই করবার বিষয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে

ভাল ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করবার জ্ঞান সম্পর্কে ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন মানুষের অভিজ্ঞতাই এ সংক্রান্ত জ্ঞানের সর্বোচ্চ উৎস। কারো মতে প্রত্যেক মানুষের মাঝে ভাল ও মন্দের পার্থক্য করবার সহজাত অন্তদৃষ্টি রয়েছে। আবার কারো মতে যুক্তির মাধ্যমেই ভাল ও মন্দের পার্থক্য করতে হবে। প্লেটো, এরিস্টটল, হেগেল, স্পিনজা প্রমুখ দার্শনিক শেষোক্ত মতের অনুসারি। এই সমস্ত জ্ঞানের উৎসগুলো কোনটাই সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে সহজ পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য কোন জ্ঞান দিতে পারে না। তা ছাড়া যুক্তি ও ধারণা পক্ষপাতদুষ্টও হতে পারে। কোন্ মানুষের অভিজ্ঞতাকে সত্য মিথ্যার মাপকাঠি করা হবে তাও একটি বিতর্কিত বিষয়। তা ছাড়া এ ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বের মানুষের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ও একিভূত করা এক অসম্ভব কাজ। মানুষ তার অভিজ্ঞতা বর্ণনায় কোন বিষয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারে না। বস্তুত এভাবে ভাল ও মন্দকে পার্থক্য করবার জ্ঞানের ব্যাপারে সবার মাঝে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

উত্তর : ৭. নৈতিকতার বাস্তবায়ন

নৈতিকতার বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তাবিদদের চারটি ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। যথা :

ক) কেউ কেউ বলেন যে, নৈতিকতা আত্ম প্রণোদিত। এটা মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। মানুষের মন সৎকাজ করলে আনন্দিত হয়, আর মন্দ কাজ করলে অনুতপ্ত হয়।

খ) কেউ বলেন মানুষের মন যুক্তিবাদী। এই যুক্তিবাদীসত্তা মানুষকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে মন্দ কাজ বর্জন করতে ও সৎ কাজ করতে অনুপ্রাণীত করে।

গ) কেউ কেউ বলেন নৈতিকতা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়। মানুষ পুলিশ ও আদালতের ভয়ে নৈতিক বিধান লংঘন করা থেকে বিরত থাকে।

ঘ) কেউ বলেন মানুষ অঘোষিত সামাজিক চাপে অনৈতিকতা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। কোন কাজের গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সমাজে কিছু প্রতিষ্ঠিত ঐকমত্য আছে। মানুষ সমাজের চোখে ভাল থাকতেই ভাল কাজ করে এবং মন্দ কাজ বর্জন করে।

উত্তর : ৮. নৈতিক আচরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন চিন্তাধারার বক্তব্য

মানুষ কেন নীতিবান জীবন অনুসরণ করবে এ ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ দার্শনিকরা তিনটি মূল কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা :

ক) নৈতিকতার প্রতি জন্মগত শ্রদ্ধা।

খ) মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তাকে পরিশুদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। যার ফলে সে নৈতিক আচরণ মেনে চলে।

গ) পূর্বের প্রশ্নের 'গ, ও 'ঘ', অংশের উত্তর অনুযায়ী রাষ্ট্র শক্তির ভয়ে অথবা সমাজে টিকে থাকবার জন্য মানুষ নৈতিক আচরণ করে।

উত্তর : ৯. নৈতিক আচরণ প্রসঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির আদৌ কোন বাস্তবতা আছে কি?

উপরে বর্ণিত নৈতিক আচরণ প্রসঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিগুলো প্রকৃত পক্ষে অবাস্তব এবং অসম্পূর্ণ। যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে বাতিল যোগ্য বা অর্থহীন নয়। তবুও এই বিধানের আলোকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সার্বিক পরিশুদ্ধি সম্ভব নয়। আখেরাতের অস্তিত্ব ও খোদার কাছে জবাবদিহির অনুভূতি ছাড়া ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নৈতিকতার পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

সূত্র :

'The Ethical Viewpoint of Islam'- Abul A'la Moududi

'The Conduct of Life'- Lews Mountford

'Living issues in Philosophy'- Harold Titus Northrope,

'The Meeting of East and West'.

৺

এফ-২ ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তি

প্রশ্ন ১. ধর্ম নিরপেক্ষ নীতিবাদ ও ধর্মীয় নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য কি?

২. আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং ইসলামী নৈতিকতার সাথে এর সম্পর্ক কি?

৩. আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য কি?

৪. আল্লাহ্ সম্পর্কে বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গি কি? এর সাথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কি?

৫. আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামী এবং অন্যান্য ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং এর সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক কি?

৬. আখেরাত সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৭. আখেরাত সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অন্যান্য মতবাদের পার্থক্য কি?

উত্তর :১. সেকুলার এথিক্স ও ধর্মীয় নৈতিকতার পার্থক্য

ধর্মীয় নৈতিকতা দুটি মৌলিক স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা- (ক) স্রষ্টায় বিশ্বাস এবং (খ) পরকালে বিশ্বাস। যদিও বিভিন্ন ধর্মে নৈতিকতার ব্যাখ্যায় পার্থক্য রয়েছে তবুও এ দুটো বিষয়ে সব ধর্মের মাঝে ঐক্যমত্য আছে।

উত্তর : ২. আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও এর সাথে ইসলামী নৈতিকতার সম্পর্ক

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সার্বভৌম, পরম সত্য ও পরিশুদ্ধ। তিনি অবিনশ্বর, সমগ্র জগতের স্রষ্টা ও পালন কর্তা। তার অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে সর্ব বিষয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, সব কিছুর উপর ক্ষমতা, দয়া ও ন্যায় বিচার। ইসলাম মানুষের সাথে আল্লাহর সরাসরি সম্পর্কের কথা বলে, এর জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। কাজেই আল্লাহর প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ স্বতস্ফূর্ত আল্লাহ্ প্রেম থেকে সৃষ্ট।

উত্তর :৩. আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

মুসলমানরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে তিনি সারা জাহানের একক প্রভূ. তার কোন শরীক নেই। কোন মানুষের মধ্যে খোদায়ীত্ব আরোপের সুযোগ ইসলামে নেই। কাজেই মুসলমানদের রয়েছে একক নিয়ন্তা নির্দেশিত সুস্পষ্ট এবং একক সত্য-মিথ্যার ও ভাল-মন্দের পার্থক্য সূচক মানদন্ড। একক প্রভূ নির্দেশিত পথে তাঁর

সন্তুষ্টি অর্জনই মুসলমানদের দায়িত্ব। কাজেই সত্য-সরল পথে মুসলমানরা অনড় থাকতে কখনও দ্বিধান্বিত হয় না। কারণ তাদের প্রভু নির্দেশিত সত্য সরল পথ একটিই। বাস্তবে গোটা সৃষ্টি জগতের দিকে তাকালেও দেখা যাবে এর বিন্যাসের মাঝে রয়েছে অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা। কোন কিছুই নিয়মের বাইরে নেই। বিশ্বজগতের এই অনুপম শৃঙ্খলা ও স্থিতি এর উপর কার্যকর একক প্রভুর একক ইচ্ছার প্রমাণই ঘোষণা করে।

উত্তর : ৪. আল্লাহ্ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে বাইবেল ও কুরআনের পার্থক্য

একত্ববাদ ও বহুইশ্বরবাদের মাঝে যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে ইসলামী তাওহীদবাদ ও বাইবেল বর্ণিত স্রষ্টা সংক্রান্ত ধারণার মাঝে তেমন বিশাল পার্থক্য নেই। তাই বলে একথা বলার কোন সুযোগ নেই যে, ইসলামী তাওহীদবাদ হচ্ছে বাইবেলের বর্ণনার কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপমাত্র। বনী ইসরাঈলীদের বর্ণনায় প্রভূকে একজন 'অতিমানব' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যার বিশ্রাম প্রয়োজন হয়, বাগানে হাটার সময় যার পদচারণার শব্দ শোনা যায়, যিনি মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দেখে হিংসাকাতর হন। পক্ষান্তরে ইসলাম আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, শুদ্ধতা, উৎকর্ষের কথা বলে এবং আরও ঘোষণা করে যে, তিনি মানবীয় সীমাবদ্ধতা ও দেহাবয়ব-এর উর্দ্ধে। কুরআনে আল্লাহকে জগতসমূহের মালিক এবং সমগ্র মানবকূলের স্রষ্টা ও মালিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একই সাথে নিউ টেস্টামেন্টের বর্ণনাও ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে যেখানে ঈসা (আ:) কে স্রষ্টার সন্তানরূপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাঁকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মানবজাতিকে আদিপাপের দায় থেকে মুক্ত করতে। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা (আ:) ছিলেন একজন সত্যপন্থী, সমগ্র মানবজাতিই 'আল্লাহর সন্তান' এই অর্থে ঈসা (আ:) ও আল্লাহর সন্তান আর অন্য কোন অর্থে নয়। এভাবেই দেখা যায় ইসলামী তাওহীদবাদের মাধ্যমেই আল্লাহ সম্পর্কে শুদ্ধতম এবং শ্রেষ্ঠতম ধারণা লাভ করা যায়।

উত্তর : ৫. আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণার বিষয়ে ইসলামের সাথে অন্যান্য মতবাদের পার্থক্য, এর সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক

আল্লাহ্ সংক্রান্ত ধারণা প্রশ্নে ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য ও এর সাথে নৈতিকতার সম্পর্কের বিষয়টি কয়েকভাবেই আলোচনা করা যায়, যথা :

ক) ধর্মীয় নীতিবাদে বর্ণিত, পরম সত্তা ও সত্যাদর্শের ধারণা যদি ভ্রান্তি, অপূর্ণ ও অশুদ্ধতা দিয়ে দূষিত থাকে তাহলে মানুষের কাছে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী স্পষ্ট, একক ও অপরিবর্তনীয় কোন মানদণ্ডই থাকে না। ফলে তার নীতিবোধ কঠোর না হয়ে হয় নমনীয়। পক্ষান্তরে তওহীদবাদীরা আল্লাহকে একক, সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান, সকল ভুল-ক্রটি-সীমাবদ্ধতামুক্ত মনে করার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যাকে পার্থক্য করার একক এবং অপরিবর্তনীয়, সুদৃঢ় মানদন্ড পতিষ্ঠা করে।

খ) পৃথিবীর সব সম্পদ ও অর্জনকে আল্লাহর দান মনে করার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের মনে আল্লাহর প্রতি স্বতস্ফূর্ত ভালবাসা ও আনুগত্য আসে (ইসলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ)।

গ) আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ এবং তাঁর বিশুদ্ধতা, প্রজ্ঞা ও ঐশী গুণাবলীর প্রতি আস্থা বিশ্বাসীদের মনে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মসচেতনতা আনে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যে কোন নৈতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাফল্য নিহিত আছে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মসচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধের উপর।

উত্তর : ৬. আখেরাত সম্পর্কে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাচ্যদেশীয় ধর্মগুলোতে পার্থিব আশা-আনন্দকে ক্ষণস্থায়ী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। দেহের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে বলা হয় আত্মাকে দেহের বাঁধন থেকে মুক্ত করে তাকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করতে। এজন্যে ধ্যান (Meditation) ও আধ্যাত্মিক সাধনার কথা জোর দিয়ে বলা হয়। ঈসা (আ:) এর পর প্রথম তিন শতকের খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের মাঝে এ ধরনের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তারা দুনিয়াকে অগ্রাহ্য করাকে সর্বোচ্চ পবিত্রতা মনে করে আত্মার উন্নতির কথা বলতেন। তারা মনে করতেন দুনিয়া ত্যাগ করে ধ্যান এর মাধ্যমেই অলৌকিকভাবে স্রষ্টাকে পাওয়া যাবে।

উত্তর : ৭. আখিরাত সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আখিরাতে বিশ্বাস করার সাথে ইসলাম দুনিয়ার জীবনকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে শেখায় না। বরং দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের লক্ষ্যে পরিচালিত করতে বলে। দুনিয়াতে অসৎ নেতৃত্ব দূর করে সৎ নেতৃত্ব কায়েমের জন্য এবং শান্তি ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেই আখিরাতের মুক্তি অর্জন করতে বলে। জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে নয় বরং আল্লাহর শাসন কায়েমের লড়াই করেই আখিরাতের শান্তি পেতে বলে।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৫০:১৬

প্রশ ৩. আল কুরআন ২১:২২

প্রশ্ন ৪ আল কুরআন ২৮:৭৯-৮০

'The Ethical Teachings of Jesus'- E. F. Scott.

এফ-৩ ইসলামের দৃষ্টিতে মানব প্রকৃতি

প্রশ্ন : ১. মানব প্রকৃতি সম্পর্কে অমুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি কি?
২. এসব দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে মুসলমানদের মতামত কি?
৩. মুসলমানরা আদম (আ:) এবং বিবি হাওয়া (আ:)-এর কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করে? আদি পাপের বিষয়ে তাদের বক্তব্য কি?
৪. মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর : ১. মানব প্রকৃতি সম্পর্কে অমুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে বহুল প্রচলিত অমুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে চারভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

ক) একটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মানুষ বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত প্রাণী এবং এখনও বিবর্তনশীল। এর বস্তুগত অস্তিত্বই এর সব কিছু। এই দৃষ্টিভঙ্গির ধারকরা বলেন মানব সৃষ্টির পেছনে কোন ঐশী স্রষ্টার পরিকল্পনা বা নির্দেশ নেই। এটা বিবর্তনের ধারায় স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে।

খ) এর বিপরীতে আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে বর্ণনা করে। দৈহিক সত্তাকে তারা চরমভাবে অবজ্ঞা করে। তারা শরীরের ব্যাপারে শুধু উদাসীনই নয় বরং শরীরকে কষ্ট দিয়ে আত্মাকে এর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে শুদ্ধ করার কথাও বলে। আত্মাকে মুক্ত করার এই প্রয়াসকে কখনও কখনও *Nirvana* হিসেবে অভিহিত করা হয়।

গ) আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের বুদ্ধি ও সৃজনশীলতাকে অতিমূল্যায়ন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানুষের বুদ্ধিমত্তাই সবকিছুর নিয়ন্তা। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার গুণে মানুষ নিজেই সব বিষয়ে বিচার করতে ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

ঘ) আর এক দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় মানুষকে পাপিষ্ঠ সত্তা মনে করে। এই মত অনুসারে মানুষের অস্তিত্বের সাথেই পাপ জড়িত। পাপের কারণেই মানুষের পৃথিবীতে পতন ও আগমন। এখন প্রায়শ্চিত্তই তার একমাত্র পাথেয়। মানুষের পাপ করার প্রবণতা সার্বজনীন ও চিরন্তন। মানুষ স্বত:ই তার দেহসত্তার দাসে পরিণত হয়। পাপের পরিণতি মৃত্যু এবং এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ রক্ত বলিদান।

উত্তর : ২. এসব অমুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য

মানুষকে অন্যসব পশুর মত বিবেকবর্জিত প্রাণী ভাবার ধারণা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। একই সাথে ইসলাম এ ধারণাকেও বাতিল করে যে, মানবসৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার কোন

উদ্দেশ্য নেই। কুরআন বলে যে, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা মানুষকেও দেহসর্বস্ব বস্তুর মত চিন্তা করে তার কোন আত্মার অস্তিত্বের কথা ভাবে না তারা চরম ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। ইসলাম বলে যে, মানুষের দৈহিক ও শারীরিক সত্তার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করে তাকে শুধু আধ্যাত্মিক সত্তা বিবেচনা করাটাও ভুল বৈরাগ্য চির কৌমার্যব্রত, ইত্যাদি যেসব বিষয় অধিকাংশ মানুষের প্রকৃতির বিরোধী এগুলোও আত্ম উন্নয়নের কোন স্বীকৃত পন্থা হতে পারে না। এটা সত্য যে, বুদ্ধিমত্তা এবং গবেষণা জ্ঞানের এক বড় উৎস কিন্তু এটাকে ওহী'র জ্ঞানের চাইতে বড় ভাবার সুযোগ নেই। মানুষের বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধতা হচ্ছে

ক) এটা অত্যন্ত আত্মগত জ্ঞানের উৎস। কাজেই এটা কখনও সত্য ও মিথ্যার, ন্যায় ও অন্যায় পার্থক্যকরণের স্পষ্ট মানদন্ড হতে পারে না।

খ) মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকেই নির্দেশনা উৎস মনে করা হলে প্রশ্ন উঠবে কার বুদ্ধিকে গ্রহণ করা হবে।

সবশেষে বলতে হয় যে, ইসলামে কোন আদিপাপের উল্লেখ নেই। কাজেই মানুষকে মূলত: পাপী হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ ইসলামে নেই। ইসলাম মানুষকে অধ:পতিত কোন সৃষ্টি মনে করে না এবং এক সম্মানিত সৃষ্টি বলে উল্লেখ করে, যে তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্য নিয়ত সচেষ্ট।

উত্তর : ৩. আদম (আ:) ও বিবি হাওয়ার কাহিনী ও আদিপাপ প্রসঙ্গ

কুরআনে আদম (আ:) এবং বিবি হাওয়ার কাহিনী নিছক প্রথম মানব-মানবীর গল্প হিসেবে বর্ণিত হয় নি বরং এটাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য নৈতিক শিক্ষা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত রূহ (আত্মা) রয়েছে আবার তার আছে বস্তু দিয়ে গঠিত দৈহিক সত্তা। মানুষের পরীক্ষা হচ্ছে এ দুটোর সমন্বয় করে কিভাবে শারীরিক অস্তিত্ব নিয়েই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করা যায়। যদিও তাদের শারীরিক সত্তা (প্রবৃত্তি) তাদের আল্লাহর বিধান লংঘন করতে প্রলুব্ধ করে তথাপি তাদের আত্মিক সত্তা তাদের অনুতপ্ত করে তাদের সুপথে আনে। কুরআন বলে যে আদম (আ:) এবং বিবি হাওয়া (আ:) দুজনেই সাময়িক ভুলে আল্লাহর বিধান লংঘন করেছিল কিন্তু পরক্ষণেই তারা দুজনেই অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে আল্লাহ তা মাফ করে দেন। যেহেতু আল্লাহ তাদের স্রষ্টা এবং তিনি জানেন কোথায় তাদের দুর্বলতা সেহেতু তাঁর পক্ষে ক্ষমা করাটাই স্বাভাবিক। এটাই বরং অস্বাভাবিক যে তিনি তাঁর প্রিয় সৃষ্টির একটি সাময়িক ভুলের দায় সমগ্র সৃষ্টিকূলের উপর আদিপাপ বলে চাপিয়ে দেবেন। কাজেই ইসলামে আদিপাপ বলে কিছু নেই। প্রত্যেক মানব শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় জন্ম নেয়। পরবর্তীতে পরিবেশ ও নিজের আমলের মাধ্যমে সে ভাল বা মন্দ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। ইসলাম আরও বলে যে, মানুষের পৃথিবীতে আগমন ও আবাসন কোন শাস্তি নয়

বরং আল্লাহই পৃথিবীকে মানুষের আবাস হিসেবে তৈরী করেছেন। মানুষ কোন পাপ করতে তা মোচন করতে কোন বলিদান ইসলামে করতে হয় না। বরং ইসলাম এটাই বলে আন্তরিক অনুতাপের সাথে তওবাহ্ করলে এবং একই ভুল আর না করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলে আল্লাহ্ তওবাহ্ কবুল করেন।

উত্তর : ৪. মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম মতে মানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা। খলিফা বলতে বোঝায় মানুষ হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট এবং কর্তৃত্বশালী। তারা মর্যাদার দিক থেকে ফেরেশতাদেরও ওপরে। স্বয়ং আল্লাহ সকল ফেরেশতাদের প্রথম মানুষ আদম (আ:) কে সিজদা করতে বলেছিলেন। এভাবেই ইসলামে মানুষ প্রশংসিত এবং সম্মানিত। তার দায়িত্ব তার মধ্যকার সব উপাদান যথা শরীর, আত্মা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে আল্লাহর পথে সুষম ও সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা। মানুষ হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র সৃষ্টি যার ভাল ও মন্দ যে কোন ধরনের কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সত্য, ন্যায় এবং সরলপথের নির্দেশনা তাকে দেয়া হয়েছে, সে পথে চলার দায়িত্ব তার নিজের।

সূত্র :

প্রশ ২. আল কুরআন ৫৪:৪৯, ২৫:২, ৪৭:১২, ৭:১৭৮

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ২:৩৭, ৬:১৬৪, ৩:১৩৫, ২০:৮২

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ২:৩০, ৬:১৬৫, ১৭:৭০, ১৫:২৯, ৯০:১০ ৭৬:৩, ১৮:২৯, ৭৫:৩৬, ২:১৪১, ২:৮০, ৪:১২২ ১২৩।

এফ-৪ জগৎ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন ১. মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির কি প্রভাব মুসলমানদের আচরণের উপর পড়ে?

২. জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা কি? এ ধারণা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে কিভাবে প্রভাবিত করে

৩. ইবাদত সম্পর্কে ইসলামী ধারণা ব্যাখ্যা করুন?

৪. পৃথিবী সম্পর্কে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির সাথে শিক্ষার (Learning) সম্পর্ক কি?

৫. প্রধান প্রধান নৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধানে ইসলাম কি শিক্ষা দেয়? এর সাথে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবিদ্যার পার্থক্য কি?

উত্তর : ১. মুসলমানদের উপর মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব

মুসলমানদের উপর মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব চারটি প্রধান ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় :

ক) আত্মউপলব্ধি : মানুষ নিজের প্রকৃত পরিচয় লাভ করে যার ফলে সে তার শক্তি-সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকে। এতে একদিকে যেমন সে তার শক্তিমত্তার কারণে উদ্ধত, গর্বিত বা নিষ্ঠুর হয় না আর একদিকে তেমনি তার দুর্বলতা এবং পাপ করার প্রবণতার জন্যে অতিমাত্রায় ভীত বা হতাশ হয় না। ফলে তার শক্তি ও সীমাবদ্ধতার সম্পর্কে তার মধ্যে এক সুপরিমিত ধারণা থাকে।

খ) খেলাফতের দায়িত্বানুভূতি : আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানুষকে তার খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে পাঠিয়েছেন এ বিশ্বাস থেকে মানুষের মাঝে তার উপর আরোপিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আসে। সে তার জীবনকে খোদার এক উপহার হিসেবে গ্রহণ করে যার অপব্যবহার বা ধ্বংস করার কোন অধিকার তার নেই। সমস্ত পৃথিবীর আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাভাবিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সে সচেতন হয়। পরিবেশ ও প্রকৃতি ধ্বংসকারী যে কোন পদক্ষেপ থেকে সে দূরে থাকে।

গ) জীবনে জাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় : ইসলাম মানুষের জীবনকে ধর্মীয়/আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব/বস্তুবাদী এ দুভাগে ভাগ করে নি। জীবনের সব কাজই আল্লাহর ইবাদত। জীবনের সব কাজ কর্মের বিষয়েই ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান আছে। কাজেই কারো পক্ষে এটা করা সম্ভব না যে, নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে অবশিষ্ট বিষয়ে ইচ্ছেমত চলা যাবে।

ঘ) **জীবন একটি পরীক্ষা :** কুরআনের বহু আয়াতে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, আমাদের জীবন কোন স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার বিষয় নয়। বরং এর নেপথ্যে স্রষ্টার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে। মানুষের মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যকার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমণের মাধ্যমেই। আল্লাহর মিশন পূরণে স্বীয় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োগ করাই মানুষের জীবনের পরীক্ষায় উত্তরণের একমাত্র উপায়।

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামের এ চার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষের তথা পৃথিবীর জীবন সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ হয়। কারণ ইসলাম মানুষের ভুল সংশোধনে, সামাজিক সুবিচার, ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানুষকে আরও নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ করে।

উত্তর : ২. জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি ও মুসলমানদের উপর এর প্রভাব

মানব প্রকৃতি এবং জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব তার নৈতিক সত্তা ও ব্যবহারিক জীবনের উপর পড়ে। জগত সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এই যে, এ জীবন এবং এ পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের খেলাফতের দায়িত্ব পালনের সহায়ক উপাদান। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ইসলামের এ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য নেতিবাচক মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কোন কোন মতবাদে জগৎকে মানুষের একচ্ছত্র আধিপত্য ও ভোগের স্থান বলা হয়েছে আর কোনটিতে জগৎ থেকে পুরোপুরি দৃষ্টি ফিরাতে বলা হয়েছে। ইসলাম বলে আল্লাহ পৃথিবীকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন এবং তার কল্যাণের জন্যে নিবেদিত করেছেন। অতএব মানুষের দায়িত্ব হবে এ জগতের সকল সম্পদ ও শক্তিকে আল্লাহর মিশন সফল করতে তাঁর নির্ধারিত পন্থায় নিয়োজিত করা।

উত্তর : ৩. 'ইবাদত' সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে 'ইবাদত' বলতে নিছক কিছু আনুষ্ঠানিকতা বুঝায় না। মুসলমানরাও 'ইবাদত' বলতে নিছক স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যসূচক কিছু গৎবাঁধা নিয়ম পালন করা বোঝে না। মুসলমানদের জীবনের সব কাজই ইবাদত যদি তা দুটো পূর্বশর্ত পূর্ণ করে :

ক) কাজের নেপথ্যের উদ্দেশ্য (নিয়ত) হতে হবে সৎ, বিশুদ্ধ এবং তা করতে হবে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে মানুষের উপর পৃথিবীতে তাঁর আরোপিত মিশন পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে।

খ) কাজটি হতে হবে আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় বা আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে। এভাবে মুসলমানরা কাজে-কর্মে, লেখাপড়ার সময়ে, বিশ্রামের সময়ে, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সব সময় ইবাদতের মধ্যেই থাকে। আল্লাহ নির্ধারিত পন্থায় চললে গোটা জীবনই মুসলমানদের ইবাদত।

উত্তর : ৪. পৃথিবী সম্পর্কে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির সাথে শিক্ষার সম্পর্ক

ইসলাম মতে ঈমান-এর সাথে জ্ঞান এর বিরোধ নেই। বরং ইসলাম মতে জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর খলিফা মানুষকে পৃথিবী পরিচালনার উপযোগী করার জন্যে এক উত্তম নেয়ামত। অধিকন্তু ইসলাম মতে জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে একটি উত্তম ইবাদত যদি তা সৎ উদ্দেশ্যে সঠিক জ্ঞান হয়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞান অর্জন ফরয। কারণ :

ক) মানুষের উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রথম অহীর অর্থ হচ্ছে 'পড়' (ইক্বরা) একই ওহীর তার পরবর্তী বাক্যটিতে 'শিক্ষা' এবং 'কলম' শব্দ দুটো এসে কিভাবে সে জ্ঞান অর্জন করতে হবে তারও স্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে।

খ) রাসূল (সা:) হাদীসে মুসলমানদের জ্ঞান অর্জন করার স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন। বস্তুত: জ্ঞান অর্জন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সুপ্রশস্ত করে। যারা যত্ন ও সতর্কতার সাথে জ্ঞান অর্জন করে তারা আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা এবং দয়া সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকে এবং দয়া লাভে সচেষ্ট হয়।

উত্তর : ৫. প্রধান প্রধান নৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধানে ইসলামী শিক্ষা

ধর্মনিরপেক্ষতবাদীরা বলেন যে, পরম ভাল হচ্ছে তাই যা সুখ ও শুদ্ধতা দান করে অথবা তারা আরও বলেন যে, দায়িত্বের জন্যেই দায়িত্ব।

প্রধান নৈতিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে ইসলামের জবাবের ভূমিকা নিহিত আছে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে, যথা–

ক) মানুষ কে?

খ) মানুষের প্রকৃতি কি রকম?

গ) মানুষের এই প্রকৃতির উৎস কি?

ঘ) জগতের প্রতি মানুষের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ?

এসব প্রশ্নের উত্তর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দিলে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম মতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হচ্ছে জীবনের পরীক্ষায় সফলভাবে জীবনকে সুখী করার একমাত্র উপায়। সত্য ও মিথ্যাকে, সৎ এবং অসৎকে পার্থক্যকারী জ্ঞান ও মানদন্ড ইসলামে একটিই এবং তার ভিত অত্যন্ত দৃঢ়– তা হচ্ছে আল্লাহর ওহী (আল কুরআন)। মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ বা চিন্তাপ্রসূত জ্ঞানের মত ওহীর জ্ঞানের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। ইসলাম মুসলমানদের জীবনকে এমনভাবে চালিত করে যার উদ্দেশ্যই থাকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর অপছন্দের কাজ থেকে দূরে থাকা। এই চালিকা শক্তিই সকল লোভ-লালসা, ভয়-প্রলোভন, অভাব-অনটন, সংকট-সন্ধিক্ষণেও মুসলমানদের নৈতিকতার উপর অটল অবিচল রাখে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৬৭ : ১-২

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ১৬:১৪, ২:২৯, ৪৫:১৩, ৭:১৮৫

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৭:৩২, ৫১:৫৬

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৫৮:১১

এফ-৫ ইসলামের নৈতিক বিধানের বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন ১. ইসলামের নৈতিক বিধানের মূল লক্ষ্য কি?

২. ইসলামের নৈতিক বিধানের সাথে ঈমানের সম্পর্ক কি?

৩. ইসলামের নৈতিক বিধানের সাথে ইবাদতের সম্পর্ক কি?

৪. যদি কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক আনুগত্যের প্রভাব তার ব্যবহারিক জীবনে না পড়ে তবে সেক্ষেত্রে কি মন্তব্য করবেন।

৫. ইসলামের নৈতিক বিধানকে যুগোপযোগী করার উদোগ নেয়ার প্রয়োজন ও অনুমতি আছে কি?

উত্তর : ১. ইসলামী নৈতিক বিধানের মূল লক্ষ্য

ইসলামী নৈতিক বিধানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কারো ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করাবার মাধ্যমে ইসলামী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। এমন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা যা আল্লাহ প্রেমে পরিপুষ্ট, যার কর্মতৎপরতা আল্লাহর ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং মন্দ কাজের প্রলোভন থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তিত্ব তার উপর অর্পিত আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ ও সচেষ্ট। সে দায়িত্ব সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি সরল, স্বচ্ছ এবং ভ্রান্তিমুক্ত। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ইসলামের নৈতিক বিধানের লক্ষ্য শুধু ব্যক্তির আত্মউন্নয়নই নয় বরং ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যষ্টির তথা গোটা সমাজের ন্যায়, সাম্য ও সুবিচার কায়েমের এবং অবিচার ও অসত্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নিবেদিত। কাজেই এর লক্ষ্য অনেক সুদূরপ্রসারী যা আল্লাহর খলিফা হিসেবে গোটা সমাজের সবার সমবেত অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি আনে।

উত্তর : ২. ইসলামের নৈতিক বিধানের সাথে ঈমানের সম্পর্ক

ইসলামে নৈতিক বিধান ও ঈমান অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। যদি সমাজ-সভ্যতার উন্নতি আল্লাহ প্রদত্ত নৈতিক বিধানের অনুসারী না হয় তবে ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষ হয় সাময়িক এবং তা একসময় থমকে দাঁড়ায়। এজন্যে কুরআন বলে যে, মানুষের হৃদয়কে যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্গঠিত না করা হবে ততক্ষণ সে উপযোগী প্রতিদান পাবে না। রাসূল (সা:) বলেন, "তোমরা কি জানো তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত, তিনি হচ্ছেন সে যে নৈতিক আচরণে শ্রেষ্ঠ।" নৈতিক বিধানের সাথে ঈমানের সম্পর্ক বিষয়ক আরও একটি হাদীস এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হচ্ছে, রাসূল (সা:) বলেন, "ঈমানদারদের মধ্যে তারাই নিখুঁত ঈমানের অধিকারী যাদের ব্যবহার উত্তম।"

উত্তর : ৩. ইসলামের নৈতিক বিধানের সাথে ঈমানের সম্পর্ক

ইসলাম মতে নিয়ত শুদ্ধ থাকলে একজনের গোটা জীবনের সব কাজই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইসলামের পাঁচস্তম্ভের অন্যতম হচ্ছে নামায আর এটা কোন নৈতিক উত্থান বর্জিত ধর্মীয় আচার আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং নামাজ হচ্ছে গোটা জীবনের নৈতিক উত্থানের সোপান। নামাজের প্রতিটি আনুষ্ঠানিকতা মানুষের নৈতিক উম্মেষ ঘটাবার প্রশিক্ষণ যথা–

ক) এতে আছে আল্লাহর প্রতি সচেতন আত্মসমর্পণ

খ) আনুগত্য ও কোমলতার শিক্ষা

গ) শয়তান থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার।

একইভাবে ইসলামের আরেক স্তম্ভ যাকাতের সাথেও নৈতিকতার সম্পর্ক আছে। কারণ এর মাধ্যমে ধর্মীয় ইবাদতের সাথে সমাজে বঞ্চিতদের সাথে ভালবাসা ও সহানুভূতি বিনিময়ের ব্যবস্থা রয়েছে। রোযার নৈতিক শিক্ষা তাকে স্থায়ীভাবে শয়তানের তাড়না ও জৈবিক তাড়নাকে জয় করতে প্রশিক্ষিত করে। হজ্বের মধ্যে রয়েছে ধৈর্য্য, সহনশীলতা, একাগ্রতা সহ অসংখ্য নৈতিক শিক্ষা।

উত্তর : ৪. ঈমানের বিশ্বাস এবং ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগ

ইসলামে অন্তরের বিশ্বাসের সাথে এর ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োগের কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারো ব্যক্তি জীবনে ইসলামের নৈতিক বিধানের প্রয়োগ না দেখা গেলে বা বিশ্বাসের সাতে কোন বৈপরীত্ব দেখলে বুঝতে হবে তার ঈমান দূর্বল বা অসম্পূর্ণ। এটা কুরআনের কথা। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য হাদীসেও দেখা যায় যেখানে রাসূল (সা:) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কর্মে প্রয়োগ এর মাধ্যমেই অন্তরের ঈমান পরিস্ফুট ও প্রমাণিত হয়।

উত্তর : ৫. ইসলামের নৈতিক বিধানকে সংশোধন করার সুযোগ ইসলামে আছে কি–

ইসলামের নৈতিক বিধানের মৌলিক বুনিয়াদগুলো অপরিবর্তনীয়। অবশ্য এই বিধানের মূলনীতিগুলো ঠিক রেখে প্রায়োগিক কিছু বিষয়কে সময় ও সমাজের সাপেক্ষে যুগোপযোগী করার সুযোগ আছে। ইসলামের নৈতিক বিধানের মৌলনীতি হচ্ছে সেগুলো যা সরাসরি কুরআনে এসেছে বা রাসূল (সা:) এর কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। এগুলো সবই প্রাত্যাদিষ্ট। কাজেই কোন মানুষের পক্ষেই একথা বলার সুযোগ নেই যে, তারা আল্লাহ ও রাসূল (সা:) এর চেয়েও জ্ঞানী হয়ে গিয়েছেন কাজেই তাঁর বিধানকে সংশোধন করার সুযোগ তাদের আছে। অথবা একথা বলাও শোভন বা সংগত নয় যে, আল্লাহর অমুক-অমুক বিধান যুগোপযোগী নয়। কারো জন্যে এটা হবে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। ওহীপ্রাপ্ত বিধানকে পরিবর্তন করার ধারণা বিপদজনক কারণ এটা আল্লাহ প্রদত্ত নৈতিক মানদন্ডকে মানুষের আবেগ ও একপেশে মনোভাবের কাছে জিম্মি করে তোলে। ইসলাম মানুষকে এই শিক্ষাই দেয় যে, তারা

ক্রমাগত তাদের আত্মউন্নয়ন ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করতে থাকবে যাতে তারা আল্লাহ্ ঘোষিত নৈতিক মান অর্জন করতে পারে। এটা না করে তারা যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত নৈতিক মানকে বদলাতে সচেষ্ট না হয়।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. রাসূল (সা:) বলেন, "আমি শুধুমাত্র মানুষের নৈতিক গুণাবলীকে পরিশুদ্ধ করতে প্রেরিত হয়েছি।"। (মুয়াত্তা, ইমাম মালিক)

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ১৩:১১, ৮:৫৩, সূরা ১০৩

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ২৯:৪৫, ২:১৮৩, ২:১৯৭, ৯:১০৩
রাসূল (সা:) বলেন যে আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি শুধুমাত্র তাদের দোয়াই কবুল করি যারা আমার শক্তি ও মর্যাদার সামনে বিনয়াবনত হয়, আমার কোন সৃষ্টিকে কষ্ট দেয় না বা ক্ষতিগ্রস্ত করে না, যারা অনৈতিক কাজে রাত অতিবাহিত করে না, যারা দিনের বেলা আমাকে স্মরণে রাখে, যারা আর্ত-পীড়িত, অসুস্থ, আহত, ভাগ্যাহত মানুষের প্রতি দয়ালু ও ক্ষমাপ্রবণ।"

এফ-৬ হালাল ও হারাম

প্রশ্ন ১. ইসলামের নৈতিক বিধানের বিস্তৃতি মুসলমানদের জীবনে কতটুকু?

২. অনেক নৈতিক বিধান সম্পর্কে বলা হয় যে, সেগুলো অস্পষ্ট। ইসলামের নৈতিক বিধান ও কি তেমন অস্পষ্ট?

৩. কিছু বিষয়কে হারাম করার পেছনে কি দার্শনিক যুক্তি আছে?

৪. হালাল ও হারামের জ্ঞান মানুষ কিভাবে লাভ করবে?

৫. অনুমোদিত বিষয়কে অননুমোদিত করার সুযোগ ইসলামে আছে কি? (কোন অবস্থায় হালাল বিষয়কে হারাম করার সুযোগ ইসলামে আছে কি?)

উত্তর : ১. ইসলামের নৈতিক বিধানের বিস্তৃতি :

ইসলামের নৈতিক বিধানের বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক, জীবনের সর্বত্রই এর প্রয়োগ আছে। অধিকন্তু ইসলামে সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন ও নৈতিক জীবনকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই– ইসলামের নৈতিক বিধান সর্বত্রই প্রযোজ্য। কাজেই ইবাদত গৃহ ত্যাগ করার সাথে ইসলামের নৈতিক বিধানকে মুসলমানরা ইবাদতগৃহে রেখে আসে না। বরং তাকে বহন করে এবং প্রয়োগ করে সর্বত্র সর্বদা। এই বিধান প্রযোজ্য গোত্র, শ্রেণী, নির্বিশেষে সবার উপর সমভাবে।

উত্তর : ২. ইসলামের নৈতিক বিধান কি অস্পষ্ট :

অন্যান্য নৈতিক বিধানের মত ইসলামী নৈতিক বিধান মানুষকে শুধু ধার্মিক, সৎ ও নীতিবান হতেই আদেশ করে না বরং কিভাবে ধার্মিক হওয়া যায়, কোন কোন বিষয় মানুষকে সৎ ও নীতিবান করে তারও নির্দেশনা দেয়। ইসলামী আইন মতে অনুমোদিত (হালাল) এবং অননুমোদিত বিষয়গুলোকে পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। যথা–

ক) মুবাহ— মুবাহ বলতে সাধারণভাবে অনুমোদিত বিষয়গুলোকে বুঝায়। যেসব বিষয় কুরআনে অত্যাবশ্যকীয় (ফরজ), বাঞ্ছিত, অপছন্দনীয় বা নিষিদ্ধ হিসেবে বর্ণিত হয়নি এমন সব বিষয়ই 'মুবাহ'— এর অন্তর্ভুক্ত।

খ) মুস্তাহাব— মুস্তাহাব বলতে বুঝায় এমন বাঞ্ছিত বিষয় যা কখনই মুসলমানদের উপর অবশ্য কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট নয়। যেমন নির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অতিরিক্ত নফল নামাজ, ফরজ রোজার বাইরে নফল রোযা এসব মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত।

গ) ফরজ— 'ফরজ' বলতে মুসলমানদের জন্যে অবশ্যপালনীয় বিষয়গুলোকে বুঝায়। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোযা, সামর্থ্যবানের যাকাত, পরিবারের ভরণপোষণ (স্বামীর জন্যে) ইত্যাদি। শাসক ও বিচারকের জন্য ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েম করা ফরজ।

ঘ) মাকরূহ— মাকরূহ মানে এমন বিষয় যা অপছন্দনীয় এবং যা করতে সাধারণভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তবে এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম) নয় ফলে এর সীমা লংঘিত হলে হারাম এর মত গোনাহ হয় না। যেমন, ধূমপান যদিও কঠোরভাবে অপছন্দনীয় তবুও এটা মদপানের মত হারাম নয়।

ঙ) হারাম— হারাম বলতে বোঝায় এমন বিষয় যা মুসলমানের জন্য সম্পূর্ণরূপে বেআইনী ও নিষেধ। যেমন ব্যভিচার, মদ্যপান, হত্যা ইত্যাদি। ইসলাম মুসলমানদের হারাম থেকে দূরে থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করে।

উত্তর : ৩. কিছু বিষয় হারাম হবার পেছনে দার্শনিক যুক্তি

ইসলামে যুক্তি ভিন্ন শুধু কুসংস্কারের বশে কোন কিছুকে হারাম করা হয়নি বা হারাম ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ভাল কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। কুরআন বলে যে, আল্লাহ পৃথিবী ও বেহেশতের সব কিছু শুধু মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন; সেই আল্লাহই যখন মানুষের জন্য কিছু নিষিদ্ধ করে তখন বুঝতে হবে যে, এর পেছনে অবশ্যই জোরালো যুক্তি আছে। এর মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে খাঁটি এবং কল্যাণকর সবকিছু মানুষের জন্য অনুমোদিত করা এবং তার জন্য ক্ষতিকর সবকিছু থেকে তাকে দূরে রাখা। যারা সত্যিকার ঈমানদার তারা সরাসরি আল্লাহ যেসব বিষয় তার জন্য হারাম করেছে তাকে বর্জন করে– সেসব বিষয় আসলেই ক্ষতিকর কিনা তার বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিকতা প্রমাণের অপেক্ষায় থাকে না।

উত্তর : ৪. হালাল-হারাম সংক্রান্ত জ্ঞানের উৎস

হালাল-হারাম সংক্রান্ত জ্ঞানের ভূমিকায় বলতে হয় যে নিষিদ্ধ হবার বিষয়ে স্পষ্ট দলিল প্রমাণ নেই এমন সব কিছুই ইসলামে অনুমোদিত। শুধু নির্দিষ্ট কিছু বিষয় অননুমোদিত। অননুমোদিত (হারাম) বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের জন্য তিন ধরনের জ্ঞানের উৎস রয়েছে, যথা–

ক) আল কুরআন— কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম (কথা)। জগৎসমূহের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্ব রয়েছে তার সৃষ্টিকূলের জন্য যে কোন বিষয়কে হালাল বা হারাম করার।

খ) হাদীস (সুন্নাহ)— হাদীস হচ্ছে রাসূল (সা:) এর কথা ও কর্ম। রাসূলের (সা:) হাদীস ইসলামী নৈতিক বিধানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কারণ কুরআন বলে, "যে আল্লাহর রাসূল (সা:) কে মানে সে আল্লাহকেই মানে।

গ) ইজতিহাদ— রাসূল (সা:) এর মিশন সমাপ্তির কয়েকশতক পর যখন আর নতুন করে ওহী আগমনের সুযোগ নেই তখন সৃষ্ট বিভিন্ন নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন কৃপাহত্যাজনিত (Euthanasia) মৃত্যুর ইস্যু, নতুন নতুন নেশাদ্রব্য আবিষ্কার হবার প্রেক্ষিতে

সেগুলোর বিষয়ে ইসলামী বিধান প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী পন্ডিতগণ কোরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত একই জাতীয় ভিন্ন সমস্যা সমধানের মূলনীতি অনুসরণ করে এসব সমস্যার বিষয়ে সমাধান দেন– এই প্রক্রিয়ারই নাম ইজতিহাদ। যেমন ইজতিহাদ এর মাধ্যমেই এল. এস. ডি, হাশিশ, হিরোইন ইত্যাদি নেশাদ্রব্যকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আদি মৌলনীতি হচ্ছে কুরআনে নেশাদ্রব্য ও চেতনা বিলোপকারী (Intoxicant) হিসেবে মদকে নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, যেসব কাজ মানুষকে হারাম কাজের কাছে নিয়ে যায় তাও হারাম। যেমন ইসলামে ব্যাভিচার হারাম আর পর্ণোগ্রাফী মানুষকে ব্যাভিচারে উৎসাহিত করে, অতএব সেটাও হারাম। এছাড়াও মুসলমানদের কঠোরভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে যেসব কাজের অননুমোদনের বিষয়টি সন্দেহাতীত নয় তা এড়িয়ে চলতে। সবশেষে বলতে হয় ভাল নিয়ত কোন অননুমোদিত কাজকে অনুমোদিত করে না। রবিনহুড— এর মত অন্যায়ভাবে ডাকাতিলব্ধ অর্থ দান করে মহৎ হবার কোন সুযোগ ইসলামে নেই।

উত্তর: ৫. হালাল বিষয়কে হারাম করা এবং হারামকে হালাল করা প্রসঙ্গে

কোন মানুষের জন্য হালাল বিষয়কে হারাম করার বা এর বিপরীত কাজ করার অনুমতি ইসলামে নেই। কারণ এটা মানুষের জ্ঞানকে আল্লাহর জ্ঞান কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উপর স্থান দেয়ার শামিল। কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার মানুষের নেই।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৬:১৪৬, ৭:১৫৭

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ২:১৬৮, ৫:৮৮, ৪২:২১

হাদীসে আছে আল্লাহ বলেন যে, তিনি কিছু বিষয়কে হালাল করেছেন এবং কিছু বিষয়কে হারাম করেছেন, এ দুটো বিষয়ের মাঝে আছে এক ধূসর এলাকা, যারা তাদের ঈমানকে রক্ষা করতে চায় তাদের উচিৎ ঐ এলাকা এড়িয়ে চলা।

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ১০:৫৯, ৬:১৩৮, ৫:৮৭

'ইসলামে হালাল হারামের বিধান,' আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী।

এফ-৭ ঈমান এবং জীবন সংরক্ষণ বিষয়ে ইসলামী বিধান

প্রশ্ন ১. অননুমোদিত (হারাম) বিষয়গুলোর কোন শ্রেণীবিন্যাস ইসলামে আছে কি?

২. 'শিরক' নৈতিক অপরাধের অন্তর্ভুক্ত কেন? এটা কিভাবে ঈমান ধ্বংস করে?

৩. কুরআনের পূর্বের ঐশী কিতাবগুলোতেও কি 'শিরক'কে নৈতিক অপরাধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল?

৪. ইসলামী নীতিবিদ্যা অনুসারে ব্যবহারিক জীবনে ঈমানের সাথে নৈতিক আচরণের সম্পর্ক কি?

৫. ঈমান রক্ষার জন্য আর কি কি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ইসলামী নীতিবিদ্যায় আছে?

৬. মানুষের জীবনকে পবিত্র ঘোষণা করে এটাকে রক্ষার জন্য ইসলাম কি বলেছে?

৭. অনিচ্ছাকৃত হত্যা, কৃপাহত্যা (Euthanasia), গর্ভপাত, আত্মহত্যা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৮. ইসলাম মতে মানবজীবন রক্ষা করার সাথে সামাজিক ন্যায়বিচারের কি সম্পর্ক?

উত্তর : ১. হারাম বিষয়গুলোর শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতি

ক) ঈমান রক্ষা করা

খ) জীবন রক্ষা করা

গ) মানুষের মন-মানসিকতা রক্ষা করা

ঘ) মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা

ঙ) মানুষ ও পৃথিবীর সম্পদ রক্ষা করা

বস্তুত: হালাম-হারাম সংক্রান্ত যে কোন বিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তা কোন না কোনভাবে উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয়ের যে কোন এক বা একাধিক লক্ষ্যে নিবেদিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইসলামী নীতিবিদ্যা শিরক, যাদু ও ইন্দ্রজালকে হারাম ঘোষণা করে মানুষের ঈমান রক্ষা করার জন্যে। তেমনি এটা জীবন রক্ষার জন্যে হত্যা ও সন্ত্রাস'কে নিষেধ করে, আবার জীবনকে নিরোগ, সুস্থ রাখতে খাদ্যের ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করে। মেধা ও মননকে সুস্থ ও বিকারমুক্ত রাখতে সকল ধরনের নেশাদ্রব্য নিষিদ্ধ করে, মানুষের সম্মান-ইজ্জতের হেফাযত করতে ব্যভিচারকে নিষেধ করে এবং মানুষের সম্পদ রক্ষার জন্য সকল ধরনের চুরিকে হারাম করে।

উত্তর : ২. নৈতিক অপরাধ হিসেবে শিরক

শিরক মানে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও সার্বভৌমত্বে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা। এটা মানে এই নয় যে, ইসলাম মতে শুধু বহু ঈশ্বরবাদীরাই শিরক-এর অপরাধ করে বরং ইসলাম মতে আল্লাহর নিজস্ব ক্ষমতা ও গুণাবলীকে তাঁর যে কোন সৃষ্টির মধ্যে যে কোনভাবে আরোপ করাই শিরক। ইসলামী তাওহীদবাদ হচ্ছে সরল আপোষহীন এবং যে কোন শিরক-এর দূষণমুক্ত। ফলে এটাকে কোন ভ্রান্ত দর্শন দিয়ে অপব্যাখ্যার সুযোগ নেই। তাওহীদ-এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুসলমানদের প্রতিনিয়ত দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। নামায, আযান ও একামতে বারবার আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা সূচক শাহাদাহ উচ্চারণ করা হয়। তদুপরি কুরআনের সর্বত্র শিরক এর ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে ক্ষমাশীল আল্লাহ শিরক-এর অপরাধ কখনও ক্ষমা করবেন না।

উত্তর : ৩. কুরআনের পূর্বের কিতাবসমূহে নৈতিক অপরাধ হিসেবে শিরক

ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী রাসূল-এর মূল মিশনই ছিল মানুষকে এক আল্লাহ ছাড়া আর সকল উপাস্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ঈমানদার বানানো। কাজেই তাওহীদই ছিল সকল নবীর মিশনের মূল উদ্দেশ্য।

উত্তর : ৪. ঈমানের সাথে নৈতিক আচরণের সম্পর্ক

যখন মানুষ সচেতনভাবে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার মত কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় তখন থেকেই সে স্বাভাবিকভাবেই পুরোপুরি আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তখন থেকে তার সমস্ত কর্মই আল্লাহর বিধান অনুসারে হতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক ঈমানের দাবী। এই দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিকভাবে আত্মসমর্পণ তার পুরো জীবনে আল্লাহর অনুগত বানিয়ে দেয়। এর ফল এই হয় যে, সামাজিক রীতিনীতি, রাষ্ট্রীয় আইন এবং সকল পার্থিব চাপের মুখেও আল্লাহর আইন অনুসরণই তার কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়। যে শিরককে প্রত্যাখ্যান করেছে তার কাছে আল্লাহই সর্বাগ্রে এবং সবার উপরে।

উত্তর : ৫. ঈমান রক্ষার জন্য অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ছাড়াও ইসলামে আরও তিনটি বিষয়কে তাওহীদের পরিপন্থী বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যথা-

ক) যাদু ও ইন্দ্রজাল— এ বিষয়ে সিরিজের 'ডি' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, পেশা হিসাবে যাদুবিদ্যাকে নেয়া, এটা শেখা বা যাদুকরের সাহায্য চাওয়া সবই ইসলাম মতে নিষিদ্ধ। একইভাবে এটা বিশ্বাস করাও নিষিদ্ধ যে আল্লাহ ছাড়া কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।

খ) স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচার— নির্যাতন ও ধর্মীয় অবদমনের কোন সুযোগ ইসলামে নেই। বরং মুসলমানদের আদেশ করা হয়েছে নির্যাতিতদের পক্ষে এবং নির্যাতকদের বিরুদ্ধে লড়তে। এটা জেহাদ।

গ) মূর্তিপূজা ও মূর্তি চর্চা— যে কোনভাবে মূর্তির ব্যবহার ও তাকে সম্মান প্রদান ইসলামে নিষেধ। এমনকি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে ইৎসর্গীকৃত প্রাণীর গোশত খেতেও মুসলিমদের নিষেধ করা হয়েছে।

উত্তর : ৬. মানব জীবন রক্ষায় ইসলামের বিধান

ইসলাম মতে মানুষের জীবন হচ্ছে পবিত্র এবং আল্লাহর আমানত। কাজেই মানুষের জীবন নাশের অধিকার কারো নেই। হত্যা এবং আত্মহত্যা কোনটির সুযোগই ইসলামে নেই। পরোক্ষ মৃত্যুর জন্যও ইসলামে আর্থিক শাস্তির বিধান আছে। যা নিবারক হিসেবে কাজ করে সমাজকে হত্যা-সন্ত্রাস থেকে মুক্ত রাখে।

উত্তর : ৭. অনিচ্ছাকৃত হত্যা, কৃপাহত্যা, (Euthanasia) গর্ভপাত, আত্মহত্যা প্রসঙ্গে ইসলাম

অনিচ্ছাকৃত ও দুর্ঘটনাবশত: মৃত্যুর জন্য ইসলাম আর্থিক ক্ষতিপূরণসহ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সান্ত্বনার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। হত্যাকাণ্ডের জন্য কোন ক্ষমার কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। কাজেই কৃপাহত্যার (Euthanasia) সুযোগ ইসলামে নেই। যে উদ্দেশ্য নিয়েই চেতনা নাশক ওষুধ বেশি পরিমাণে কোন কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেয়া হোক না কেন তা হত্যা সমতুল্য।

যে কোন অবস্থাতে মানব ভ্রূণের বৃদ্ধি ব্যহত করাটাই হবে এক নিষ্পাপ জীবনকে হত্যার শামিল। কাজেই গর্ভপাত এখানে কঠোরভাবে নিষেধ। শুধুমাত্র যদি মায়ের জীবনহানির আশংকা থাকে তবেই গর্ভপাতের অনুমোদন আছে (কোন কোন আলেম যেসব ভ্রূণের ভবিষ্যতে বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই যেমন Spina bifida সেসব ভ্রূণের গর্ভপাতের অনুমোদন দিয়েছেন- অনুবাদক)।

আত্মহত্যা ইসলাম মতে মহাপাপ এবং কঠোরভাবে নিষেধ।

উত্তর : ৮. মানবজীবন রক্ষা করার সাথে সামাজিক ন্যায়বিচারে সম্পর্ক

মানবজীবনকে পবিত্র ঘোষণা করে একে রক্ষার আদেশ করার মাধ্যমে ইসলাম শুধু জীবন রক্ষা করতেই তাগিদ দেয়নি বরং সার্বিকভাবে আরও বৃহত্তর পরিসরে নির্দেশ দিয়েছে। মানুষকে সম্মানজনকভাবে জীবন-ধারণের সুযোগ দিতে হবে- এটাই ইসলামের শিক্ষা। কাজেই আদর্শ ইসলামী সমাজে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক চাহিদার যথা খাদ্য, আশ্রয়, বস্ত্র, যাতায়াত সুবিধা জীবিকা ইত্যাদির ন্যূনতম প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এসব কিছুই একটি মানুষকে সম্মানিত নাগরিকের স্তরে উপনীত করে।

সমাজের মধ্যে লোভের প্রশ্রয়, সম্পদের অসম বণ্টন, এমন অর্থব্যবস্থা চালু থাকা যা ধনীকে আরও ধনবান করে আর বঞ্চিতকে আরও প্রতারিত করে-এসব কিছুই ইসলামের দৃষ্টিতে ইনসাফের লংঘন। ইসলামে এগুলোকে মানবজীবন রক্ষার পরিপন্থি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন সমাজে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নেই-এটা ইসলামের পরিপন্থী।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৭:১৯৪, ৩৯:৩৮, ৪:১১৬, ৪:৪৮, ২২:৩১, ৭২:২০, ১৮:৪২-৪৩

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৭:৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮০, ৮৫; ২১:২৫, ৩৬:৬০-৬১, ২:১৩১-১৩২, ৫:৭৫, ৩১:১৩, ৩৯:৬৫, ৬:১৫১

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৪৯:১-২

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ১৭:৩৩, ৫:৩৫, ২:১৭৯

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ৪:২৯

এফ-৮ খাদ্য সম্পর্কে ইসলামী বিধান

প্রশ্ন ১. খাদ্য সম্পর্কে ইসলামী বিধান কি? এর সাথে ইসলামের জীবনরক্ষার মূলনীতির সম্পর্ক কি?

২. শিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৩. প্রাণী হত্যার বিষয়ে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান কি?

৪. মৃত প্রাণীর হাড় অথবা চামড়া ব্যবহারের অনুমতি ইসলামে আছে কি?

উত্তর : ১. খাদ্য সম্পর্কে ইসলামী বিধানের সাথে ইসলামের জীবনরক্ষার মূলনীতির সম্পর্ক

ইসলামের লক্ষ্য জীবনকে শুধু রক্ষাই নয় বরং তাকে সুস্থ সবলভাবে টিকিয়ে রাখা। এজন্যে ইসলামে যা কিছু কল্যাণকর তাকে বৈধ করা হয়েছে। এবং যা কিছু বিপদজনক, অশান্তিদায়ক বা অকল্যাণকর তাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই মানুষকে কিছু তৃপ্তিদায়ক বা কল্যাণকর খাবার থেকে বঞ্চিত করে কষ্ট দেবার জন্য নয় এবং মানুষের সার্বিক সুস্থতা ও মঙ্গলের জন্য কিছু খাদ্য-পানীয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খাদ্য সম্পর্কে ইসলামী বিধান কুরআনের পঞ্চম সূরার তৃতীয় আয়াতে আছে। উক্ত আয়াত অনুসারে মুসলমানদের জন্য নিম্নলিখিত খাদ্য নিষিদ্ধ যথা:

'মৃত প্রাণীর গোশত'— মৃত প্রাণীর গোশত এবং যেসব প্রাণীকে যথা নিয়মে জবাই করা হয়নি সেসব প্রাণীর গোশত। এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে দু'টি যৌক্তিক কারণ আছে, যথা-

ক) মৃত প্রাণীর মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত থাকে। হয়তবা তার মধ্যে কোন সংক্রামিক-ক্ষতিকারক রোগ থাকতে পারে অথবা কোন অজানা বিষের ক্রিয়ায় তার মৃত্যু হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই এই গোশত জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

খ) যখন কোন প্রাণী মৃত্যুবরণ করে তখন রক্ত তার ধমনী ও শিরার ভেতর জমাট বাঁধে (Clot) আর এই জমাট বাধা রক্ত রোগ জীবানুর জন্য উর্বর চারণভূমি (Culture media) হয়ে পড়ে। যেখানে দ্রুত ব্যাকটেরিয়া বংশ বিস্তার করে এবং পরবর্তীতে যে এই গোশত খাবে তার জন্যে ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরী করে।

'রক্ত'— প্রাক ইসলামী আরবরা কোন কোন প্রাণীর শরীরে ছুরি দিয়ে আঘাত করে সেখান থেকে নি:সৃত রক্ত সংগ্রহ করে তা পান করত। এটা নি:সন্দেহে প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং সম্ভবত: এই রক্তপান তাদের জন্যেও স্বাস্থ্যহানিকর। ইসলাম এই

রক্তপানকে হারাম করেছে (চিকিৎসা বিজ্ঞান মতেও রক্ত পান স্বাস্থ্যের জন্যে বিপদজনক-অনুবাদক)।

'শ্বাসরুদ্ধ করে বধ করা প্রাণী'— এভাবে প্রাণী হত্যার পদ্ধতিটি যেমন নিষ্ঠুর তেমনি এভাবে বধ করা প্রাণীর রক্ত তার শরীরের ভেতরেই আবদ্ধ থেকে যায়।

'তীব্র আঘাতে মৃত প্রাণীর গোশত'— এভাবে মৃত প্রাণীর রক্ত যেমন তার শরীরের ভেতরে জমাট বাঁধে তেমনি এভাবে প্রাণী হত্যাটাও নিষ্ঠুর।

'উপর থেকে নীচে পড়ে মৃত প্রাণীর গোশত'— এক্ষেত্রেও উপরের নিষেধাজ্ঞার মতই এক কথা প্রযোজ্য।

'কোন মাংশাসী প্রাণী কর্তৃক আংশিক ভুক্ত প্রাণীর গোশত'— এক্ষেত্রে মাংশাসী প্রাণীর লালা উক্ত গোশতে থেকে যেতে পারে যা মানুষের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। তাছাড়া এভাবে প্রাপ্ত গোশতে সাধারণত: পচন শুরু হয়ে যায় এবং প্রাণীর মৃত্যু কত আগে হয়েছে সে তথ্যও অজ্ঞাত থাকে। এক্ষেত্রে একমাত্র ছাড় হচ্ছে যে, মাংশাসী প্রাণী ভক্ষণরত অবস্থায় যদি উক্ত প্রাণীকে জীবিত উদ্ধার করা যায় এবং তার মৃত্যুর আগেই তাকে যথার্থভাবে জবাই করা যায় তবে উক্ত প্রাণীর গোশত মুবাহ হবে।

'শুকরের গোশত' — এফ-৯ দ্রষ্টব্য।

উত্তর : ২. শিকার সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে শিকার করা প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয, তবে শর্ত এই যে, উক্ত প্রাণীকে জীবিত অবস্থাতেই যথানিয়মে জবাই করতে হবে। কাজেই শিকার করা প্রাণীর গোশত জায়েয পন্থায় খেতে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে। যথা:

ক) শিকারের জন্যে এমন অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে যা রক্ত ঝরাবে। যেমন তীর, বুলেট অথবা ধারালো যে কোন কিছু। প্রাণীর মস্তক লক্ষ্য করেই তীর বা গুলি ছুঁড়তে হবে।

খ) শিকারের সময় আল্লাহ্‌র নাম নিতে হবে।

গ) শিকারের সহায়তার জন্যে অন্য কোন পোষা প্রাণীর (যেমন কুকুর) সাহায্য নিলে উক্ত প্রাণীকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেন তা শিকারকৃত প্রাণীর গোশত না খায়।

শিকার করা প্রাণীর গোশত কেনার আগে মুসলমানদের অবশ্যই খোঁজ নিতে হবে যে, শিকারী মুসলিম, খ্রিস্টান অথবা ইহুদী ছিলেন (পৌত্তলিক ছিলেন না)।

উত্তর : ৩. প্রাণী হত্যা বিষয়ে ইসলামী বিধান

প্রাণী হত্যায় ব্যবহৃত ছোরা বা অস্ত্র হতে হবে অত্যন্ত ধারালো যা দ্রুত এবং সবচাইতে কম কষ্ট দিয়ে জবাই নিশ্চিত করবে। মুসলিম আইনবিদরা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে গলা

এবং তার সংলগ্ন ধমনীর শিরাগুলো কাটতে বলে। অধিকাংশ আইনবিদের মতে জবাই করা গোশত জায়েয করার জন্যে জবাই এর সময়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ অপরিহার্য। জবাই কার্য যথাসম্ভব মানবিক উপায়ে সম্পন্ন করতে হবে। যদি কোন মুসলমান প্রাণী জবাই এর আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে ভুলে যায় অথবা যদি কোন খ্রিস্টান বা ইহুদী আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করেই প্রাণী জবাই করে তবুও উক্ত জবাইকৃত প্রাণীর গোশত মুসলমানদের জন্যে মুবাহ হবে তবে শর্ত এই যে, খাবার পূর্বে আল্লাহর নাম নিতে হবে।

উত্তর : ৪. মৃত প্রাণীর চামড়া ও হাড়-এর ব্যবহার প্রসঙ্গে

ইসলাম মতে স্বাভাবিকভাবে মৃত প্রাণীর চামড়া ও হাড় ব্যবহার করা যাবে। নিষেধাজ্ঞা শুধু গোশত খাবারের বিষয়েই থাকবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলের হাদীস আছে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৫:৪
মৃত প্রাণীর গোশত খাবার নিষেধাজ্ঞার দুটো ব্যতিক্রম .. যথা– মৃত মাছ ও চিংড়ী, (এ প্রসঙ্গে হাদীস আছে)

প্রশ্ন ৩. হাদীসে রাসূল (সা:) বলেন, মুসলমানরা সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ পন্থায় খাবার উদ্দেশ্যে প্রাণী জবাই করবে। তা হচ্ছে ধারালো ছুরি ব্যবহার করবে এবং সম্ভব হলে এক প্রাণীর সামনে অপর প্রাণীকে জবাই করবে না।

এফ-৯ শুকর : ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ

প্রশ্ন ১. শুকরের গোশত খাওয়ার বিষয়ে কুরআনে সুনির্দিষ্ট কি কি নিষেধাজ্ঞা আছে?

২. উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞা কি শুধু শুকরের গোশতের উপরই প্রযোজ্য নাকি শুকরজাত অন্যান্য ভোজ্য সামগ্রী (যেমন Lard) এর উপরেও প্রযোজ্য।

৩. শুকরের গোশত নিষেধ হওয়া বিষয়ে ইহুদী এবং ইসলামী আইনের মধ্যে মিল থাকার বিষয়ে মন্তব্য করুন।

৪. খ্রিস্টানরা কেন শুকরের গোশত খাওয়াকে অনুমোদিত মনে করে?

৫. ইসলামে শুকরের গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ হবার কারণ কি কি?

৬. হাস-মুরগী ও তো বিষ্ঠা খায়, তাহলে হাস-মুরগী ভক্ষণ অনুমোদিত আর শুকর ভক্ষণ নিষেধ কেন?

উত্তর : ১. কুরআনে শুকরের গোশত বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে

শুকরের গোশত খাওয়া নিষেধ ঘোষণা করে কুরআনে চারটি আয়াত আছে। এর মধ্যে তিনটি আয়াতে শুধু মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু একটি আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকেই শুকরের গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে শুকরের গোশত বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের উপরও ছিল এবং পূর্বতন কিতাবসমূহে এ বিষয়ে উল্লেখ ছিল।

উত্তর : ২. নিষেধাজ্ঞা কি শুধু শুকরের গোশতের উপরই প্রযোজ্য?

কুরআনের নিষেধাজ্ঞা শুকরের গোশতসহ শুকরজাত সকল ভোজ্য বিষয়ের উপর প্রযোজ্য। কারণ গোশতের আরবী শব্দ 'লাহ্‌ম' গোশত ছাড়াও প্রাণীজাত আর সকল ভোজ্য বিষয়েরও প্রতিশব্দ। 'লাহাম' শব্দের এই বিস্তৃত প্রয়োগ এর উদাহরণ কুরআনের আরও কয়েকটি আয়াতে দেখা যায়।

উত্তর : ৩. শুকরের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে ইহুদী এবং ইসলামী আইনের তুলনা

ওল্ড টেস্টামেন্টের বহু জায়গায় ইহুদীদের শুকরের গোশত স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এটা অপরিস্কার। ওল্ড টেস্টমেন্টের আইন খ্রিস্টানদের উপরও প্রযোজ্য কারণ এটা তাদেরও ধর্মগ্রন্থ। যেহেতু যিনি মূসা (আ:)-এর উপর কিতাব নাযিল করেছিলেন তিনিই ঈসা (আ:) এবং রাসূল মুহাম্মদ (সা:)-এর উপর কিতাব নাযিল করেছিলেন সেহেতু ইহুদী আইন এবং মুসলিম আইনের মাঝে এ মিল থাকাটাই স্বাভাবিক।

উত্তর : ৪. খ্রিস্টানরা কেন শুকরের গোশত খাওয়া অনুমোদন করে?

এ বিষয়ে খ্রিস্টানদের যুক্তি হচ্ছে যে, ঈসা (আ:) এবং তাঁর কিতাব বাইবেল-এর আগমন সব কিছুকে পবিত্র করেছে। একজন নেতৃস্থানীয় খ্রিস্টান যিনি এই যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি তিনি হচ্ছেন সি. লিওনার্ড ভরিস, যিনি তাঁর গ্রন্থ, "The Hog: Should It Be Used For Food?'-এ শুকরের গোশত প্রসঙ্গে খ্রিস্টানদের মতকে প্রত্যাখান করেছেন। তিনি বলেছেন এটা অবাস্তব যে, বাইবেল শুকরের স্বভাবকেও পরিবর্তন করে পবিত্র করবে যেখানে খোদ মানুষই তার স্বভাব বদলে পবিত্র হয়নি। এই বলে তিনি মত দেন যে, যেহেতু বাইবেল শুকরের স্বভাব বদলায়নি সেহেতু শুকরের বিষয়ে ওল্ড টেস্টামেন্টের নিষেধাজ্ঞাই বহাল থাকবে। এতসব সত্ত্বেও খ্রিস্টানদের কাছে শুকরের গোশত গ্রহণযোগ্য হবার দুটো সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে–

ক) খ্রিস্টানদের আদি ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, কনস্টানটাইন-এর আমলে বহু ইহুদী'কে জোর করে খ্রিস্টান বানানো হয়েছিল। এই জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত নও-খ্রিস্টানদের আনুগত্যের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে কনস্টান্টিনোপোলের ধর্মগুরু পরামর্শ দেন তাদের শুকরের গোশত খেতে আদেশ করতে– যারা স্বেচ্ছায় শুকরের গোশত খাবে না ধরে নেয়া হবে তারা মনে প্রাণে ইহুদীই রয়ে গিয়েছে। যখন কনস্টানটাইন তার ধর্মগুরুর কাছে শুকরের গোশত খাওয়ার বিষয়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যা জানতে চাইল তখন তিনি বললেন, নিউ টেস্টামেন্ট অনুসারে যাই মুখের ভেতর যাচ্ছে তাই পবিত্র আর যা শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তাই অপবিত্র।

খ) সেন্ট পিটার দাবি করেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে স্বয়ং আল্লাহ অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে যেটা ইচ্ছে সেটাই জবাই করে খেতে তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন। তিনি আরও দাবি করেন যে, সেসব প্রাণীর মধ্যে তিনি শুকরও দেখেছেন। এ বিষয়ে মুসলমানদের বক্তব্য এই যে, ইসলামী শরীয়তে এমনকি কোন পূণ্যাত্মা ব্যক্তির স্বপ্নকেও আইনের উৎস মনে করা যাবে না। বাইবেলের সুস্পষ্ট বিধান এই যে, শুকরের গোশত খাওয়া হারাম তাহলে একজনের স্বপ্নে তা অনুমোদিত হয় কিভাবে। মথীর (Mathew) লিখা অনুসারে জানা যায় যে, ঈসা (আ:) বলেছেন, "আমি পূর্ববর্তী নবীদের আইনকে পূর্ণতা দিতে এসেছি", কাজেই তাঁর দ্বারা পূর্ব থেকে হারাম ঘোষিত শুকর হালাল হবার কোন যৌক্তিকতা নেই। কাজেই খ্রিস্টানদের কাছে শুকরের গোশত অনুমোদিত হবার বিষয়ে কোন দালিলিক ভিত্তি বা তথ্য প্রমাণ নেই।

উত্তর : ৫. ইসলামে শুকর-এর গোশত নিষিদ্ধ হবার কিছু কারণ

ঈমানদার মুসলমান-এর জন্যে শুকরের গোশত স্পর্শ না করার পেছনে এতটুকু যুক্তিই যথেষ্ট যে, আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন। যদি আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত বস্তুর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কোন তথ্য নাও পাওয়া যায় তবুও

আমরা তা বর্জন করে যাবো। 'কুরআন' যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় নবীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে তার কোথাও এতটুকু ভুল, অসংগতি বা অপূর্ণতা নেই। অবশ্য ইসলাম তার অনুসারীদের অন্ধ অনুকরণ করতে বলে না বরং আল্লাহর সৃষ্টিশৈলী ও বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর বিধান নিয়ে গবেষণা করতেই উৎসাহিত করে। এ জন্যে ইসলাম এ ধরনের আচরণকে অনুমতি দেয় যেমন কেউ বললো, 'যেহেতু আল্লাহ এটা নিষেধ করেছেন সেহেতু আমি এটা স্পর্শ করবো না। আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে মেনে চলবো। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সাথে আমি তাঁর এ নিষেধাজ্ঞার পেছনে কারণ ও যুক্তি অনুসন্ধান করবো।' পক্ষান্তরে ইসলাম এ ধরনের প্রবণতাকে নিষেধ করে যেমন কেউ বললো, "আল্লাহ এটা নিষেধ করেছেন কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যৌক্তিক কারণ না পাওয়া পর্যন্ত আমি আল্লাহর আদেশ মানবো না।"

কুরআনে শুকরের গোশত নিষিদ্ধ হবার পক্ষে যেসব পরোক্ষ যুক্তি পাওয়া যায় তা হচ্ছে–

ক) যেহেতু স্বাস্থ্য বিজ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শুকরের গোশত উপকারী গোশতের মধ্যে পড়ে না সেহেতু এটা হারাম হওয়াই উচিৎ।

খ) কুরআনে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, শুকরের গোশত খাওয়া এক ধরনের অপবিত্রতা। আরও বলা হয়েছে এটা নোংরা এবং ঘৃণ্য। কুরআনে বর্জ্যভুক প্রাণী ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুকর প্রকৃতিগতভাবেই বর্জ্য ও বিষ্ঠাভুক। শুকর সবকিছুই খায়, এমনকি যত্নের সাথে খামারে পালন করলেও এটা নোংরা জিনিস বিষ্ঠা খায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই মানুষ নোংরা কিছুর উপমা দিতে গেলে বলে যে, 'শুকরের মতো নোংরা'।

উত্তর : ৬. বিষ্ঠা খাওয়া সত্ত্বেও হাস-মুরগীর গোশত হালাল কেন?

হাস-মুরগী কখনও কখনও বিষ্ঠা খায় যার সাথে শুকরের নিয়মিত বিষ্ঠাভক্ষণের স্বভাবের অনেক পার্থক্য আছে। এছাড়াও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় খাবারকে শরীরের ভেতরে প্রক্রিয়াজাত করবার জন্যে হাস-মুরগীর দুটো পাকস্থলী আছে (glandular এবং gizzard)। কাজেই গৃহীত খাবার-এর ময়লা দূর করতে তারা যথেষ্ট পারদর্শী। (জাবর কাটা প্রাণীদেরও দুই বা ততোধিক পাকস্থলী থাকে) অন্যদিকে শুকরের মাত্র একটি পাকস্থলী আছে যার গঠনও খুব সরল। তাই নোংরা খাবার তিন ঘন্টার মধ্যেই তা শুকরের শরীরে পুষ্টি বিধান করে। এছাড়াও ইসলামী শরীয়ত মতে বিষ্ঠা ও আবর্জনা খেকো প্রাণীর গোশত খাওয়া তো দূরের কথা সেসব প্রাণীর পিঠে চড়াও নিষেধ।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ২:১৭৩, ৫:৩, ১৬:১১৪-১১৫, ৬-১৪৫

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ২৩:১৪, ২:১৫৯, ৩৫:১২, ১৬:১৪, ২২:৩৭, ৫৬:২১, ৫২:২২

প্রশ্ন ৩. Lev ১১:৭-৮, Isaiah ৬৫:৪, ৬৬:১৭, Deut ১৪:৩-৮

আরও দেখুন- "Pork- possible Reasons for its prohibition". Dr. A. Sakr. "The Hog-Should It be Used for Food." C. Leonard Vories.

এফ-১০ শুকর : চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

প্রশ্ন ১. শুকরের নোংরা খাবার স্বভাব কি তাকে উন্নতমানের খাবার সরবরাহের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়?

২. চিসিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শুকর খাবার বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি আছে?

৩. শুকরের চর্বির অনু মানব শরীরে হজম এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে কঠিন কেন ব্যাখ্যা করুন?

৪. ট্রাইগ্লিসারাইড-এর গুরুত্ব কি?

৫. ২নং কার্বনে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের ক্ষতিকর দিক কি? (ওমেগা-২)

৬. চর্বি হজম ও প্রক্রিয়াজাতকরণের এই সমস্যা কি শুধু শুকরের চর্বির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নাকি যে কোন চর্বি বা তেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

৭. যদি শুকরের চর্বি ঠিকমতো প্রক্রিয়াজাত নাই হয় তাহলে এটা রক্তে প্রবাহিত হলে কি হয়?

৮. যারা বলে যে, শুকরের চর্বিতে প্রচুর অসম্পৃক্ত ফ্যাটও আছে তাদের যুক্তির জবাবে কি বলবেন?

৯. শুকর-এর গোশত খেলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কি কি ক্ষতি হতে পারে?

উত্তর : ১. শুকরের খাদ্যভ্যাস উন্নয়ন প্রসঙ্গে

যদিও শুকরকে উন্নত খামারে আলাদা করে উন্নত ও পরিচ্ছন্ন খাবার সরবরাহ করা হয় তবুও তার নোংরা খাবারের প্রতি আকর্ষণ কমে না। এটি এমন এক নোংরাভূক যা নিজের মল-মূত্রও খায়। এজন্যেই রেভারেন্ড ভরিস তাঁর বুকলেটে বলেছেন যে, খোদা বলেছেন, শুকর তোমাদের জন্য অপবিত্র এবং এই বাস্তবতাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

উত্তর : ২. শুকরের গোশত খাবার বিপক্ষে বিজ্ঞানের যুক্তি

সাধারণভাবে এটা বলা যায় যে, মানুষের পক্ষে প্রাণীজ চর্বি হজম ও প্রক্রিয়াজাত (Metabolize) করা কঠিন এবং শুকরের গোশত প্রক্রিয়াজাতকরণ আরও কঠিন। বিশিষ্ট খাদ্য বিশেষজ্ঞ ড. আহমদ সাকর তাঁর গ্রন্থ 'Pork-possible reasons for its prohibition বইতে দেখিয়েছেন যে, শুকরের চর্বির অনু হজম ও দহন দুটোই মানুষের জন্য কষ্টকর।

উত্তর : ৩. শরীরে শুকরের চর্বির অনুর দহন কঠিন কেন

প্রাণীজ চর্বির প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপ

ক) ফসফোলিপিড

খ) গ্রাইকোলিপিড

গ) নিউট্রাল লিপিড-যা পরিপাক-এর পর বিভিন্ন রূপ নেয়। মনোগ্লিসারাইড ডাইগ্লিসারাইড, ট্রাইগ্লিসারাইড, ফ্রি ফ্যাটি এসিড

ঘ) ওয়াক্স

উত্তর : ৪. ট্রাইগ্লিসারাইড-এর গুরুত্ব

ট্রাইগ্লিসারাইড-এর মেটাবলিজম বোঝাতে হলে এর রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে ধারণা দেয়া যেতে পারে। ট্রাইগ্লিসারাইড গঠিত হচ্ছে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের সমন্বয়ে। প্রতিটি ফ্যাটি এসিডে আছে কার্বন এর এক বিশাল চেইন। এই কার্বন চেইন-এর কার্বন গুলোকে বিশেষ নিয়মে ক্রমমান (position) দেয়া হয়। যথা কার্বন-১, কার্বন-২, কার্বন-৩, কার্বন-৪ ইত্যাদি। এই চেইনে একটি কার্বন এর সাথে আরেকটি কার্বন এক বন্ধনী বা একাধিক বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকতে পারে। এটাকে সম্পৃক্ত (Saturated) বা সম্পৃক্ত (Unsaturated) বলা হয়। যদি কার্বন-২ সম্পৃক্ত (স্যাচুরেটেড) হয় তবে সেই ফ্যাটি এসিড প্রক্রিয়াজাত করা কঠিন।

উত্তর : ৫. ২নং কার্বনে সম্পৃক্ত ফাটি এসিডের সমস্যা

ফ্যাট এবং বিশেষভাবে ট্রাইগ্লিসারাইডকে হজম করতে হলে মানব পরিপাকতন্ত্রে টাইগ্লিসারাইড-এর ভাঙন ঘটাতে হবে। যে প্রক্রিয়ায় এই ভাঙন সাধিত হয় তার নাম হাইড্রোলাইসিস যা অগ্ন্যাশায় কর্তৃক নি:সৃত প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ নামক পাচক রসের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। বৈজ্ঞানিকরা এটা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ পজিশন-২ তে সম্পৃক্ত কার্বন যুক্ত ফ্যাট এসিড সম্পন্ন ট্রাইগ্লিসারাইড সহজে ভাঙতে পারে না। শুকরের চর্বির ট্রাইগ্লিসারাইডে পজিশন-২ তে সম্পৃক্ত কার্বন যুক্ত ফ্যাটি এসিড আছে তা নয়, বরং অন্যান্য যেসব প্রাণীর মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাদের সবই সাধারণত মানুষের জন্য ভোজনের অযোগ্য যেমন কুকুর, বিড়াল, ইদুর ইত্যাদি। অপরপক্ষে মানুষের ভোজনের যোগ্য তৃনভোজী প্রাণীসমূহের চর্বিতে (যেমন গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া) ট্রাইগ্লিসারাইডে পজিশন-২ তে অসম্পৃক্ত কার্বন যুক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে। এজন্যে এসব প্রাণীর চর্বি সহজ পাচ্য আর শুকরের চর্বি ভোজনের অযোগ্য।

উত্তর : ৬-৭. শুকরের চর্বি ঠিকমত প্রক্রিয়াজাত না হলে কি হয়

যেহেতু মানুষের পরিপাকতন্ত্র শুকরের চর্বিকে পুরোপুরি ভাঙতে পারে না সেহেতু তা অপরিবর্তিত অবস্থাতেই রক্তে প্রবাহিত হয়। যা ক্রমান্বয়ে রক্তনালীর দেয়ালে জমা হয়। যা ভবিষ্যতে Alherosclerosis এর সম্ভাবনা বাড়ায়। অন্যদিকে অন্যান্য তৃণভোজী

প্রাণীর চর্বি পরিপাকতন্ত্রে ভেঙে সরলীকরণ হয় যার ফলে তার দহন থেকে উৎপন্ন শক্তি শরীরের কর্মতৎপরতায় কাজে লাগে এবং রক্তনালীর দেয়ালে কম জমা হয়।

উত্তর : ৮. যারা বলেন যে, শুকরের চর্বিতে প্রচুর অসম্পৃক্ত ফ্যাটও আছে তাদের যুক্তি প্রসঙ্গে

এটা ঠিক যে, সামগ্রিকভাবে শুকরের চর্বিতে অসম্পৃক্ত ফ্যাট বেশি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে, অসম্পৃক্ত ফ্যাট-এর সামগ্রিক পরিমান মুখ্য বিষয় নয় বরং মুখ্য বিষয় হচ্ছে কার্বন চেইন-এর কোন পজিশনের কার্বন সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে পজিশন-২ এর কার্বন-এর সম্পৃক্ততাই বেশি বিপদজনক যা শুকরের গোশতে বহুল পরিমাণে আছে।

উত্তর : ৯. শুকরের গোশত থেকে আর যেসব ক্ষতি হতে পারে

বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়া এবং প্যারাসাইট শুকরের গোশতের গভীরে অবস্থান করে। এর মধ্যে ভয়াবহ হচ্ছে Triching নামক গুড়াকৃমি। যার লার্ভা দৃঢ় আবরণ আচ্ছাদিত (Cyst Encapsulated)। মানুষ শুকরের গোশত খেলে পরে মানুষের পাকস্থলির এসিড লার্ভার ক্যাপসুলকে ভেঙে লার্ভাকে মুক্ত করে। এসব লার্ভা দ্রুত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রজানন করে সংখ্যায় বাড়ে। অন্ত্র থেকে পোর্টাল রক্তসংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে এই কৃমি গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এই লার্ভা ছয় বছর পর্যন্ত অক্ষত থাকতে পারে।

সূত্র :

'The Hog-Should it be used for food'? C. Leonard Vories.

'Pork-Possible reasons for its prohibition. Dr. Ahmad Sakr.

এফ-১১ শুকর বিষয়ে আরও কথা এবং অন্যান্য খাদ্য প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ১. বলা হয় যে, শুকর ছাড়াও ইসলামে হালাল অনেক প্রাণীও রোগ ছড়ায় তাহলে তাদের হারাম না করে শুকরের গোশত হারাম করা হল কেন?

২. শুকরের গোশতে অবস্থিত কৃমি কিভাবে ছড়ায়?

৩. শুকরের গোশত ভালভাবে রান্না করার মাধ্যমে কি এর ক্ষতিকারক কৃমি ধ্বংস করা যায়?

৪. পাশ্চাত্যের হোটেল রেস্তোরা ও ফাস্ট ফুডের দোকানে গোশত ও চর্বিজাত যেসব খাবার পাওয়া যায় তা গ্রহণের পূর্বে কি সতর্কতা নেয়া উচিৎ?

৫. শুকরের চর্বি (Lard) সহযোগে প্রস্তুত খাদ্য সনাক্ত করার কোন উপায় আছে কি?

৬. পাশ্চাত্যে তৈরী রুটি (Bread) সম্পর্কে কোন সতর্কতা নেয়া প্রয়োজন আছে কি?

৭. অন্যান্য কোন কোন খাবারে শুকরজাত দ্রব্যের মিশ্রণ আছে?

৮. শুকরজাত জিলার্টিন-এর ক্যাপসুল-এর ওষুধ গ্রহণের বিষয়ে মুসলমানদের ফয়সালা কি হবে?

৯. ইনসুলিন তৈরীতে শুকরের ব্যবহার প্রসঙ্গে কি বলবেন?

১০. পনির সম্পর্কেও কি সতর্ক হতে হবে?

১১. অন্যান্য কোন কোন প্রাণী সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক হতে হবে?

উত্তর : ১. অন্যান্য প্রাণীর (Cattle)-এর কৃমির সাথে শুকরের কৃমির পার্থক্য

Triching কৃমির দুটো প্রজাতি আছে যথা- Tania-saginata এবং tania-Solium। এর মধ্যে প্রথমটি (Tania-saginata) গরু-মহিষে থাকে। তবে এটা তার সমগ্র জীবন-চক্র Host (গরু-মহিষ বা মানুষ)-এর পরিপাকতন্ত্রেই সম্পন্ন করে। এর বাইরে যায় না। যার ফলে এর ক্ষতিকর প্রভাব শুধু মানুষের পরিপাকতন্ত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং ওষুধের মাধ্যমে এর বিনাশ সম্ভব। অন্যদিকে Tania-Solium যা শুকরের গোশতে থাকে তা মানব শরীরের সকল অংশেই বাহিত হতে পারে এবং বিশেষভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আবাস গড়তে পারে। ফলে-এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতিটা এক সিষ্টেমে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটাকে ওষুধ প্রয়োগে নির্মূলও কঠিন কারণ শরীরের এমন সব জায়গায় এটা আবাস গড়ে যেখানে ওষুধ পৌছুতে পারে না। কাজেই যদিও Tania কৃমি গরু-মহিষ এবং শুকর দুটোতেই দেখা যায় তবুও একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, শুকরের গোশতে যে প্রজাতি থাকে তার ক্ষতিকর প্রভাব ভয়াবহ।

উত্তর : ২. শুকরের গোশতের কৃমি যেভাবে ছড়ায়

পরজীবী কৃমিগুলোর মধ্যে Tania-Solium হচ্ছে সবচাইতে ভয়াবহ। যখন মানুষ কৃমি আক্রান্ত শুকরের গোশত খায় তখন এর ক্যাপসুল আবৃত লার্ভাগুলো মানুষের পাকস্থলির এসিড এবং অন্যান্য জারক রসের সংস্পর্শে খোলসমুক্ত হয়। মানুষের অন্ত্রে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে কৃমিগুলো প্রজাননে লিপ্ত হয় এবং বিপুল সংখ্যায় বাড়ে। অত:পর এই কৃমি রক্ত সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়ায় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে আবাস গড়ে। এই অবস্থাকে বলা হয় Trichinosis। এই কৃমির বিস্তার রোধের একমাত্র উপায় শুকরের গোশত বর্জন। যদিও বলা হয় ভালভাবে গোশত সিদ্ধ করলে কৃমির বিস্তারের সম্ভাবনা কমে।

উত্তর : ৩. ভালভাবে রান্না করার মাধ্যমে কি শুকরের গোশতকে কৃমিমুক্ত করা যায়

ড: আহমদ সাকর যিনি শুকরের গোশত নিষিদ্ধ হবার বিষয়ে গবেষণা করেছেন তিনি তাঁর গ্রন্থে USDA এর ৩৪ নং লিফলেট থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, এক পরীক্ষায় ২৪ জন সনাক্তকৃত Trichinosis রোগীর ২২ জনই উত্তমরূপে রান্না করা শুকরের গোশত গ্রহণ করতেন। এতে বোঝা যায় যে, অত্যন্ত কড়া রান্না প্রক্রিয়াতেও Tania-solium এর ক্যাপসুল ভাঙা কঠিন।

উত্তর : ৪. গোশত ও চর্বিজাত খাবার গ্রহণের পূর্বে সতর্কতা

পাশ্চাত্যে গোশত কেনার সময় মুসলমানরা সতর্ক থাকবে যেন তাতে কোনভাবেই শুকরের গোশতের মিশ্রণ না থাকে। রেষ্টুরেন্টে গোশতজাত খাবার অর্ডার এমনভাবে দিতে হবে যেন তা রান্নার প্রক্রিয়ায় শুকরের চর্বি (Lard) বা অন্য কোন নিষিদ্ধ বিষয় যুক্ত না থাকে। আজকাল অনেক হোটেলেই বিজ্ঞপ্তি থাকে যে, সেখানে ভোজ্য তেল হিসেবে ১০০% ভেজিটেবল তেলই ব্যবহার করা হয়। ডিম ভাজি বা অন্য কোন তেলে ভাজা খাবার খেতে মুসলমানরা যেন নিশ্চিত করে যে, তা ভেজিটেবল তেলে অথবা গরুর দুগ্ধজাত Butter oil -এ প্রস্তুত।

উত্তর : ৫. শুকরের চর্বিজাত খাবার সনাক্ত করার উপায়

খাবারের প্যাকেট-এর উপর যে Ingredients-এর তালিকা লিখা থাকে তা খুব সতর্কভাবে পড়া উচিৎ। যদি কোন খাবারের Ingredients-এর মধ্যে Animal fat কথাটি লিখা থাকে এবং এটা কোন্ প্রাণীর তা লিখা না থাকে তবে সেই খাবারকে সন্দেহযুক্ত মনে করে বাদ দেয়া যেতে পারে। মুসলমানরা বিশেষভাবে ভিজিটেবল তেলে প্রস্তুত খাবারই অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্রহণ করবে।

উত্তর : ৬. রুটি (Bread) সম্পর্কেও কি সতর্কতা গ্রহণ প্রয়োজন আছে

পাশ্চাত্যের অনেক বেকারীতে ময়দার মন্ড তৈরীতে শুকরের চর্বি (Lard) ব্যবহৃত হয়।

কাজেই সেখানে বেকারীজাত Bread কেনার সময় সেগুলোই কেনা যাবে যাতে স্পষ্ট করে বলা আছে যে এর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন শুকরজাত সামগ্রী ব্যবহৃত হয়নি। একইভাবে বিস্কুট এবং কেক গ্রহণের পূর্বেও তার Ingredients এবং কিসে ভাজা তা নিশ্চিত করা উচিৎ।

উত্তর : ৭. শুকরজাত অন্যান্য খাবার

অনেক খাদ্যে জিলাটিন ব্যবহৃত হয় যা শুকর বা অন্যান্য প্রাণীর চামড়া অথবা হাড় থেকে প্রস্তুত। এসব ক্ষেত্রে সন্দেহ এড়ানোর জিলাটিন-এর উৎস পরীক্ষা করা বা তার অন্য বিকল্প দেখা উচিৎ (জিলাটিন-এর বিকল্প পাওয়া যায়)।

উত্তর : ৮. ওষুধের ক্যাপসুলে জিলাটিন প্রসঙ্গে

কোন কোন ওষুধের ক্যাপসুলে শুকরজাত জিলাটিন ব্যবহৃত হয়। যদি এমন ওষুধ গ্রহণের কোন বিকল্প না থাকে এবং জীবন রক্ষার্থে নিরুপায় হয়ে তা গ্রহণ করতে হয় তবে সেক্ষেত্রে কিছু বলার নেই (বর্তমানে বায়োটেকনোলজীর বিস্ময়কর অগ্রগতির প্রেক্ষিতে এ ধরনের ক্যাপসুল কভার-এর প্রচুর বিকল্প তৈরী করা সম্ভব –অনুবাদক)।

উত্তর : ৯. ইনসুলিন তৈরীতে শুকরের অগ্ন্যাশয়-এর ব্যবহার প্রসঙ্গে

ইনসুলিন তৈরীতে শুকরের অগ্ন্যাশয় ব্যবহৃত হয় যদিও তা গরু-মহিষের অগ্ন্যাশয় থেকেও তৈরী সম্ভব। বর্তমানে রিকম্বিনেন্ট ডি. এন. এ টেকনোলজি'র মাধ্যমে ব্যাপকভাবে হিউম্যান ইনসুলিন তৈরী হচ্ছে। যার ফলে প্রাণীজাত ইনসুলিনের ব্যবহার দ্রুত কমছে। কাজেই মুসলমানদের উচিৎ শুকরজাত ইনসুলিন এড়িয়ে চলা। তারপরও যদি কোন জীবন বিপন্ন রুগীর সামনে Porcine ইনসুলিন-এর কোন বিকল্প না থাকে তবে সে তা গ্রহণ করতে পারে। কারণ ইসলাম জীবন রক্ষাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে।

উত্তর : ১০. মাখন/পনির সম্পর্কে সতর্কতা

কোন কোন প্রতিষ্ঠানে পনির তৈরীর সময় ব্যাক্টেরিয়ার কাজকে ত্বরান্বিত করতে পেপসিন প্রয়োগ করা হয়। এই পেপসিন সাধারণত: শুকরজাত। যদিও কিছু মুসলিম আইনবিদ এই যুক্তিতে এসব পনিরকে মুবাহ্ বলেছেন যে, এখানে ব্যবহৃত পেপসিন মূলত: একটি রাসায়নিক নির্যাস এবং এটা খুব কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তবুও ঈমানকে সন্দেহমুক্ত রাখতে মুসলমানদের উচিৎ পেপসিনবিহীন পনির গ্রহণ করা।

উত্তর : ১১. অন্যান্য যেসব প্রাণীর ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে

রাসূলের একটি স্পষ্ট হাদীসে যেসব পাখি এবং প্রাণী গোশতভোজী সেসব পাখি ও প্রাণীকে মুসলমানদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।

সূত্র :

.Pork-Possible reasons for its prohibition-Dr. Ahmad Sakr.

এফ-১২ এলকোহল ও অন্যান্য নেশাদ্রব্য প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ১. প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে নেশা দ্রব্যের ব্যবহার কেমন ছিল?

২. প্রাক ইসলামী আরব সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে মদের অবস্থান যদি এত ব্যাপক হয়ে থাকে তবে ইসলাম কিভাবে এই জনপ্রিয় অভ্যাসকে নির্মূল করল?

৩. নেশাদ্রব্য বোঝাতে কুরআনে কোন্ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর প্রকৃত অনুবাদ কি?

৪. যদি কেউ বলে যে, 'কুরআনে অন্যান্য নিষিদ্ধ দ্রব্যের ক্ষেত্রে হারাম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা মদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়নি বিধায় মদ নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে কুরআন অত কঠোর নয়'- তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন?

৫. নেশাদ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে রাসূল মুহাম্মদ (সা:)-এর মন্তব্য কি?

৬. কেউ কেউ বলতে চান যে, অল্প পরিমানে মদপান, কম এলকোহলযুক্ত মদ বা বিয়ার পান, অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানে সামান্য মদ্যপান (Social drinking) খারাপ নয় তাদের যুক্তির জবাবে কি বলবেন?

৭. মদ ছাড়া অন্যান্য নেশাদ্রব্যের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৮. মদ না খেয়ে মদের ব্যবসা বা বিপণনের সাথে মুসলমানরা জড়িত থাকতে পারে কি?

৯. মুসলিম সমাজে মদ বা নেশাদ্রব্যের বিস্তার কতটুকু?

উত্তর : ১. প্রাক ইসলামী আরব সমাজে নেশাদ্রব্যের প্রভাব

প্রাক ইসলামী আরব সমাজে নেশাদ্রব্যের ব্যবহার কত যে ব্যাপক ছিল তা বোঝা যায় এই বাস্তবতা থেকে যে আরবী ভাষায় শুধুমাত্র মদ শব্দের একশ'রও বেশী প্রতিশব্দ রয়েছে।

উত্তর : ২. ইসলাম যেভাবে আরব থেকে মদের ব্যবহার দূর করল

অনেকে বলেন ভয়ভীতি প্রদর্শন, আইন ও শক্তির কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমেই ইসলাম আরব থেকে মদের উচ্ছেদ ঘটায়। কিন্তু বাস্তবে এই মন্তব্য ঠিক নয়। বরং যেভাবে ইসলাম আরব থেকে মদের ব্যবহার উচ্ছেদ করে তা হচ্ছে-

ক) প্রথমত: ইসলাম মানুষকে আল্লাহর স্বত্তা, গুণাবলী ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে তাঁর উপর ঈমান আনতে বলে। তারপর নিজেদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব

থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশনা ও নির্দেশ অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার আদেশ দেয়। এভাবে একবার আন্তরিক ও সচেতনভাবে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন করলে মানুষের পক্ষে এটা সহজ হয় তাঁর আদেশ অনুসারে জীবনকে পুনর্গঠন করা। তাদের মন তখন আল্লাহর যে কোন আদেশ ও আইন নির্দ্বিধায় পালনে উম্মুখ থাকে।

খ) মদ নির্মূলে ইসলামের সাফল্যের আরো একটি কারণ হচ্ছে মদ উচ্ছেদে ইসলামের কর্মসূচী ছিল পর্যায়ক্রমিক। এটা ধীরে ধীরে মানুষকে মদের অভ্যেস ছাড়তে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করে। কুরআনে মদের বিরুদ্ধে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মদের ক্ষতিকারক প্রভাব এর উপকারী প্রভাবের চাইতে অনেক বেশী। পরবর্তীতে নাযিলকৃত আয়াতে মুসলমানদেরকে মদ্যপ অবস্থায় নামাজে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। যার ফলে নামাজী মুসলমানদের মদপান শুধুমাত্র এশার নামাযের পর ঘুমানোর আগের সময়টাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ আর কোন নামাজের মাঝে এত দীর্ঘ বিরতি ছিলনা যার মধ্যে মদপান করে তার প্রভাব মুক্ত হয়ে পরবর্তী নামাজে দাঁড়ানো যায়। অবশেষে পঞ্চম সূরার ৯৩ নং আয়াতে সরাসরি মদপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যে আয়াত নাযিলের পর তখন যারা মদপান করছিল এবং যাদের ঘরে মদের পাত্র ছিল তারা সবাই তা নির্দ্বিধায় ছুঁড়ে ফেলে।

উত্তর : ৩. নেশাদ্রব্য বোঝাতে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ এবং তার অর্থ

নেশাদ্রব্য বোঝাতে কুরআনে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে 'খামর'। এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে সর্বধরনের নেশাকারক খাদ্য বা পানীয় তা গাঁজানো বা পরিশোধন যে কোন প্রক্রিয়াতেই উৎপন্ন হোক না কেন। 'খামর' শব্দের মূল ক্রিয়া হচ্ছে 'খামারা' যার অর্থ হচ্ছে এমন কিছু যা আবরণ ও আচ্ছাদন করে এবং 'খামারা' শব্দের অর্থ গাজানো (Fermented)। দুটো শব্দই পরস্পর সম্পৃক্ত। কারণ যখনই কেউ কোন গাঁজানো দ্রব্য পান করে তখনই তার চেতনা আবৃত বা বিনষ্ট হয়। এভাবে এমন অনেক কিছু আছে যা মদ নয় অথচ চেতনাকে নষ্ট করে এসবই 'খামর' এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (সা:)-এর একটি হাদীস এবং ওমর (রা:)-এর একটি বাণীতে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, যা কিছু মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তাই 'খামর' এবং পরিত্যাজ্য।

উত্তর : ৪. মদের উপর নিষেধাজ্ঞা কি অন্যান্য নিষেধাজ্ঞার চাইতে শিথিল

কুরআনে মদ নিষিদ্ধ হবার বিষয়ে 'ইজতানিবুহ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ বর্জন করা/দূরে থাকা ইত্যাদি। কোন কিছু নিষিদ্ধ হবার জন্যে তা সংক্রান্ত আলোচনায় হারাম শব্দের উপস্থিতি থাকা কোন শর্ত নয়। কাজেই যারা বলেন যে, মদের নিষেধাজ্ঞা তেমন কঠোর নয় তাদের বক্তব্য যুক্তিহীন। কুরআনে অনেক নিষিদ্ধ বিষয়ের বর্ণনায় হারাম শব্দ

ব্যবহৃত হয়নি। যেমন খুন করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ অথচ খুন নিষিদ্ধ হবার আয়াতেও হারাম শব্দ অনুপস্থিত। বস্তুত: হারাম শব্দের সমার্থক আরও অনেক শব্দ আছে। 'ইজতানিবুহ' হচ্ছে তেমনি একটি শব্দ। এছাড়াও বলা যায় যে, কুরআনে মদ্যপান নিষেধ করতে গিয়ে 'রিজ' (Rigz) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একই শব্দ মূর্তিপূজার মত ভয়াবহ অপরাধ বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছে।

উত্তর : ৫. নেশাদ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে রাসূল (সা:)-এর উক্তি

মানুষের তথা মুসলমানদের জন্যে রাসূল (সা:)-এর জীবনই হচ্ছে অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর কথা ও কাজ দিয়ে এটা সন্দেহাতিভাবে স্পষ্ট যে মদপান নিষিদ্ধ। রাসূল (সা:) বলেন-

ক) আল্লাহ্ মদ্যপ ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না যতক্ষণ সে তওবা না করে।

খ) মদপানকারী বেহেশতের সুমিষ্ট পানীয় থেকে বঞ্চিত হবে।

গ) যে ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাকে আল্লাহর কাছে মূর্তি পূজারীদের মতই হাজির করা হবে যদিনা সে মৃত্যুর আগে তওবা করে।

ঘ) যা কিছু নেশার উদ্রেক করে তা সবই 'খামর' এবং তা সবই নিষিদ্ধ।

ঙ) মদ হচ্ছে শয়তানীর উৎস।

উত্তর : ৬. সামাজিক মদ্যপান ও অল্প এলকোহলযুক্ত পানীয় পান প্রসঙ্গে

রাসূলের দুটো হাদীসে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে ন্যূনতম পরিমাণে হলেও মদপান নিষিদ্ধ। আর বৈজ্ঞানিক গবেষণাও বলে যে, অল্প পরিমাণে মদ্যপান বা সামাজিক মদ্যপান (Social drinking) থেকেই ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে মদের আসক্তি জন্ম নেয়- এভাবে একসময় সে মদ্যপ হয়ে যায়।

উত্তর : ৭. অন্যান্য নেশাদ্রব্য প্রসেঙ্গ

মদ ছাড়া অন্যান্য নেশাদ্রব্য ও ড্রাগস হারাম হবার বিষয়ে দুটো প্রধান যুক্তি হচ্ছে-

ক) রাসূল (সা:) বলেছেন, যা কিছু নেশার উদ্রেক করে তা সবই 'খামর' এবং নিষিদ্ধ।

খ) যেহেতু নেশাকারক ড্রাগসমূহ মদের মতই মানুষের উপর কাজ করে এবং আসক্তি জন্মায়। অতএব এসব ড্রাগও নিষিদ্ধ হবে এটাই স্বাভাবিক।

উত্তর : ৮. মুসলমানদের জন্যে মদের ব্যবসাও কি নিষেধ-

ইসলামে যখন কিছু নিষেধ করা হয় তখন তার উৎসমূল থেকে সর্বোচ্চ বিস্তার পর্যন্ত সকল ধাপই নিষিদ্ধ হয়। দুটো হাদীসে রাসূল (সা:) নেশাদ্রব্যের সাথে জড়িত দশ ধরনের মানুষকে অভিশাপ দিয়েছেন। তারা হচ্ছে–

ক) যে নেশাদ্রব্য উৎপন্ন করে, যে কাউকে নেশাদ্রব্য উৎপাদনের জন্য আদেশ বা অনুরোধ করে।

খ) যে নেশা করে।

গ) যে মাদকদ্রব্য বহন করে।

ঘ) যার জন্য মাদকদ্রব্য বহন করা হয়।

ঙ) যে মাদকদ্রব্য পরিবেশন করে

চ) যে মাদকদ্রব্য বিক্রয় করে

ছ) যে মাদকদ্রব্যের মূল্য গ্রহণ করে

জ) যে মাদকদ্রব্য ক্রয় করে

ঝ) যার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য ক্রয় করা হয়।

ঞ) এমনকি যে কৃষক এই উদ্দেশ্যে আঙুর উৎপন্ন করে যে, তা মদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে সেও খারাপ কাজ করছে। অন্য একটি হাদীসে মুসলমানদের যে টেবিলে মদ পরিবেশন করা হয় সে টেবিলে বসতে নিষেধ করা হয়েছে।

উত্তর : ৯. মুসলিম সমাজে মদ ও নেশাদ্রব্যের বিস্তার প্রসঙ্গে

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও বিস্তারের দিক দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে পাশ্চাত্যের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রে মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় সরকারীভাবে নিষিদ্ধ। সাধারণ মুসলিমদের কাছে মাদকাসক্তি ঘৃণার বিষয়। যদিও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী কিছু মুসলিম নামধারী মদপানের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করাকে গৌরবের বিষয় মনে করে।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ২:২১৯, ৪:৪৩, ৫:৯৩-৯৪,

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ১৬:৩৬, ৪২:৩৭, ৫৩:৩২, ৪:৩১, ১৪:৩৫, ৯২:১৭, ২২:৩০

এফ-১৩ মাদকদ্রব্য প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ১. ইসলামে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ হবার পেছনে কোন সুনির্দিষ্ট কারণ আছে কি?

২. মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন না করে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার কিভাবে বন্ধ করা যায়?

৩. যারা বলে যে যেখানে কুরআনে বলা আছে বেহেশতের অন্যতম আকর্ষণ হবে সুস্বাদু পানীয়, সেই কুরআন ই কিভাবে মদ নিষিদ্ধ করে- তাদের যুক্তির জবাবে কি বলবেন?

৪. শীতে শরীর গরম করার জন্যে মদ্যপান, অজ্ঞানকারক হিসেবে এলকোহলের ব্যবহার এবং কফ সিরাপে এলকোহলের ব্যবহার সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৫. রান্নার কাজে, বেকারী শিল্পে, মাউথওয়াশে এবং সুগন্ধীতে এলকোহলের ব্যবহার সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর : ১. ইসলামে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ হবার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ

কুরআনের পঞ্চম সূরার ৯০-৯১ আয়াতে মাদকদ্রব্যের উপর বিশদ আলোচনা হয়েছে। উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ হবার পেছনে তিনটি মৌলিক কারণ পাওয়া যায়, যথা-

ক) কুরআনে মাদকদ্রব্যকে অপবিত্র এবং শয়তানের হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে মাদকদ্রব্য সেবনে মানুষের যে কোন নৈতিক অপরাধ সংঘটন সম্ভব। সম্ভবত, এজন্যেই রাসূল (সা:) বলেছেন, "মাদকদ্রব্য হচ্ছে শয়তানের জননী।"

মাদক দ্রব্যের এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতির দিক ছাড়াও মানব শরীরের উপর এর প্রভাবও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

অর্থনৈতিকভাবে মাদক দ্রব্য উদ্ভূত সমস্যা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করতে সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাদকদ্রব্য সেবনে কর্মজীবি মানুষের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় ব্যয় হয় বিপুল অর্থ। আর মাদকাসক্তদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ ও দুর্ঘটনার দ্বারা বিপর্যস্ত হয় সমাজ।

খ) কুরআন আরও বলে যে, শয়তান চায় মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও ঘৃণা ছড়াতে আর মাদকদ্রব্য শয়তানের এ উদ্দেশ্য পূরণের অস্ত্র। কারণ মাদকাসক্ত মানুষ তার আসক্তি পূরণের অর্থ সংগ্রহের জন্যে চুরি-ছিনতাই, ডাকাতি-হত্যায় কোন

দ্বিধাবোধ করে না। পরিবারেও স্ত্রী-পীড়ন, শিশু-পীড়নের মত ঘটনার সৃষ্টি হয় মাদকাসক্তি থেকে। এ থেকে পরিবারে ভাঙন, বিয়ে-বিচ্ছেদ-এর উদাহরণ প্রচুর আছে। মাদকদ্রব্য যে মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে এসব ঘটনা এটারই প্রমাণ।

গ) সর্বশেষে বলা যায় মাদক দ্রব্যের ব্যবহার এজন্যে নিষেধ করা হয়েছে যে, এগুলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মানুষের চিন্তা-চেতনা হচ্ছে আল্লাহর দেয়া সর্বোচ্চ নেয়ামত। আর মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে মানুষ সেই চেতনাকেই আচ্ছন্ন করে। নিজেকে বাস্তবতা থেকে, জীবন থেকে দূরে সরিয়ে তাকে এমন এক জগতে নিয়ে যায় যেখানে জীবনের কোন অর্থ বা মহৎ উদ্দেশ্য থাকে না। এভাবে মাদকাসক্তি মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে ক্রমে অসচেতন করে পৃথিবীতে তার খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম করে।

উত্তর : ২. মাদকদ্রব্যের নিষেধাজ্ঞা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার উচ্ছেদ করতে ইসলামের গৃহীত ব্যবস্থা শুধুমাত্র কঠোর শাস্তির বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রথম আবেদন মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এটা শুরু হয় ঈমান গ্রহণের পর যখন থেকে মানুষ আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যখন একজন মানুষ আল্লাহর উপর সচেতনভাবে ঈমান এনে তার ইচ্ছায় একটি পরিচ্ছন্ন-পরিশীলিত জীবন-যাপনের সিদ্ধান্ত নেয় তখন তার জন্য সবকিছু সহজ হয়ে যায়। এরপরও সমাজ ও রাষ্ট্রে এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে কেউ চাইলেও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে না পারে। এর বিক্রয় বা বিপণন করতে না পারে। সমাজে মাদকদ্রব্যের পক্ষে কোনরকম প্রচারণা বা অনুমোদন থাকতেও পারবে না।

উত্তর : ৩. কুরআনে প্রতিশ্রুত বেহেশতের পানীয় প্রসঙ্গে

পৃথিবীতে মানুষ বিভিন্ন কারণে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে একাকীত্ব বা দু:খের অনুভূতিকে দূর করা। আর একটি হচ্ছে এমন আনন্দ লাভ করা যা তারা অন্যভাবে পায় না। আর এই মদ্যপানের বিনিময়ে তাকে আসক্তি সহ নানা নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

অন্যদিকে বেহেশতে মানুষের কোন কিছু না পাওয়ার অনুভূতিই থাকবে না। সেখানে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত পুরস্কার লাভে ধন্য হবে। কোন দু:খ একাকীত্ব থাকবে না। বেহেশতের আনন্দ হবে যুগপৎ দৈহিক ও আত্মিক। সেখানে দৈহিক সুখের বিনিময়ে আত্মিক অশান্তির কোন সুযোগ নেই।

বেহেশতের পানীয় সম্পর্কে কুরআন বলে যে, এটা এমন সুমিষ্ট হবে যা কোন মাদকতা সৃষ্টি করবে না। কাজেই এই পানীয়ের সাথে পৃথিবীর মদ-এর তুলনা অযৌক্তিক। রাসূল (সা:) আরও বলেন যে, কুরআনে বেহেশতের যতটুকু বর্ণনা আসছে তা শুধু মানুষের কল্পনাসাধ্য বিষয়েরই, বাস্তবে বেহেশত এমন সুন্দর যা পৃথিবীর কোন চোখ দেখেনি কোন কান শোনেনি।

উত্তর : ৪. শরীর গরম করতে, অজ্ঞানকারক হিসেবে এবং কফ সিরাপের এলকোহলের ব্যবহার প্রসঙ্গে

শরীর গরম করার জন্যে মদপানই একমাত্র উপায় নয়। আল্লাহ মানুষের জীবন রক্ষার জন্যে অনেক উপকরণ দিয়েছেন। বাস্তবে এলকোহল তাপের এক ভ্রান্ত অনুভূতিরই জন্ম দেয়। যে কোন ওষুধে এলকোহলের ব্যবহার সম্পর্কে বিধান হচ্ছে, একবার রাসূল (সা:) যখন দেখলেন কেউ ওষুধে প্রয়োগের জন্য মদ তৈরী করছে তখন তিনি বাধা দিয়ে বললেন যে, এটা কোন প্রতিষেধক নয়।

এনেস্থেশিয়ায় আজকাল এলকোহলের ব্যবহার নেই বললেই চলে। বর্তমানে এলকোহল বর্জিত কফ সিরাপ বাজারে সহজলভ্য। কাজেই এলকোহলযুক্ত কফ সিরাপ আর গ্রহণযোগ্য নয়। সব সময়ই ইসলাম এলকোহল বর্জন করতে বলে, শুধুমাত্র জীবন রক্ষায় যদি কোন এলকোহল যুক্ত ওষুধ আবশ্যক হয়ে পড়ে যার বিকল্প নেই। (আজকাল অজ্ঞানকারক হিসেবে এলকোহল ব্যবহৃত হয় না। এলকোহল গ্রহণ করলে অবাত শ্বসন হয়। এর ফলে প্রতি অনু এলকোহলে যে তাপ উৎপন্ন হয় সবাত শ্বসনে গ্লুকোজের মাধ্যমে তার চাইতে অনেক বেশী তাপ উৎপন্ন হয়। বর্তমানে প্রায় সকল কফ সিরাপ এলকোহল বর্জিত। - অনুবাদক)

উত্তর : ৫. রান্না, বেকারী শিল্প, এবং মাউথওয়াশ ও সুগন্ধিতে এলকোহলের ব্যবহার প্রসঙ্গে

এটা অনাকাঙ্ক্ষিত যে একজন মুসলিম এমন কিছু রান্নার কাজে বা বেকারী শিল্পে ব্যবহার করবে যা ইসলামে নিষিদ্ধ। অনেকে অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করেন এটা ঠিক নয়।

যদিও সঠিকভাবে রান্না করলে রান্নায় এলকোহল ব্যবহার সম্ভব-তবে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, সমস্ত এলকোহল যেন পুড়ে গিয়ে থাকে।

মাউথওয়াশের এলকোহল পেটে যেতে পারে। কাজেই এলকোহল বর্জিত মাউথওয়াশ ব্যবহার করা উচিৎ। এলকোহল যুক্ত সুগন্ধী ব্যবহারযোগ্য কারণ এটাতো শরীরের ভেতর গৃহীত হচ্ছে না। তবুও মুসলমানরা এলকোহল বর্জিত সুগন্ধী বেশী পছন্দ করে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৫:৯০-৯১

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৩৭:৪৫, ৩২:১৭

এফ-১৪ খাদ্য সংক্রান্ত অন্যান্য প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ১. ভিনেগার সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি? যদি তা এলকোহল থেকে উদ্ভূত হয়?

২. খোলসযুক্ত মাছ (চিংড়ী, গলদা) এবং আঁশবিহীন মাছ (Catfish) সম্পর্কে ইসলামে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

৩. পাশ্চাত্যে প্রাপ্ত অনেক পনির তৈরীতে শুকরজাত Pepsin ব্যবহৃত হয় মুসলমানদের সতর্কতার জন্য এসব বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

৪. খাদ্য রান্না, পরিবেশন ও মিশ্রণ-এর ব্যাপারে ইসলামে কোন বিধি নিষেধ আছে কি?

৫. মুসলমানদের খেতে বারণ করা হয়েছে এমন আর কি কি খাদ্য আছে?

৬. মুসলমানদের খেতে উৎসাহিত করা হয়েছে এমন কোন খাবার আছে কি?

৭. খাবার আদব বিষয়ে ইসলামের আর কোন বিধান আছে কি?

উত্তর : ১. ভিনেগার সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

দুটো কারণে মুসলমানদের জন্যে ভিনেগার ব্যবহারে কোন নিষেধ নেই।

প্রথমত: এটা চেতনা-নাশ করে না। দ্বিতীয়ত: ইসলামী আইনে একটি শব্দ আছে 'ইসতিহালা'। এর অর্থ একটি বস্তুর পরিপূর্ণ রূপান্তর। যেমন আঙুরের রস মুসলমানদের জন্য অনুমোদিত। কিন্তু যদি এটা থেকে গাঁজন প্রক্রিয়ায় মদ উৎপন্ন করা হয় তখন হালাল রসটিই হারাম হয়ে গেল। অপরপক্ষে নিষিদ্ধ বস্তুও রূপান্তর প্রক্রিয়ায় মুবাহ্ হয়ে যেতে পারে। যেমন এলকোহল থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে যদি ভিনেগার তৈরী করা হয় তবে তা মুবাহ্ হয়ে যায়। এছাড়াও রাসূলের (সা:) একটি হাদীস আছে যাতে ভিনেগার এর বিষয়ে অনুমোদন আছে।

উত্তর : ২. খোলসযুক্ত মাছ ও আঁশবিহীন মাছ প্রসঙ্গে

কুরআন মতে সমুদ্রজাত যে কোন খাবার খেতে নিষেধ নেই। এ সংক্রান্ত ইসলামী বিধান একটি হাদীসেও পাওয়া যায়। যে হাদীসে সমূদ্রের পানি দিয়ে ওযু করা প্রসঙ্গে রাসূল বলেন, যে এটা পরিষ্কার এবং পবিত্র আর এর থেকে জাত সকল কিছুই পবিত্র।

উত্তর : ৩. পাশ্চাত্যে প্রাপ্ত পনির সম্পর্কে তথ্যের উৎস (মূলত: যুক্তরাজ্যের জন্যে প্রযোজ্য)

এবারডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের ইসলামী সোসাইটি এবং ব্রাইটন ইসলামী সেন্টার উভয়ে দুটো সংক্ষিপ্ত বুকলেট তৈরী করেছে যাতে সাধারণভাবে বাজারে প্রাপ্ত তৈরী খাদ্যসামগ্রীর কোনগুলো হালাল আর কোনগুলো হারাম তার তালিকা আছে। এ

দুটো বুকলেট অনুসারে বৃটেনের সুপারমার্কেটগুলোতে প্রাপ্ত অধিকাংশ শক্ত (Hard chees) পনিরই হালাল নয় কারণ তাদের প্রস্তুতিতে এমন প্রাণীজ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়েছে যা হালালভাবে জবাইকৃত নয়। অবশ্য অনেক বিশেষজ্ঞ এ মত দিয়েছেন যে, এভাবে প্রস্তুত পনিরও মুবাহ হবে। কারণ এটা তৈরীতে যে প্রাণীজ এনজাইম ব্যবহৃত হয় তা অতি স্বল্প পরিমাণেই লাগে। তবে নরম পনির (Soft cheese) এবং ঘরে তৈরী পনির সাধারণত হালাল। এগুলো তৈরীতে দুধ এবং রাসায়নিক বা জীবানুজাত অনুঘটক ব্যবহৃত হয়।

তবে এসব খাদ্যের লেভেলে সংযুক্ত (Ingredients) তালিকা মুসলমানদের জন্যে খুব সহায়ক হয় না। কারণ তাতে এনজাইম এর নাম থাকে কিন্তু তা হালাল প্রাণীর কিনা তা স্পষ্ট করে লিখা থাকে না। এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের উচিৎ পণ্য নির্মাতার কাছে সরাসরি চিঠি লিখে জেনে নেয়া। এছাড়া আরেকটি উপায় হচ্ছে Vegetable rennet থেকে তৈরী পনির ব্যবহার করা।

উত্তর : ৪. খাদ্য রান্না, পরিবেশন ও সংমিশ্রণ সম্পর্কে ইসলামী বিধান

ইসলাম মূলত: হারাম খাবার বর্জনের জন্য বলে, হালাল খাবার রান্না ও পরিবেশনের বিষয়ে ইসলামের নির্দিষ্ট কোন বিধিনিষেধ নেই। এক্ষেত্রে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম লক্ষ্যণীয়-

ক) খাঁটি সোনা বা রূপার পাত্রে বা ট্রেতে খাবার পরিবেশন করা ঠিক নয়। কারণ এটা অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা। অপচয় আর অহংকারের প্রতীক। অবশ্য এই বিধান কাঁটা চামচে মরিচা রোধ করতে যে সিলভার বা অন্য ধাতব প্রলেপ দেয়া হয় তাকে নিষেধ করে না।

খ) খাদ্য সংক্রান্ত ইসলামের হালাল হারামের বিধানের অন্যতম উদ্দেশ্য জীবন রক্ষা করা। সেহেতু হালাল খাবারও যদি রোগ জীবানুর সংস্পর্শে নষ্ট হয় তবে সেটাও বর্জনীয়।

উত্তর : ৫. আর যেসব খাবার সম্পর্কে বিধি নিষেধ আছে

হারাম খাবার (মরা পশুর গোশত, রক্ত, শিকারী প্রাণী, শিকারী ও সর্বভূক পাখী, মাদকদ্রব্য) ছাড়া আর কিছু খাবার আছে যেগুলোর ইসলামে মাকরূহ (সাধারণভাবে খেতে নিরুৎসাহী করা হয়েছে) বলা হয়। এছাড়াও দুটো বিষয় ইসলামে নিষেধ না করা হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় তা হচ্ছে

ক) ধূমপান অপছন্দনীয় কারণ এটা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ইসলাম এটাই বলে যে, মানুষ তার জীবনের মালিক নয়। এ জীবন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া আমানত। কাজেই এই জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত করার অধিকার কারও নেই। এরই ভিত্তিতে বলা যায় সচেতনভাবে ধূমপান আল্লাহর দেয়া জীবনের আমানত এর প্রতি অবিশ্বস্ততা ছাড়া আর কিছুই না। ধূমপান

অপছন্দনীয় হবার আরও কয়েকটি কারণ হচ্ছে- ধূমপান অর্থের অপচয় ঘটায়। ইসলামে অপ্রয়োজনে এবং শরীরের ক্ষতি করে অর্থব্যয় নিষেধ করা হয়েছে।

খ) ধূমপান মানুষের মধ্যে আসক্তি জন্মায়। যা সহজে ছাড়া যায় না। এটা কোন মুসলমানের জন্যে অনৈসলামিক যে সে কোন বদ অভ্যাসের দাসে পরিণত হবে।

গ) ইসলামে নিজের জীবনকে যেমন বিপন্ন করার অধিকার নেই তেমনি অন্যের জীবনকেও বিপন্ন করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। ধূমাপায়ীর ধূমপান তার আশপাশের মানুষদের ক্ষতি করে পরিবেশ দূষিত করে।

ঘ) যে কোন বৈধ খাবার পানীয় অতিরিক্ত খাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। এখানে অতিরিক্ত বলতে বেশী খাওয়া অথবা খাবারের কোন উপাদান অতি বেশী খাওয়া আর কোনটি অতি কম খাওয়া অর্থাৎ অসম খাওয়াও অপছন্দনীয়। অপরপক্ষে কারো মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা কাজ করে যে শরীরকে কষ্ট দিলে নফস নিয়ন্ত্রিত থাকে। তারা ঠিকমত খায়না, ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। এটাও ইসলামের দৃষ্টিতে দূষণীয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও অতি ভোজন বা অনাহার ক্ষতিকর।

এছাড়াও ইসলামে বসে খেতে বলা হয়েছে। দাঁড়িয়ে খাওয়াটা অশোভন ও বেয়াদবির পরিচায়ক। রসুন, পেঁয়াজ বা এমন কিছু খেলে যা মুখ দুর্গন্ধ করে ইসলাম বলে জনসমক্ষে আসবার পূর্বে ভাল করে কুলি করতে।

উত্তর : ৬. মুসলমানদের যেসব খাবার খেতে উৎসাহিত করা হয়েছে

কিছু কিছু খাবার খেতে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এসব বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামে আছে। এসব বিষয়ে কুরআনে এবং হাদীস উদ্ধিতি আছে। এমন খাবারের মধ্যে প্রথমে যেটির নাম নিতে হয় তা হচ্ছে মধু। কুরআনে একটি সূরা আছে যার নাম 'মৌমাছি', সেখানে বলা হয়েছে মধুতে আছে শেফা (আরোগ্য)। এটা লক্ষ্যণীয় যে মধুতে উৎকৃষ্ট শর্করা ছাড়াও আরও প্রয়োজনীয় উপাদান আছে যা এটাকে বহুগুণ দিয়েছে যেমন-

ক) এটা কফ সিরাপ-এর উত্তম বিকল্প।

খ) এটা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে

গ) এটা বদহজম ও অজীর্ণ দূর করে

ঘ) হেপাটাইটিসেও বিশেষ কার্যকরী।

দ্বিতীয় যে খাবারটির নাম নিতে হয় তা হচ্ছে দুধ। যখনই রাসূল দুধ খেতেন তখনই পরিতৃপ্তভাবে বলতেন, "হে আল্লাহ আমাদের এই নেয়ামত আরও বেশি করে দান কর"।

কুরআনে জয়তুন-এর নাম নেয়া হয়েছে এবং একে পবিত্র খাদ্য বলা হয়েছে। এজন্যে অলিভ অয়েলও পছন্দনীয়।

রাসূল (সা:) বলেছেন, প্রত্যেকে সকালে প্রথমে সাতটি খেজুর খেয়ে দিন শুরু করতে এবং মাঝে মাঝে পরিপাকতন্ত্রকে নফল রোজা রেখে বিশ্রাম দিতে।

উত্তর : ৭. খাবার ইসলামী আদব (etiquette)

খাবার সময় পালনীয় রাসূলের কয়েকটি আদব হচ্ছে নিম্নরূপ–

ক) রাসূল বলেন, "যখন তুমি খেতে বসবে, আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করবে, ডান হাতে খাবে এবং খাবার পাত্রের যে অংশ তোমার কাছে সেখান থেকে খাবে"। খাবার একটি দোয়া হচ্ছে, "হে আল্লাহ তোমার এই নেয়ামতে বরকত দান কর এবং আমাদের দোজখের আগুন থেকে রক্ষা কর"।

খ) খাবার পূর্বে ভাল করে হাত ধুয়ে নিতে হবে

গ) হাতে খেলে তিন আঙুলে খেতে হবে

ঘ) বসে খেতে হবে

ঙ) সামষ্টিক ভোজনে বরকত ও সওয়াব বেশী

চ) কোন মুসলমান কোন বিশেষ খাবার পছন্দ না করলে সে যেন তার নিন্দা না করে।

ছ) মেহমানের সাথে খেতে বসলে মেজবান যেন মেহমানের আগে খাবার শেষ না করে।

জ) অন্যদের কিছু পান করতে দিলে মেজবান নিজে যেন সবার পরে পান করেন

ঝ) খাবার পরে হাত ধুতে হবে

ঞ) খাবার শেষে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। এক্ষেত্রে দোয়া হচ্ছে, "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন"।

ট) মুসলমানরা রমজানে রোযা রাখবে। এটা তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবাদত।

সূত্র :

প্রশ্ন ৪. রাসূল (সা:) বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি সোনা বা রূপার পাত্রে খাবার খায় তখন যেন সে আগুন খায়"।

প্রশ্ন ৫. হাদীসে আছে রাসূল (সা:) বলেন, "মানুষ নিজের পাকস্থলীর মত বাজে পাত্র যেন পরিপূর্ণ না করে," তিনি আরও বলেন, "উত্তম হচ্ছে পাকস্থলীতে কিছু জায়গা রেখে খাবার শেষ করা, পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয় এবং এক তৃতীয়াংশ বাতাসের জন্যে উন্মুক্ত রাখা।"

এফ-১৫ মানুষের মর্যাদা রক্ষায় ইসলামী বিধান

প্রশ্ন ১. মানুষের মর্যাদা রক্ষায় ইসলামী বিধানটি এই পুস্তকের এফ-৭ অধ্যায়ে বর্ণিত ইসলামের নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত?

২. 'মর্যাদা' বলতে কি বিশেষ কিছু ইসলামে বোঝানো হয়েছে?

৩. যারা বলেন, ১৪০০ বছর আগের নৈতিক বিধান কি এখনও কার্যকরী হতে পারে যেখানে সময় ও সমাজ সবই পরিবর্তিত- তাদের যুক্তির জবাবে কি বলবেন?

৪. কেউ কেউ বলেন, 'মানুষ এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিত্য পরিবর্তনশীল, এমতাবস্থায় তাদের উপর অপরিবর্তনীয় স্থায়ী নৈতিক বিধান চাপিয়ে দেয়া কি সঙ্গত? এ প্রশ্নের জবাবে কি বলবেন?

৫. যৌন নৈতিকতা বিষয়ে ইসলামের শিক্ষার সারসংক্ষেপ কি?

৬. যৌন নৈতিকতা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি puritanical দৃষ্টিভঙ্গির মত?

৭. যৌন বিষয় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি অধিক ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তব?

৮. যৌন নৈতিকতা রক্ষায় ইসলাম আর কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে?

উত্তর : ১. মানুষের মর্যাদার সাথে ইসলামের নৈতিক বিধানের উদ্দেশ্যের সম্পর্ক

ইসলামের নৈতিক বিধানের পাঁচটি প্রধান উদ্দেশ্যের চতুর্থ হচ্ছে মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা (এফ-৭ দ্রষ্টব্য)। এই পাঁচটি উদ্দেশ্য হলো

মানুষের ঈমান রক্ষা করা

মানুষের জীবন রক্ষা করা

মানুষের মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা

মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা

মানুষের সম্পদ রক্ষা করা।

উত্তর : ২. ইসলামী নীতিবিদ্যায় 'মর্যাদা' শব্দের বিশেষ অর্থ প্রয়োগ

মর্যাদা একটি সাধারণ শব্দ। ইসলামী নীতিবিদ্যায় মর্যাদা বলতে বিশেষভাবে মানুষের সতীত্ব, সুনাম রক্ষা এবং যৌন নৈতিকতা বজায় রাখার বিষয়টিকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

উত্তর : ৩. ১৪০০ বছর পূর্বের জারিকৃত নৈতিক বিধানের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে

মুসলমানরা সুদূর অতীতের কোন মানুষের গড়া আইন বা বিধানের অনুসরণ করে না।

তারা সারাজাহানের স্রষ্টার দেয়া বিধান পালন করেন- যিনি সকল সময়ের সকল জনপদের, সকল সভ্যতার জন্যে স্থায়ী বিধান দিয়েছেন। তিনি কোন সময়, কাল বা জাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। এখন এমন কথা বলা, 'এই ইলেক্ট্রনিক ও স্পেস এইজে আমাদের নৈতিক বিধান দরকার নেই' হাজারো বছর আগের সেইসব জাতির কথারই প্রতিধ্বনি যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করার পক্ষে নানা অজুহাত দিতো। মুসলমানরা ইসলামী নৈতিক বিধান মানার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যাকে সফলভাবে পৃথক করে সত্যকে ধারণ করে। সত্য সত্যই আর মিথ্যা মিথ্যাই। দুটোর মিশ্রণের সুযোগ নেই। আপেক্ষিক নৈতিকতা বলে কোন কিছুর স্থান ইসলামে নেই কারণ তখন প্রত্যেকে তার ইচ্ছেমত নৈতিক বিধানের ব্যাখ্যা করা শুরু করবে।

উত্তর : ৪. মানুষের নিত্য পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং নৈতিক বিধান

আল্লাহ গোটা বিশ্বজগৎকে পরিপূর্ণ এবং গতিশীল করে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এটা স্বাভাবিক যে, মানুষ এবং তার সমাজ ও সংস্কৃতি রূপান্তরিত হবে, উন্নতি ও প্রগতি লাভ করবে। তারপরও কেউ যেমন বলতে পারে না, "সূর্যটা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও গতানুগতিক হয়ে গিয়েছে, এটা বছরের পর বছর একই চক্রে আবর্তিত হচ্ছে।"

এখানে পরিবর্তনের চিন্তা যেমন অবান্তর তেমনি মানুষের মৌলিক মানবীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিও অপরিবর্তনীয়। যেমন কিছু স্থায়ী অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন সৌরজগত তথা তাবৎ মহাজগত তেমনি আল্লাহ কিছু স্থায়ী বিধান মানুষকে দিয়েছেন যা দিয়ে সব যুগের সব সময়ের সকল মানব তৎপরতাকেই নৈতিক বা অনৈতিক এভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। কাজেই যদিও আমাদের জীবনধারা নিত্য পরিবর্তনশীল, জ্ঞান ও তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতির বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটছে তবুও সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ যাচাই করার মাপকাঠি একই রয়ে গিয়েছে। মানুষের অন্তরে আল্লাহ যে নৈতিক গুণ (বিবেকবোধ) দিয়েছেন তা কখনও পরিবর্তন হবার নয়।

উত্তর : ৫. যৌন নৈতিকতা বিষয়ে ইসলামের শিক্ষার সারসংক্ষেপ

যৌন নৈতিকতা বিষয়ে ইসলামের বিধান ইতিবাচক। এখানে মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং তা পূরণের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা (বিয়ে) রাখা হয়েছে। বিবাহ বন্ধন ছাড়া অন্য যে কোন যৌন সম্পর্ককে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

উত্তর : ৬. যৌন নৈতিকতা বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি? Puritanical

শুচি-শুদ্ধতা(purity) 'র সাথে Puritanism-এর বিশাল পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী যৌন বিধানে শুদ্ধতা বলতে সকল পাপ থেকে দূরে থেকে চরিত্র, সতীত্ব ও সরলতা রক্ষার বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। একই সাথে মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি দিয়ে তা পূরণের স্বাভাবিক পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। অন্যদিকে Puritanism হচ্ছে সেই মতবাদ

যা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ড এবং তার কলোনীসমূহের Puritan খ্রিষ্টানদের কর্তৃক পালিত হত। Puritan রা ধর্ম ও নৈতিকতার বিষয়ে অস্বাভাবিক বাড়াবাড়ি করত। তারা সামগ্রিকভাবে মানুষের যৌনাকাঙ্ক্ষাকেই অপবিত্র মনে করতো। এটা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থি।

কাজেই ইসলামী যৌনবিধান Puritanical নয় বরং অনেক ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তব।

উত্তর : ৭. যৌন বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তব

যৌন বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে এ বিষয়ে ইতিহাসে অন্যান্য যেসব বাড়াবাড়ি ঘটেছে তা লক্ষ্য করা উচিৎ। এর একদিকে রয়েছে সেই দর্শনভিত্তিক নৈতিক ধস যাতে বলা হয়েছে যা কিছু আনন্দদায়ক তাই নৈতিক। এই দর্শন যৌন বিষয়ে সকল বাধা ও রাখ ঢাক বর্জন করতে বলে। ইসলাম এ ধরনের অবাধ যৌনাচারকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে। অন্যান্য প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগুলোও অবাধ যৌন স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে আর এক দল লোক আছেন যারা যে কোন যৌন আকাঙ্ক্ষাকেই অপবিত্র, নোংরা, মন্দ আর শয়তানী মনে করে। তারা বৈরাগ্য বা চিরকৌমার্য অবলম্বন করে। ইসলাম এ দুটো চরমপন্থার বাইরে ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দেয়। ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃত দিয়ে তা পূরণের এমন ব্যবস্থা করে যাতে ব্যক্তির মধ্যে কোন অপরাধবোধ আসবে না। সাথে সাথে ইসলাম এমনভাবে মানুষের যৌনবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়। যৌন অনাচার রোধে ও স্বাভাবিক পন্থায় যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে ইসলাম গৃহীত বিধান নিম্নরূপ-

ক) বিবাহ বহির্ভূত সকল যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ।

খ) ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচার-এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান।

গ) আল্লাহ মানুষকে স্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষা, সন্তান ও সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম বৈধভাবে এসব আকাঙ্ক্ষা পূরণকে দূষণীয় বলে না। ইসলাম সব সময় পৃথিবীর জীবনের সাথে আখেরাতের প্রস্তুতিকে সংযুক্ত করতে বলে।

ঘ) কুরআন বলে যে মানুষের বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা বৈধ এবং বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা আর উত্তম স্বামী বা স্ত্রী পাওয়া হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত।

ঙ) ইসলামে বৈরাগ্য বা চিরকৌমার্যের কোন স্বীকৃতি নেই।

উত্তর : ৮. যৌন নৈতিকতা রক্ষায় ইসলাম গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ

ইসলাম যখন কোন কিছুকে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করে তখন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও সামাজিক ইনস্টিটিউটগুলোকে এমনভাবে চালিত করে যে, সেই নিষিদ্ধ বিষয় নির্মূল হয়ে হয়। ইসলামের এই পরিশোধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সফল ও সার্থক। কারণ যে কোন সংশোধন প্রক্রিয়া তখনই সফল হতে পারে যখন তার পক্ষে জনগণকে ঠিকভাবে শিক্ষিত

ও সচেতন করা যায়, সমাজকে প্রস্তুত করা হয়, রাষ্ট্রের মাধ্যমে আইনকে গঠন ও প্রয়োগ করা হয়। ইসলাম কুরআন বর্ণিত যৌন বিধান বাস্তবায়নের জন্য এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার শিকড় উৎপাটনের জন্য যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে-

ক) মুসলমানদের লালসার দৃষ্টিতে কারো দিকে তাকাতে বারণ করা হয়েছে।

খ) মুসলমানদের শালীন পোশাক পরতে আদেশ করা হয়েছে।

গ) নারী-পুরুষের শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া মেলামেশা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

ইসলামের উদ্দেশ্য একটি সুশীল, সুসভ্য, শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ গঠন। এজন্যে ইসলাম যুব সমাজের চারিত্রিক ক্ষতি করতে পারে এমন সকল ধরনের প্রচার মাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৭. আল-কুরআন ১৭:৩২, ২৫:৬৮-৭০, ৩:১৪-১৫, ৩০:২১

একটি হাদীসে রাসূল (সা:) বলেন যে, যখন স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য মিলন করে তখন উভয়ে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কৃত হয়। একথা শুনে যখন সাহাবারা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন যে, কিভাবে মানুষ এমন কাজ থেকে পুরস্কৃত হতে পারে যা সে নেহাৎ নিজের আনন্দের জন্যে করেছে। তিনি উত্তরে বলেন, একই কাজ তারা যদি বিবাহ বন্ধন ছাড়া করত তবে তারা শাস্তি পেত, এখন আল্লাহর বিধান মেনে আনন্দ করার জন্যে তারা পুরস্কার পাবে।

যখন একদল সাহাবী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা বিয়ে করবে না এবং আজীবন রোযা ও নামাজে কাটাবে, তখন রাসূল (সা:) তাঁদের কঠোরভাবে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, "আমি তোমাদের চাইতে আল্লাহর আপন, তবুও আমি রাতে নামাজও পড়ি আবার বিশ্রামও করি, আমি রোযাও রাখি আবার খাই, এবং আমি বিবাহিত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমার পথ থেকে বিচ্যুত হবে সে আমার কেউ নয়"।

প্রশ্ন ৮. আল-কুরআন ১৭:৩২

এফ-১৬ যৌন নৈতিকতা

প্রশ্ন ১. যৌন বিকৃতি রোধে ইসলাম কি পদক্ষেপ নিয়েছে?

২. যৌন নৈতিকতা বজায় রাখতে ইসলাম সামাজিকভাবে কি কি পদক্ষেপ নিতে বলেছে?

৩. যারা বলে, যৌন বিষয় মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত, কাজেই এ বিষয়ে সমাজের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছিত নয়- তাদের যুক্তির বিষয়ে কি বলবেন?

৪. ইসলাম যৌন নৈতিকতা রক্ষায় ব্যক্তির উপর প্রাথমিকভাবে কি দায়িত্ব দিয়েছে?

৫. সংযত দৃষ্টির ব্যাখ্যা কি?

৬. কেউ কেউ বলেন, সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা রোধে নারী এবং পুরুষকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখতে হবে (পৃথক কর্মক্ষেত্র, পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : ১. যৌনবিকৃতি রোধে ইসলামের পদক্ষেপ

ইসলামী আইনে কারো জন্য বৈধভাবে বিয়ে করা সঙ্গী/সঙ্গিনী ছাড়া আর কারো সাথে কোন যৌন সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা শুধু ব্যভিচার (যা একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে হয়) এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং আর সকল ধরনের যৌন বিকৃতি যেমন সমকামিতা, দলবদ্ধ যৌনাচারকেও নিষিদ্ধ করে। এভাবে ইসলাম যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারকে রুদ্ধ করে।

উত্তর : ২. যৌন নৈতিকতা রক্ষায় ইসলামের সামাজিক পদক্ষেপ

ইসলাম যে কোন সমস্যার সমাধানে তা নৈতিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক যে পদক্ষেপ দেয় তা সমস্যাকে গোড়া থেকে সমাধানের লক্ষ্যে চালিত হয়। ইসলাম সমস্যার Cause কে নির্মূল করে, Cause বাদ দিয়ে effect নিয়ে মেতে থাকে না।

ইসলাম তার আদর্শ ও নির্দেশনা প্রতিষ্ঠায় শুধুমাত্র শাস্তির আইন প্রণয়ন আর সাজা প্রদানকে একমাত্র পথ মনে করে না।

ইসলাম মানুষের অনেক উঁচু নৈতিক মান দাবি করে। সামাজিক পরিবেশ নিত্য মানুষকে অনৈতিকতার পথে নিতে চাইলে মানুষের পক্ষে শুধু ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইসলাম বর্ণিত নৈতিক মান অর্জন অত্যন্ত কঠিন। অবশ্য তাই বলে তা অসম্ভব কিছু নয়। এজন্যে ব্যক্তির পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্যে সমাজকেও পরিশুদ্ধ করতে হবে। সমাজে এমন পরিবেশ তৈরী করতে হবে যাতে উন্নত নৈতিক মান অর্জনের দিকে মানুষ ধাবিত হয়। এ বিষয়ে ইসলামের পদক্ষেপ নিম্নরূপ-

ক) ইসলাম পর্ণোগ্রাফী এবং নগ্নতার বিপক্ষে কঠোর অবস্থান নিতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আদেশ করে। ইসলামের এই আদেশ বলে পত্রিকা, ম্যাগাজিন, চলচ্চিত্র ও টিভি ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে যে কোন অশ্লীল বিষয়ের প্রচার থেকে বিরত রাখতে হবে।

খ) ইসলাম পতিতাবৃত্তিকে বন্ধ করতে আদেশ করে। এটা শুধু শাস্তি প্রয়োগ করেই বন্ধ করতে বলে না বরং পতিতাবৃত্তির উৎস সন্ধান করে যেনো কোন মানুষকেই এই অমানবিক জঘন্য পেশায় আসতে না হয় তা নির্মূল করতে ইসলাম আদেশ দেয়। এটা সামাজিক ন্যায়বিচার ও প্রতিটি নাগরিকের ন্যূনতম অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের কথা বলে। সমাজ থেকে সব ধরনের দুর্নীতি ও শোষণ নির্মূল করতে বলে।

ইসলাম সমাজের নাগরিকদের শিক্ষিত করতে এবং ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করে আল্লাহ সচেতন করতে বলে। এভাবে মানুষ আল্লাহ সচেতন হলে তাদের দ্বারা কাউকে দেহব্যবসায় নিয়োগ অসম্ভব হয়- কারণ আল্লাহ এটা নিষেধ করেছেন।

উত্তর : ৩. যারা বলে যৌনতা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, কাজেই এখানে সমাজের হস্তক্ষেপের কিছু নেই তাদের যুক্তির জবাব

ইসলাম কখনো এটা বলে না যে, লোকজন বা রাষ্ট্র যৌন বিষয়ে জনগণের উপর গোয়েন্দাগিরি করবে। কিন্তু এটা তো অনস্বীকার্য যে সমাজের নৈতিক শক্তিকে রক্ষার সার্বিক অধিকার সমাজের আছে। যখন ব্যক্তির অনাচার অন্যকে বা সমাজকে আক্রান্ত করে তখন ব্যক্তির প্রাইভেসী রক্ষার নামে সমাজ নিশ্চুপ থাকতে পারে না। বায়ু দূষণ বা পানি দূষণ রোধে পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার যেমন রাষ্ট্রের বা সমাজের আছে তেমনি নৈতিক দূষণ রোধে ব্যবস্থা নেয়ার অধিকারও রাষ্ট্রের আছে। পাশ্চাত্য শুধু বস্তুগত দূষণগুলোই দেখে। সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা যে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে তা দেখে না। একটি জাতির উন্নতির ও অস্তিত্বের জন্য বস্তুগত শক্তি যত দরকার নৈতিক শক্তি আরও বেশী দরকার। আর যখন এই নৈতিক শক্তি রক্ষার পদক্ষেপ কোন মানবীয় আইন দিয়ে চালিত না হয়ে ঐশী বিধান অনুসারে চালিত হয় তখন তা হয় আরও শক্তিশালী ও ব্যাপক।

উত্তর : ৪. নৈতিকতা রক্ষায় ব্যক্তির দায়িত্ব

আল- কুরআনের ২৪ নং সূরার ৩০-৩১ নং আয়াতে আল্লাহ নারী-পুরুষ উভয়কে আদেশ করেছেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত করতে অর্থাৎ লালসার দৃষ্টিতে চাহনি পরিহার করতে। লক্ষ্যণীয় যে, এটা বলা হয়নি যে, তোমরা চোখ বুঁজে থাকো বরং বলা হয়েছে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের দিকে গভীর দৃষ্টি বা কামনাপূর্ণ দৃষ্টি না দিতে। রাসূলের একটি হাদীস অনুসারেও এটা নিশ্চিত যে, শুধুমাত্র কামনার দৃষ্টিতে চাহনীই নিষেধ- যা মানুষকে ক্রমে ব্যভিচারের দিকে চালিত করে।

শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীই একে অন্যের দিকে পূর্ণ আবেগ নিয়ে তাকাতে পারবে কারণ এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ পন্থায় আল্লাহ প্রদত্ত আনন্দ উপভোগ। কাজেই ইসলাম প্রত্যেককে

ভদ্র, শালীন হতে এবং দৃষ্টিকে সংযত করতে বলে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার পথকে শুরুতেই দমন করে।

উত্তর : ৫. সংযত দৃষ্টির ব্যাখ্যা

যখন রাসূল (স:)কে প্রশ্ন করা হল, 'যদি অনৈচ্ছিকভাবে কোন নারীর দিকে চোখ পড়ে যায় তবে কি হবে?" উত্তরে রাসূল (সা:) বলেন, "তুমি দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করো না, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নাও।" তিনি তাঁর চাচাতো ভাই আলী (রা:)কে বলেন, "প্রথম দৃষ্টিকে দ্বিতীয় দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করো না, কারণ প্রথম দৃষ্টির জন্য তোমাকে দায়ী করা না হলেও দ্বিতীয় দৃষ্টির জন্যে তুমিই দায়ী।

উত্তর : ৬. নারী-পুরুষের পৃথক রাখা প্রসঙ্গে

এই প্রশ্নের দুটো দিক রয়েছে। একদিকে রয়েছে তাদের যুক্তি যারা একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির আশায় নারী-পুরুষকে পৃথক রাখতে বলেন যাতে কোথাও কামনার ন্যূনতম পরিবেশ তৈরী হতে না পারে। অবশ্য ইসলাম কখনই নারী-পুরুষের অপ্রয়োজনীয় ও অবাধ মেলামেশা সমর্থন করে না। এমনকি অমুসলিমরাও স্বীকার করবেন যে, তাদের দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছেলেমেয়েদের মাঝে নৈতিক অপরাধের আধিক্যের কথা। কাজেই এটা বলা যায় যে, মেয়েদের পৃথক স্কুল-কলেজ সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে পারলে ভাল হত। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় মনোযোগ বাড়ত।

ইসলাম অবশ্য একথা বলে না যে, মেয়েরা কখনও ছেলেদের মাঝে যেতে পারবে না। ইসলামের পোশাক ও শিষ্টাচার পালন করে প্রয়োজনে নারী-পুরুষ এক কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। রাসূল (সা:)-এর যুগে মেয়েরা মসজিদে যেতে এবং সকল ধরনের কাজ কর্মে অংশ নিতে পারতেন। আর নৈতিকতার প্রশ্নে রাসূল কত আপোসহীন ছিলেন তা সবার জানা। অবশ্য তখনকার মেয়েরা ইসলামী পোশাক পরিধান করত এবং মসজিদে বা সমাবেশে ছেলেদের চেয়ে পৃথক স্থানে বসত, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এড়িয়ে চলত। তারা সমাবেশে আলোচনায় অংশ নিত এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সমাজে যৌন-নৈতিকতার বিপর্যয়টা নারী-পুরুষের দেখা সাক্ষাতের কারণে বা এক কর্মক্ষেত্রে অবস্থানের কারণেই হচ্ছে না। বরং এটা নির্ভর করছে দেখা সাক্ষাতের স্থান, পরিবেশ, পরিচ্ছদ, উদ্দেশ্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উপর।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ২৯:২৮,

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ২৪:১৯

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ২৪:৩০-৩১, ৩১:১৯ এই আয়াতে লোকমান তার ছেলেকে পুরোপুরি নীরব থাকতে বলেননি।

হাদীসে আছে রাসূল (সা:) সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে কামনার চাহনী থেকে চোখের জেনা হয়।

এফ-১৭ ইসলামে পোশাকের বিধান ও শিষ্টাচার

প্রশ্ন ১. অনেকেই বলেন, মানুষের পোশাক নির্বাচন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়, সেখানে ইসলাম কেন মুসলমানদের উপর ড্রেস কোড চাপিয়ে দিল?

২. যেহেতু ইসলামী পোশাকের বিধানে মেয়েদের উপর বেশী বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সেহেতু এটা কি বলা যায় না যে ইসলামী পোশাক বিধান ন্যায় সংগত নয়?

৩. পোশাক সংক্রান্ত ইসলামী বিধানগুলো সংক্ষেপে বলুন।

৪. 'আউরা' (সতর) শব্দের ব্যাখ্যা করুন।

৫. মেয়েদের 'সতর' এর সীমা বেশী কেন?

৬. এমন কোন ক্ষেত্র আছে যেখানে মেয়েদের 'সতর' এর সীমা শিথিল?

৭. কোন কোন পুরুষের সামনে মেয়েদের 'সতর' এর সীমা শিথিল?

উত্তর : ১. ইসলামে পোশাকের বিধান কেন করা হয়েছে?

পোশাক শুধু আচ্ছাদনের উদ্দেশ্যেই পরা হয়না এর কয়েকটি কাজ আছে। যারা আবেগের বশে বলেন যে, পোশাক একান্ত ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয় তারা পোশাক পরার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের দুটির প্রতি জোর দিতে গিয়ে তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটিকে ভুলে যান। পোশাক পরার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক) শীত ও রোদ থেকে রক্ষা

খ) শরীর সৌন্দর্যকরণ ও সুসজ্জিতকরণ

গ) নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা। পোশাকের এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল কুরআনের ৭ম সূরার ২৬ নং আয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। উক্ত আয়াতে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে যদিও অন্তরের পবিত্রতা গুরুত্বপূর্ণ তবুও শুদ্ধতা বাহ্যিক দেহাবরণ এর সাথে সংযুক্ত। কারণ এটা নৈতিক অপরাধ ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখে। লক্ষ্যণীয় যে এই আয়াতে শুধু মুসলিমের নয় বরং সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। যাতে বোঝা যায় অপর্যাপ্ত পোশাক পরার কারণে সৃষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতা গোটা মানব সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর। অন্তরের পবিত্রতা বাহ্যিক আচরণের শুদ্ধতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উত্তর : ২. মেয়েদের উপর কি পোশাকের বিধান বেশী চাপানো হয়েছে?

একটি আদর্শ মুসলিম সমাজে নৈতিক মান বজায় রাখার দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়ের

সমান। এতদসংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে নারী-পুরুষ উভয়কেই আহ্বান জানানো হয়েছে তাদের দৃষ্টিকে সংযত করতে এবং তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে। এছাড়া যখন কুরআন উন্নত নৈতিক আদর্শ আর সতীত্বের প্রশংসা করেছে তখন নারী-পুরুষ উভয়ের প্রশংসা করেছে। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নৈতিকতা রক্ষায় উভয়ের দায়িত্ব সমান। যদিও দায়িত্ব পালনের কর্মপরিধি আর বিধিনিষেধ উভয়ের ক্ষেত্রে এক নাও হতে পারে। কিন্তু উভয়ের পোষাকের বিধানের নেপথ্যে মূলনীতি একই।

উত্তর : ৩. পোশাক সংক্রান্ত ইসলামী বিধানের সারমর্ম

এ সংক্রান্ত ইসলামী আইনের কিছু বাধ্যতামূলক কিছু বাঞ্ছিত, কিছু অনুমোদিত, কিছু অপছন্দনীয় এবং কিছু নিষিদ্ধ। নীচে ছক আকারে তা দেখানো হল

যার জন্য পোশাকের বিধান প্রযোজ্য

	নারী ও পুরুষ	শুধু নারী	শুধু পুরুষ
বাধ্যতামূলক	'সতর' ঢাকা (আওরা)	মুখ ও কব্জি পর্যন্ত হাত বাদে পুরো শরীর	নাভীর উপর থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত
বাঞ্ছিত	পরিচ্ছন্নতা, শালীনতা Tidiness	ঢিলে পোশাক পরা চাদর বা আবায় পরা	মাথায় টুপি পরা
অনুমোদিত	এই তালিকায় নিষিদ্ধ এবং অপছন্দনীয় বাদে সব		
অপছন্দনীয়	অহংকার ও অন্ধ অনুকরণ		
নিষিদ্ধ	বিপরীত লিঙ্গের মানুষের পোশাক পরা		স্বর্ণের অলংকার ও সিল্কের পোশাক

উত্তর : ৪. 'আওরা' (সতর) শব্দের ব্যাখ্যা

আওরা শব্দের সাধারণ অর্থ ও প্রায়োগিক অর্থ দুটোই আছে। এর সাধারণ অনুবাদ হচ্ছে শরীরের একান্ত আচ্ছাদনযোগ্য অঙ্গসমূহ। একটি হাদীসে আছে কোন পুরুষ অপর পুরুষের সতর দেখতে পারবে না। তেমনি কোন নারীও কোন নারীর সতর দেখতে পারবে না। অর্থাৎ সতর বলতে বোঝায় শরীরের এমন ন্যূনতম অংশ যা অবশ্যই অপ্রকাশিত থাকতে হবে (শুধুমাত্র চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া)। এই সাধারণ অর্থ ছাড়াও 'আওরা' শব্দের প্রায়োগিক অর্থ হচ্ছে শরীরের সেসব অংশ যা অন্যদের দেখানো যাবে না। পুরুষের জন্য যা অবশ্য ঢাকতে হবে তা হচ্ছে নাভীর উপর থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। নারীর জন্য হচ্ছে মুখমণ্ডল এবং হাত (কব্জি পর্যন্ত) ছাড়া সর্বাঙ্গ। অবশ্য একজন নারীর

জন্য তার পুত্র-সন্তানের সামনে, পিতার সামনে এই আওরা শিথিলযোগ্য আর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য দৃষ্টির কোন বাধা নেই।

উত্তর : ৫. মেয়েদের সতর এর সীমা বেশী কেন?

আল্লাহ নারী-পুরুষ উভয়কে পরস্পরের দিকে আকর্ষণ দিয়ে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ বিয়ে করে পরিবার গঠন করে পৃথিবীতে মানব বংশধারা টিকিয়ে রাখতে পারে। শারীরিক এবং শারীরবিদ্যাগত দিক থেকে নারী-পুরুষ এক রকম নয়। নারীকে স্রষ্টা অধিক আকর্ষণীয় ও কমনীয় করে সৃষ্টি করেছেন। যার ফলে তাকে বেশী আবৃত করতে হয়। এটা পুরুষের প্রতি দেয়া কোন সুবিধা বা নারীর প্রতি অবিচার নয়। এটা মনে রাখা উচিৎ যে, এই বিধান কোন পুরুষ আলেম, .. নবী করেননি, করেছেন স্বয়ং আল্লাহ যিনি নারী- বা পুরুষ নন কাজেই তাঁর পক্ষে কোন লিঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নই উঠে না। কোন মুসলিম নারী এই পোষাক সামাজিক বা পারিবারিক চাপে কিংবা স্বামীর ভয়ে পরে না বরং এটা স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অংশ হিসেবে পড়ে।

উত্তর : ৬. যেখানে সতরের সীমা শিথিল

যখন কোন নারী তার নিজস্ব বাড়ীতে অবস্থান করে অথবা স্বামীর সাথে অবস্থান করে তখন সে ইচ্ছেমত পোশাক পরিধান করতে পারবে। এছাড়াও সে যখন মাহরেম আত্মীয়দের (যাদের সাথে বিয়ে হারাম) মাঝে অবস্থান করে তখন তার পুরো আবৃত হবার প্রয়োজন নেই- সে তখন চুল, ঘাড়, বাহু এবং পা উন্মুক্ত রাখতে পারে।

উত্তর : ৭. যেসব পুরুষের সামনে সতর এর সীমা শিথিলযোগ্য

স্বামী ছাড়া যাদের সামনে নারীর সতর সীমা শিথিলযোগ্য তারা হলো, পুত্র, পিতা, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বোনের ছেলে। এসব একান্ত আপন আত্মীয়দের পক্ষে তার দিকে লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ অসম্ভব। এছাড়াও যখন কোন নারী অন্য নারীদের মধ্যে অবস্থান করে তখনও তার সতর সীমা শিথিলযোগ্য।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৭:২৬

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ২৪:৩০-৩১, ৩৩:৩৫

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ২৪:৩০-৩১

এফ-১৮ ইসলামের পোশাক বিধান

প্রশ্ন ১. নারীর জন্য নেকাব পরা কি কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা?

২. যেসব মুসলিম নারী নেকাব পরে তারা কি ভুল করছে বা অপ্রয়োজনীয় সতর্কতা নিচ্ছে?

৩. পোশাক সম্পর্কে বাঞ্ছিত আর কি বিধান আছে?

৪. পোশাক সম্পর্কে অপছন্দনীয় কি কি বিধান আছে?

৫. পোশাক সম্পর্কে নিষিদ্ধ বিধান কি কি?

উত্তর : ১. নেকাব পরা কি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা?

কোরআন এবং হাদীসে মুসলিম নারীর নেকাব বাধ্যতামূলক হবার পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং নেকাব যে বাধ্যতামূলক নয় তার পক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আছে। যথা-

ক) হাদীসে আসমা- একবার রাসূল (সা:)-এর শ্যালিকা আসমা বিনতে আবুবকর (রা:) তাঁর সামনে প্রথম পাতলা কাপড় পরে আসেন যা দিয়ে তার সৌন্দর্য ঢাকা পড়ছিল না। তখন রাসূল (সা:) রাগ করে তাঁর মুখ সরিয়ে নেন এবং ঠিকভাবে কাপড় পরতে আদেশ করেন। তিনি বলেন, "আসমা, প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর জন্য তার শরীরের 'এ দুটো' ছাড়া আর কিছু প্রদর্শন ঠিক নয়" এই বলে তিনি নিজের মুখমণ্ডল ও হাত (Hand) দেখান। রাসূলের এই হাদীস থেকে এটা অকাট্যভাবে স্পষ্ট যে, মুসলিম নারীর শরীরে কতটুকু ঢাকতে হবে আর কতটুকু উন্মুক্ত রাখা যাবে।

খ) সকল মুসলিম আলেম ও আইনবিদ এ বিষয়ে একমত যে, মুসলিম নারী মুখমণ্ডল খোলা রেখেই নামায পড়তে পারবে। আমরা জানি যে, নামাজের অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে সতর ঢাকা। কাজেই নামাজে মুখমণ্ডল খোলা রাখার অনুমতি এটাই প্রমাণ করে যে, মুখমণ্ডল মেয়েদের সতর-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই পরিচ্ছদেই সে বাইরে যেতে পারবে।

গ) হজ্ব ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত একটি মৌলিক ইবাদত। লক্ষ্যণীয় যে, নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যেই হজ্বের সময় মুখ খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি মুখমন্ডল নারীর সতরের অন্তর্ভুক্তই হত তাহলে হজ্বের মত মৌলিক ইবাদতে এ বিষয়ে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করা হত না। কাজেই নারীর জন্যে মুখমন্ডল আবৃত রাখাটা কোন বাধ্যবাধকতা নয়।

ঘ) রাসূল (সা:) এর হাদীস থেকেও এটা দেখা যায় যে, মেয়েদের জন্যে মুখমন্ডল আবৃত রাখার কোন অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন বা চর্চা নেই।

ঙ) আল- কুরআনের ২৪ নং সূরার ৩০-৩১ নং আয়াতে মুসলিম পুরুষদের বলা হয়েছে তাদের দৃষ্টিকে সংযত ও নত করতে; এখান থেকেও এটা বোঝা যায় যে,মেয়েরা পর্দা পালন করার পরও তাদের মধ্যে দেখার মত কিছু (অর্থাৎ মুখমন্ডল) উন্মুক্ত থাকবে।

উত্তর : ২. নেকাব পরা কি ভুল অথবা অপ্রয়োজনীয় সতর্কতা?

নেকাব পরা যেমন বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যে পড়ে না তেমনি নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় কাজের মধ্যেও পরে না। যদি কোন মহিলা নেকাব পরিহিত অবস্থায় অধিকতর নিরাপদবোধ করে তবে সে নেকাব পড়তে পারে। বর্তমানে সমাজে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নারীর প্রতি অব্যহত সহিংসতা থেকে নিজকে নিরাপদ ও দূরে রাখতে অনেক মহিলা নেকাব পরা পছন্দ করেন। অবশ্য হজ্বের আনুষ্ঠানিকতার সময় নেকাব খুলতেই হবে।

উত্তর : ৩. পোষাক সম্পর্কে আরও কিছু বাঞ্ছিত বিষয়

নারী এবং পুরুষ উভয়ের পোষাক সম্পর্কে আরও তিনটি বাঞ্ছিত বিষয় আছে- যেমন

ক) পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধির সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা:) একটি হাদীস বলেছেন, “পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।”

খ) পরিপাটি থাকা॥ ইসলামী পোষাক বিধান মান্য করে কোন মুসলিম যেন অপরিপাটি বা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় না থাকে।

গ) শালীনতা॥ মুসলমানরা সর্বাবস্থায় পোষাকে শালীনতা ও ভদ্রতা বজায় রাখবে। এমনভাবে পোষাক পরবে না যা অন্যদের জন্য কামোদ্দীপক হতে পারে। যদিও পুরুষের সতর নাভীর উপর থেকে হাটুর নীচ পর্যন্ত, কিন্তু উর্ধাঙ্গ অনাবৃত রেখে চলাফেরা তার জন্যে অভদ্রতা ও অশালীন।

এছাড়াও পুরুষদের মাথা ঢাকবার জন্য টুপী বা অন্য কিছু ব্যবহারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা:) বলেছেন যে,এটা মানুষের চেহারায় ফেরেশতার দীপ্তি এনে দেয়। নারীদের জন্যে এটা বাঞ্ছিত যে, সতর ঢাকবার পর উর্ধাঙ্গে আলাদা চাদর/ ওভারকোর্ট/ এপ্রন পরা।

উত্তর : ৪. পোষাক সংক্রান্ত অপছন্দনীয় কাজ

সাধারণভাবে ইসলামে বর্ণিত নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় তালিকার বাইরে আর সবই অনুমোদিত। কাজেই পোষাকের ব্যাপারে সকল রং ও ডিজাইন (যা ইসলাম বর্ণিত সীমার শরীরকে আচ্ছাদন করে) স্বীকৃত। অবশ্য ছেলে বা মেয়ের পোষাকের ডিজাইন যেন বিপরীত লিঙ্গের মানুষের পোষাকের অনুরূপ না হয়।

এছাড়া গর্ব, অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছার উদ্দেশ্য নিয়ে পোষক পরা ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু অপছন্দনীয়ই নয় বরং নিষিদ্ধ। পোষাক সংস্কৃতিতে অবিশ্বাসীদের অন্ধ অনুকরণও ইসলামে অপছন্দীয়।

উত্তর : ৫. পোষাক সংক্রান্ত নিষিদ্ধ বিষয়

পোষাক বিষয়ে সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে কারো পক্ষে বিপরীত লিঙ্গের পোষাক পরা। যেসব পুরুষ বা নারী বিপরীত লিঙ্গের মানুষের মত আচরণ করে রাসূল (সা:) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। এত কঠোর নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে এটা প্রকৃতির শুদ্ধ ধারার প্রতি বিদ্রোহের শামিল। একইভাবে অহংকারও নিষিদ্ধ বিষয়। ইসলামে বলা হয়েছে যে, অহংকার হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর অধিকার।

সবশেষে বলা প্রয়োজন যে, মুসলিম পুরুষের জন্য স্বর্ণ অথবা রেশম পরা নিষেধ।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৯:১০৮, ২:২২২

হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দারা তাঁর নির্ধারিত সীমা মেনে চলতে কতটা আন্তরিক তা দেখতে আগ্রহী থাকেন।

প্রশ্ন ৫. হাদীস রাসূল (সা:) বলেন, যে, ব্যক্তি পৃথিবীতে অহংকারের পোষাক পরে তার জন্য পরকালে রয়েছে তিরস্কারের আবরণ।

এফ-১৯ ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য চর্চা ও পরিচ্ছন্নতা

প্রশ্ন ১. সৌন্দর্য চর্চা ও পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. সৌন্দর্য চর্চা প্রসঙ্গে বাধ্যতামূলক ও পছন্দনীয় কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে কি কি?
৩. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বলতে ইসলামে কি বোঝানো হয়েছে?
৪. ইসলামের নৈতিক শিক্ষায় সৌন্দর্য চর্চা প্রসঙ্গে অনুমোদিত ও অছন্দনীয় কাজগুলো কি কি?
৫. ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য চর্চা প্রসঙ্গে নিষিদ্ধ কাজগুলো কি কি?
৬. অপ্রয়োজনীয় প্লাষ্টিক সার্জারী বলতে কি বোঝায়?
৭. সৌন্দর্য চর্চা সম্পর্কে ইসলামের এসব বিধি-নিষেধের বিষয়ে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি আছে কি?
৮. ইসলামের দৃষ্টিতে কামনীয় ভঙ্গিতে হাটা ও কথা বলাও কি নিষেধ?
৯. শালীনতা ও ভদ্রতা প্রসঙ্গে ইসলামের আর কোন নির্দেশনা আছে কি?

উত্তর : ১. সৌন্দর্য চর্চা প্রসেঙ্গ ইসলামী নীতিমালার সার সংক্ষেপ

যার উপর নীতিমালা প্রযোজ্য

	নারী ও পুরুষ	শুধু নারী	শুধু পুরুষ
অত্যাবশ্যক			
পছন্দনীয়	নখ কাটা, নিজ স্বামী বা স্ত্রীর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করতে সাজ-সজ্জা করা। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।	মেহেদী (হেনা) ব্যবহার করা	দাঁড়ি রাখা মোচ ছাঁটা
অনুমোদিত : নিষিদ্ধ এবং অপছন্দনীয় নয় এমন সব কিছু। মেয়েদের রেশম ও স্বর্ণের জিনিস পরা।			
অপছন্দনীয়	পাকা চুল উপড়ে ফেলা, আংশিক চুল বা দাঁড়ি কামানো চুল বা দাঁড়ি জটা পাকানো		
নিষিদ্ধ	উল্কি আঁকা, পরচুলা পরা, ভ্রূ প্লাকিং করা, অপ্রয়োজনীয় প্লাষ্টিক সার্জারী, স্বাভাবিক দাঁত তুলে স্বর্ণের দাঁত লাগানো।	ঘরের বাইরে যাবার সময় সুগন্ধি ব্যবহার বা মেক-আপ নেয়া কমনীয় ভাবে হাটা বা কথা বলা	রেশম বা স্বর্ণের জিনিস পরা।

উত্তর : ২. ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য চর্চা বিষয়ে বাধ্যতামূলক পছন্দনীয় কিছু আছে কি?

পুরুষ বা নারী কারো জন্যেই সৌন্দর্য চর্চা বিষয়ে ইসলামে বাধ্যতামূলক কিছু নেই। রাসূল (সা:) বলেছেন যে, মুসলমান পুরুষের জন্যে দাঁড়ি রাখা পছন্দনীয় কাজ। অবশ্য দাঁড়ি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করতে ছাঁটা যাবে। কোন কোন মুসলিম আইনবিদ দাঁড়ি মুন্ডন করাকে ইসলামে নিষিদ্ধ মনে করেন। মোচ ছাঁটা ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় কাজ অবশ্য এটা যে, একেবারে মুন্ডন করে ফেলতে হবে এমন কোন কথা নেই।

মুসলিম মেয়েদের জন্য মেহেদী (হেনা) ব্যবহারে হাত রাঙানো পছন্দনীয় কাজ। এছাড়াও মুসলিম নারী পুরুষের জন্যে পছন্দনীয় হচ্ছে–

ক) নখ কাটা

খ) পাকা চুল মেহেদীযোগে রঙীন করা

গ) স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরের কাছে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে সাজ-সজ্জা করা। অনেকে মনে করেন যেহেতু ইসলাম শালীনতা ও সতীত্ব রক্ষায় মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে মেক-আপ ও সুগন্ধী ব্যবহারে বারণ করেছে সেহেতু এগুলো হারাম। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। বরং স্বামীর জন্য নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতেই ইসলাম মেয়েদের উৎসাহিত করেছে। তেমনি স্বামীকেও স্ত্রীর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে বলেছে।

উত্তর : ৩. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বলতে ইসলামে যা বোঝায়

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ফলে এর নির্দেশনা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধানের সাথে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার বিষয়েও বিস্তৃত। রাসূল (সা:) মুসলমানদের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে নিম্নলিখিত পাঁচটি আদেশ দিয়েছেন–

ক) পুরুষের জন্য সুন্নতে খৎনা

খ) গোপনাঙ্গের চুল কাটা

গ) বগলের চুল কাটা

ঘ) মোচ ছাঁটা।

ঙ) নখ কাটা

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা:) উপরের তালিকা 'খ' থেকে 'ঙ' পর্যন্ত অংশ অন্তত: প্রতি চল্লিশ দিনে একবার পালন করতে বলেছেন।

উত্তর : ৪. সৌন্দর্য চর্চায় অনুমোদিত ও অপছন্দনীয়

ইসলামে নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় নয় এমন সব কিছুই মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্যে অনুমোদিত। এছাড়াও মুসলিম নারীর জন্য স্বর্ণ ও রেশমের সামগ্রী পরা অনুমোদিত।

পুরুষ ও নারীর জন্য অপছন্দনীয় কাজের তালিকায় যা পড়ে তা হচ্ছে–

ক) পাকা চুল উপড়ানো, যদিও পাকা চুল মেহেদী দিয়ে রঙ করা ইসলামে অনুমোদিত।

খ) চুল আংশিকভাবে কামানো (পাংকদের মত) এবং চুল বা দাঁড়িতে জটা পাকানো। চুল পুরোপুরি কামাতে হবে অথবা পুরোপুরি রাখতে হবে।

গ) যে, কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা। এমনকি অনুমোদিত বিষয়গুলোও বাড়াবাড়ির কারণে নিষিদ্ধের পর্যায়ে চলে যায়।

উত্তর : ৫. সৌন্দর্য চর্চায় নিষিদ্ধ কাজগুলো

পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশম নিষিদ্ধ। মেয়েদের জন্যে ঘরের বাইরে যাবার সময় মেক-আপ ও সুগন্ধির ব্যবহার নিষিদ্ধ।

নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যে নিষিদ্ধ–

ক) উল্কি আঁকা- কারণ এটা আল্লাহ্ যে, প্রকৃতিতে মানুষকে তৈরী করেছেন তাকে নষ্ট করে।

খ) পরচুলা পরা– কারণ রাসূল এটা পরাকে মিথ্যাচার বা প্রতারণার শামিল বলেছেন।

গ) ভ্রু প্লাক করা। অবশ্য কোন মেয়ের মুখমন্ডলে অবাঞ্ছিত চুল থাকলে যা বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে তা অপসারণ করা যাবে।

ঘ) অপ্রয়োজনীয় প্লাষ্টিক সার্জারী।

উত্তর : ৬. প্রয়োজনীয় প্লাষ্টিক সার্জারী বলতে যা বুঝায়

যদি দুর্ঘটনাবশত : কারো শরীরের বিকৃতি ঘটে বা জন্মগতভাবে কারো শরীরে এমন অসঙ্গতি থাকে যা স্বাভাবিক নয় এবং বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্ম দেয় তবে তার জন্য এই অস্বাভাবিকতা দূর করতে প্লাষ্টিক সার্জারী অনুমোদিত। আর জাতিগত ভাবেই যার নাক উঁচু নয় (যেমন চিনা বা মঙ্গোলীয়রা) তাদের জন্য সেটাই স্বাভাবিক, এমন ব্যক্তির জন্য প্লাষ্টিক সার্জারী করে নাক উঁচু করা অপচয় এবং আল্লাহর সৃষ্টি শৈলীর প্রতি বিদ্রোহের শামিল।

উত্তর : ৭. উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞা সমূহের পক্ষে শরয়ী দলীল

যেসব পুরুষ ও নারী নিজেদের গায়ে উল্কি আঁকে, অন্যদের উল্কি আঁকতে আদেশ করে বা কারো গায়ে উল্কি আঁকে তাদের রাসূল (সা:) অভিশাপ দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি যারা স্বাভাবিক দাঁত তুলে স্বর্ণের কৃত্রিম দাঁত লাগায়, যারা পরচুলা পরে এবং ভ্রু প্লাক করে তাদেরও অভিশম্পাত দিয়েছেন।

উত্তর : ৮. কমনীয় হাঁটা ও বাচনভঙ্গি প্রসঙ্গে

অন্যদের মাঝে কামোদ্দীপনা ও আকর্ষণ জাগিয়ে হাটা-চলা করা ইসলাম বর্ণিত শালীনতা ও সতীত্বের ধারণার পরিপন্থী। এটা সরাসরি কুরআনে নিষিদ্ধ। মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্যে একসাথে কথা বলা অনুমোদিত, কিন্তু তারা এমনভাবে কথা বলবে না যাতে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ তৈরী হয়।

উত্তর : ৯. শালীনতা ও ভদ্রতা প্রশ্নে ইসলামের অন্যান্য নির্দেশনা

গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষের জন্য কোন ঘর বা পার্ক এর নির্জনতায় একান্ত অবস্থান ইসলামে অনুচিত। কোন মুসলিম নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা নৈতিক অভিযোগ আনা ইসলামের দৃষ্টিতে দন্ডনীয় গুরুতর অপরাধ।

সূত্র :

প্রশ্ন ৫. একবার বিবি আয়েশা (রা:)-এর কাছে এক মহিলা জানতে চাইলেন যে, তাঁর মুখমন্ডলের অবাঞ্ছিত চুল তার স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য সে কাটতে পারে কিনা। জবাবে বিবি আয়েশা বললেন, "যা কিছু বিব্রতকর ও অসুন্দর তা অপসারণ কর"।

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ৪:১১৯

প্রশ্ন ৮. আল কুরআন ২৪:৩১, ৩৩:৩২।

এফ-২০ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ ও অধিকার রক্ষা

প্রশ্ন ১. সম্পদ ও অধিকার রক্ষার বিষয়ের সাথে ইসলামের নৈতিক বিধানের সম্পর্ক কি?

২. সম্পদ ও অধিকার সুরক্ষায় ইসলাম কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

৩. চৌর্যবৃত্তি রোধে ইসলাম কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

৪. শোবাহ্ শব্দের ব্যাখ্যা করুন।

৫. চোরাই মাল খরিদ করা কি ইসলামে অনুমোদিত?

৬. সুদ সম্পর্কে ইসলামী বিধান কি? এই বিধানের সাথে মানব সম্পদ রক্ষায় ইসলামের ব্যবস্থাটি কিভাবে সম্পৃক্ত?

৭. জুয়া খেলা বন্ধ করার নৈতিক কারণ কি?

৮. সরকারী লটারী এবং sweep stakes সম্পর্কে ইসলামী বিধান কি?

৯. প্রতারণার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে ইসলাম কিভাবে মানুষকে সতর্ক করেছে?

১০. এককভাবে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির বাজার দখল (Monopoly) সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি?

১১. অপচয়ের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কি?

উত্তর: ১. সম্পদ ও অধিকার রক্ষার বিষয়ের সাথে ইসলামের নৈতিক বিধানের সম্পর্ক

এই বইয়ের 'এফ-৭' অনুচ্ছেদে ইসলামের নৈতিক বিধানের পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই পাঁচটি হচ্ছে।

ক) ঈমান রক্ষা।

খ) জীবন রক্ষা

গ) মানুষের মানসিক শান্তি ও ভারসাম্য রক্ষা

ঘ) মানুষের মর্যাদা রক্ষা

ঙ) মানুষের সম্পদ ও হক রক্ষা।

এই প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনে ইসলাম যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। ইসলামের এই ব্যবস্থা শুধু ফৌজদারী দন্ড বিধানেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলাম ব্যক্তির অন্তরকে আধ্যাত্মের পথে জাগ্রত করে পরিশুদ্ধির পথে নিয়ে যায়।

উত্তর : ১. সম্পদ ও অধিকার রক্ষায় ইসলাম গৃহীত ব্যবস্থা

সম্পদ রক্ষায় ইসলামী আইনে গৃহীত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিম্নরূপ (এই তালিকার বাইরেও আরও অনেক ব্যবস্থা আছে)

ক) চুরির উপর নিষেধাজ্ঞা

খ) সুদ এর উপর নিষেধাজ্ঞা

গ) জুয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা

ঘ) প্রতারণার উপর নিষেধাজ্ঞা

ঙ) মনোপলি ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা

চ) অপচয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা।

উত্তর : ৩. চুরি রোধে ইসলাম গৃহীত ব্যবস্থা

ক) প্রথমত : ইসলাম সবাইকে আল্লাহ সচেতন করে তোলে। এই আল্লাহ সচেতনতার ফলে মানুষের প্রতিটি কাজ আল্লাহ দেখছেন এই বিশ্বাস তার মাঝে দৃঢ় থাকে। ফলে আল্লাহর উপস্থিতিতে চুরি অসম্ভব হয়ে পড়ে।

খ) ইসলাম মানুষকে অনুপ্রাণিত করে শ্রমকে এক মহৎ গুণ হিসাবে গণ্য করতে এবং প্রতিটি জিনিস শ্রম করে অর্জন করতে। ইসলাম মতে এটা সমাজের দায়িত্ব যে, মানুষকে এমনভাবে চালিত করা যাতে তারা কাজ ও শ্রমকে সম্মানজনক হিসেবে দেখে।

গ) ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর দায়িত্ব দিয়েছে প্রতিটি নাগরিক যেন সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন-যাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে। প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম চাহিদা হিসেবে খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, বাসস্থান এবং যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করে সে যেন জীবিকা খুঁজে নিতে পারে তা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টার পরও সে কাজ খুঁজে না পায় বা শারীরিক কারণে কাজ করতে অক্ষম হয় তবে তার ভরণপোষণের ভারও রাষ্ট্রের উপরই বর্তায়।

ঘ) এভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তির জন্যে সকল সুবিধা নিশ্চিত করবার পরও যদি কেউ চুরি করে বা কোনভাবে অন্যের হক নষ্ট করে কেবল তখনই ইসলামের শাস্তির বিধান তার উপর প্রযোজ্য হবে। ইসলামে চুরি এবং এ জাতীয় অন্য অপরাধের জন্য শাস্তির বিষয়টি সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবেই আছে এবং এটা সন্দেহজনক (Shobhah) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না।

উত্তর : ৪. শোবাহ (Shobhah) শব্দের ব্যাখ্যা

আরবী 'শোবাহ' শব্দের অনুবাদ করা হয় 'সন্দেহ' এই শব্দ দিয়ে। কিন্তু 'সন্দেহ' শব্দ দিয়ে 'শোবাহ' শব্দের পুরো অর্থ প্রকাশিত হয় না। ইসলামে 'শোবাহ' শব্দ একটি আইনী

পরিভাষা। এর মানে যে, কোন অপরাধের সাজা প্রদানের আগে বিচারককে এটা নিশ্চিত হতে হবে যে, অপরাধীর সামনে এমন কোন পরিস্থিতি ছিল না যা তাকে অপরাধ সংঘটনে বাধ্য করেছে। যেমন, ক্ষুধার তাড়নায় কেউ যদি খাদ্য বা রুটি চুরি করে তবে তার উপর ইসলামের দন্ড বিধান প্রযোজ্য হবে না। ইসলাম একটি ইনসাফপূর্ণ দরদী সমাজ গড়তে চায় যেখানে মানুষের চুরির কোন প্রয়োজন থাকবে না। তেমন সমাজে ইসলামের দন্ডবিধান অপরাধ রোধে নিবারকের কাজ করবে।

উত্তর : ৫. চোরাই মাল ক্রয় প্রসঙ্গে

কেউ যদি সজ্ঞানে চোরাই মাল ক্রয় করে তবে সে নিজেও চুরির দায়িত্বে শরীক হয়। রাসূল (সা:) বলেন, যখন কেউ জেনেশুনে চোরাই মাল কেনে তখন সে নিজে ঐ পাপের এবং তার শাস্তির অংশীদার হয়।

উত্তর : ৬. সুদ প্রসঙ্গে ইসলামী বিধান এবং এর সাথে সম্পদ রক্ষায় ইসলামী বিধানের সম্পর্ক

ঋণ বা পুঁজি খাটানোর মাধ্যমে ব্যবসার কোন ক্ষতি বা ঝুঁকিতে অংশ না নিয়ে নিরেট লাভ করার নাম সুদ। ক্ষতির ঝুঁকি ছাড়া এ ধরনের আয় মুসলমানদের জন্য হারাম। ইসলামে কাজ না করে অথবা ব্যবসায় ন্যূনতম ঝুঁকিতে অংশ না নিয়ে আয় করাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম ছাড়া খ্রিস্টবাদেও সুদ নিষিদ্ধ। ইসলামে সুদের উপর নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মানুষের সম্পদকে হেফাজাত করা হয়েছে কারণ সুদের মাধ্যমে সমাজে অনেক সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যেমন–

ক) সুদের মাধ্যমে সহজে ঋণপ্রাপ্তি মানুষকে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় ও সাধ্যের অতীত ক্রয়ে প্রলুব্ধ করে।

খ) একইভাবে সহজে ঋণপ্রাপ্তি মানুষকে অতি ঝুঁকিপূর্ণ এবং অতি লোভনীয় ব্যবসায় জড়াতে প্রলুব্ধ করে।

গ) ঋণগ্রস্ত মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যে একবার খারাপ করলে এবং ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে তার পক্ষে দেউলিয়া হওয়া ভিন্ন আর উপায় থাকে না। কারণ চক্রবৃদ্ধি সুদের পরিমাণ কল্পনাতীত রকমের বেশি হয়ে যায়।

ইসলামে ব্যবসা এবং বিনিয়োগ হালাল, যেখানে বিনিয়োগকারী এবং ঋণ গ্রহণকারী উভয়ের লাভ-লোকসানে সমান অংশীদারিত্ব থাকবে।

উত্তর : ৭. জুয়া খেলা নিষিদ্ধ হবার কারণ

কোরআনের একটি আয়াতে জুয়া নিষিদ্ধ হবার তিনটি কারণ আলোচিত হয়েছে। যথা–

ক) জুয়াকে অপবিত্র অনৈতিক বলা হয়েছে। কারণ এটা এমন এক খেলা যেখানে মানুষ খেলা অনুকূলে থাকলে বিনাশ্রমে মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার পাউন্ড

আয় করতে পারে। পক্ষান্তরে যে, খেলার হারে সেও একই প্রক্রিয়ায় নি:স্ব হয়। এটা মানবিকতার বিপরীতে চরমতম স্বার্থপরতার নিদর্শন।

খ) কোরআন বলেছে এ ধরনের টাকার খেলা মানুষের মাঝে ঝগড়া ও শত্রুতা তৈরী করে। যেখানে ইসলাম মুমিনদের মাঝে ভ্রাতৃত্বসূলভ, দরদী ও আন্তরিক সম্পর্কের কথা বলেছে সেখানে এটা নিশ্চিত যে, জুয়া খেলা ইসলামের চেতনার বিরোধী।

গ) জুয়ার আর এক দোষ হচ্ছে তা মানুষের মধ্যে আশক্তির জন্ম দেয়। এ খেলায় জয়ী ব্যক্তি আরও টাকা প্রাপ্তির লোভে এবং পরাজিত ব্যক্তি হারানো টাকা পুনরুদ্ধারের আশায় দ্বিগুণ আকর্ষণে খেলতে নামে। এটা মানুষের অন্তরে লালসার জন্ম দেয় এবং তাকে খোদার স্মরণ হতে দূরে সরিয়ে দেয়। এটা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত এবং পৃথিবীতে তার জীবনের মূল লক্ষ্য ও তৎপরতা থেকে সরিয়ে দেয়।

উত্তর : ৮. সরকারী লটারী এবং Sweepstakes সম্পর্কে ইসলামী বিধান

লটারীর মধ্যে জুয়ার আলামত থাকায় ইসলামে লটারী নিষেধ। সরকার এটার আয়োজক হলেই এর অবৈধতা দূর হয় না। বরং সরকারের উচিৎ মানুষকে অনুৎপাদনশীল আয়ে অনুপ্রাণিত করে এমন সব তৎপরতা রোধ করা।

Sweepstakes এ সরাসরি জুয়ার উপাদান দেখা যায় না। কিন্তুএখানেও পুরস্কার হিসেবে মোটা অংকের বিনাশ্রমে অর্জিত অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ থাকে। যেহেতু এটা সন্দেহজনক বিষয় সেহেতু মুসলমানদের এটা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

ক্রয় করা পণ্যের সাথে প্রাপ্ত উপহার এবং ফ্রি সাম্পল অবশ্য বৈধ।

উত্তর : ৯. প্রতারণা রোধে ইসলামগৃহীত ব্যবস্থা

কুরআন এবং হাদীসে প্রতারণার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এসব থেকে আত্মরক্ষা করতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। এর সবই নিষিদ্ধ এগুলো হচ্ছে–

ক) মানুষকে ওজন বা পরিমাপে কম দেয়াটা একটা প্রতারণা

খ) সব ক্ষেত্রেই বিক্রেতার উচিৎ বিক্রয়কৃত মালের কোন ত্রুটি থাকলে তা সম্পর্কে ক্রেতাকে আগে অবহিত করা। তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত লাভ করবে।

গ) ক্রেতাকে মাল সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয়াও প্রতারণা। অনেক সময় খারাপ মাল ভাল মালের আড়ালে বা নীচে রাখা হয়। ক্রেতারা উপরের ভাল মাল দেখে সুধারণা করেন।

ঘ) যার পরিমাণ ও গুণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই তা অগ্রিম মূল্যে নিষেধ। যেমন পুকুরে জাল ফেলার আগে মাছের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তা বিক্রয় বা ক্ষেত বা বাগান পরিপক্ক হবার আগেই বিক্রয়।

ঙ) নিলাম বাজারে বিক্রেতার নিযুক্ত দালালরা মিথ্যা ক্রেতা সেজে দাম বাড়ায়। এতে সাধারণ মানুষ প্রতারিত হয়। রাসূল (সা:) এটা নিষেধ করেছেন।

চ) অনেক সময় ক্রেতা মাল বাজারে পৌছে তার প্রকৃত দরে পৌছবার আগেই প্রাক বাজার যাচাই করে উৎপাদকের কাছ থেকে পূর্ব নির্ধারিত দামে মাল বাজারে যাবার আগেই কিনে নেয়।

এখানে উৎপাদককে প্রকৃত দাম থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটাও একটা প্রতারণা।

উত্তর : ১০. মনোপলি ব্যবসা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে মজুতদারি করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করিয়ে পণ্যের দাম বাড়ানো নিষিদ্ধ। ১৯৭০ সালে এভাবে বিশ্বব্যাপী চিনির সংকট তৈরি করিয়ে ব্যাপকভাবে দাম বাড়ানো হয়েছিল। রাসূল (সা:) এভাবে পণ্যের মজুদকারীদের অভিশাপ দিয়েছেন বিশেষভাবে যারা অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী মজুদ করে।

উত্তর : ১১. অপচয় প্রসঙ্গে ইসলাম

ইসলামের মূল শিক্ষা এটাই যে, মানুষ তার কাছে থাকা সম্পদের একচ্ছত্র মালিক নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে এর জিম্মাদার। এ সবের একমাত্র এবং চূড়ান্ত মালিকানা আল্লাহর। এজন্যই কারোই অধিকার নেই সম্পদ যথেষ্ট অপচয় বা নষ্ট করার এছাড়াও কুরআন এই বিধান দিয়েছে যে, যারা তাদের সম্পদ ঠিকমত দেখে রাখতে পারবে না (যেমন অল্প বয়সে মীরাসী সূত্রে সম্পদপ্রাপ্ত নাবালক) তাদের জন্য অভিভাবক নিয়োগ করা হবে যিনি ঐ ব্যক্তির এবং সমাজের স্বার্থে সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ৪. শোবাহ এর একটি উদাহরণ ওমর (রা:)-এর শাসনামলে পাওয়া যায়। একবার তাঁর কাছে কয়েকটি বালককে উট চুরির অভিযোগে ধরে আনা হয়। ওমর (রা:) তাদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, যে, তাদের খামারের মালিক তাদের ঠিকমত খেতে দেয়না ও খোঁজ খবর নেয় না, তাই অনাহারে আক্রান্ত হয়ে তারা চুরি করেছে। তখন ওমর (রা:) তাদের চুরির অপরাধে সাজা না দিয়ে খামার মালিককে শ্রমিকদের অবহেলার জন্য জরিমানা করেন।

প্রশ্ন ৬. Deut. পঞ্চম অধ্যায়

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ৫:৯০

প্রশ্ন ৯. আল কুরআন ৭:৮৫, ১৭:৩৫, ২৬:১৮১-৮৩, ৮৩,

প্রশ্ন ১১. আল কেরআন ৪:৫-৬

এফ-২১ নৈতিক গুণ-তাকওয়া

প্রশ্ন ১. তাকওয়ার সাথে ইসলামী নৈতিকতার সম্পর্ক কি?

২. তাকওয়া শব্দের ব্যাখ্যা করুন।

৩. খোদাভীতি শব্দের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা কি? এর মানে কি আল্লাহর ভয়ে তটস্থ থাকা?

৪. তাকওয়া'র উপাদান হিসেবে আল্লাহ্-সচেতনতার ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

৫. আল্লাহর প্রেম বলতে ইসলামে কি বোঝায়?

৬. আল্লাহর প্রেম জাগ্রত করতে ইসলামে কোন নির্দিষ্ট কাজের আদেশ করা হয়েছে কি?

৭. কোন কোন বিষয় মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়?

৮. তাকওয়া থেকে কি কি উপকার ব্যক্তি ও সমাজ লাভ করে?

উত্তর : ১. তাকওয়ার সাথে ইসলামী নৈতিকতার সম্পর্ক

একটি নৈতিক ব্যবস্থা সমাজে ও জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুধু মানুষের কাছে আবেদন জানানো আর নিষিদ্ধ এবং অনুমোদিত বিষয়ের তালিকা প্রদানই যথেষ্ট নয়। ইতিপূর্বে বর্ণিত ইসলামী নৈতিকতার সংজ্ঞা, মানুষের ঈমান, জীবন, মন, সম্মান ও সম্পদ রক্ষায় নিবেদিত-এর উদ্দেশ্য এবং হালাল হারামের তালিকা ছিল ইসলামী নীতিবিদ্যার একটি অংশ। মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনে ইসলাম হালাল-হারামের আইনী বিধান প্রদান ছাড়াও মানুষের এমন আধ্যাত্মিক উত্থানের ব্যবস্থা করেছে যা তাকে যে, কোন পরিস্থিতিতে নৈতিক বিধান মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে। মানুষের এই আধ্যাত্মিক উন্নয়নই তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

উত্তর : ২. তাকওয়া শব্দের ব্যাখ্যা

'তাকওয়া' সমগ্র কুরআনে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত এক কেন্দ্রীয় ধারণা। এর অর্থ সাধারণভাবে করা হয়, আনুগত্য, সতর্কতা বা খোদাভীতি। তাকওয়া এই সব বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিত করে।

উত্তর : ৩. আল্লাহর ভয় শব্দের ব্যাখ্যা

তাকওয়া শব্দের অর্থ হিসেবে বর্ণিত খোদাভীতির মানে আতংকিত হওয়া নয়। কারণ ভালবাসা বা শ্রদ্ধার আন্তরিক অনুভূতি ছাড়াও কোন শক্তির ভয়ে আতংকিত হওয়া যায়। কিন্তু মুমিনের আল্লাহভীতি এমন নয়। মুমিনের আল্লাহভীতির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে হাশরের

ময়দানে তাঁর বিচার ও শাস্তির ভয় (যা অকৃতজ্ঞ ও আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীদের জন্য বরাদ্দ) এবং পৃথিবীর তাঁর নেয়ামত হারাবার ভয়। এছাড়াও এই ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ দুজন মানুষ যেমন সবসময় একে অপরকে সন্তুষ্ট করতে এবং যে, কোন অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলতে সচেষ্ট থাকে– মুমিনের আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা ঠিক তেমনি। আল্লাহ আমাদের জীবন, সম্পদ, জ্ঞান ও পথনির্দেশনা (হেদায়েত) দিয়েছেন কাজেই আমাদের তাঁকে জানতে হবে, তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি জানতে হবে এবং তাঁর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়তে হবে। তাঁকে অসন্তুষ্ট করা হবে অকৃতজ্ঞতার শামিল। কাজেই ইসলাম বর্ণিত তাকওয়া প্রচলিত অর্থে ক্ষমতাবানদের অসীম শক্তির ভয়ে আতংকের সাথে তুলনীয় হতে পারে না বরং এটা ভালবাসা থেকে সৃষ্ট সচেতনতা। মুসলমানরা আল্লাহ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁর সত্তা ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে তাঁর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলবে।

উত্তর : ৪. তাকওয়ার উপাদান হিসেবে সতর্কতা ও আল্লাহ সচেতনতার ব্যাখ্যা

তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কাজ থেকে সতর্ক ও নিরাপদ দূরত্বে থাকেন। ওমর (রা:) তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 'যখন একজন মানুষ কাটাপূর্ণ ঝোপঝাড় আবৃত সরু রাস্তা দিয়ে পথ বলেন, তখন তার কাপড়ে কাটা বিদ্ধ হবার আশাকায় সে যেমন সতর্ক ও সংকুচিত হয়ে পথ চলে তাই তাকওয়া।" এখানে মানুষের চরিত্রের রূপক অর্থেই পোষাক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে পবিত্র এবং খালিস চরিত্র দিয়েছেন যাকে যাবতীয় লোভ ও বিচ্যুতির কাঁটা থেকে রক্ষা করা মানুষের দায়িত্ব। আল্লাহ সচেতনতার মানে হচ্ছে সদা-সর্বদা সর্বত্রই আল্লাহর উপস্থিতি এবং ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থাকা-তাকওয়ার গুণের এটাই মূলকথা। আল্লাহ যে, প্রতিটি মানুষের প্রতিটি মুহূর্তের তৎপরতা ও মনের চিন্তাকেও লক্ষ্য করছেন এই অনুভূতি মানুষের গোটা জীবনের সকল কর্মকান্ডকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে। ইসলাম এভাবেই মানুষকে জীবনের সব কাজে আল্লাহর অনুগত হতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানুষের ধর্মীয় জীবন ও পার্থিব জীবনের মাঝে কোন ভেদরেখা টানে না।

উত্তর : ৫. আল্লাহ-প্রেম বলতে ইসলামে যা বোঝায়

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাকওয়া ও আল্লাহর প্রতি ভালবাসার কথা একসাথে আলোচিত হয়েছে। ইসলামে বর্ণিত এই আল্লাহ-প্রেম শুধু অর্থহীন অন্ধ-আবেগ প্রসূত মুখের কথা নয়, বরং এই আল্লাহ-প্রেম হচ্ছে মানুষের সার্বিকভাবে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং আল্লাহ ছাড়া সে যে, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এই অনুভবের প্রকাশ। এভাবে সে গর্ব অহংকার থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। আল্লাহর প্রতি ভালবাসার বহি:প্রকাশ ঘটবে তার আনুষ্ঠানিক ইবাদত (নামাজ, রোযা ইত্যাদি) এবং তার জীবনের সকল কাজকর্মে। এটা বলাই যথেষ্ট নয় যে, আমি আল্লাহ প্রেমী বরং আল্লাহ নির্দেশিত পথে সার্বিক জীবনকে

পুনর্বিন্যাস্ত করতে হবে প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, সম্পদ, সময়, যোগ্যতা এবং জীবনকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে হবে। রাসূল (সা:) এর একটি হাদীস বলা হয়েছে যে, যদি কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল-এর প্রতি ভালবাসাকে আর সব ভালবাসার উর্দ্ধে স্থান দেয়, সে তার অন্তরে ঈমানের প্রশান্তি অনুভব করবে এবং আল্লাহর কাছ থেকেও ভালবাসা পাবে।

উত্তর : ৬. আল্লাহ্-প্রেম জাগ্রত করার নির্দিষ্ট পন্থা

আল্লাহ্-প্রেম অর্জনের জন্য ইসলাম বলে–

ক) তাকওয়া অর্জন করতে
খ) আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত, তওবাহ্ করতে
গ) আত্মশুদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে
ঘ) সৎ কাজ করতে
ঙ) আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও নির্ভরতা রাখতে
চ) আল্লাহর আনুগত্যে স্থির থাকা
ছ) ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে।

উত্তর : ৭. যেসব বিষয় মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়

ক) অন্য মানুষের হক্ব নষ্ট করা
খ) দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়া
গ) অকৃতজ্ঞতা
ঘ) আল্লাহর প্রতি অবিশ্বস্ততা
ঙ) সমাজে নিপীড়ন ও নির্যাতন
চ) প্রতারণা ও শঠতা
ছ) অপচয়
জ) গর্ব, অহংকার, দম্ভ।

উত্তর : ৮. তাকওয়ার সুফল

তাকওয়া মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সফর সফলভাবে শেষ করে আখেরাতের জন্য সুন্দর ভিত্তি তৈরী করতে সাহায্য করে। তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষ যেসব উপকার পায় তা নিম্নরূপ–

ক) সে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি সদা অনুগত হয়।
খ) তার মধ্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তৈরী হয়।
গ) আল্লাহর প্রতি ঈমানের কারণে তার কাজ-কর্ম সহজতর হয়।

ঘ) সে তার ভুল ও অন্যায়ের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

ঙ) সে আল্লাহর দয়া লাভ করে

চ) সে দুনিয়ার জীবনে চূড়ান্ত সফলতা ও বিজয় এবং আখেরাতে মুক্তি লাভ করে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৫. আল-কুরআন ৩:৭৬, ৩:৩১, ২:১৬৫

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ৩:১৯৮, ২:২২২, ৩:১৭

প্রশ্ন ৭. আল-কুরআন ২:২০৫, ৪:৩৬

প্রশ্ন ৮. আল-কুরআন ২:২, ৮:২৯, ৬৫:৩, ৬৭:১২, ৭:৯৬

এফ-২২ নৈতিক গুণ ইখলাস

প্রশ্ন ১. ইখলাস শব্দের অর্থ কি?

২. নিয়তের বিশুদ্ধতা বলতে ইসলামে কি বোঝায়?

৩. খারাপ মতলবে কারো দ্বারা কোন ভাল কাজ হয়ে গেলে সে তার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে কি?

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল কাজ বলতে কি শুধু (নামাজ রোযার মতো) আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো শুদ্ধ করে পালন করাকেই বোঝায়?

৫. ইসলামী পরিভাষায় 'ইখলাস' শব্দের বিপরীত অর্থবোধক শব্দ কি?

৬. কেউ সৎ নিয়তে ভাল কাজ করল এবং অন্য কেউ তা দেখে ফেলল এমতাবস্থায় এটা কি লোক দেখান কাজ বলে পরিগণিত হবে?

৭. কেউ ভাল কাজের নিয়ত করল কিন্তু অনিবার্য কারণে তা সম্পন্ন করতে পারল না এ অবস্থায় কি সে তার নিয়তের জন্য কোন পুরস্কার পাবে?

৮. কেউ কোন খারাপ কাজের পরিকল্পনা করে শেষ পর্যন্ত তা করল না এ অবস্থায় কি শুধু খারাপ নিয়তের জন্য তার কোন সাজা হবে?

৯. ইখলাস-এর মান কিভাবে বাড়ানো যায়?

উত্তর : ১. ইখলাস শব্দের অর্থ

আরবী শব্দ 'ইখলাস এর অনুবাদ করা হয় 'বিশুদ্ধতা' শব্দ দিয়ে। কুরআনে দুধের বিশুদ্ধতা বর্ণনা করতেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের ১১২ নং সূরায় আল্লাহর একত্বের কথা আলোচিত হয়েছে এবং উক্ত সূরার নাম রাখা হয়েছে ইখলাস। সেখানে মানুষের নিয়তকে শুদ্ধ পবিত্র করতে সর্বাগ্রে তার অন্তরে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বের ধারণাকে বদ্ধমূল করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

উত্তর : ২. নিয়তের বিশুদ্ধতা বলতে ইসলামে কি বোঝায়?

মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য কাজ করে। ইসলাম এটাই দাবি করে যে, আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজের পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য থাকতে হবে। কাজের উদ্দেশ্য (নিয়ত) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, এটা মানুষের কাজের পেছনে প্রেরণা, আন্তরিকতা, একাগ্রতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য তৈরী করে। যদিও এ যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে, মানুষের অনেক কাজের পেছনেই সক্রিয় বা সচেতন উদ্দেশ্য (স্বার্থচিন্তা, খ্যাতি বা অর্থের লোভ) নাও থাকতে পারে। তবুও ইসলাম নিয়তের

বিশুদ্ধতার মাধ্যমে মানুষের সকল কাজকেই সচেতনভাবে আল্লাহ ইবাদতে পরিণত করে। ইসলাম মানুষের নিয়তকে বিশুদ্ধ করতে বলে যা আল্লাহর মানুষের সব কাজ দেখছেন এবং অন্তরের সকল চিন্তাকেও অনুভব করছেন কেবল এই ঈমানবোধ থেকেই আসে।

উত্তর : ৩. খারাপ মতলবে ভাল কাজ হলে

ইসলামের বক্তব্য এ ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট, আল্লাহ আমাদের কাজের মূল্যায়ন করেন আমাদের কাজের ফলাফল দিয়ে নয় বরং কোন উদ্দেশ্যে আমরা সে কাজ করেছি তার ভিত্তিতে। রাসূল (সা:) তাঁর হাদীসে বলেন যে, মানুষের কাজের প্রতিদান তার নেপথ্যের উদ্দেশ্য (নিয়ত) এর উপর নির্ভরশীল।

উত্তর : ৪. ভাল কাজ বলতে কি শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদত (নামাজ-রোযা) গুলোকেই বোঝায়?

কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন– এভাবে ইসলামে ইবাদতের বিষয়টি একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। এই ইবাদত বলতে ইসলামে শুধু নামাজ-রোযার মত আনুষ্ঠানিক কাজকেই বোঝায় না বরং জীবনের সকল কাজের উপর এর ব্যাপ্তি। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কাজই আল্লাহর ইবাদতে পরিণত হতে পারে যদি তা সৎ পন্থায় করা হয় এবং তার পেছনে সৎ উদ্দেশ্য থাকে। এভাবে কেউ যদি খাবার সময় এই খাদ্যের জন্য আল্লাহর শোকরানা আদায় করে এই নিয়তে খায় যে, তার শরীর-স্বাস্থ্যকে উন্নত করে তাকে পৃথিবীতে আল্লাহর মিশন বাস্তবায়নে ব্যয় করবে তবে তার এই খাবারও ইবাদত হয়ে যায়।

উত্তর : ৫. ইখলাস শব্দের বিপরীত অর্থ

ইসলামী পরিভাষায় 'ইখলাস' শব্দের (বিপরীত অর্থ বোঝাতে রিয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া পার্থিব স্বার্থে (প্রদশনেচ্ছা, গর্বের বশে বা অর্থ-যশ কামাইয়ের আশায়) কোন কাজ করা। রাসূল (সা:) এর হাদীস মতে রিয়া ভাল কাজকেও বাতিল এবং নিষ্ফল করে দেয়। যার ফলে মানুষ তার কাজের কোন ভাল পুরস্কার আশা করতে পারে না বরং তার জন্য সাজা বরাদ্দ হতে পারে। আল্লাহ জানেন মানুষ কোন নিয়তে নামাজ পড়েন বা দান-খয়রাত করেন, যদি মানুষের নিয়ত শুদ্ধ না হয় বা শুধুমাত্র তাঁকে সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত না হয় তবে তিনি মানুষকে আখিরাতে তার কাজের প্রতিদান দেবেন না।

উত্তর : ৬. সৎ নিয়তে ভাল কাজ করলে এবং অন্য কেউ তা দেখলে

কেউ যদি সৎ নিয়তে ভাল কাজ করে এবং ঘটনাক্রমে অন্যরা তা দেখে ফেলে এবং এর জন্য তার প্রশংসা করে তবে তার কাজ লোক দেখানোর দোষে নষ্ট হবে না যদি না সে

লোকের প্রশংসায় আবেগে আত্মহারা হয়ে গর্ব করে বসে। একবার আবু হুরাইরা (রা:) যখন তাঁর বাড়ীতে নামাজ পড়ছিলেন তখন কয়েকজন মেহমান তাঁকে নামাজরত দেখে তাঁর প্রশংসা করেন এতে আবু হুরাইরা নিজেও প্রীতবোধ করেন। তারপর যখন তিনি এ বিষয়ে রাসূলকে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন, এমনকি তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কারও দিতে পারেন, একটি গোপনে ইবাদত করার জন্য এবং অপরটি প্রকাশ্যে ইবাদত করার জন্য।

উত্তর : ৭. ভাল কাজের নিয়ত করে তা করতে না পারলে

যদি কোন ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কিন্তু অনিবার্য কারণে তা করতে না পারে তবুও সে নিয়তের জন্য পুরস্কৃত হবে। এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূল (সা:) এর একটি হাদীসে। যেখানে দেখা যায় যে, এক জেহাদে একদল মুসলমান অংশ নেবার জন্যে রাসূলের (সা:) অনুমতি চাইলে তিনি যে, কোন কারণে তাদের যুদ্ধে নিতে পারেননি, তারা ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরে যায়। অত:পর মদিনা থেকে বেরিয়ে তিনি তাঁর সাথীদের বললেন, "আমরা যা কিছু সওয়াব কামাচ্ছি তাতে তাদেরও অংশ আছে যাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সাথে শারীরিকভাবে থাকতে পারেনি।"

উত্তর : ৮. খারাপ কাজের পরিকল্পনা করে তা করতে না পারলে

এ বিষয়ে মানুষের প্রতি আল্লাহর অপার দয়া ও করুণার নিদর্শন পাওয়া যায় রাসূলের নিম্নোক্ত হাদীস। সেখানে তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে, কেউ কোন ভাল কাজের নিয়ত করেও তা সম্পন্ন করতে পারল না তার আমলনামায় এটি একটি ভাল কাজ হিসেবে রেকর্ড হল, যদি কেউ ভাল কাজের নিয়ত করে তা সম্পন্ন করে তখন আল্লাহ এর বিনিময়ে দশ থেকে সাতশত গুণ পুরস্কার দেবেন, যদি কেউ খারাপ কাজের পরিকল্পনা করেও আল্লাহর ভয়ে সিদ্ধান্ত বদল করে এবং তা সম্পন্ন না করে তবে সে শাস্তির বদলে একটি ভাল কাজ করার সমান পুরস্কার পাবে; যদি একজন মানুষ একটি খারাপ কাজের নিয়ত করে তা সম্পন্ন করে তবে তার আমলনামায় একটি খারাপ কাজের রেকর্ড হবে।"

উত্তর : ৯. 'ইখলাস' এর মান যেভাবে বাড়ানো যায়

ব্যক্তির খুলুসিয়াৎ (ইখলাস এর মান) বাড়ানোর তিনটি পন্থা আছে–

ক) এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, ব্যক্তির পরিকল্পিত প্রতিটি কাজ হবে বৈধ। (ইসলামে কাজের চূড়ান্ত ফলাফল যাই হোক তা যদি অবৈধ পন্থায় করা হয় তবে কাজের বৈধতা থাকবে না)। কারো ভাল কাজ করার মহৎ ইচ্ছা থাকলে সে যেন বৈধ ও উত্তম পন্থায় তা সম্পন্ন করে।

খ) সব সময়ে অন্তরে আল্লাহ সচেতনতা জাগরুক রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ আমাদের মনের সব চিন্তা, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার খবর রাখেন।

গ) যে, কোন কাজ শুরুর পূর্বে মুসলমানরা যেন খানিক চিন্তা করে যে, সে কেন একাজ করছে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নাকি মানুষকে দেখানোর জন্য।

এ বিষয়ে একটি হাদীসের শিক্ষা লক্ষ্য করা যেতে পারে, যেখানে রাসূল (সা:) বলেছেন যে, ভবিষ্যতে তিন ধরনের মানুষ দেখা যাবে, যথা–

ক) একদল ধার্মিক হতে চেষ্টা করবে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে

খ) একদল মানুষকে দেখে ধার্মিক মনে হবে এবং তারা প্রতিনিয়ত আল্লাহর আনুগত্যের কথা বলবে, কিন্তু সবই হবে লোক দেখানোর এবং নাম কামানোর জন্য

গ) একদল লোক শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে টাকা নেবার উদ্দেশ্যেই ধর্মাশ্রয়ী হবে।

রাসূল (সা:) বলেন যে, প্রথম দল ছাড়া আর সবাই দোজখের আগুনে জ্বলবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ২২:৩৭, ৩৯:২-৩

রাসূল (সা:) বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা, পোষাক বা সম্পদের দিকে তাকান না বরং তোমাদের অন্তর (হৃদয়) ও কর্মের দিকে তাকান।"

প্রশ্ন ৪. রাসূল (সা:) বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন ঘরবাড়ী তৈরী করে বা গাছ লাগায় যা জনগণের উপকারে আসে তবে কেয়ামত পর্যন্ত যত ব্যক্তি তার উপকার ভোগ করবে সে ততবার পুরস্কৃত হবে।

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৪:১৪২, ২:২৬৪

রাসূল (সা:) বলেন যে, একটি চিন্তা তাঁকে খুব ভাবিত করে, তা হচ্ছে তাঁর উম্মত (মুসলমান) দের মধ্যে এক ধরনের পরোক্ষ শিরক এর উদ্ভব হবে। আর তা হচ্ছে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তের বদলে শুধুমাত্র লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করবে। তিনি আশংকা করেন যে, মুসলমানরা ভণ্ড নবীর খপ্পরে পড়ার চেয়ে এই রিয়ার (প্রদর্শনেচ্ছা) ফিৎনাতে বেশি আক্রান্ত হবে।

প্রশ্ন ৯. আল কুরআন ৩:২৯, ৭৬:৯

এফ-২৩ নৈতিক গুণ আমানাহ্

প্রশ্ন ১. আমানাহ্ শব্দের অর্থ কি?

২. ইসলামের আমানতদারিতার ধারণাটি কি শুধু বিশেষ কিছু ব্যক্তির জন্যেই প্রযোজ্য যাদের উপর বিশেষ কোন দায়িত্ব আছে, নাকি এটি সকল মুসলমানের উপর প্রযোজ্য?

৩. আমানতদারিতা বিষয়ে ব্যক্তির দায়িত্ব কি?

৪. ব্যক্তিগত নৈতিক গুণ 'আমানতদারিতার' সাথে সমাজের কি সম্পর্ক?

৫. আমানতদারিতার সাথে চাকরী সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব এবং অন্যান্য চুক্তি ভিত্তিক দায়িত্বগুলোর কি সম্পর্ক?

৬. ইসলামের বর্ণিত আমানতদারিতার সাথে ইসলাম প্রদত্ত সরকারের ধারণার কোন সম্পর্ক আছে কি?

৭. ওয়াদা পালনের বাধ্যবাধকতার কোন ব্যতিক্রম (ছাড়) আছে কি?

৮. ওয়াদা পালনে ব্যর্থ হলে তার কোন কাফ্ফারার বিধান আছে কি?

উত্তর : ১. আমানাহ্ শব্দের অর্থ

আমানাহ শব্দের সাধারণভাবে অর্থ করা হয় সততা বা বিশ্বস্ততা, কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ অনেক ব্যাপক। আমানতদারীতার গুণের মূলে রয়েছে আল্লাহর কাছে জীবনের সকল কাজের জন্য জবাবদিহিতার অনুভূতি এবং তাঁর কাছে কৃত ঈমানের ওয়াদার পরিপূরণ। কুরআনে ওয়াদার খেলাফ সম্পর্কে এভাবে উপমা দেয়া হয়েছে যে, কেউ দীর্ঘ সময় ধরে সুতা বুনল তা আবার খুলে ফেলবার জন্যে।

উত্তর : ২. আমানতদারিতা যাদের উপর প্রযোজ্য

ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহর খলিফা হিসেবে প্রত্যেক মানুষের নির্দিষ্ট দায়িত্বের আমানত রয়েছে। রাসূল (সা:) বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকে মেষচালক (দায়িত্ববান) এবং প্রত্যেককে আল্লাহর কাছে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "শাসক (নেতা) দায়িত্ববান তার জনগণের বিষয়ে, পুরুষ দায়িত্ববান তার পরিবারের বিষয়ে, নারী (গৃহকর্ত্রী) দায়িত্বত্ববান তার সংসারের বিষয়ে।" এভাবে দেখা যায় যে, ইসলাম সবার উপরই আমানত দিয়েছে।

উত্তর : ৩. 'আমানতদারিতার দায়িত্ব'- ব্যক্তিগত পর্যায়ে

ব্যক্তির উপর সবচাইতে বড় আমানত হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ যে, উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ তৈরী করেছেন তা পূরণের মাধ্যমে একটি অর্থপূর্ণ জীবন-যাপন করা। মানুষ প্রতিনিয়ত:

সকল ধরনের অন্যায়, জুলুম ও অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়বে– তা নিজের মধ্যেই হোক অথবা বাইরের। এই অবিরাম সংগ্রাম (জিহাদ) হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বহি:প্রকাশ। ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, প্রতিটি মানুষের আল্লাহর সাথে এক ধরনের ওয়াদা রয়েছে, যা তার প্রকৃতি আধ্যাত্মিকতা আর কর্মের মাধ্যমে পূরণ হয়। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা, এক শয়তানের অনুসরণ (শয়তান ও তার দোসরদের সৃষ্ট জীবন বিধান ও আদর্শের অনুসরণ পরিহারসহ) পরিত্যাগ করা, যা আল্লাহর আনুগত্য ও বিধানের পরিপন্থী। যদিও আল্লাহর এই আমানত রক্ষা করতে মানুষকে দুনিয়ায় অনেক বাধা বিপত্তির মুখে পড়তে হয় এবং কঠোর অধ্যবসায় করতে হয় তবুও পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে সফল হয়ে আখিরাতে পুরস্কার পেতে হলে তাকে এটি করতেই হবে। ব্যক্তির উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমানত হচ্ছে সর্বাবস্থায় সৎ এবং আল্লাহর আনুগত্যে স্বত:স্ফূর্ত থাকা, সকল ইসলামবিরোধী সামাজিক চাপের মুখে সত্যপথে দৃঢ় থাকা।

উত্তর : ৪. ব্যক্তির আমানতদারীতার সাথে সমাজের সম্পর্ক

ইসলামের শিক্ষায় ব্যক্তির আমানতদারীতার সাথে সমাজ জীবনের ওৎপ্রোত সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়, বিশেষভাবে নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে–

ক) বৈবাহিক সম্পর্ক ও পরিবার— কুরআন এবং হাদীস জীবনের এই দুটো ক্ষেত্রে আমানতদারীতার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। যেমন বিয়ের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয়া যে, কোন ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। রাসূল (সা:) বিয়ে চুক্তির সময়কৃত ওয়াদা পূরণকে সবচাইতে প্রশংসিত ওয়াদা পূরণ বলেছেন। আর একটি হাদীসে রাসূল (সা:) সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে কেউ স্বামী-স্ত্রীর একান্ত সম্পর্ক সংক্রান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াদি প্রকাশের বিষয়ে। এগুলো প্রকাশ করা বিশ্বাস এবং শালীনতা পরিপন্থী।

খ) বন্ধু-বান্ধবের ক্ষেত্রে— বন্ধুদের মধ্যে একজন যদি অন্যজনকে নিজের কোন গোপন তথ্য জানায় এবং তা প্রকাশ করতে বারন করে, তবে সে কথা রক্ষা করা একটি আমানত। এটা কোন অবস্থায় প্রকাশ করা যাবে না (এ বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রমের বিধান পরে আলোচিত হবে)।

গ) ঋণ সংক্রান্ত— কারো কাছ থেকে নেয়া ঋণ চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা আর একটি আমানত। যদি কোন অনিবার্য সমস্যা বা বাধা না আসে তবে মুসলমানরা অবশ্যই যথাসময়ে ঋণদাতাকে ঋণের অর্থ ফেরত দেবে। রাসূল (সা:) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদিও আল্লাহ শহীদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন তবুও তার পরিশোধিত ঋণ ক্ষমা করবেন না, কারণ এটা তার কাছে

প্রাপকের অধিকার। এছাড়াও মুসলমানরা তাদের হেফাজতে অন্য কেউ কিছু জমা বা গচ্ছিত রাখবেন তার যথাযথ হেফাজত করবে এবং চাওয়ামাত্র ফেরত দেবে।

উত্তর : ৫. আমানতদারীতার সাথে চাকুরী সংক্রান্ত বা চুক্তিভিত্তিক দায়-দায়িত্বের সম্পর্ক

ইসলামের এটা একটা মৌলিক বিধান যে, যদি কেউ নির্দিষ্ট কোন চাকরী নেয় তবে সে যেন যথাযথ আন্তরিকতার সাথে চাকরীর সকল দায়িত্ব পালন করে। যদিও ইসলামই প্রথম জীবন বিধান যা সবার আগে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত যে, কোন চুক্তি লিখিতভাবে করার আইনী পরামর্শ দিয়েছে, তবুও এটা কোন বাধ্যবাধকতা নয় যে, সব চুক্তিই লিখিত হতে হবে। বরং ইসলাম এটাই শিক্ষা দেয় যে, মুসলমানদের কথাই হবে তাদের স্বাক্ষরের মত মূল্যবান। কুরআনে বলা হয়েছে, প্রকৃত ঈমানদার সেই যে, তার কথা (ওয়াদা) রক্ষা করে, রাসূল (সা:) এর হাদীসেও একই শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

উত্তর : ৬. ইসলাম বর্ণিত আমানতদারিতা ইসলাম বর্ণিত সরকারের রূপারেখার সাথে সামঞ্জস্যশীল

ইসলামে ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের কোন বিভাজন নেই। কারণ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যাতে জীবনের সকল বিষয়ের (এমনকি রাজনৈতিক) ব্যাপারে বিশদ এবং পরিপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। রাষ্ট্রনেতা নির্বাচনের ব্যাপারেও ইসলাম বলে যে, যোগ্য ব্যক্তিকেই দায়িত্ব দেয়া উচিৎ। এর ফলে জনগণ এমন ব্যক্তিকেই নেতা নির্বাচন করেন যিনি নেতৃত্বের দায়িত্ব আমানতদারিতার সাথে পালন করবেন। রাসূল (সা:) নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে, তারা যেন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের আমানতের খেয়ানত না করেন। তিনি আরও বলেছেন যে, খেয়ানতকারীদের মধ্যে নিকৃষ্ট হচ্ছে তারা যারা নেতৃত্বের আসনে বসে জনগণকে প্রতারিত করে। তাঁর এই কঠোর সতর্কবাণীর কারণ হচ্ছে জাতির নেতাদের ভুলের মাশুল গোটা জাতিকে দিতে হয়। তিনি শাসকদের আরও সতর্ক করেছেন তারা যেন ক্ষমতা ও দায়িত্বকে নিজের পার্থিব উন্নতির বাহন মনে না করেন এবং কোন রকম স্বজনপ্রীতি না করেন। স্বজনপ্রীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, "যদি কোন শাসক কোন পদে কাউকে নিয়োগ করে (যার জন্য সে যোগ্য নয়) শুধু এই কারণে যে, সে তার আত্মীয়, সেই শাসক আল্লাহকে প্রতারিত করে; তাঁর রাসূলের সাথে প্রতারণা করে; ঈমানদারদের সাথে প্রতারণা করে।

উত্তর : ৭. ওয়াদা পালনের বাধ্যবাধ্যকতা বিষয়ে কয়েকটি ব্যতিক্রমী বিষয়

রাসূল (সা:) বলেন যে, মুসলমানরা ওয়াদা পালনে বাধ্য যদি না এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা অননুমোদিত বিষয়কে অনুমোদন দেয় এবং অনুমোদিত বিষয়ের অনুমতি

স্থগিত করে। যদিও কোন গোপন আলোচনার আলোচ্য বিষয় গোপন রাখা একটি আমানত কিন্তু তবুও তিনটি বিশেষ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের দায়িত্ব গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়া, এই তিনটি পরিস্থিতি হচ্ছে যথা–

ক) যদি সেই গোপন আলোচনায় অহেতুক রক্তপাত বা জীবনহানির পরিকল্পনা করা হয়।

খ) যদি সেই গোপন আলোচনায় কোন অনৈতিক কাজের পরিকল্পনা (যেমন ব্যাভিচার) করা হয়।

গ) যদি সেই আলোচনায় কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়।

এসব ক্ষেত্রে গোপন আলোচনার বিষয় ফাঁস না করলে জনগণ ও সমাজ-এর মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেবে।

এছাড়াও যদি কেউ এমন কোন প্রতিজ্ঞা করে ফেলল যে, পরে দেখা গেল উক্ত প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়ন হলে মন্দ ও অকল্যাণ হবে, তখন সে প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে ফেলতে পারে। অবশ্য রাসূল (সা:) এমন অবস্থায় উক্ত ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গার জন্য কাফফারা করতে বলেছেন, যাতে ভবিষ্যতে আবারো তার দ্বারা এমন অযৌক্তিক কাজের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

উত্তর : ৮. ওয়াদা ভঙ্গ করার কাফফারা

কোন ওয়াদা ভঙ্গ করার কাফফারা হচ্ছে তিনদিন রোযা রাখা। এই কঠোর কারণ হচ্ছে মুসলমানরা যখন ওয়াদা করে তখন তারা আল্লাহর নামে ওয়াদা করে। তাই ওয়াদা করার বিষয়ে সে যেন সতর্ক হয়।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ১৭:৩৪, ১৬:৯১-২

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৩৩:৭২, ৩৬:৬০-৬১

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৪:৫৮

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৫:১, ২৩:৮

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ২৩:৮, ৩:১৬১

রাসূল (সা:) বলেন যে, ওয়াদা ভঙ্গকারীকে হাশরের ময়দানে লাঞ্ছিত করা হবে। তিনি আরও বলেন, যারা কোন দায়িত্ব পালন করার বিপরীতে নির্দিষ্ট বেতন পায় তারা যখন এর থেকে অতিরিক্ত সুবিধা নেয় তখন এর জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রশ্ন ৮. আল কুরআন ৫:৮৯

এফ-২৪ নৈতিক গুণ সত্যবাদিতা

প্রশ্ন ১. ইসলামের অন্যতম নৈতিক গুণ হিসেবে সত্যবাদিতার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২. সত্যবাদিতার বিপরীত বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস কি বলে?

৩. এমন কোন অসত্য এবং মিথ্যাচার আছে কি যা অন্যগুলোর চেয়েও জঘন্য?

৪. সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অসত্য ও মিথ্যাচারের প্রভাব কি?

৫. শিশুদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া কি ঠিক? ইসলামে নিষ্কলুষ মিথ্যা (white lie) বলে কিছু আছে কি?

৬. শিক্ষামূলক বা বিনোদনের কাজে এমন কোন গল্প বা কাহিনী কি বলা যাবে যা মূলত: সত্য নয় অথবা অতিরঞ্জিত?

৭. সদা সত্য কথা বলা সংক্রান্ত আদেশের কোন ব্যতিক্রম আছে কি?

৮. সত্যবাদিতার গুণ থেকে কি কি উপকার পাওয়া যায়?

উত্তর : ১. নৈতিক গুণ হিসেবে সত্যবাদিতার গুরুত্ব

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আসসিদক শব্দ একশরও বেশী বার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে সত্যবাদিতার বিষয়টি সাধারণত: যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা হচ্ছে–

ক) সত্যবাদিতা হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর আদিষ্ট গুণ।

খ) আল্লাহর নবী-রাসূল ও প্রিয় মুমিনদের অন্যতম প্রধান গুণ তাদের সথ্যবাদিতা। কুরআনে বর্ণিত সকল নবী-রাসূল ছিলেন সত্যবাদী।

গ) ঈসা (আ:) এর জননী বিবি মরিয়ম (রা:) এর মত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের সত্যবাদিতা।

ঘ) রাসূল মুহাম্মদ (সা:) এর জীবন ও চরিত্রে সত্যবাদিতার প্রকাশ সুস্পষ্ট। তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য তাঁর শত্রু কাফেররাও তাঁকে সম্মান করে ডাকত আল-আমীন (বিশ্বস্ত)। কাফের নেতা আবু সুফিয়ান রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এর রাসূল (সা:) এর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, ..."তিনি লোকদের আল্লাহর উপর ঈমান আনতে, নামাজ কায়েম করতে, সত্যবাদী হতে, সৎ ও আত্মীয় পরিজনের প্রতি দয়ালু হতে বলেন।"

উত্তর : ২. সত্যবাদিতার বিপরীত বিষয় সম্পর্কে

মিথ্যাবাদিতা বা মিথ্যাচারকে কুরআন এবং হাদীসে নিকৃষ্টতম অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে। রাসূল মুহাম্মদ (সা:) বলেন, "নিকৃষ্টতম প্রতারণা হচ্ছে আমার এমন ভাইকে

মিথ্যা কথা বলা যে, তোমাকে বিশ্বাস করে। তিনি আরও বলেন,

সত্যবাদী হও কারণ সত্যবাদিতা তোমাদের সততার দিকে চালিত করে আর, সততা বেহেশতের দিকে চালিত করে।" পক্ষান্তরে তিনি বলেন, মিথ্যা মানুষকে প্রতারণার দিকে চালিত করে আর প্রতারণা জাহান্নামের দিকে চালিত করে।" রাসূল (সা:) কারো অতি প্রশংসা করা যা চাটুকারিতার পর্যায়ে পরে সেটাকেও মিথ্যার শামিল মনে করতেন এবং তা নিষেধ করতেন। (মিথ্যা সম্পর্কে কুরআনের উদ্ধৃতি সূত্রে দেখুন)।

উত্তর : ৩. জঘন্যতম মিথ্যাচার

কুরআন এবং হাদীস মতে জঘন্যতম মিথ্যাচার হচ্ছে তা যা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন আল্লাহ্ যা বলেননি এমন কথাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দেয়া, আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী পাওয়ার দাবি করা এসবই জঘন্য মিথ্যাচার হিসেবে চিহ্নিত। এছাড়াও কুরআনে কাফেরদের কর্তৃক রাসূল (সা:) এর উপর কুরআন রচনার (Fabrication) অভিযোগ আরোপের জবাব দেয়া হয়েছে।

রাসূল (সা:) যা বলেননি এমন কথা তাঁর নামে প্রচার ও একটি নিকৃষ্ট মিথ্যাচার, এটা দ্বীনের অনুসারীদের বিভ্রান্তিতে ফেলে। এজন্যে হাদীস সংকলনের সময় মুহাদ্দিসরা অত্যন্ত সতর্কভাবে রাসূলের নামে বর্ণিত প্রতিটি কথার উৎস যাচাই করেছেন।

উত্তর : ৪. সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মিথ্যাচারের প্রভাব

এ বিষয়ে একটি মৌলিক আইন রয়েছে যে, সবচাইতে নিন্দিত মিথ্যাচার হচ্ছে তা যা গোটা সমাজের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, যা অসংখ্য মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে– এমন মিথ্যাচারকারীর জন্য আখিরাত কঠোর সাজার বিধান রয়েছে। এ বিধান এর জন্য ঐসব ব্যক্তি যারা রাষ্ট্রের বা জনগণের নেতৃত্বের আসনে রয়েছেন তাদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে সত্যবাদী হওয়ার, কারণ তাদের মিথ্যাবাদিতা গোটা জাতিকে বিভ্রান্তি ও ক্ষতির মধ্যে ফেলে। ইসলামী আইনে যে, কোন বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কঠোরভাবে নিষেধ। অপরদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যারা তাদের ব্যবসায়ীক লেনদেন সৎ তাদের আল্লাহ বরকত দেবার কথা ঘোষণা করেছেন।

উত্তর : ৫. শিশুদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া ও নির্দোষ মিথ্যা (white lie)

রাসূল (সা:) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, শিশুদের দিয়ে কোন কাজ করানোর জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি না দিতে। কোন পিতা-মাতা যদি সন্তানকে বলে, "তুমি একাজ করলে তোমার জন্য অমুক পুরস্কার রয়েছে।" এক্ষেত্রে বাস্তবে প্রতিশ্রুত বিষয় না থাকলে তা হবে পিতা-মাতার জন্য মিথ্যা বলার শামিল। অনেক সময় শিশুরা মুরুব্বীদের অনেক বিব্রতকর প্রশ্ন করে, সেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা জবাব না দিয়ে সত্য কথা বলাই শ্রেয়। নির্দোষ মিথ্যার চেয়ে সত্য কথাই চূড়ান্তভাবে মঙ্গলজনক।

উত্তর : ৬. বিনোদন বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে অসত্য কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে

যদিও বিনোদন বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে সাজানো গল্প কাহিনী বলা নিষিদ্ধ নয় তবুও মুসলমানদের উচিৎ এসব ক্ষেত্রেও সত্য কাহিনী ব্যবহার করা। যেমন নৈতিক আচরণ শিক্ষা করার ক্ষেত্রে রাসূল (সা:) এর জীবন থেকে কাহিনী অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কোন ব্যক্তি বাস্তবে যা ছিলেন না তার নামে সেসব কল্পকাহিনী তৈরী অনুচিত।

উত্তর : ৭. সত্য কথা বলা সংক্রান্ত আদেশের ব্যতিক্রম

সদা সত্য কথা বলা সংক্রান্ত আদেশের দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বিধান আছে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কাউকে ইচ্ছেমত কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়েছে। ইসলামে যেসব ক্ষেত্রে সত্য বলার বিষয়ে ছাড় দেয়া হয়েছে তার জোরালো আইনী ভিত্তি আছে, যেমন−

ক) যদি সত্য প্রকাশে জীবনহানির হুমকি আশংকা জড়িত থাকে তবে সে সত্য প্রকাশে বিরত থাকতে পারে। অবশ্য রাসূল (সা:) এমন ক্ষেত্রেও সত্য বলতে বলেছেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ব্যক্তির বিবেকের।

খ) পারিবারিক জীবনে কখনো এমন শংকা দেখা দিতে পারে যে, সত্য প্রকাশে দাম্পত্য সম্পর্ক বিপর্যস্ত হতে পারে।

গ) যুদ্ধরত দুই পক্ষকে নিবৃত্ত করে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য কোন মধ্যস্থতাকারী যদি উভয় পক্ষের কাছেই শুধু তাদের জন্য ভাল খবরগুলোই প্রদান করে তবে এক্ষেত্রে সে সত্য গোপনের জন্য অভিযুক্ত হবে না। এ বিষয়ে হাদীসে শিক্ষা রয়েছে।

ঘ) ইব্রাহীম (আ:) এর জীবনীতে দেখা যায় কাফেরদের ভুলকে প্রকাশ্যে তুলে ধরতে কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

উত্তর : ৮. সথ্যবাদিতার গুণ থেকে নিম্নরূপ সুফল পাওয়া যায়

ক) আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান অর্জন করা যায়।

খ) সত্যবাদিতার মাধ্যমে মুমিনের নৈতিক মান উন্নত হয়। কারণ সত্যবাদিতা আল্লাহর এক ঐশী নিদর্শন।

গ) আল্লাহ তাঁর ওহী দান করে যাদের ধন্য করেছেন তারা সবাই সত্যবাদী ছিলেন।

ঘ) সকল নবী-রাসূল এবং ধার্মিক ব্যক্তিরা সত্যবাদী ছিলেন।

ঙ) সত্যবাদিতার জন্য মানুষ আখিরাতে পুরস্কৃত হবে।

চ) সত্যবাদিদের আখিরাতে স্থান হবে নবী, শহীদ এবং ধার্মিকদের সাথে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৯:১১৯, ৩৩:৭০, সূরা ১৯- এই সূরায় বিভিন্ন নবীর সত্যবাদিতার বিষয় আলোচিত হয়েছে। আল কুরআন ১২:৪৬, ৩৯:৩৩, ৫:৭৫, ৩৩:৩৫

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৪০:২৮, ৩৯:৩,
রাসূলের একটি হাদীসে মুনাফিক এর তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটি হিসেবে মিথ্যা বলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৬৯:৩৪৪-৪৬, ৪২:২৪

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ২:২৮৩

প্রশ্ন ৬. রাসূল (সা:) বলেন, "তার জন্য আফসোস! যে, শুধুমাত্র মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে।"

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ২১:৬২-৬৩

প্রশ্ন ৮. আল কুরআন ৪:৮৭, ১৭:১০৫, ৩৩:২৪, ৩৩:৩৫, ৪:৬৯

এফ-২৫ নৈতিক গুণ বিনয় নম্রতা ও আত্মমর্যাদাবোধ

প্রশ্ন : ১. কুরআন অনুসারে বিনয়/নম্রতা সম্পর্কে মুসলিম ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২. বিনয়/নম্রতা সম্পর্কে রাসূল (সা:) এর কোন হাদীস আছে কি?

৩. গর্ব/অহংকার সম্পর্কে ইসলাম কি বলেছে?

৪. গর্ব অহংকারের সাধারণ বহি:প্রকাশগুলো কি কি?

৫. ইসলামে অহংকারের সাথে পোষাক পরতে নিষেধ করা হয়েছে। এর মানে কি এই যে, মুসলমানরা পোষাকের সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকবে?

৬. ইসলামের শিক্ষার আলোকে আত্মমর্যাদাবোধ এর ব্যাখ্যা করুন। এর ধারণার সাথে বিনয়/নম্রতা সংক্রান্ত ইসলামের ধারণার কোন বিরোধ আছে কি?

৭. কিভাবে একজন মানুষ মর্যাদা অর্জন করবে।

উত্তর : ১. বিনয়/নম্রতা শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

ইসলামের পরিভাষায় বর্ণিত বিনয়/নম্রতার ধারণাকে দু'ভাগে আলোচনা করা যায়–

ক) আল্লাহর প্রতি বিনয়– এর মানে আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ। প্রশ্নাতীত আনুগত্যের সাথে তাঁর আদেশ যথাবিহিত বিনয় সহকারে পালন করা।

খ) অন্যান্য মানুষের প্রতি বিনয় ও নম্রতা—এর মানে সকল মানুষের প্রতি ভদ্র আচরণ। সকল ধরনের গর্ব, অহংকার, আত্মপ্রদর্শন, অহমিকা, অপরের উপর প্রভুত্ব করার প্রবণতা পরিহার করে নম্রতা অবলম্বন। কুরআন মতে একমাত্র যে, বিষয়ে ভিত্তিতে মানুষের একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে তা হচ্ছে তাকওয়া এবং একজন মুমিনের নম্র ভদ্র আচরণ। বস্তুত: কুরআন মতে বিশ্বাসীদের মধ্যে তারাই আল্লাহর সবচাইতে প্রিয় যারা নম্রতা সম্পন্ন। কুরআন রাসূল (সা:) কে উপদেশ দেয় বিশ্বাসীদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে। কুরআন সকল বিশ্বাসীকে সতর্ক করে দেয় নিজের অতিমূল্যায়ন করা ও গর্ব অহংকার করা থেকে দূরে থাকতে।

উত্তর : ২. বিনয় সম্পর্কে রাসূল (সা:) এর কিছু হাদীস

"আল্লাহ আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন যাতে তোমরা বিনম্র ও বিনয়ী হও। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অহংকারী না হয় এবং তোমাদের কেউ যেন কোনভাবে অন্যের উপর কোন আক্রমণ বা অত্যাচার না করে।"

"যে নম্রতা চর্চা করবে অথচ আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দিবেন।"

আল্লাহ বলেন, "আমি শুধুমাত্র তাদের দোয়া কবুল করি যারা আমার ক্ষমতা ও মর্যাদার সামনে বিনয়াবনত হয়, যাদের দিন কাটে আমার যিকিরে (স্মরণ), যারা আমার কোন সৃষ্টির সাথে রূঢ় বা রুদ্র ব্যবহার করে না, যারা আমাকে অমান্য করে কোন রাতে নিদ্রা যায় না।"

এসব হাদীস ছাড়াও বলতে হয় যে, রাসূল (সা:) এর গোটা জীবনই ছিল বিনয় ও নম্রতার এক অনুপম অনুকরণীয় আদর্শ। বাড়ীতে তিনি স্ত্রীদের গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করতেন, তিনি নিজের কাপড় ও জুতা সেলাই করতেন, ছাগীর দুধ দোহন করতেন। এক ভ্রমনের সময় তিনি এবং তাঁর সাথী খাবার তৈরীর জন্য যাত্রাবিরতি করলেন; তিনি অলসভাবে বসে থাকলেন না বরং বললেন, ".... আমি কোন কাজ না করে বসে থাকা এবং তোমাদের উপর কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাটাকে ঘৃণা করি." অত:পর তিনি জ্বালানী কাঠ কাটতে গেলেন। যখন তিনি কোন লোকজনের সমাবেশে যোগ দিতেন তখন সবসময় খালি জায়গায় বসতেন কখনও সামনে যাবার জন্য ঠেলাঠেলি করতেন না। মুসলমানদের নম্রতার এই আচরণ শুধু তখনই সীমাবদ্ধ ছিল না যখন তারা দুর্বল ও অত্যাচারিত ছিল বরং তখনও দেখা গেছে যখন তারা বিজয়ী ও প্রতাপশালী ছিল।

উত্তর : ৩. গর্ব-অহংকার সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা

গর্ব হচ্ছে এক নৈতিক বিকৃতি যা থেকে মুসলমানদের দূরে থাকতে বলা হয়েছে। কুরআনে অহংকারী শয়তানের পতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে মানুষের শিক্ষার জন্য। তাতে দেখা যায় নিজের অহংকারবোধের কারণে শয়তান আল্লাহর আদেশে আদম (আ:) কে সেজদা করতে অস্বীকার করে, যার ফলশ্রুতিতে সে জান্নাতের সুশোভিত বাগিচা থেকে বিতাড়িত হয়। অহমিকা হচ্ছে এমন এক আচরণ যা আল্লাহর কাছে সবচাইতে ঘৃণিত, এর বিপরীত হচ্ছে বিনয় যা আল্লাহর সবচাইতে প্রিয়। মানুষের অহমিকা ও গর্বের পরিণতি বর্ণনা করে কুরআনে অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কুরআনে অহংকারী ফেরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যার পরিণতি হয়েছিল ধ্বংস এবং পুরো সেনাবাহিনীসহ সলিল সমাধি। কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে অহংকারী ফেরাউন এবং তার বাগানের সাথীদের কথা। তাদের সবার যাবতীয় সম্পদ নষ্ট হয় তাদের আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের কারণে। যদিও এসব ঘটনায় এই জীবনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে তবে অহংকারের আসল শাস্তি তো হবে পরকালে। রাসূলের একটি হাদীসে

অহংকারের বিষয়ে ইসলামের কঠোর অবস্থানের বিষয়টি জানা যায়, তা হচ্ছে, "তোমাদের যার মধ্যে কণা পরিমাণ অহংকারও আছে তাকেই জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।"

উত্তর : ৪. অহংকারের সাধারণ কিছু বহি:প্রকাশ

মানুষের জন্য নিকৃষ্টতম অহংকার হচ্ছে সত্য তার সামনে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবার পর এবং সে তা উপলব্ধি করার পরও তা প্রত্যাখ্যান করা। সবচাইতে বড় সত্য হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। এই সত্যকে প্রত্যাখ্যান হচ্ছে সবচাইতে শাস্তিযোগ্য অহংকার। (এটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে অহংকার)। আর এক ধরনের অহংকার হচ্ছে অন্যান্য মানুষের সাথে আচরণে যা প্রকাশিত হয়, যথা পোশাক ও হাঁটাচলায় অহংকার, মানুষের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যভাব, রূঢ়তা ইত্যাদি।

উত্তর : ৫. গর্বভরে পোশাক না পরার ইসলামী বিধান কি মুসলমানদের সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে পোশাক পরা থেকে বিরত রাখে

এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সা:) বলেন যে, "আল্লাহ নিজে সুন্দর তাই তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।" তিনি আরও বলেন যে, আসল অহংকার হচ্ছে সত্য প্রত্যাখ্যান করা ও জনগণকে ছোট মনে করা। কাজেই মুসলমানরা লোক দেখানো ও অহংকার প্রকাশ হতে মুক্ত থেকে ইসলামের পোশাক বিধানের অধীনে যে, কোন ডিজাইনের সুন্দর পোশাক পরতে পারে।

উত্তর : ৬. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মমর্যাদার ব্যাখ্যা

মর্যাদা সংক্রান্ত ইসলামী পরিভাষা হচ্ছে 'ইজ্জাহ' (ইজ্জত), যার অর্থ সম্মান ও মর্যাদা দুটোই। ইসলামী পরিভাষায় ইজ্জাহ হচ্ছে এমন মর্যাদা যা সরাসরি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই এটা কারো ব্যক্তিগত অর্জন নয়। বা অহংকারের বিষয় নয়। অপরপক্ষে অহংকার হচ্ছে এমন আচরণ যাতে একজন মনে করে যে, সে অন্যদের চেয়ে উত্তম ও উচ্চ। কাজেই সে সবার সাথে প্রতিপত্তির সাথে ব্যবহার করে। মুসলমানদের বলা হয়েছে তারা যেন মুসলমান হবার জন্য এবং সত্য পথের সন্ধান পাওয়ার জন্য গর্বিত থাকে, কিন্তু এটা অহংকার প্রসূত গর্ব নয়; বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিনয় ও কৃতজ্ঞতার বহি:প্রকাশ যিনি মানুষকে মুসলমান হবার এবং সত্যপথের অনুসারী হবার সুযোগ দিয়েছেন।

উত্তর : ৭. মর্যাদা অর্জনের উপায়

ইসলাম বর্ণিত মর্যাদা (ইজ্জাহ) কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য দিয়েই অর্জন করা সম্ভব। অতএব, মর্যাদা অর্জনের জন্য মুসলমানদের যা

করতে হবে তা হচ্ছে-

ক) আল্লাহর অনুগত হতে হবে

খ) তাঁর নির্দেশিত পথের অনুসারী হতে হবে।

গ) তাঁর অপছন্দের সব কাজ বর্জন করতে হবে

ঘ) এটা মনে রাখতে হবে যে, মর্যাদাহানি, অর্থহানি বা অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং ঈমান হারানোর সাথে সম্পৃক্ত।

মুসলমানদের এটা অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁর আদেশ মান্য করে সে নিজে শুধু উপকৃতই হচ্ছে না বরং সে মর্যাদারও অধিকারী হচ্ছে। এই মর্যাদা তার আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়। কোন ব্যক্তি মানবীয় মাপকাঠিতে খুব সাধারণ এবং দরিদ্র হতে পারে কিন্তু ঈমান ও নম্রতার গুণে আল্লাহর কাছে সে অসংখ্য অহংকারী ধনী ব্যক্তির চেয়েও মর্যাদাবান ও প্রিয়। ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, মর্যাদা প্রসূত হয় আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন এবং মানবীয় ভ্রান্তি থেকে মুক্তির মাধ্যমে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৪৯:১৩, ৫:৫৪, ১৫:৮, ৫৩:৩২

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৭:১২, ১৬:২৩, ২৮:৭৬, ৫৮:১৭, ৪৩:৫১-৫৫, ৭১:৭, ৭:১৪৬-৪৭
রাসূল (স:) বলেন যে, তিনটি জিনিস মানুষকে সম্মানিত করে এবং তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে। যে, তিনটি জিনিস তাকে সম্মানিত করে তা হচ্ছে: অন্তরে এবং বাইরে আল্লাহর সচেতনতা, সততা এবং মধ্যমপন্থা।
যে, তিনটি বিষয় তাকে ধ্বংস করে তা হচ্ছে: প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হওয়া, আত্মপ্রশংসা এবং গর্ব।

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৩৭:৩৫, ৩১:১৮, ১৭:৩৭

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ৬৩:৮

প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ৩৫:১০, ৪:৯৭

এফ-২৬ নৈতিক গুণ : সহানুভূতি

প্রশ্ন ১. সহানুভূতি এবং দয়া আল্লাহর অন্যতম ঐশী গুণ হিসেবে কুরআনে কিভাবে বর্ণিত হয়েছে

২. দয়ার সাথে ন্যায়বিচারের সম্পর্ক কি? (মানুষের মধ্যে এ বিষয়ের উপলব্ধিতে এক ধরনের ভ্রান্তি দেখা যায়, তারা আল্লাহর ক্ষমার গুণের সাথে তাঁর শাস্তি প্রদানের ক্ষমতাকে এক করে চিন্তা করতে পারে না)

৩. মানুষের অন্যতম গুণ হিসেবে দয়াশীলতার প্রকৃতি এবং ভিত্তি কি?

৪. নৈতিক গুণ হিসেবে দয়া সম্পর্কে রাসূল মুহাম্মদ (সা:) কি বলেছেন?

৫. এমন কোন মানুষ আছে কি যাদের প্রতি বেশী সহানুভূতি দেখানো উচিৎ?

৬. মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীকূল-এর প্রতি সহানুভূতিশীল হবার ব্যাপারে ইসলামে কোন নির্দেশনা আছে কি?

উত্তর : ১. আল্লাহর ঐশীগুণ দয়া সম্পর্কে কুরআনের ব্যাখ্যা

কুরআনে সহানুভূতি ও দয়াকে আল্লাহর সবচাইতে আলোচিত ঐশীগুণ হিসেবে বর্ণনা হয়েছে। কুরআনের সকল সূরা (একটি বাদে) যে, আয়াত দিয়ে শুরু হয়েছে তাতে ক্ষমাশীল হিসেবে আল্লাহর পরিচয় স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। সে আয়াতটি হচ্ছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' অর্থাৎ দয়াময় অনন্ত দাতা আল্লাহর নামে। এই বাক্যে দুটি শব্দ 'আর রহমান' এবং 'আর রহীম' একই ধাতু 'রাহমা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ সহানুভূতি/ক্ষমা। 'রাহমান' এবং 'রাহীম' শব্দ দুটোর অর্থে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। 'আর রাহীম' শব্দের অর্থ দয়ালু, ক্ষমাশীল, সহানুভূতিশীল, এসব গুণ মানুষের মধ্যেও থাকতে পারে। কিন্তু 'আর রাহমান' শব্দ এমন গুণের পরিচায়ক যা একমাত্র আল্লাহরই আছে। 'আর রাহমান' শব্দের অর্থ 'সকল ক্ষমার উৎস'। কোন মানুষের এই গুণ থাকতে পারে না। রাসূল (স:)-এর একটি হাদীসে আল্লাহর এই গুণ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তোমার প্রতি একজন মা তার শিশু সন্তানের প্রতি যতটা সহানুভূতিশীল তার চাইতেও বেশী সহানুভূতিশীল।"

উত্তর : ২. আল্লাহর দয়ার গুণের সাথে আল্লাহর ন্যায় বিচারের গুণের সম্পর্ক

আল্লাহর দয়ার গুণের সাথে তাঁর ন্যায়বিচারের গুণের কোন বিরোধ নেই। আল্লাহর ক্ষমা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে তাঁর সহানুভূতির বিষয়টি সুনিশ্চিত সত্য। এতদসত্ত্বেও মানুষকে এমনভাবে চলতে হবে যাতে সে যথার্থভাবে আল্লাহর এই দয়া অর্জন করতে পারে। এজন্য তাকে যা অবশ্যই করতে হবে

তা হচ্ছে-

ক) আল্লাহর উপর যথার্থভাবে ঈমান আনতে হবে। শুধুমাত্র তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে বিনয়ী ও দৃঢ় হতে হবে।

খ) অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্র সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কার্যকরী করে তাঁর এবাদত করতে হবে।

যখন মানুষ এত অন্ধ-অহংকারী হয়ে পড়ে যে, সে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করে যার কাছ থেকেই সে সবকিছু লাভ করেছে। আল্লাহর নির্দেশনাকে অমান্য করতে থাকে তখনই ক্ষমাশীল আল্লাহ তার শাস্তি কার্যকর করেন। অর্থাৎ আল্লাহ কখনোই মানুষের উপর কঠোর বা অবিচারকারী নন বরং মানুষই তার নিজের প্রতি অবিচারকারী। সেজন্যেই কুরআনে বলা হয়েছে যখন কেউ অন্যায় বা জুলুম করে তখন সে যেন নিজের উপরেই জুলুম করে। কাজেই ইসলাম মতে আল্লাহর ক্ষমাশীলতার সাথে তাঁর ন্যায়বিচারের কোন বিরোধ নেই। বরং প্রশ্ন হচ্ছে যে, মানুষ নিজেই আল্লাহকে অস্বীকার করে তাঁর নির্দেশিত সরল সঠিক পথে চলার আদেশ অমান্য করে নিজের উপর জুলুম করছে কিনা। একইভাবে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর আদেশ পালনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও কোন ভুল করে তবে তার জন্য আল্লাহর ক্ষমার দরজা বন্ধ হবে না। আন্তরিকভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরা ভুল করলেও সাথে সাথে বিনয়ের সাথে আল্লাহর পথে ফিরে আসবে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে। রাসূল (সা:)-এর একটি হাদীসে আছে যে, আল্লাহ বলেন, "আমার ক্ষমাশীলতা আমার ক্রোধের উপর জয়ী।

উত্তর : ৩. মানুষের গুণ হিসেবে দয়াশীলতার প্রকৃতি ও ভিত্তি

মানুষের গুণ হিসেবে দয়ার বিষয়টি বোঝা যায় তার অন্যের প্রতি সংবেদনশীলতা থেকে। এ সংবেদনশীলতা হতে পারে মানুষের শারীরিক অসুখ-বিসুখ বা দুর্বলতার প্রতি, আবার এটা হতে পারে মানুষের আধ্যাত্মিক বিষয়ে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত তাদের পৃথিবীতে জীবন যাপনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই এবং এ জীবনের কোন মহৎ মূল্য নেই। মানুষের প্রতি এই বিষয়ে সহানুভূতির দিকটি কুরআনে বিবৃত হয়েছে সকল নবী-রাসূলের মিশন হিসেবে। বস্তুত: তাদের সবার মিশনই ছিল মানুষের কাছে তার জীবনের লক্ষ্য তার পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য বোঝানো, যাতে জীবন অর্থপূর্ণ হয়। কুরআনে রাসূল (স:)কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সমস্ত জগতের প্রতি রহমত হিসেবে।"

রাসূল মুহাম্মদ (সা:) কর্তৃক আনীত দাওয়াত ছিল মানব জাতির জন্য এক রহমত কারণ-

ক) এটা মানুষকে ভ্রান্ত মতবাদের অনুসরণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে।

খ) এটা সমাজের বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করে।

গ) এটা মানুষকে জুলুম নির্যাতন, বেইনসাফী থেকে মুক্ত করে। বিশেষভাবে ধনী ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা দরিদ্র ও দুর্বলদের উপর শোষণ ও পীড়ন বন্ধ করে।

মানুষের মাঝে ক্ষমাশীলতার সৃষ্টি ও বিকাশে এসবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

উত্তর : ৪. মানুষের নৈতিক গুণ হিসেবে দয়া সম্পর্কে রাসূল (সা:)-এর বাণী

ক্ষমা ও সহানুভূতি সম্পর্কে রাসূল (সা:)-এর হাদীসসমূহ হচ্ছে এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্যেরই বিস্তৃতি। একটি হাদীসে তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে মানুষের ক্ষমাশীলতার গুণকে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ক্ষমাশীল হও।" তিনি আরও বলেন যে, সহানুভূতিশীল হবার মানে শুধু এই নয় যে, কেউ শুধু তার সাথী বা সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে বরং এর মানে প্রত্যেক মানুষের প্রতি ক্ষমা ও সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা ও দয়া লাভ করতে হলে মানুষের আগে নিজে ক্ষমা ও দয়াশীল হতে হবে। তাঁর মতে আল্লাহর কাছ থেকে সবচেয়ে দূরত্বে অবস্থান করেন তারা যারা নির্দয় ও নিষ্ঠুর। রাসূলের জীবনের প্রতিটি ঘটনায় তার দয়া ও ক্ষমাশীলতার অনুপম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তায়েফবাসীরা যখন তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে ফেলে তখনও তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন তাদের ক্ষমা করে দেবার জন্য।

উত্তর : ৫. যেসব মানুষের প্রতি বেশী সহানুভূতি দেখানো উচিত

কুরআন মতে সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিৎ। তারপরও নিম্নোক্ত মানুষদের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতি দেখাতে বলা হয়েছে–

ক পিতা-মাতা (কুরআনের একটি আয়াতে এক আল্লাহর ইবাদতের পরই পিতামাতার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলা হয়েছে)

খ) সন্তান ॥ রাসূল (সা:) একবার একব্যক্তিকে তিরস্কার করেন যখন শোনেন যে, সেই ব্যক্তি কখনও তার সন্তানদের আদর করে চুমু খাননি। তিনি বলেন, "যে মমত্ব প্রদর্শন করে না সে আল্লাহর কাছে থেকেও মমত্ব লাভ করবে না।"

গ) স্বামী-স্ত্রী ॥ রাসূল (সা:) বলেন, "ঈমানদারদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে, তার চরিত্র ও ব্যবহারে উত্তম এবং তার পরিবারের কাছে উত্তম।" এখানে তিনি বিশেষভাবে স্ত্রীদের প্রতি উত্তম ব্যবহারের কথাই বলছিলেন।

ঘ) আত্মীস্বজন

ঙ) এতিম ॥ কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে এতিমদের হক রক্ষায় সচেষ্ট হতে ও তাদের প্রতি দরদী হতে বলা হয়েছে।

চ) অসুস্থ ॥ যে, ব্যক্তি অসুস্থ মানুষের খবর নিতে যায় আল্লাহ্ সেটাকে তাঁর প্রতি সাক্ষাৎ হিসেবে বিবেচনা করেন।

ছ) পরিচারক ও সাহায্যকারী ॥ রাসূল (সা:) গৃহপরিচারকদের প্রতি কর্কশ হতে নিষেধ করেছেন।

উত্তর : ৬. অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রসঙ্গে

কুরআন ও সুন্নাহ কোন নৈতিক গুণকেই অবজ্ঞা করেনি। কুরআন রাসূল (স:)কে সম্বোধন করেছে 'রাহমাতাল্লিল আলামীন' হিসেবে। যার অর্থ জগতসমূহের জন্য রহমতস্বরূপ। কাজেই বোঝা যায় রাসূল (স) সমগ্র জগতের জন্য। সকল প্রাণীকূলের জন্য রহমতস্বরূপ এসেছিলেন। অতএব মুসলমানদেরও বিশ্ব পরিবেশ ও অন্যান্য প্রাণীকূলের প্রতি দায়িত্ববান ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। রাসূল (সা:) এর অসংখ্য হাদীসে দেখা যায় যে, যারা প্রাণীদের প্রতি সদয় আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের প্রতি সদয়। এমনকি যখন মানুষ তার খাদ্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনে কোন প্রাণীকে হত্যা করবে তখন সেটারও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে যাতে প্রাণীর সবচাইতে কম কষ্ট হয় এবং তার মর্যাদা দেয়া হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যেসব প্রাণী ব্যবহৃত হবে তাদের বিষয়েও একই পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৭:১৫৬, ৪০:৭

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ২১:১০৭

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ১৭:২৩-২৪, ৯৩:৯, ৪:৩৬

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ২১:১০৭

এফ-২৭ নৈতিক গুণ-ক্ষমাশীলতা এবং আত্মার পরিশুদ্ধি

প্রশ্ন ১. ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে কুরআন কি বলেছে?

২. রাসূল মুহাম্মদ (স:)-এর হাদীসে ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

৩. কেউ কেউ বলেন যে, রাগ হচ্ছে মানুষের দু:খ ও কষ্টের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, কাজেই ক্ষমা সম্পর্কে ইসলামী বিধান স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বিরোধী এবং বাড়াবাড়ি। তাদের মন্তব্যের বিষয়ে কি বলবেন?

৪. কোন কোন মানুষের মাঝে এমন কোন অনার্জিত গুণ আছে কি যা তাদের অন্যদের চাইতে বেশী ক্ষমাশীল করে?

৫. এমন কোন শরয়ী দলিল আছে কি যার ফলে কেউ ক্ষমা চাইলে মুসলমানরা তাকে ক্ষমা করতে বাধ্য থাকবে?

৬. হিংসা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?

৭. রাগ দমনের ব্যাপারে কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর : ১. ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে কুরআন

প্রথমত: কুরআন ক্ষমা করার গুণকে আল্লাহ্ সচেতনতা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। দ্বিতীয়ত: কুরআন মুমীনদের সামনে এই যুক্তি নিয়ে এসেছে যেন তারা অন্যান্য মানুষকে ক্ষমা করার সময় মনে রাখে যে, তাদের প্রত্যেকেকে নিজের ভুল ও পাপের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। কাজেই কেউ আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা নিতে আগ্রহী হলে সে নিজেও যেন অন্যের ভুলক্রটির প্রতি যৌক্তিকভাবে বিবেচক ও ক্ষমাশীল হয়। তৃতীয়ত: কুরআন ক্ষমার ধারণার সাথে ধৈর্য্যের ধারণাকে যুক্ত করেছে।

উত্তর : ২. ক্ষমা সম্পর্কে রাসূল (সা:) এর হাদীস

রাসূল (সা:) কয়েকটি হাদীসে বলেছেন যে, একজন মানুষের শক্তি তার যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না বরং নির্ভর করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার উপর। তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী যে, রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে"। একবার তিনি তাঁর সাথীদের বললেন, "তোমরা কি জানো কোন্ আমল এর মাধ্যমে তোমরা বেহেশতে উঁচু দেয়াল বিশিষ্ট প্রাসাদের মালিক হতে পারো, কোন্ আমলের জন্য আল্লাহ তোমাদের বড় ও সম্মানিত করবেন।" জবাবে যখন সাহাবারা না সূচক উত্তর করলেন তখন রাসূল (সা:) বললেন "উস্কানীর মুখেও ক্ষমাশীল হতে পারা ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, তোমার প্রতি যে, জুলুম

ও অবিচার করেছে তার সাথে উত্তম ব্যবহার ও সুবিচার করা, এমন কাউকে দান করা যে, তোমার প্রয়োজনের সময় কোন সাহায্য করেনি, এমন কারো সাথে সম্পর্ক রাখা যে, তোমার কোন খোঁজ রাখেনি"; রাসূল (সা:) নিজে তাঁর জীবনে এইসব গুণের বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। এমনকি যেসব মানুষ তাঁর উপর চরম আঘাত করেছে, তাদের সাথেও সুব্যবহার করেছেন।

উত্তর : ৩. রাগ কি মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া? ক্ষমার বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী কি অবাস্তব?

কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন যে, তিনি কোন মানুষের উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না। কাজেই মানুষকে তার শত্রুর প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হতে বলে বা তার রাগ দমন করতে বলে ইসলাম মানুষের উপর অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করেছে এমন বলাটা ভুল। ঈমানদারদের সবসময় সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে তার রাগ দমন করতে। তার রাগের বহি:প্রকাশ হতে গিয়ে সমাজে যের কোন হানাহানি বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়।

ইসলাম আল্লাহর পথে রাগ বা ক্ষোভের সাথে ব্যক্তি স্বার্থে বা অহংবোধের কারণে সৃষ্ট রাগের মধ্যে পার্থক্য করেছে। প্রথম ধরনের ক্ষোভ ঈমানদারদের মধ্যে তৈরী হয় যখন তারা দেখে মানুষ খোদার বিধান অমান্য বা অবজ্ঞা করছে। এ ধরনের ক্ষোভ হওয়াটা বাঞ্ছনীয়, কারণ এটা ঈমানদারের আন্তরিকতার চিহ্ন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে ক্ষুব্ধ বা রাগান্বিত হওয়াটা অবাঞ্ছিত। বিশেষত যদি রাগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, মানুষ প্রচণ্ড ক্রোধান্ধ হয়ে যায় এবং সামান্য উস্কানীতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া করে। ইসলাম মানুষকে উস্কানীর মুখে একেবারে অনুভূতিহীন হতে বলে না কিন্তু এটা এই শিক্ষাই দেয় যে, রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ক্ষমার মানসিকতা রাখতে হবে। রাসূল (সা:) বলেন, "মানুষের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা দেরীতে রাগে এবং দ্রুত ক্ষমা করে। অন্যদিকে তারা নিকৃষ্ট যারা দ্রুত রাগে এবং দেরীতে ক্ষমা করে।"

উত্তর : ৪. যেসব গুণ মানুষকে বেশী ক্ষমাশীল করে

যেসব বৈশিষ্ট্য মানুষকে ক্ষমাশীল করে তার প্রথমটি হচ্ছে আত্মার পরিশুদ্ধি। প্রকৃত নম্রতা যা হৃদয়ে থাকে তাই মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ ধরনের মানুষ সবসময় তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োজিত করে আল্লাহর ক্ষমাশীলতার সাথে সম্পৃক্ত হতে। ফলে তারা অন্যদের প্রতি সদয় ও ক্ষমাশীল হয়। একবার রাসূল (স:)কে প্রশ্ন করা হয় যে, কারা শ্রেষ্ঠ মানুষ। তখন তিনি বলেন, "সেই শ্রেষ্ঠ যার জিহ্বা সত্য কথা বলে, যার হৃদয় পবিত্র ও ধার্মিক, যার পাপ, হিংসা, প্রতিশোধ বা আক্রমণের কোন প্রবণতা নেই।" তিনি আরও উপদেশ দেন, "তোমরা ঝগড়া বিবাদ করে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না, অহেতুক তর্কে জড়িয়ে পড়ো না, একে অপরকে হিংসা করো না, তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং ভাই"।

উত্তর : ৫. কেউ ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করতে হবে

কুরআনে মুসলমানদের স্পষ্টভাবে আদেশ করা হয়েছে, "অপরের ভুল ক্ষমা করে দাও।" কাজেই কেউ যদি অপরের ক্ষমা পার্থনাকে মঞ্জুর না করে তবে সে কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করবে। মানুষের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকে যে, মেনে নিতে হবে এ সম্পর্কে রাসূলের একটি হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "যদি কেউ তার ভাইয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সেই প্রার্থনা মঞ্জুর না হয় তবে যে, ক্ষমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করল সে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাতের সমান অপরাধ করল"।

আরেকটি হাদীসে রাসূল (সা:) বলেন, "মানুষের মধ্যে তারা নিকৃষ্ট যারা-

ক) সবসময় একাকী থাকে (অর্থাৎ অসামাজিক)।

খ) তাদের পরিচারকদের সাজা দেয়।

গ) অন্যকে সাহায্য করে না।

ঘ) যে মানুষকে ঘৃণা করে এবং মানুষ দ্বারা ঘৃণিত হয়। এবং সর্বশেষে এ সবের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট সে যে, অন্যের ভুল ও অপরাধ ক্ষমা করতে অস্বীকার করে।"

উত্তর : ৬. হিংসা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী

রাসূল (সা:) মুসলমানদের বলেন, "হিংসা থেকে দূরে থাকো, কারণ হিংসা মানুষের সৎ কাজকে এমনভাবে ধ্বংস করে যেমনভাবে আগুন কাঠকে ধ্বংস করে"। তিনি আরও বলেন, "ঈমানদারদের হৃদয়ে দুটো জিনিস একসাথে থাকতে পারে না তা হচ্ছে হিংসা এবং ঈমান।" হিংসা কিভাবে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস করে তার উদাহরণ পাওয়া যায় কুরআন বর্ণিত শয়তানের কাহিনীতে। সেখানে দেখা যায় শুধুমাত্র গর্ব ও হিংসার কারণেই শয়তান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হয়।

উত্তর : ৭. ক্রোধ দমনে করণীয়

রাগ বা ক্রোধ দমনের জন্য নিম্নোক্ত পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক) নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, "এই রাগ বা ক্রোধের পেছনে হিংসা বা গর্ব কি চালিকাশক্তি"?

খ) এই রাগ বা ক্ষোভ কি আল্লাহর পথে নাকি হীন ব্যক্তি স্বার্থে? রাসূল (সা:) এ বিষয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, তিনি কখনও নিজের স্বার্থে রাগ করেননি বা প্রতিশোধ নেননি। তিনি কারো উপর শুধু তখনই ক্ষুব্ধ হতেন যখন কেউ আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করত।

গ) একটি হাদীসে রাসূল (সা:) বলেন, “যখন কেউ অনুভব করবে যে, তার ক্রোধ বাড়ছে তখন যদি সে হাঁটা অবস্থায় থাকে তবে যেন দাঁড়িয়ে যায়, যদি সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তবে যেন সে বসে পড়ে, যদি সে বসা অবস্থায় থাকে তবে যেন শুয়ে পড়ে...” (রাগ থেকে সৃষ্ট বিপর্যয় এড়াতেই এই পন্থা নিতে বলা হয়েছে। এছাড়াও রাগ হলে অযু করতে বলা হয়েছে)

ঘ) রাগের সময় যথাসম্ভব ধৈর্য্যের সাথে আল্লাহর সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৩:১৩৩-৩৪, ২৪:২২, ৪২:৪৩

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৪১:৩৪

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৪২:৩৭

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৫৯:১০, রাসূল (সা:) বলেন যে, যদি দুজন মুসলমানের মধ্যে মারাত্মক ঝগড়াও হয় তবুও তাদের দু'জনের পরস্পর সম্পর্কহীন অবস্থায় তিনদিনের বেশী থাকা উচিৎ নয়। ঝগড়াকারীদের দু'জনের মধ্যে সেই উত্তম যে, তার ভাইকে আগে সালাম দেবে।

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ২৪:২২

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ৭:১২

এফ-২৮ নৈতিক গুণ- ধৈর্য্য

প্রশ্ন ১. সবর শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করুন

২. মুমিনদের জীবনে ধৈর্য্যের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. অনেক সময় দেখা যায় অত্যন্ত ধার্মিক ও ভাল মানুষ বিপর্যয় ও অবিচারের শিকার হচ্ছেন, এক্ষেত্রে তাদের ধৈর্য্য ও বিনয় কি বিফলে যায়?

৪. কিছু মানুষ ধৈর্য্য ও সংযমের নামে নিজেকে কষ্ট দেয়। তাদের শরীরের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে বা শরীরের উপর অত্যাচার করে। এদের সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী কি?

৫. ইসলাম বর্ণিত অন্যান্য নৈতিক গুণের সাথে ধৈর্য্যের সম্পর্ক কি?

৬. ধৈর্য্য থেকে কি কি উপকার ও পুরস্কার পাওয়া যায়?

৭. মানুষ কিভাবে তার ধৈর্য্যের গুণ বাড়াতে পারে?

উত্তর : ১. সবর শব্দের অর্থ

'সবর শব্দের অনুবাদ করা হয় ধৈর্য্য', কিন্তু ধৈর্য্য শব্দের মাধ্যমে 'সবর' শব্দের পুরো অর্থ প্রকাশিত হয় না। সবর শব্দের মূল ধাতু 'সাবরা' যার অর্থ 'বেঁধে রাখা' অর্থাৎ ভয় বা দুর্বলতার অনুভূতিকে বেঁধে রাখা।

ইসলাম মতে এটা কোন নেতিবাচক নৈতিক গুণ নয় বরং এটা সক্রিয়, গতিশীল গুণ যা অর্জন করতে ইসলাম ঈমানদারদের উৎসাহিত করেছে। এটা মুসলমানদের নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়তে উৎসাহিত করে। এটা মুসলমানদের যে, কোন বিপদ বা বিপর্যয়ের মুখে অটল ও দৃঢ় থাকতে উৎসাহিত করে।

উত্তর : ২. মুমিন জীবনে ধৈর্য্যের প্রয়োগ

মুসলমানদের জীবনে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োগ নিম্নরূপ–

ক) কুরআন ধৈর্য্যকে আল্লাহ প্রতি আনুগত্যের সাথে যুক্ত করেছে।

খ) কুরআন এবং হাদীস অনুসারে খারাপ ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখতে কঠোর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় অবলম্বন করতে হবে। রাসূল (সা:) বলেন, "বেহেশত কঠিন এবং কষ্টসাধ্য বিষয় দিয়ে বেহেশত পরিবেষ্টিত, আর আনন্দময়, সহজ ও উজ্জ্বল বিষয়াদি দিয়ে দোজখ পরিবেষ্টিত।" (অর্থাৎ কঠোর প্রচেষ্টায় বেহেশত লাভ করতে হবে, অপরদিকে হেসে-খেলে জীবন পার করে দোজখে যাওয়া যাবে- অনুবাদক)

গ) কুরআনের বেশ কয়েক জায়গায় আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ (সা:) এবং ঈমানদারদের ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের গুণ অর্জন করতে বলেছেন।

ঘ) কুরআনে বলা হয়েছে মুমীনদের বিভিন্ন আপদ-বিপদ-বিপর্যয়-দুর্ভাগ্য দিয়ে তাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করা হবে।

ঙ) মুমীনদের বলা হয়েছে ধার্মিক ও সৎ লোকের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ার চাকচিক্যের পেছনে ধাবমান এবং যারা ঈমানহীন তাদের সংগ পরিত্যাগ করতে।

ঙ) মুসলমানদের আরও বলা হয়েছে ধৈর্য্য এবং সংযম অবলম্বন করতে এমনকি যখন তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। রাসূল (সা:) যে, কোন সামান্য ঐশ্বর্য্য পেলেও বলতেন, "এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আমাকে পরীক্ষা করতে যে, আমি কৃতজ্ঞ নাকি অকৃতজ্ঞ-অহংকারী হই। কাজেই সবশেষে বলতে হয় ইসলামী পরিভাষায় ব্যবহৃত 'সবর' বলতে সাধারণভাবে ধৈর্য্যের চাইতে অনেক বৃহত্তর ধারণা প্রকাশিত হয়। সাধারণভাবে ধৈর্য্য বলতে ভাগ্যের প্রতি নেতিবাচক, নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ বা অনুমোদনের ধারণা প্রকাশিত হয়।

উত্তর : ৩. ধার্মিক ও সৎ মানুষে বিপদের শিকার হয় কেন?

মুসলমানরা এটাই বিশ্বাস করে যে, কোন মানুষই আল্লাহর কাজের পেছনে ক্রিয়াশীল পরিকল্পনা ও প্রজ্ঞার বিচারে সক্ষম নয়। জীবনে অনেক কিছু মানুষের স্বাভাবিক চিন্তায় বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। যেমন সৎ ও ভাল মানুষের ভাগ্য বিপর্যয় বা নিপীড়ন। এসব দেখে মুমীনরা এটাই বলবে যে, মানুষের বিবেচনা শক্তির আওতার বাইরে সব কিছুর উপর আল্লাহর মহাপরিকল্পনা কার্যকর। কিসে চূড়ান্ত কল্যাণ তা তিনিই ভাল জানেন। কুরআন এটা বলেছে যে, পৃথিবীতে শুধু পাপী এবং শয়তান লোকজনই যে, কষ্ট ও সাজার শিকার হবে তাই নয়। আল্লাহ মুমীনদেরও বিপর্যয় দিয়ে পরীক্ষা করবেন। একইভাবে প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্যও মুমীন এবং পাপী উভয়কেই দেয়া হবে। কুরআন এর ব্যাখ্যা দিয়েছে এভাবে যে, জনগণকে শুধু তাদের বিশ্বাস আনার ভিত্তিতেই ছেড়ে দেয়া হবে না। তাদের বিভিন্ন বিপর্যয়, বিপদ, শোক দিয়ে ঈমানের পরীক্ষা করা হবে। রাসূল (সা:) বলেন, "আল্লাহ কাউকে পছন্দ করলে তাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করবেন"। তিনি আরও বলেন যে, অনেক সময় আল্লাহ কোন কোন মানুষকে তাদের পাপের শাস্তি এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেন এই পরিকল্পনায় যাতে সে আখেরাতে বেকসুর হয়ে যায়।

উত্তর : ৪. ধৈর্য্য ও সংযমের নামে বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গে ইসলাম

ঈমানদারদের উৎসাহিত করা হয়েছে তারা যেন বিপদ এবং বিপর্যয়কে ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর মনে করে ধৈর্য্য ধারণ করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা নিশ্চিন্তে বসে থাকবে বা বিপদের তালাশ করবে, বস্তুত: এটা ইসলামী নয়। সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে

পার্থক্য আছে যাদের একজন যিনি আপদ-বিপদের মুখে ধৈর্য্যশীল, দৃঢ় এবং অবিচল থাকে আর একজন যিনি সর্বদা বিপদ-বিপর্যয় ডেকে আনেন। এ বিষয়ে রাসূল (স:)-এর একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। একদল সাহাবী নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যেতে যেতে তিনি বললেন, তারা যেন যুদ্ধ বাধার জন্য আকুল না থাকে বরং তা এড়ানোর জন্য দোয়া করেন; তবুও যুদ্ধ অনিবার্য হলে তারা যেন সাহস ও দৃঢ়তার প্রদর্শন করে।

উত্তর : ৫. ইসলাম বর্ণিত অন্যান্য নৈতিক গুণ ও ধৈর্য্য

ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ইসলাম বর্ণিত অন্যান্য নৈতিক গুণের সাথে সম্পৃক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

ক) এটা আল্লাহ্ সচেতনতার সাথে সম্পৃক্ত। যাদের আন্তরিক তাকওয়া আছে তারা বেশী ধৈর্য্যশীল।

খ) ক্ষমাশীলতা ॥ এটা নিশ্চিত যে, যারা ধৈর্য্যশীল তারা বেশী ক্ষমাশীল। তারা ক্রোধ লালন করবে না। মুসলমানদের প্রতিশোধের অধিকার দেয়া হয়েছে কিন্তু কুরআন বলেছে যে, ধৈর্য্য এবং ক্ষমা হচ্ছে উত্তম।

গ) ধৈর্য্য মানুষকে আল্লাহর নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হতে শেখায়।

ঘ) ধৈর্য্য মানুষের মাঝে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আস্থা, নির্ভরতা বাড়ায়।

ঙ) আল্লাহর পথে জিহাদে ধৈর্য্য অত্যাবশ্যক

চ) ধৈর্য্য মানুষকে দয়াশীল ও সহানুভূতিশীল করে।

উত্তর : ৬. ধৈর্য্যের সুফল ও পুরস্কার

কুরআন মতে ধৈর্য্য হচ্ছে এমন এক গুণ যা অন্যান্য মানুষের সাথে নবী-রাসূলদের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। ইব্রাহীম (আ:), মূসা (আ:), ঈসা (আ:) এবং মুহাম্মদ (স:)-এর নাম এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুরআন বলে যে, মুমীনদের ধৈর্য্যের জন্য তাদের মাফ করে দেয়া হবে এবং তাদের বিরাট পুরস্কার দেয়া হবে। ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা ইসলাম মতে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের পূর্বশত। রাসূল (সা:) ধৈর্য্যকে মুমীনদের জন্য একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে বলেছেন এবং ঈমানের অর্ধেক বলে উল্লেখ করেছেন।

উত্তর : ৭. ধৈর্য্য বৃদ্ধির উপায়

ইসলাম মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চর্চা করলে একজনের ধৈর্য্য বাড়তে পারে–

ক) সারাজাহানের মালিক ও পালনকর্তা হিসেবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও আস্থাকে বাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, এবং বিচার ক্ষমতার পরিধি আমাদের কল্পনার অতীত।

খ) এই ধারণা সব সময় মনে বদ্ধমূল থাকতে হবে যে, আমাদের সকল সম্পদ আসলে আল্লাহর। অতএব তিনি যে, কোন মুহূর্তে চাইলে তা নিয়ে নিতে পারেন।

গ) জগতে যা কিছু ঘটবে তা পৃথিবী সৃষ্টির আগেই আল্লাহ্ কর্তৃক পরিকল্পিত। কাজেই যদি গোটা জগতও কারো ক্ষতি বা কল্যাণ করার জন্য একত্রিত হয় তবু তারা ব্যর্থ হবে যদি তাতে আল্লাহর অনুমোদন না থাকে।

ঘ) এটা মনে রাখা যে, দুনিয়ার বিপদগুলো গুনাহ্ মাফের বা তার সাজা দুনিয়াতে শেষ করার উসিলা হতে পারে। কাজেই বিপদে ধৈর্য্যশীল হওয়া।

ঙ) যে কোন বিপর্যয়ের মুখে আল্লাহর কাছে নত হয়ে শুধুমাত্র তাঁর কাছেই বিপদ উত্তরণের জন্য সাহায্য চাইতে হবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ১৯:৬৫, ১০৩, ৭৬:২৪, ৩১:১৭, ১৮:২৮, ১১:১০-১১

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ২৯:২, ৩:১৪২

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৪:১৪৭

একবার রাসূল (সা:) মক্কার পথে হজ্বের উদ্দেশ্যে একজন বৃদ্ধ লোককে দেখলেন যিনি তার সন্তানদের কাঁধে ভর দিয়ে পায়ে হেঁটে হজ্বের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। রাসূল (সা:) বৃদ্ধের ছেলেদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পায়ে হাঁটার কষ্ট সহ্য করে তিনি মক্কা যাবেন অতিরিক্ত সওয়াবের আশায়। রাসূল (সা:) বৃদ্ধকে বললেন যে, আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে এমনটি চাননি, বরং তিনি যেন কোন বাহনে চড়ে আরাম করে যান।

এফ-২৯ নৈতিক গুণ কথার সঠিক ব্যবহার

প্রশ্ন ১. মুখের কথার সঠিক ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্পর্কে কুরআন কি বলেছে?

২. মানুষ যাতে মুখের কথার অপব্যবহার থেকে দূরে থাকে সেজন্যে ইসলাম কোন ব্যবস্থা নিয়েছে কি?

৩. মার্জিত ও ভদ্রভাবে কথা বলা সংক্রান্ত ইসলামী আদেশ কি শুধু মুসলমানদের নিজেদের কথাবার্তার মধ্যেই সীমিত থাকবে নাকি এটা সার্বজনীন আদেশ?

৪. কেউ আক্রমণাত্মক ও বৈরী মনোভাব নিয়ে কথা বললে তার সাথে মুসলমানরা কিভাবে আচরণ করবে?

৫. ইসলাম কি এই শিক্ষাই দেয় যে, বৈরীতার জবাবে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখিতে নম্রতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়?

৬. মুসলমানরা কি অবুঝ যুক্তি প্রদানকারী মানুষের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করবে?

৭. গীবত সম্পর্কে কুরআনে কোন আলোচনা এসেছে কি?

৮. অন্যের দুর্বলতা বা দোষ সম্পর্কে নেপথ্যে আলাপের নিষেধাজ্ঞার কোন ব্যতিক্রম আছে কি?

উত্তর : ১. কুরআন মতে মুখের কথার ব্যবহার ও অপব্যবহার

কুরআন বারবার বলেছে যে, মানুষের কথা বলার ক্ষমতা আল্লাহর এক মহান নেয়ামত এবং এটার যথার্থ ব্যবহার হওয়া উচিৎ। কথা বলার যোগ্যতা মানুষকে অন্যসব প্রাণী থেকে আলাদা করে পৃথক মর্যাদা দিয়েছে। কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে যে, প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে ভদ্র, সুন্দর ও অর্থপূর্ণ কথা বলা এবং কথার অপব্যবহার না করা। কুরআন একটি উপমা দিয়ে বলেছে যে, ভাল কথা এমন এক বৃক্ষের মত যার শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত আর খারাপ কথা এমন এক বৃক্ষের মত যার কোন ভিত্তিমূল নেই। কুরআন আরও বলেছে যে, আল্লাহর দেয়া কথা বলার ক্ষমতা এবং অন্যের সাথে ভাব বিনিময়ের যোগ্যতা প্রতিটি মানুষ দায়িত্ববানের মতো ব্যবহার করে।

উত্তর : ২. মুখের কথার অপব্যবহার রোধে কুরআন গৃহীত ব্যবস্থা

কুরআন মুসলমানদের অর্থহীন, অশ্লীল ও অলস কথাবার্তা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। কুরআন আরও বলে যে, কথা বলার যৌক্তিক কারণ না থাকলে এবং ভাল ও উত্তম কথা বলা না গেলে বরং নীরব থাকাই ভাল। কুরআন মতে ঈমানদারদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা অর্থহীন কথাবার্তা বলে না এবং অলস বাচালতায় লিপ্ত লোকের সঙ্গ

এড়িয়ে চলে। রাসূল (সা:) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং কেয়ামতে বিশ্বাস করে, সে উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে"। রাসূল (সা:) আরও বলেন, "মানুষের ঈমান শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ তার হৃদয় শুদ্ধ হবে না, এবং হৃদয় শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ তার কথা শুদ্ধ হবে না"। এই হাদীস থেকে একথাই বোঝা যায় যে, হৃদয়ের শুদ্ধতার উপর ঈমান নির্ভরশীল আর শুদ্ধ (উত্তম) কথার উপর হৃদয়ের শুদ্ধতা নির্ভরশীল। কুরআন বলে যে, একজন মানুষ তার মুখের কথার বিষয়ে সতর্ক না হলে সে এই দুনিয়ার জীবন এবং আখেরাতে বিপদের সম্মুখীন হবে। এখান থেকে এটা শিক্ষণীয় যে, মানুষের অন্যের প্রতি বেপরোয়া কথাবার্তা মারাত্মক শত্রুতার জন্ম দিতে পারে। রাসূল মুহাম্মদ (সা:) বলেন, "জিহ্বার ভুল পায়ের ভুলের চাইতেও ভয়াবহ।"

উত্তর : ৩. ভদ্রভাবে কথা বলার আদেশ কি শুধু মুসলমানদের মধ্যে কথোপকথনের জন্যই

ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অমুসলিমরা মুসলমানদের প্রতি সক্রিয় শত্রুতা প্রদর্শন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে মুসলিম প্রতিবেশীর মতই উত্তম আচরণ করতে হবে।

উত্তর : ৪. আক্রমণাত্মক ও বৈরী মনোভাবসম্পন্ন লোকের কথার জবাব মুসলিমরা কিভাবে দেবে?

ইসলাম মুসলমানদের এই পরামর্শই দেয় যে, দুটি বিবাদমান প্রতিপক্ষের মধ্যে শত্রুতা ও বিরোধ কমাতে হলে মন্দ কথার জবাব মন্দ কথা দিয়ে দেবার প্রবণতা ত্যাগ করা উচিত। বরঞ্চ মুসলমানদের উচিৎ শত্রুদের বৈরীতার জবাব বন্ধুত্ব দিয়ে দেয়া যাতে চূড়ান্তভাবে শত্রুতাকারী ব্যক্তির হৃদয় জয় করা যায়। কুরআন বলে যে, এই পন্থায় শত্রুতাসম্পন্ন লোকেরাও ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়। রাসূল (সা:) বলেন, "তুমি তোমার অর্থ ও সম্পদ দিয়ে সকল মন জয় করতে পারবে না কিন্তু দুটো জিনিস দিয়ে তোমরা সবার মন জয় করতে পারবে তা হচ্ছে সদাহাস্যময় মুখ ও সুন্দর ব্যবহার"। রাসূল (সা:) আরও বলেন যে, যদি কোন মুসলমান দেখে যে, তার কারো সাথে আলোচনা মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝি ও বিবাদের দিকে মোড় নিচ্ছে তখন যেন সে বিতর্ক বন্ধ করে নিজের কথার জন্য অগ্রিম ক্ষমা চায়।

উত্তর : ৫. বৈরীতার জবাবে নম্রতা প্রসঙ্গে ইসলাম

ইসলাম মুসলমানদের নতজানু হতে বলে না বরং তাদের বিনয়ী ও মর্যাদাবান হতে বলে। অবশ্য কোন অজ্ঞ, বদরাগী ও ক্রুদ্ধ ব্যক্তির অন্যায়, অশ্লীল কথার জবাব অন্যায় কথা দিয়ে দিতে গেলে মুসলমান বরং তার সম্মান হারাবে। এজন্যে এসব পরিস্থিতিতে নীরব থাকাই কল্যাণকর। যদিও এমন প্রতিটি পরিস্থিতিই অন্যগুলোর চেয়ে পৃথক। কাজেই

স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোন পন্থা অবলম্বন উত্তম সেটা মুসলমান নিজেই বিবেচনা করবে। তবে তাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, তার কথার মাধ্যমে যেন শত্রুতা-বৈরীতা কোনভাবে না বাড়ে। রাসূল (সা:) বলেন, "মুমিন লোক অন্যকে আঘাত করে না; অন্যের ক্ষতি করে না এবং অশ্লীল, কুৎসিত কথাবার্তা বলে না।"

উত্তর : ৬. তর্ক প্রিয় মানুষের সাথে আলাপচারিতায় সময় নষ্ট করা প্রসঙ্গে

যুক্তি, তর্ক শব্দের আরবী হচ্ছে 'জাদল', এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো অর্থই আছে। ইতিবাচক অর্থে এর দ্বারা বোঝায় এমন তর্ক বা যুক্তি যার পেছনে মহৎ উদ্দেশ্য আছে এবং যেখানে উভয় পক্ষই খোলামেলা সত্যের সন্ধানে উৎসুক। কুরআনে এমন তর্ককে উৎসাহিত করা হয়েছে। অবশ্য যুক্তির নামে ঐসব লোকের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়াকে (যারা সত্য থেকে তাদের মনের দুয়ার রুদ্ধ করেছে এবং তর্কের খাতিরেই তর্ক করে) ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। রাসূল (সা:) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, হেদায়েত প্রাপ্ত লোকেরাও অন্ধ, বাচাল, তর্ককারী লোকের সাথে অর্থহীন আলোচনায় জড়িয়ে পড়ে পথ হারাতে পারে।

উত্তর : ৭. গীবত

কুরআনে গীবত সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষকে তার কথার জন্য দায়ী করবেন। গীবত হচ্ছে কথার এমন অপব্যবহার যার জন্যে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে। কুরআন কারো নেপথ্যে তার নিন্দাবাদ করাকে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছে। যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সত্য হলেও 'গীবত' হবে। রাসূল (সা:) এর হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তিনি বলেন, "গীবত হচ্ছে কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে শুনলে ব্যথিত হতো"। যখন রাসূল (স:)-এর সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন যে, অনুপস্থিতিতে বলা কথা যদি সত্য হয় তাহলেও কি গীবত হবে। উত্তরে রাসূল (সা:) বললেন, "যদি (তার সম্পর্কে) তোমার বলা কথা সত্য হয় তবে তুমি শুধু গীবত করলে আর যদি তুমি (তার সম্পর্কে) মিথ্যা কথা বল তবে তুমি গীবত ও মিথ্যাচার এই দুই অভিযোগে অভিযুক্ত হবে।" ইসলাম গীবত সম্পর্কে এমন কঠোর অবস্থান নিয়েছে যাতে সমাজে মন্দ বিষয়ের বিস্তৃতি না ঘটে এবং অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যক্তিরা গীবত করে উদ্দেশ্য হাসিল করতে না পারে। যেমন মানুষ তার অপছন্দের ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে হেয় করার জন্য বা কাউকে খুশী করার জন্য বা নিছক হাসি-তামাশার বশে গীবতে লিপ্ত হয়, ইসলাম এসব বন্ধ করেছে। এছাড়াও ইসলাম মুসলমানদের একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, তারা যেন প্রত্যেক মানুষের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাকে উপলব্ধি করে। কাজেই কারো দুর্বলতা বা ভুল সম্পর্কে সমাজে জানাজানি

ও ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হলে তার পক্ষে নিজেকে সংশোধন আরও কঠিন হবে। বরং কাউকে সংশোধনের জন্য এটাই উত্তম সকলের অগোচরে তার দুর্বলতা নিয়ে তার সাথে আন্তরিকভাবে আলোচনা করা।

উত্তর : ৮. অন্যের দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা না করার বিধানের ব্যতিক্রম

ত্রয়োদশ শতকের প্রখ্যাত মুসলিম আইনবিদ নিম্নলিখিত কয়েকটি তালিকা দিয়েছেন যেসব ক্ষেত্রে অন্যের সম্পর্কে নেপথ্যে আলাপ করা যায়-

ক) মজলুম ব্যক্তির অধিকার আছে তার উপর জুলুমকারীদের সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার। বরং এটা মজলুমের জন্য বাঞ্ছনীয় সে যেন জুলুমকারীদের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে দেয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা জাতীয় পর্যায়ে যে, কোন স্বৈরশাসকের বিরোধিতা ইসলামে অনুমোদিত এবং ন্যায্য।

খ) কোন ব্যক্তি বা দলের তৎপরতা সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হলে বা তাদের দ্বারা সমাজে দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা গেলে তাদের সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে দেয়া বাঞ্ছনীয়।

গ) কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে আইনী পরামর্শ দরকার হলে সে সেই বিষয়ে আইনবিদ বা মুফতির সাথে বিস্তারিত আলাপ করতে পারে (যদি সে আলাপে অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ও জড়িত থাকে)

ঘ) বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে যার সাথে বিয়ের আলোচনা চলছে তার বিষয়ে বিস্তারিত খবর নেয়া যেতে পারে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৫৫:৪, ১৪:২৪
প্রশ্ন ২. আল কুরআন ২৩:৩, ৬:৬৮, ২:৮৩, ১৭:৫৩
প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ২৯:৪৬
প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৪১:৩৪, ২৫:৬৩, ২৮:৫৫
প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ১৬:৪৬
প্রশ্ন ৭. আল কুরআন ৪৯:১২, ২৪;১৯
প্রশ্ন ৮. আল কুরআন ৪:১৪৮

এফ-৩০ নৈতিক গুণ–মধ্যমপন্থা অবলম্বন ও দানশীলতা

প্রশ্ন ১. ইসলামী নীতিবিদ্যায় মধ্যমপন্থা বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

২. ইসলামে বাড়াবাড়ি বা বাহুল্য বলতে কি বোঝানো হয়েছে? বাড়াবাড়ির ধরনগুলো কি?

৩. বাড়াবাড়ি বর্জনের এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বনের উপকারিতা কি?

৪. কুরআন নৈতিক গুণ হিসেবে দানশীলতা প্রসঙ্গে কি আলোচনা করেছে?

৫. কোন কোন বিষয় মানুষকে আরও নি:স্বার্থ ও দানশীল করে?

৬. অত্যধিক দানশীলতা সম্পর্কে ইসলাম কি বলে (অবিবেচনাপ্রসূত)

উত্তর : ১. নৈতিক গুণ হিসেবে মধ্যমপন্থার অর্থ

ইসলাম মুমীনদের চাল চলনে ভারসাম্যপূর্ণ হতে বলে এবং এটা এমন এক পন্থা নির্দেশ করে যা মানুষকে মনেপ্রাণে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ করে। ইসলাম চরম দুনিয়াদার হতে যেমন নিরুৎসাহিত করে তেমনি বৈরাগ্যবাদী হয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেও নিষেধ করে। কুরআন বলে যে, চরম বস্তুবাদ মানুষকে পশুর পর্যায়ে নীত করে। যারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে এবং নফসের দাস হয়ে নিজের খেয়ালখুশীমতো চলে তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের পর্যায়ভুক্ত নয়। একই সাথে আবার কুরআন মানুষকে সতর্ক করে এই বলে যে, তারা যেন পার্থিব জীবনের সুখ ও সাচ্ছন্দ্যকে উপেক্ষা না করে। মানুষ আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্যে থেকে পৃথিবীতে তার নেয়ামত ভোগ করে সুখ লাভ করবে একই সাথে আখেরাতে মুক্তি অর্জন করবে। কুরআনে বর্ণিত একটি দোয়ায় এই ভাবধারা বিধৃত হয়েছে যা রাসূল (সা:) প্রায়ই পড়তেন। দোয়াটিতে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় সস্থানেই সুখ ও কল্যাণ চাওয়া হয়েছে। এভাবেই ইসলামে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থা অবলম্বনকেই আদর্শ করা হয়েছে। ঈমানদাররা যেনো মাত্রাতিরিক্ত বস্তুবাদী অথবা বৈরাগ্যবাদী না হয়।

উত্তর : ২. ইসলামের দৃষ্টিতে বাড়াবাড়ি ও বাহুল্য এবং তার ধরন

এ বিষয়ের আলোচনার পূর্বে দুটো বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। প্রথমত: মধ্যমপন্থা ও বাড়াবাড়ির মাঝে সবসময় কাটছাটভাবে পার্থক্য করা যায় না। কারণ স্থানীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যগুলো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয়ত: ইসলামী পরিভাষায় বাড়াবাড়ি বা মধ্যমপন্থার বিধান শুধু অনুমোদিত বিষয়গুলোর উপরই প্রযোজ্য।

মুসলমানদের বলা হয়েছে তারা যেন অনুমোদিত বিষয়ের যথেচ্ছ ব্যবহার না করে। কিন্তু নিষিদ্ধ বিষয় যেন কোনভাবে স্পর্শ না করে যদি তা অল্পমাত্রায়ও হয়।

বাড়াবাড়ির কয়েকটি ধরন নিম্নরূপ-

ক) অতিভোজন ॥ অতিভোজনের নিন্দা করে রাসূল (সা:) বলেছেন, "পাকস্থলী পরিপূর্ণ করা সবচেয়ে নিন্দনীয়।"

খ) পোশাকের বাহুল্য ॥ কিছু মানুষ ফ্যাশনের দাসে পরিণত হয়। আর সেসব মানুষের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো শত শত কোটি পাউন্ড হাতিয়ে নেয়। মানুষ এভাবেই তাদের প্রয়োজনের চাইতে বেশী কিনতে উৎসাহী হয়। ইসলাম রুচিশীল, সুন্দর পোশাক পরতে কখনও নিষেধ করে না। কিন্তু ইসলাম পোশাক নিয়ে বাহুল্য করতে নিষেধ করে।

গ) বিলাসবহুল প্রসাধনীর ব্যবহার ॥ বাড়ীতে বা বাইরে প্রসাধনী বা মেক-আপের অত্যধিক ব্যবহার অর্থের অপচয় ঘটায়। এই অর্থ যৌক্তিক প্রয়োজনে ব্যয় করা যেতো। রাসূল (সা:) মুসলমানদের যে, কোন ধরনের বিলাসিতা প্রদর্শন করতে নিরুৎসাহিত করেছেন (স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সামগ্রীর ব্যবহারসহ)।

ঘ) খেলার নেশা, কাজের নেশা এবং এধরনের যে, কোন অভ্যাসের মাত্রাধিক্য মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বা অন্যদের সাথে সম্পর্ককে ব্যহত করে। ইসলামে বৈধ বা অনুমোদিত বিষয়েরও মাত্রাতিরিক্ত অভ্যেস নিষিদ্ধ।

উত্তর : ৩. মধ্যমপন্থা গ্রহণের ও বাড়াবাড়ি বর্জনের সুফল

ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যমপন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেয় যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুখী জীবনযাপন করতে পারে। বস্তুত: জীবনে নানা রকম উত্থান-পতন ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এসব পরীক্ষায় সফল হয়ে আল্লাহর পথে জীবনকে চালিত করতে হলে সাময়িক আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে জীবনের উদ্দেশ্যকে ভুলে গেলে চলবে না। এজন্যেই ইসলাম মুসলমানদের জীবনের সব ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়। ফলে তাদের মন-প্রাণ এমনভাবে তৈরী হবে যে, তারা জীবনকে উপভোগ করবে কিন্তু বাড়াবাড়ি করবে না। স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ উপভোগ করবে কিন্তু গর্ব-অহংকার করবে না। তারা বিনম্র হবে কিন্তু নতজানু হবে না। আজ থেকে ১৪০০ বছরেরও বেশী আগে রাসূল (সা:) এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, "আমি শংকিত এই ভেবে যে, একদিন পৃথিবী তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হবে (অর্থাৎ পৃথিবীর সম্পদ মানুষ উন্মোচন করবে) তখন তোমরা তা অর্জনের জন্য অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে নিজেদের ধ্বংস করবে যেভাবে এই বস্তুবাদ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংস করেছে"। বর্তমানে মুসলিম বলে দাবীদার সম্পদশালীদের স্বেচ্ছাচারীতা

আর ভোগবিলাস দেখলে রাসূলের এই শংকার যথার্থতা বোঝা যায়। মধ্যমপন্থা ও মিতব্যয়িতা শুধু যে, তার অনুসারীদের যে, কোন সমস্যার মাঝে টিকে থাকতে শেখায় শুধু তাই নয় বরং এটা মানুষকে অন্যের সমস্যায় সাহায্য করতেও অনুপ্রাণিত করে। চরম ভোগবাদী যারা জীবনের ও জগতের সব আনন্দ লুটে নিতে মত্ত তারা সাধারণত: বঞ্চিত ও দরিদ্রদের সেবায় কিছুই করে না। বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারীরাই বঞ্চিতদের সহায়তায় এগিয়ে আসে।

উত্তর : ৪. নৈতিক গুণ হিসেবে দানশীলতা প্রসঙ্গে কুরআন

কুরআন এটাই বলে যে, এ পৃথিবীতে আমাদের কাছে যেসব সম্পদ আছে তার একচ্ছত্র মালিকানা আমাদের নয়। আমাদের জীবন এবং এর সকল সম্পদের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ। এই সম্পদ আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া আমানত। আল্লাহর দেয়া এই সম্পদ যথাযথভাবে ব্যয় করবার জন্য কুরআন বলে যে, প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে গরীব এবং অসহায়ের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা যা তাদের অধিকার। বস্তুত: দানশীলতা মানুষকে স্বার্থপরতা থেকে রক্ষা করে তাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে। দানশীলতার মাধ্যমে ক্ষমা ও দয়ার মত অন্যান্য গুণ তৈরী হয়। ইসলামে দানশীলতা বলতে শুধু দরিদ্রদের অর্থ প্রদানকেই বোঝায় না। বরং ইসলামে দানশীলতার বহুমাত্রিকতা রয়েছে।

রাসূল (সা:) বলেন, মানুষের সাথে সুন্দর কথা, উত্তম ব্যবহার ও সহাস্য মুখও দানশীলতার বহি:প্রকাশ। এছাড়াও শুধু যে, দরিদ্রদের প্রতিই দয়ালু ও দানশীল হতে হবে তাই নয় বরং বাড়ীতে আগত অতিথিদের প্রতিও আন্তরিক হতে হবে। এ বিষয়ে রাসূলের অনেক হাদীস রয়েছে।

উত্তর : ৫. যেসব বিষয় মানুষকে নি:স্বার্থ ও দানশীল করে

দুটো বিষয় মানুষকে আরও নি:স্বার্থ করে। এর মাঝে একটি হচ্ছে সম্পদ ব্যয়ের সময় মানুষ যে, আল্লাহর খলিফা এবং তাঁর পক্ষ থেকে এই সম্পদের জিম্মাদার মাত্র একথা দৃঢ়ভাবে মনে রাখা। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে সবসময় এটা মনে রাখা যে, জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং কেউ তার সম্পদ নিয়ে কবরে যেতে পারবে না। মানুষের যা স্থায়ী হয় তা হচ্ছে তার সৎকাজ এবং আল্লাহর পথে কৃত দান। শয়তান মানুষকে এই কুমন্ত্রণা দিয়ে দান থেকে দূরে রাখতে চায় যে, দান করলে মানুষের সম্পদ কমে যাবে। পক্ষান্তরে কুরআনে আল্লাহ দানকারীদের জন্য বিশাল প্রতিদান ও পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন, রাসূল (সা:) ও এই কথা বলেছেন।

উত্তর : ৬. অবিবেচনাপ্রসূত দানশীলতা প্রসঙ্গে ইসলাম

রাসূল (সা:) দানশীলতার কয়েকটি সীমা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন কেউ যেন তার সমুদয় সম্পদ দান না করে। তিনি আরও বলেছেন, "উত্তম দান

হচ্ছে তাই যা নিজের প্রয়োজন পূরণের পর করা হয়"। তাঁর ভাষায় "দান শুরু হয় বাড়ীতে, পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণ ও আত্মীয়দের দান করার মাধ্যমে।"

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ৪৭:১২, ২:১০২

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৭:৩১

প্রশ্ন ৩. রাসূল (সা:) বলেন, শেষ জমানায় এমন কিছু লোক আসবে যারা নিজেদের আমার উম্মত বলে দাবি করবে কিন্তু তারা সব ধরনের দামী খাবার খাবে, সব ধরনের পানীয় পান করবে, সব জাতীয় (মূল্যবান) পোশাক পরবে, গর্ব ও অহমিকার সাথে কথা বলবে, এবং এরা হবে সবচাইতে নিকৃষ্ট মানুষ।

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ১৭:২৬, ৫৯:৯

রাসূল (সা:) এর একজন সাহাবার জীবনে দানশীলতার এক অনুপম উদাহরণ দেখা যায়। একরাতে তিনি তাঁর বাড়ীতে একজন মুসাফির মেহমানকে আপ্যায়ন করার জন্য নিয়ে আসেন। সেদিন তাঁর ঘরে একজনের পরিতৃপ্তির সাথে খাবার মত খাদ্য ছিল। এ অবস্থায় মেহমান যাতে নির্দ্বিধায় পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে খাবার খান সেজন্যে তিনি ও তাঁর স্ত্রী না খেয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর স্ত্রী খাবার পরিবেশন করেই বাতি নিভিয়ে দেন অন্ধকারে সাহাবী খাবার ভান করেন। এদিকে মেহমান পুরো খাবার খেয়ে নেন। অভুক্ত অবস্থায় সাহাবী এবং তার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েন। স্বয়ং আল্লাহ এই ঘটনায় সন্তুষ্ট হয়ে রাসূলের কাছে কুরআনের ৫৯ নং সূরার ৯ নং আয়াত নাযিল করেন।

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ১৬:৯৬, ২:২৬৮, ৫৭:১৮

একদিন রাসূল (সা:)-এর বাসায় কিছু দুম্বার গোশত ছিল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে সেই গোশত বিতরণ করতে বলেন। তারপর রাসূল (সা:) বাসায় এসে যখন জানতে চান যে, দুম্বার গোশতের কিছু কি অবশিষ্ট আছে। তখন তাঁর স্ত্রী বলেন যে, শুধুমাত্র কাঁধের গোশত ছাড়া আর সব বিতরণ হয়ে গিয়েছে। তখন রাসূল (সা:) বলেন "না, শুধু কাঁধই গিয়েছে, বাকীটা আছে।" এখানে দানের বিপরীতে আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্য প্রতিদান ও পুরস্কারের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬. রাসূল (সা:) বলেন, আল্লাহ এমন ব্যক্তির দান কবুল করবেন না যার দরিদ্র এবং সাহায্যপ্রার্থী আত্মীয় (বিশেষভাবে পিতা-মাতা) আছে।

ইসলামী শিক্ষা সিরিজ

৩য় খণ্ড

ইসলামের সামাজিক বিধান

সূচি

জি-১ মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা (১)

প্রশ্ন ১. এই কোর্সের পূর্বের সিরিজ সমূহের সাথে মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার সম্পর্ক কি?

২. ইসলামের সামাজিক বিধানের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিন?

৩. প্রায় সব ধর্ম বিশ্বাসেই মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে এসেছে, এক্ষেত্রে ইসলামের পৃথক কোনো বিশেষত্ব আছে কি?

৪. মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বিষয়টি কিভাবে ঈমান ও আকীদার সাথে সম্পর্কিত?

৫. ইসলামের নৈতিক বিধান কিভাবে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের সাথে সম্পর্কিত?

৬. আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:)-এর কাহিনী কুরআনে কিভাবে বর্ণিত হয়েছে? এক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনার সাথে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার কোনো পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : ১. বর্তমান প্রসঙ্গ ও পূর্ববর্তী সিরিজ সমূহের সম্পর্ক

ইসলামী শিক্ষা সিরিজের প্রথম পাঁচটি পর্ব মূলত: তাওহীদ, রেসালত ও প্রথাগত ইবাদত (Worship)-এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ পর্বে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, অন্যান্য ধর্মের মতো কিছু আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। এই দ্বীন বা জীবন-ব্যবস্থায় নির্দেশনা রয়েছে বিশ্বাস (ঈমান) ও ইবাদত (Worship) সংক্রান্ত বিষয়ে, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক সহ মানব জীবনের সব বিষয়ে। কাজেই আগের সিরিজগুলোর ধারাবাহিকতাই বর্তমান সিরিজ।

উত্তর : ২. ইসলামের সামাজিক বিধানের প্রধান ক্ষেত্রগুলো

ইসলামের সামাজিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে আমরা দু'টো প্রধান ভাগে আলোচনা করতে পারি :

ক) আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ইসলামের বিশ্বাস, নৈতিক শিক্ষা ও মূলনীতিসমূহ সমাজ জীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারে। এসব বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষার মধ্যে নিহিত আছে মানুষের মাঝে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচালনা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতিসমূহ।

খ) পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে ইসলামী বিধানের আলোচনার মাধ্যমেও আমরা ইসলামের সামাজিক নীতির ধারণা পেতে পারি। কারণ পরিবারই হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক ইউনিট।

উত্তর : ৩. মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা সম্পর্কে ইসলামী বিধানের বিশেষত্ব

মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা সম্পর্কে ইসলাম ও অন্যান্য মতাদর্শের মাঝে প্রধান সামঞ্জস্য হচ্ছে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্বাস। ওহী প্রাপ্ত ধর্ম-বিশ্বাসীগণ। (খ্রিস্টান, ইহুদী, মুসলমান) মনে করেন যে, মানুষের উৎপত্তি আদম (আ:) এবং বিবি হাওয়া (আ:) থেকে। যারা এর বিপক্ষে বলেন (বিবর্তনবাদীগণ), তাদের মতো হলো মানুষ বানর বা অন্য প্রাণীর উন্নত সংস্করণ। মুসলিমরা এ ধারণায় দীক্ষিত যে, সকল মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। এ ক্ষেত্রে মানবতাবাদ বিষয়ে ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মমতের পার্থক্য নিম্নরূপ :

ক) প্রাচ্যের প্রাচীন ধর্মের ন্যায় ইসলাম এটা সমর্থন করে না যে, মানুষকে বিভিন্ন বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত করে জন্ম দেয়া হয়েছে। বরং ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে প্রত্যেক মানুষকেই আল্লাহ মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করে তৈরি করেছেন।

খ) দ্বিতীয়ত: ইসলাম এ ধারণা দেয় যে আল্লাহ কেবল কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতির প্রভু নন। তিনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন (জগৎসমূহের প্রভু) এবং রাব্বুন নাস (সমগ্র মানবজাতির প্রভু)। এখানেই ইসলামী মানবতার বিশ্বজনীনতা।

গ) অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:)-এর কাহিনী নেহায়েৎ গল্পের মতই বর্ণিত হয়েছে। তাতে শিক্ষণীয় তেমন কিছু নেই। অথচ কুরআনে তাঁদের ঘটনাগুলো এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির একই উৎস থেকে সৃষ্ট হবার এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা জন্ম নেয়।

উত্তর : ৪. মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা ইসলামের ঈমান ও আকীদার সাথে সম্পৃক্ত

তৌহিদ তথা একত্ববাদই ইসলামের সারকথা। একক সত্ত্বা আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং পালনকর্তা। এই ধারণা থেকেই তাঁর সৃষ্ট মানবজাতির মধ্যে সমতা, একতা, ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা সৃষ্টি হয়। কারণ একই স্রষ্টা সকল মানুষ (তা সে সাদা. কালো, নর বা নারী যেই হোক সকলকেই) সৃষ্টি করেছেন। সবাই সেই একক প্রভুরই বান্দা। অন্যদিকে যদি আল্লাহর ক্ষমতা ও আধিপত্যের এক বা একের অধিক শরীক থাকত তাহলে মানুষের সমতা ও ভ্রাতৃত্ব সম্ভব হতো না। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও একতার ক্ষেত্রে একত্ববাদ (তৌহিদ) অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ভূমিকার দাবিদার।

শুধু একত্ববাদই নয়, ইসলাম আরও শিক্ষা দেয় যে আদম (আ:) থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত নবী রাসূল যেমন, নূহ (আ:), ঈসা (আ:), মুসা (আ:), মুহাম্মদ (সা:)

প্রত্যেকেই ছিলেন পরস্পর ভাইয়ের মত। তাঁরা সবাই ছিলেন মানব জীবনের জন্য আদর্শ স্বরূপ। তাঁদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল স্ব-স্ব উম্মতদের পথপ্রদর্শক রূপে। তাঁরা সবাই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মানুষের কাছে প্রচার করেছিলেন :

ক) আল্লাহর উপর ঈমান সংক্রান্ত জ্ঞান।

খ) আত্মজ্ঞান– পৃথিবীতে আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

গ) জীবন পরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান।

ইসলামের এ শিক্ষা থেকে এটা নিশ্চিত হয় যে, যারা এ সব নবী ও রাসূলগণের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন ও তাদের অনুসরণ করেন তারা সবাই একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

উত্তর : ৫. ইসলামের নৈতিক বিধান এবং মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা

ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা নয়। বরং জীবনের সমস্ত দিক একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিক বিধান, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন এগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই মানব ভ্রাতৃত্ব ও একতা সম্পর্কিত ইসলামের শিক্ষা নৈতিক শিক্ষার উপরই ভিত্তি করে গঠিত। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তিগতভাবে মদ্যপান, জুয়াখেলা, ব্যভিচার, সুদ গ্রহণ ইত্যাদি নিষেধ করে। এই নিষেধাজ্ঞার একটা সামাজিক সুফলও আছে। কারণ যারা এসব কাজ করে তারা শুধু তাদের নিজেদের ক্ষতিই করছে না বরং সমাজেও এর কুপ্রভাব পড়ছে। একইভাবে ইসলাম যে নৈতিক গুণাবলীর কথা অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সুখের জন্যই নয় বরং সমষ্টিগত সামাজিক কল্যাণের জন্যও বটে। সমাজে মানুষ যদি দায়িত্বশীলতা, ক্ষমা, সহানুভূতি এসব গুণের চর্চা করত এবং বিশ্বাসী হতো তাহলে সমাজে তার সুফল পরিলক্ষিত হত। একইভাবে এ গুণগুলোর অনুপস্থিতি সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

উত্তর : ৬. আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:)-এর কাহিনী কুরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে

কুরআনে বর্ণিত আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:)-এর কাহিনী ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বিধানের ভিত্তি প্রদান করেছে। সমগ্র কুরআনের মূলভাবের একটা অংশ হলো এ কাহিনী। এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়গুলো হলো :

ক) কুরআন আদি পাপের দোষ শুধুমাত্র বিবি হাওয়া (আ:)-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় নি। আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:) উভয়কেই সমভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য ও শয়তানের প্ররোচনায় পড়ার জন্য দোষারোপ করা

হয়েছে। সমতা ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে এ ঘটনার বিশেষ ব্যঞ্জনা রয়েছে। কারণ মানুষের অধ:গমনের জন্য শুধু মানবজাতির একটা অংশকে (মহিলা) দোষী করা হয়নি, যা বাইবেলে লক্ষ্য করা যায়। এভাবে আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:)-এর কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন পুরুষ ও নারীর সমতার বিষয়টিকে তুলে ধরেছে।

খ) কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায় আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা পান। এ ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে ইসলামে আদি পাপ বলতে কোনো কথা নেই। যেমন কোনো কোনো ধর্মে ধারণা করা হয় যে, মানবজাতির আদি পাপ হাওয়া (আ:) করেছিলেন যার শাস্তি স্বরূপ মানুষ দুনিয়াতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কোরআন থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ নিছক শাস্তিস্বরূপ মানুষকে এই পৃথিবীতে পাঠাননি। বরং আল্লাহর খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে আল্লাহর মিশন সফল করতে প্রেরিত হয়েছেন।

এভাবেই আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:)-এর কাহিনী আনুগত্য ও আনুগত্যহীনতার পরিণতির প্রতীকী বর্ণনা হিসেবে এসেছে। সাথে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং তিনি মানুষকে উত্তম সৃষ্টি হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাদেরকে এ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য নির্দেশনা সহ প্রেরণ করেছেন। এভাবে আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান এবং লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, গোত্র ও জন্ম পরিচয়-এর উর্ধ্বে তারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

সূত্র :

প্রশ্ন : ৬ আল কুরআন - ২০:১২২

জি-২ মানব ভ্রাতৃত্ব এবং সমতা (২)

প্রশ্ন ১. কুরআনে আদম (আ:) এবং বিবি হাওয়া (আ:)-এর কাহিনী কিভাবে বর্ণিত হয়েছে? এই বর্ণনার সাথে মানব ভ্রাতৃত্ব এবং সমতার বিষয়টি কতটুকু সংযুক্ত?

২. মানব ভ্রাতৃত্ব এবং সমতার বিষয়ে কুরআনে সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্ধৃতি আছে কি?

৩. সমতার এই মৌলিক কাঠামোতে মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষকে পৃথক করার কোনো মানদণ্ড ইসলামে আছে কি?

উত্তর : ১. আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:) সংক্রান্ত কুরআনের কাহিনীর সাথে মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার সম্পর্ক

আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:)-এর প্রসঙ্গ কুরআনের বেশ কয়েক জায়গায় এসেছে। সূরা বাকারার ২৮ থেকে ৩৮ আয়াতে বিস্তৃতভাবে পুরো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম মানব-মানবীর ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে :

ক) আল্লাহ মানুষ তৈরির আগেই পৃথিবী তৈরি করেছেন এবং এতে মানুষের স্বচ্ছন্দ অবস্থানের পরিবেশ ও উপাদান নিশ্চিত করেছেন। কাজেই পৃথিবীতে মানুষের আগমন আল্লাহর পূর্ব পরিকল্পিত ইচ্ছা। এটা কারো কোনো পাপের ফল নয়।

খ) যখন আল্লাহ সকল ফেরেশতাদের ডেকে বললেন যে, তিনি দুনিয়াতে তাঁর খলিফা (দূত, প্রতিনিধি) প্রেরণ করতে চান তখন ফেরেশতারা শঙ্কা প্রকাশ করল যে, এরা হয়ত: দুনিয়াতে অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত হবে। এখন প্রশ্ন হল ফেরেশতারা পূর্ব থেকেই এমন ধারণা কেন করল। এর একটা উত্তর হতে পারে এই যে, ফেরেশতারা যখন জানল মানুষকে মাটি থেকে তৈরি করা হবে তখন তারা ধারণা করল পার্থিব পাপের কবলে তারা পড়তে পারে। প্রথম মানব-মানবী মাটি থেকে তৈরি হয়েছেন এবং তাদের থেকেই সমগ্র মানবজাতির সৃষ্টি। সেহেতু এই মানবকূল-এর মধ্যে কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা কেউ অতি মানব এমন দাবি করা অবান্তর।

গ) যখন ফেরেশতারা মানুষের সম্ভাব্য অবাধ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন তখন আল্লাহ বলেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না, যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ

মানুষকে সেই জ্ঞান দিয়েছেন যা ফেরেশতাদের দেন নি। কুরআনের মতে এ জ্ঞান হচ্ছে পৃথিবীর সব বস্তুর নাম, আল্লাহ্‌র বিধান বোঝার ও পালন করার যোগ্যতা এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য করার সামর্থ্য। হক অথবা বাতিল যে কোনো পন্থা গ্রহণের স্বাধীনতাও মানুষকে দেয়া হয়েছে। এসব জ্ঞানের ব্যাপারেও কোনো মানুষেরই অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার কোনো সুযোগ নেই।

ঘ) আল্লাহ্‌ কর্তৃক ফেরেশতাদের আদম (আ:)-কে সেজদা দানের (সম্মান প্রদর্শনের) আদেশের মধ্যে সার্বিকভাবে সমগ্র মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বিষয়টিই নিশ্চিত হয়েছে।

ঙ) এসব আয়াতের মাধ্যমে জাতীয়তা, লিঙ্গ বা অন্যান্য ভিত্তিতে মানুষের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিটি বাতিল প্রমাণিত হয়। আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:)-এর কাহিনী এই শিক্ষাই দেয় যে, সকল মানুষের উৎপত্তি স্থল একই এবং একই মিশন সাধনের জন্য তাদের পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। তাদের সবাই সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আবার তাদের সবাই শয়তানের প্ররোচনায়ও পড়তে পারে। এক্ষেত্রে কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়।

উত্তর : ২. মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বিষয়ে কুরআনের সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতি

কুরআনে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতির মাধ্যমে মানব জাতির মধ্যকার সাম্যের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত: মানুষকে সম্বোধন করার ব্যাপারে কুরআনে সাধারণত *'ইয়া আইয়ুহাননাস'* (হে মানবজাতি) এই বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মানুষের মাঝে সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, মুসলিম ও অমুসলিম কোনো ভেদ করা হয়নি। আল্লাহ সবাইকে সমভাবে সম্বোধন করেছেন। এ ধরনের সম্বোধন এই ধারণারই জন্ম দেয় যে, একই স্রষ্টা সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত: সূরা বাকারার ১৬৮ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহে সকল মানুষের সমান ভোগাধিকার রয়েছে।

তৃতীয়ত: কুরআন নর ও নারী উভয়ের সমান মর্যাদা ঘোষণা করে মায়ের বিশেষ সম্মান দিয়েছে। কুরআন স্পষ্টভাবে নর ও নারীর একক উৎসস্থলের কথা বর্ণনা করে উভয়ের সমঅধিকারের কথা বলেছে। সর্বশেষে বলা যায় কুরআনে বার বার সকল মানুষকে শেষ বিচারের দিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার কথা বলেছে। কেউ সেদিন বিচার-এর উর্ধ্বে থাকবে না। এটাও মানব সাম্যেরই ঘোষণা দেয়।

উত্তর : ৩. মানুষের মর্যাদা বিষয়ক কুরআনের মানদন্ড

এটা স্পষ্টভাবেই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক এবং মানবিক মানদন্ডে সকল মানুষই এক। রং, জাতীয়তা, গোত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু ভাল আর মন্দ কখনই এক হতে পারে না। এজন্যই ইসলামের ভাল আর মন্দের ভিত্তিতে মানুষকে মর্যাদা দেবার এক অনুপম মানদন্ড দেয়া হয়েছে।

"(আল্লাহর দৃষ্টিতে) তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে বেশী তাকওয়া সম্পন্ন (সৎকর্মশীল)।"

অর্থাৎ আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষকে পৃথক করার একমাত্র মানদন্ড হচ্ছে সততা এবং খোদাভীতি (আরবীতে তাকওয়া)। তাকওয়া বলতে ব্যাপক অর্থে সকল ভাল কিছুকেই বুঝায়। এ সততা মানে বিশ্বাসের সততা, নৈতিকতায় উত্তম এবং অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় উত্তম হওয়া। কুরআনে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করে সৃষ্টি করেছেন 'যেন তারা পরস্পরকে জানতে পারে'। এক্ষেত্রে বাইবেলে বর্ণিত মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করার কারণটি তুলনা করে দেখা যেতে পারে। বাইবেল বলে যে, আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও ভাষায় ভাগ করেছেন, এই ভয়ে যে নচেৎ তারা খুব ক্ষমতাশালী হয়ে যাবে। (বাবেল টাওয়ার নির্মাণ কাহিনী প্রসঙ্গ) অথচ কুরআনে এই ভেদটি একটি নেয়ামত হিসেবে এসেছে যাতে মানব বৈচিত্র পূর্ণতা পেতে পারে বিভিন্ন ভাষাগোত্র ও জাতীয়তার সম্মিলনে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ২:২৮-৩৮, ৩৮:৭১, ৭:১১

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ২:২১ ২:১৬৮, ৪:১-২, ১৯:৯৩-৯৫

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ৪৯:১৩, ৩০:২২

জি-৩ মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা (৩)

প্রশ্ন ১. মানব ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে রাসূল মুহাম্মদ (সা:)-এর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?

২. ইসলামে বর্ণিত সমঅধিকার অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবার কোনো উদাহরণ আছে কি?

৩. যদিও কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করেছে কিন্তু তবুও বেশ কয়েক জায়গায় বিশেষভাবে মুসলিম বা বিশ্বাসীদের সম্বোধন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এমন ধারণার উদ্রেক হতে পারে কি যে কুরআনে মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার ধারণা উপেক্ষিত হয়েছে?

৪. যারা মুসলমানদেরকে জন্মগত মুসলিম, নওমুসলিম (ইসলাম গ্রহণকারী) অথবা পিতা মুসলিম হবার সুবাদে মুসলিম এমনভাবে ভাগ করতে চায় তার সমর্থনে ইসলামে কোনো যুক্তি আছে কি?

উত্তর : ১. মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা বিষয়ে রাসূলের (সা:) দৃষ্টিভঙ্গি

মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বিষয়ে রাসূল (সা:)-এর দৃষ্টিভঙ্গি সকল ক্ষেত্রেই পরিষ্কার। যথা :

ক) যে সময়টাতে চার্চ নিজে খোদায়ী কালামের একক ব্যাখ্যাদাতা ছিল এবং তারা নিজেদেরকে আল্লাহর মুখপাত্র হিসেবে দাবি করত সে সময় মুহাম্মদ (সা:) শেখালেন যে, যদিও আলেমরা সম্মানিত ব্যক্তি; কিন্তু তাদের কথা খোদায়ী কথার সমতুল্য হতে পারে না। সেজন্যে ইসলামে চার্চের মতো কোনো ইনস্টিটিউট নেই। রাসূল (সা:) এটা নিশ্চিত করেছেন যে, ধর্মে সাধারণ জনগণের উপর প্রাধান্য প্রদানকারী এমন জনগোষ্ঠী নেই।

খ) তিনি আরও শিখিয়েছেন যে, নবী রাসূলগণ সহ সকল মানুষই সমান। তিনি তাঁকে পূজা করতে নিষেধ করতেন।

গ) তিনি শিখিয়েছেন যে, সব মানুষ সমান বিধায় কোনো মানুষ কোনো মানুষকে সেজদা করতে বা তার কাছে মাথা নত করতে পারবে না। শুধু আল্লাহর কাছেই মানুষ মাথা নত করবে।

ঘ) তিনি যখন কোনো সভা সমাবেশে যোগ দিতেন তখন সামনে আসন নেবার জন্য লোকজনকে ঠেলাঠেলি না করে নিকটতম জায়গায় বসে পড়তেন। তিনি বর্ণ, গোত্র, পোশাক, সম্পদ এসবের বিবেচনায় মানুষকে ভাগ করার বিরুদ্ধে বলতেন। মানব সমতার বিষয়ে শেষ বাণী পাওয়া যায় তাঁর বিদায় হজ্জের

ভাষণে –"হে মানবজাতি তোমাদের আল্লাহ এক, পিতা এক, সুতরাং কোনো অনারবের উপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শুধু খোদাভীতির ভিত্তিতেই তোমাদের মর্যাদার পার্থক্য হতে পারে।" এটা লক্ষ্য করার মতো যে, প্রথম যাঁরা রাসূল (সা:)-এর দাওয়াত কবুল করে মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান এবং জাতীয়তা থেকে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর (রা:) যিনি আরবের একজন বিশিষ্ট ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বিল্লাল (রা:) ছিলেন একজন নিগ্রো ক্রীতদাস, শুহাইব (রা:) ছিলেন রোমান, সালমান (রা:) ছিলেন পার্শী। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সবাই সম ভ্রাতৃত্বের অংশীদার হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো কোনো কুরাইশ নেতা রাসূল (সা:) কে বলতেন যে, আমরা তোমার দ্বীন কবুল করতাম যদি গরীব এবং নীচ ব্যক্তিরা এটা কবুল না করত। তাদের এই কথার জবাবে রাসূল (সা:) বলতেন, "হে আল্লাহ আমি যেন দরিদ্র হিসেবেই জীবন ধারণ করি, মৃত্যুবরণ করি এবং হাশরের দিনে দরিদ্রদের সাথেই অবস্থান করি।"

উত্তর : ২. সমঅধিকার অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে কি?

কুরআনে এবং রাসূল (সা:)-এর জীবনে অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও সমঅধিকার দেবার প্রমাণ আছে। কুরআনে দুর্ঘটনাবশতঃ কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে যে ক্ষতিপূরণ দেবার বিধান রয়েছে তা মুসলিম অমুসলিম উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কুরআন এবং হাদীসে মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের জানমাল ইজ্জতের মর্যাদা মুসলিম নাগরিকের মতই সমভাবে দেয়া হয়েছে।

রাসূল (সা:) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে আঘাত করে সে যেন আমাকেই আঘাত করে।"

প্রথম দিকের মুসলিম শাসকরা রাসূল (সা:)-এর এই আদেশ বুঝতেন এবং যথাযথভাবে পালন করতেন। আবু ইউসূফ প্রণীত 'খারাজ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানরত ইহুদী, খ্রিস্টানসহ সবার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। এসব প্রমাণাদির আলোকে ওইসব মনীষী (যেমন, প্রফেসর ডাব্লিউ সি স্মিথ), যারা বলেন ইসলামে অমুসলিমের মর্যাদা রক্ষার কোনো নির্দেশনা নেই তাদের কথা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। ইসলামে মুসলিম অমুসলিম সুসম্পর্ক ও সমঅধিকার রক্ষার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

উত্তর : ৩. যেসব ক্ষেত্রে কুরআন শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের সম্বোধন করেছেন তার ব্যাখ্যা

যদিও ইসলাম সকল মানবকে একসাথেই বলেছে আল্লাহর আনুগত্য করার কথা কিন্তু তবুও কখনো কখনো শুধু বিশ্বাসীদের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের বিশেষ কাজ যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুমীনদের ভ্রাতৃত্ব প্রকৃত অর্থে মানব ভ্রাতৃত্বের কোনো বিকল্প বা প্রতিপক্ষ নয় বরং এটা ব্যাপকভাবে মানব ভ্রাতৃত্বের সীমার মধ্যেই বিশেষভাবে মুমীনদের জন্য প্রযোজ্য। তার উপর ইসলাম মুসলমানদেরকে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা ও সম্মান প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। মুসলিম অমুসলিম উভয়ের স্বার্থ ব্যবহারের জন্য একক নৈতিক বিধান ইসলামে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে এক খোদা, এক শেষ নবী, এক কিতাব এবং আখেরাতে বিশ্বাসীদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলাম শিক্ষা দেয় সহনশীলতার। এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ চাইলে গোটা মানব সমাজকে এক জাতিতে পরিণত করতেন।

উত্তর : ৪. জন্মগত মুসলমান, নওমুসলিম এবং পিতা অথবা মাতা মুসলিম হবার সুবাদে মুসলমান-এমন বিভক্তির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

সকল মানুষই জন্ম নেয় মুসলিম হিসেবে। সকল শিশু আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের (ফিতরা) অঙ্গীকার নিয়েই জন্ম নেয়। এই সুবাদে সব শিশুই মুসলিম। যখন একজন ব্যক্তি তার পিতা মাতার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে তখন প্রকৃতপক্ষে সে তার মূল ধর্মেই ফিরে আসে। কাজেই জন্মগত মুসলমান, নওমুসলিম আর পিতা অথবা মাতার মুসলিম হবার সুবাদে মুসলিম-এমন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মুসলমানদের ভাগ করা ইসলাম সম্মত নয়। বিশ্বাস হচ্ছে বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে। কোনো মুসলমানকে কাফের ঘোষণার অধিকার কারো নেই। কেউ এ ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে বাধা দেবার অধিকারও কারো নেই।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : রাসূল (সা:) বলেন, "যে কেউ তার জন্য মানুষকে অপেক্ষমান রেখে গৌরববোধ করে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।" তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ তোমাদের চেহারার সৌন্দর্য, পোশাক, শক্তি, সম্পদ কিছুই দেখেন না। তিনি তোমাদের হৃদয়কে দেখেন। যার হৃদয় ধার্মিক আল্লাহ তাকেই দয়া করেন। তোমরা সবাই আদম (আ:)-এর সন্তান। তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে বেশি তাকওয়াসম্পন্ন।"

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ১৮:২৮

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ৪:৯২

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ২:২৫৬, ৩:৭৫, ১০:১৯

প্রশ্ন ৪ : আল কুরআন ৩০:৩০, ৯:১১

জি-৪ ইসলামের ভ্রাতৃত্ব

প্রশ্ন ১. আরবী ভাষী মুসলমানদের অনান্য ভাষাভাষীদের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আছে কি?

পবিত্র ভূমি ও মদীনার আশে-পাশের বাসিন্দাদের কোনো বিশেষ মর্যাদা আছে কি?

২. উম্মাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এবং এটা 'জাতি' শব্দের প্রচলিত ধারণা থেকে পৃথক কিভাবে?

৩. ইসলামের ভ্রাতৃত্ব (brotherhood· oPfJ faith) বা উম্মাহর ধারণা সময়ের এবং ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে কিভাবে?

৪. রক্তের সম্পর্ক কি ইসলামের ভ্রাতৃত্বের উপরে স্থান পায়?

৫. ইসলামের ভ্রাতৃত্বকেই সবার আগে স্থান দিয়েছে এমন কোনো মানব সমাজের উদাহরণ আছে কি?

উত্তর : ১. আরবী ভাষী হওয়ার বা পবিত্র মক্কা ও মদীনার আশে-পাশের অধিবাসী হবার মধ্যে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষ মর্যাদা আছে কি?

যদিও আরবী জানার মধ্যে সুস্পষ্ট কল্যাণ নিহিত আছে কারণ এ ভাষাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে, তবুও এমন ধারণা ভুল যে, কোনো মুসলমান যিনি আরবী জানেন না তিনি আরবীভাষীর চেয়ে কোনভাবে নিম্ন মর্যাদার। আল্লাহর বাণী হিসাবে কুরআন বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত। কোনো ভাষা এমনকি আরবীও এমন মর্যাদার অধিকারী নয়।

একইভাবে রাসূল (সা:)-এর পুণ্যভূমিতে থাকতে পারা সৌভাগ্যের এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমান হিসেবে সেখানকার অধিবাসীরা অন্য এলাকার মুসলমানদের উপর কোনো রকম শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হতে পারেন না। ইসলাম সব ধরনের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ অস্বীকার করে। এখানে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হচ্ছে ইসলামের জ্ঞান অর্জন এবং জীবনে তার অনুসরণ (তাকওয়া)।

উত্তর : ২. 'উম্মাহ' শব্দের অর্থ এবং 'জাতি' শব্দের প্রচলিত ধারণা থেকে এর পার্থক্য

'জাতি' বলতে প্রচলিত ধারণায় কোনো নির্দিষ্ট ভাষাভাষী অথবা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জনগণ অথবা একই ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক জনগোষ্ঠীকে বুঝায়। পক্ষান্তরে 'উম্মাহ' বলতে এমন এক গোষ্ঠীকে বুঝায় যার অন্তর্ভুক্ত পৃথিবীর

সর্বকালের সর্বদেশের সকল বিশ্বাসীরা। এটা জাতির চেয়ে অনেক উদার ও ব্যাপক ধারণা। ইসলাম সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না। পৃথিবীর দু'টো মহাযুদ্ধসহ প্রায় সব বিপর্যয়ের মূল কারণ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। এক হাদীসে রাসূল (সা:) বলেন, "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আসাবীয়া (fanatical parochialism বা nationalism) (জাতীয়তাবাদ) প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেয়।" জনৈক সাহাবী যখন আসাবিয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন তখন রাসূল (সা:) বলেন, "আসাবিয়া হচ্ছে যখন এক জাতি আর এক জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে এবং তাদের অধিকারকে অস্বীকার করে, যখন কোনো জাতির লোকজন তাদের লোকদের অন্যায় এবং ভুলগুলোকে সমর্থন দেয় শুধুমাত্র জাতীয়তার কারণে।"

উত্তর : ৩. ইসলামের ভ্রাতৃত্ব কিভাবে কাল (সময়কে) অতিক্রম করে

কুরআনে বর্ণিত উম্মাহ শব্দ শুধু গোটা বিশ্বের সকল দেশের সকল ঈমানদারকেই অন্তর্ভুক্ত করে না বরং তা পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত সকল ঈমানদারকে সংযুক্ত করে। এভাবে কুরআনে যখন বলা হয় সকল ঈমানদার ভাই ভাই তখন তা আদম (আ:) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (সা:) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করে। সকল বিশ্বাসী একই ভ্রাতৃত্ব এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত। এভাবে ইসলাম আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সকল নবী-রাসূল ও সকল ঐশী কিতাবকে স্বীকৃতি দিয়ে লাভ করেছে বিশ্বজনীনতা। আর সব সংকীর্ণ মতবাদ যা শুধু কোনো বিশেষ গোত্র বা বিশেষ নবীর অনুসারীকেই স্বীকৃতি দেয় সেসব থেকে ইসলামের পার্থক্য এখানেই।

উত্তর : ৪. রক্তের সম্পর্ক কি ইসলামের ভ্রাতৃত্বের উপর স্থান পায়

ইসলামে রক্তের সম্পর্কসহ অন্য সকল সম্পর্কের উপরে বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থান পায়। ইসলামের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি যেহেতু আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং ভালবাসা সেহেতু এই ভ্রাতৃত্বের উপর রক্তের সম্পর্ককে স্থান না দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে (যদিও রক্তের সম্পর্ককে রক্ষা করা এবং একে সম্মান করার ব্যাপারে মুমিনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে)। মুমিনদের ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং রক্তের সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে বলা হয়েছে। যদি কারো রক্তের সম্পর্কিত ব্যক্তি বা স্বামী বা স্ত্রী অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সেই সম্পর্ককে বিশ্বাসের উপর স্থান দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি অবিশ্বাসী আত্মীয় সম্পর্কে হাশরের ময়দানে সুপারিশও করা যাবে না।

উত্তর : ৫. রক্তের সম্পর্কের উপর ইসলামের ভ্রাতৃত্বকে স্থান দেয়ার উদাহরণ

কুরআনে এমন চারটি উদাহরণ আছে। প্রথম উদাহরণ হচ্ছে নূহ (আ:)-এর নৌকায় অবিশ্বাসী ছেলে আরোহণ করেনি। দ্বিতীয় উদাহরণ যেখানে সন্তান বিশ্বাসী পিতা

অবিশ্বাসী যেমন, ইব্রাহীম (আ:), তাঁর মূর্তি নির্মাতা পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তৃতীয় উদাহরণ লুত (আ:) এবং তাঁর স্ত্রীর। এখানে লুত (আ:) বিশ্বাসী আর তাঁর স্ত্রী অবিশ্বাসীদের দলে। চতুর্থ উদাহরণ ফেরাউন এবং তাঁর স্ত্রী। ফেরাউনের হুমকি সত্ত্বেও তাঁর বিশ্বাসী স্ত্রী ঈমান পরিত্যাগ করেন নি। এসব উদাহরণে দেখা যায় বিশ্বাসী নবী বা বান্দাগণ তাদের অবিশ্বাসী স্বামী স্ত্রী বা সন্তানের সাজা রোধ করতে পারে নি।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩. আল কুরআন ৪৯:১০, ৫৯:১০, ২৩:৫১-২, ২১:৯২

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ৯:২৪, ৩১:১৫

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ১১:৪৬, ৯:১১৪, ৬৬:১০-১১

জি-৫ সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধু নির্বাচন

প্রশ্ন ১. ইসলামী সমাজব্যবস্থায় বন্ধুত্বের গুরুত্ব ও ভূমিকা কি?

২. ইসলামের শিক্ষায় বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান আছে কি?

৩. এমন কোনো ক্ষেত্র আছে কি যেখানে মুসলমানদের খোলাখুলি মেশা ঠিক নয়?

৪. কোনটাকে ইসলাম বন্ধুত্বের সঠিক ভিত্তি মনে করে?

৫. কোনো কোনো কাজ বন্ধুত্বকে নষ্ট করে?

উত্তর : ১. ইসলামী সমাজে বন্ধুত্বের তাৎপর্য ও ভূমিকা

শুধু ইসলামের তাগিদেই নয় বরং সামাজিক দিক থেকেও বন্ধুত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। এর কারণ এই যে, একজন ব্যক্তির মানসিক গঠন, চিন্তাশক্তি ও আচার আচরণ বিকাশে বন্ধুত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। উপরন্তু, বন্ধুত্ব একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশে ও নৈতিক উন্মেষের সাহায্য করে। সুতরাং এ থেকে এটাই অনুমিত হয় যে, একটা সমাজের সাফল্য নির্ভর করে সেই সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বন্ধুত্ব যদি আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয় তবে এটা আশীর্বাদ স্বরূপ। যদি এ সম্পর্ক অন্যান্য নগণ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয় তবে এটা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কুরআন ও হাদীস যে বন্ধুত্ব মানুষকে অপেক্ষাকৃত ভাল মুসলমান বানাবার পরিবর্তে তাকে সত্য সরল পথ হতে বিচ্যুত করে তার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নবী করিম (সা:) এরশাদ করেছেন, "ব্যক্তি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জীবনধারা ও চিন্তাচেতনা অনুসরণ করে। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকেই বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্ক হও।"

কুরআন এ ব্যাপারে সতর্ক করে এভাবে যে, শেষ বিচারের দিন অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই নিদারুণ মনস্তাপে ভুগবে। কারণ তারা অনুধাবন করবে যে, এ ধরনের বন্ধুত্বের কারণে তারা সত্যপথ হতে বিচ্যুত হয়েছিল। অন্যত্র আল্লাহতাআলা সতর্ক করেছেন এভাবে যে, অবিশ্বাসী বন্ধুগণ কেয়ামতের দিন শত্রুতে পরিণত হবে।

উত্তর : ২. ইসলামের শিক্ষায় বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান আছে কি

যদিও ইসলাম সবিস্তারে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্কের কথা বলে তথাপি একে কোনো একক ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস বলা যায় না। ইসলামের শিক্ষা হলো দুনিয়াদারী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকা উচিৎ নয়। কুরআনের বরাত দিয়ে নবী করিম (সা:)

বৈরাগ্যবাদকে নিন্দা করেছেন। যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বৈরাগ্যবাদের মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যানে সারাজীবন উৎসর্গ করা ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আধ্যাত্মিকতার চরম স্তরে উপনীত হওয়া যায় তথাপি এটা ইসলামের আদর্শ নয় কারণ এটা সমাজ পরিবর্তনের বদলে শুধু ব্যক্তিগত মুক্তির প্রচেষ্টা মাত্র। অপরদিকে ইসলাম মানুষকে পারস্পরিক মেলামেশায় উৎসাহিত করে। ইসলাম বিশ্বাসীদের একে অপরকে জানার জন্য সমন্বিত কার্যক্রম ও সহযোগিতায় উৎসাহ দেয়।

ইসলামের অনেক ইবাদত ব্যক্তিগতভাবে করা যায় না বরং দলবদ্ধভাবে করতে হয় (যেমন : জানাযার নামাজ, হজ্ব, আল্লাহর পথে জিহাদ ইত্যাদি)। উপরন্তু, রাসূল (সা:) দৈনিক নামাজসমূহ জামায়াতে পড়ার তাগিদ দিয়েছেন যদি মাত্র দু'জন লোক হয় তবুও।

উত্তর : ৩. যে সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের খোলাখুলি মেশা ঠিক নয়

যে সব লোক ঈমানকে ঠাট্টার বিষয় ভেবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে সে সব লোকের সাথে মুসলিমরা মিশতে বাধ্য নয়। এসব লোক থেকে দূরে থাকার জন্য ইসলাম শিক্ষা দেয়। কোনো অবস্থাতেই এদের সাথে বন্ধুত্ব করা ঠিক নয়। তাছাড়া কোনো নির্দিষ্ট চক্র বা সমাজ যদি খারাপ হয় এবং কারও পক্ষে যদি এতে ঢুকে এর অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব না হয় তবে তার উচিৎ ঐ গোষ্ঠী বা সমাজ ত্যাগ করা। যদি কোনো বিশ্বাসী ব্যক্তির এমন সামর্থ্য বা মেধা থাকে যা দ্বারা সে ঐসব খারাপ কাজ বা অপকর্ম শুধরাতে পারে তাহলে তার উচিৎ হবে সে চেষ্টা চালিয়ে ঐ সমাজ বা গোষ্ঠীকে সঠিক পথে আনা, যদি সে ব্যর্থ হয় তবে সে সঙ্গ ত্যাগ করাই তার জন্য যথার্থ। নবী করিম (সা:)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কোন্ ধরনের লোক সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি উত্তর দিলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জান, মাল ও সময় ব্যয় করে লড়াই করে। এরপর সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে অসৎ ও অনাচারপূর্ণ সমাজ থেকে নিজেকে পৃথক রাখে।"

এটাই সত্য যে, সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতেও কিছু লোক অবশ্যই থাকবে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের রজ্জুকে আঁকড়ে থাকবে। তাঁর দেয়া অপরিবর্তনীয় নৈতিক আচরণের নিয়মনীতিকে অনুসরণ করবে ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় বিশ্বাসীদের দল গঠন করবে। কেউ বিচ্ছিন্ন থাকার চেয়ে এটাই হবে বেশী বাঞ্ছিত।

উত্তর : ৪. ইসলামের দিক থেকে নিখুঁত বন্ধুত্বের ভিত্তি

কুরআন ও রাসূলের হাদীস থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, যে বন্ধুত্ব আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাস এবং তাঁর পথ অন্বেষণের উদ্দেশ্য থেকে সৃষ্ট তা-ই নিখুঁত ভিত্তির উপর স্থাপিত। অপরদিকে, যে বন্ধুত্ব কোনো বিশেষ স্বার্থরক্ষা, সামাজিক শ্রেণী

বা ভৌগোলিকতার উপর ভিত্তি করে স্থাপিত সেটা নিখুঁত নয়। হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে যে, আল্লাহ বলেছেন, যারা একে অপরকে আমার জন্যে ভালবাসে তাদেরকে কেয়ামতের দিন আমি আমার ছায়ায় আশ্রয় দিব যেদিন আমি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়দাতা থাকবে না।

যে সব পন্থা বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগায়

কুরআন ও রাসূলের হাদীস অনুসারে, আট প্রকার নির্দিষ্ট পন্থা বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে উৎসাহ দেয় :

ক) দুর্নীতি, শঠতা ও অহংকার বর্জন। কারণ এগুলো মানুষের হৃদয়ের আন্তরিকতা ও সরলতাকে ধ্বংস করে।

খ) সামাজিক সৌজন্যবোধ যেমন, একজন মুসলিম তার সহচরকে তার নাম ও কোথা থেকে সে এসেছে জিজ্ঞাসা করা।

গ) যদি কেউ কোনো ভাই বা বোনকে আল্লাহকে বিশ্বাসের কারণে ভালবাসে তাহলে সে যেন অন্যদেরকে সেটা জানায়।

ঘ) ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বাড়ীতে যাওয়া। এটা বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগায়। বেহেশতের শুভ সংবাদ তাদের জন্য যারা বন্ধুর বাড়ী যায়, অন্য কোনো কারণে নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই।

ঙ) উপহার সামগ্রী আদান প্রদান।

চ) ক্ষমাশীল ও দয়ালু হওয়া।

ছ) ভোজের দাওয়াত গ্রহণ করা।

জ) নি:স্বার্থ হওয়া : নবী করিম (সা:) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজের জন্য যা পছন্দ কর তোমার ভাই-এর জন্যও তা পছন্দ না কর, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত মুমিন নও, বিশেষত: যদি সেই ভাই অভাবী হয়।

উত্তর : ৫. বন্ধুত্ব রক্ষার্থে যে সব কাজ পরিত্যাগ করা দরকার

ক) কোনো মুসলিম ভাইকে ব্যঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা।

খ) তাকে শ্লেষ না করা এবং তার অনুভূতিতে আঘাত হানা থেকে বিরত থাকা।

গ) যে নাম সে পছন্দ করে না সেই নামে তাকে না ডাকা।

ঘ) বন্ধুদের গীবত না করা ও গোয়েন্দাগিরি এড়িয়ে চলা।

ঙ) বিনয়ী হওয়া ও চালবাজি বর্জন করা।

চ) বন্ধুর কোনো কাজের পেছনে অসৎ উদ্দেশ্য আরোপ বর্জন করা।

ছ) এমন কাজ বর্জন করা যা ভ্রাতৃত্বের পথে হুমকীস্বরূপ: অর্থাৎ মদ্যপান, জুয়াখেলা, ঠকবাজী ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী বিধানের দিকে খেয়াল রাখা।

জ) তিন বা তিনের অধিক লোক একত্রিত হলে যে কোনো দু'জনের ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মেতে উঠা ঠিক নয়, বিশেষ করে যদি সে কথোপকথন অন্যরা শুনতে না পায়।

ঝ) যদি বাদানুবাদ দেখা দেয়, তবে একজন দায়িত্ববান মুসলমানের কর্তব্য হবে সেটা মিটমাট করা।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ২৫:২৭-৩০, ৪৩:৬৫-৬৭

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ৫৭:২৭

যখন এক ব্যক্তি রাসূল (সা:)-কে বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল তখন উত্তরে তিনি বললেন, যে বিশ্বাসী ব্যক্তি মানুষের সাথে মিশে, তাদের মাঝে কাজ করে ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী হয় যদিও তারা তাকে অবজ্ঞা করে বা আহত করে, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে শ্রেয়, যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তারা আঘাত করলে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না।

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ৬:৭০

প্রশ্ন ৬ : আল কুরআন ৪৯:১১

জি-৬ সামাজিক দায়িত্ব (১)

প্রশ্ন ১. ধর্ম ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

২. ইসলাম যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির নির্দেশনা দেয় না বরং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিশুদ্ধির নির্দেশনা দেয়, এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে কি?

৩. সমাজকে পরিশুদ্ধ করার কোনো উপায় ইসলামে নির্দেশিত আছে কি?

৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ *(আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার)*-এর ব্যাখ্যা কি?

৫. একজন মুসলিম কিভাবে সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে? এ ব্যাপারে কুরআনে নির্দিষ্ট আদেশ আছে কি?

৬. পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি পন্থার যে কোনো একটি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে- এর অর্থ কি?

৭. সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সাধারণত: নীরবতা ও এড়ানোর চেষ্টা দেখা যায়। এটা কি গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : ১. ধর্ম ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং এই সম্পর্ককে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে। এটা এমন এক সম্পর্ক যা কালক্রমে ব্যক্তির গোটা জীবনের সকল তৎপরতাকে প্রভাবিত করে, পরিশুদ্ধ করে। ইসলাম নিছক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানাদি সর্বস্ব ধর্ম নয়। এটা শুধু মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্কই নিয়ন্ত্রণ করে না; বরং মানুষে মানুষে সম্পর্ককেও নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও সামাজিক দায়িত্ব ছাড়া ইসলাম অসম্পূর্ণ। যে এটা ছাড়া ইসলামকে কল্পনা করে তার উদাহরণ এমন যে, কেউ বলল আমার একটি বাড়ী আছে, আসলে তার শুধু মাত্র একটি বাড়ির ভিত্তি (Foundation) আছে।

উত্তর : ২. ইসলাম যে শুধু ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধি নয় বরং গোটা সমাজের পরিশুদ্ধির নির্দেশনা দেয় কুরআন থেকে তার পক্ষে দলিল

এর পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে কুরআনের সকল আদেশ নির্দেশ এবং শিক্ষা সকল মানব বা মুমিনদের সম্বোধন করে বহু বচনে বলা হয়েছে, এক বচনে বলা হয়নি। নামাজ কায়েম করতে বলা হয়েছে যে এককভাবে সম্ভব নয়। একই ভাবে যাকাত সংক্রান্ত, মদপান ও জুয়া থেকে বিরত থাকা সংক্রান্ত আদেশসহ প্রায় সব আদেশ নিষেধ বহুবচনে জারী হয়েছে। এসব উদাহরণ এটাই প্রমাণ করে ইসলাম মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবন এমনভাবে পরিশুদ্ধ করে যা চূড়ান্তভাবে সমাজকেও শুদ্ধ করে।

উত্তর :৩. ইসলামের নির্দেশনায় সমাজ পরিশুদ্ধির উপায়

ইসলামের এজন্যে তিনটি পন্থা রয়েছে :

ক) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মগঠন যা ব্যক্তিকে শুধু দেশের বা সমাজের আদর্শ নাগরিকই করে না বরং পৃথিবীর আদর্শ নাগরিকে পরিণত করে।

খ) পরিবার, রাজনৈতিক সংগঠন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিটি পরিচালনার সুষম বিধান ইসলামে রয়েছে এবং এই তিন-এর সমন্বয়ে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব।

গ) কুরআনে সকল মুসলমানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সৎ কাজের আদেশ দিতে এবং অসৎ কাজে বাধা দিতে।

উত্তর : ৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাখ্যা

"আমরু বিল মারুফ ওয়ানাহি আনিল মুনকার" সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। যে সব বিশ্বাসী নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবে অন্যায়কে প্রতিরোধ করে ও ন্যায় কায়েম করে তারা আল্লাহর দয়া লাভ করবে। যে সমাজ এই কাজ করবে তা আল্লাহর দৃষ্টিতে সফল সমাজ। কাজেই এটা নিশ্চিত হচ্ছে যে, এই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ ইসলামের একটি মৌলিক বিধান, যার মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহর খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে তাদের মিশন পূর্ণ করবে। কুরআন মুসলমানদের আরও সতর্ক করে দেয় যে, অতীতে যে সব জাতির ভাল লোকেরা তাদের খারাপ লোকদের অন্যায় কাজে বাধা দেয়নি সেসব জাতির ওপর যখন আযাব দেয়া হয় তখন খারাপদের সাথে ভালদেরও রেহাই দেয়া হয়নি। প্রকৃত মুমীনরা সমাজ সংস্কারে সতত তৎপর থাকেন।

উত্তর : ৫. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের পন্থা

রাসূল (সা:) বলেন, "তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন তার হাত দিয়ে তাতে বাধা দেয়। এর সামর্থ্য না থাকলে সে যেন কথা দিয়ে চেষ্টা করে, তা-ও সামর্থ না থাকলে অন্তরের মাধ্যমে এবং এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম প্রকাশ"।

(আন-নববী উদ্ধৃত '৪০ হাদীস-এর ৩৪ নং হাদীস)

উত্তর : ৬. উপরের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থার ব্যাখ্যা

উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে এটা বোঝা যায় যে, রাসূল (সা:) অন্যায়ের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা বুঝাতে গিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ থেকে দুর্বলতম পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে–

প্রথমত: কাজের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ (হাত); দ্বিতীয়ত: কথার মাধ্যমে (যেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা); তৃতীয়ত: হৃদয়ের মাধ্যমে (যেখানে মুসলমান অন্যায় দেখে কষ্ট পাবে কিন্তু কোনো কিছু করতে ক্ষমতাহীন)। যখনই কোনো মুসলিম কোনো অন্যায় দেখবে তখনই সে তার অবস্থা এবং সময়ের আলোকে এই হাদীসের ভিত্তিতে ব্যবস্থা

নেবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি দেখে একদল শিশু একটি পশুকে অত্যাচার করছে তখন তার উচিৎ হবে প্রথমত: পশুটিকে মুক্ত করা। কারণ বাচ্চাদের পশুর প্রতি নমনীয় হবার উপদেশ দেয়ার চেয়ে সেটা অগ্রাধিকার পাবে। আবার কেউ যদি তার বন্ধুকে মদ্যপান করতে দেখে তবে সেখানে শক্তি প্রয়োগের চেয়ে আন্তরিকতার সাথে তাকে বুঝানোটাই বেশী ফলপ্রসূ হতে পারে। সাথে সাথে এটাও মনে রাখা দরকার যে, সমাজের প্রতিষ্ঠিত অসৎদের শুধু মুখের কথায় পথে আনা যাবে না, এজন্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও প্রতিরোধ আবশ্যক হবে।

উত্তর : ৭. নীরবতা ও দায়িত্ব এড়ানোর প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে নীরবতা কখনই বিশ্বাসীদের জন্য সঠিক পথ হতে পারে না। রাসূল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য বিশ্বাসীদের বিষয়ে উদাসীন সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সাধারণত: তিনটি কারণে মানুষ দায়িত্ব এড়াতে চায়।

ক) বন্ধুত্ব হারানোর ভয়ে।

খ) অন্যায়ের মোকাবেলায় একা হয়ে যাবার ভয়ে।

গ) নীরবতা অথবা দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টায়।

প্রথম যুক্তি এজন্যে গ্রহণযোগ্য নয় যে, নিজের দোষ ধরিয়ে দেয়া যারা পছন্দ করে না তাদের আচরণ ইসলাম সম্মত নয়। এমন বন্ধুত্ব হারানোতে কোনো ক্ষতি নেই। আর দ্বিতীয় যুক্তি এজন্য গ্রহণীয় নয় যে, সবাই এই যুক্তি অনুসরণ করলে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত ভাল কিছু হতো না। মানুষের ভাল প্রচেষ্টায় সাফল্যের মালিক আল্লাহ। কিন্তু প্রচেষ্টা ঠিকমতো করা মানুষের দায়িত্ব। তৃতীয় যুক্তিকে কেউ এভাবে যায়েজ করতে চায় যে নিজের পরিশুদ্ধি ও মুক্তি হলেই তা যথেষ্ট। কিন্তু এটাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ যদি মনে করে অন্যায়কারীরা অন্যদের আক্রমণ করছে, কাজেই আমার ভয়ের কিছু নেই তবে তা হবে তাদেরকে নিজ দরজা পর্যন্ত আসার সুযোগ করে দেয়া। এটা ঠিক যে অনেক সময় ব্যক্তিগত চেষ্টায় সমাজ থেকে অন্যায় উৎখাত করা যায় না। এজন্য সমন্বিত চেষ্টা দরকার।

সূত্র :

প্রশ্ন ৪ : আল কুরআন ৯:৭১, ৩:১০৪, ৩:১১০

প্রশ্ন ৭ : খলিফা ওমর (রা:) বলেন, "আল্লাহ যেন তাকে দয়া করেন, যে আমাকে আমার ভুল ধরিয়ে দেয়।" আলকুরআন ৮:২৫

জি-৭ সামাজিক দায়িত্ব (২)

প্রশ্ন ১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বিধান কি কুরআনে বর্ণিত 'ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নেই' মূলনীতির বিরোধী নয়?

২. কোনো মুসলমান যদি দাবি করে যে আমি নিজে সৎপথে আছি, এ অবস্থায় অহেতুক খারাপ লোকদের সাথে লড়তে যাবার দরকার নেই?

৩. ইসলামে এমন কোনো নিশ্চয়তা আছে কি যার কারণে কেউ আল্লাহর কথাকে ইচ্ছেমতো নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না?

৪. সামাজিক দায়িত্ব কিভাবে বিধিবদ্ধ ইবাদত (Worship)-এর সাথে সম্পৃক্ত? এ দুটোর মধ্যে কোনটা অগ্রাধিকার পাবে?

৫. সামাজিক দায়িত্ব কিভাবে কাজে পরিণত হয় তার উদাহরণ দিন।

৬. সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি।

৭. সত্যিকার ইসলামী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তর : ১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের সাথে 'ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নেই'- এই মূলনীতির কথিত বিরোধ প্রসঙ্গে

এটা একটা মহৎ বিধান যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য মানুষকে জোর জবরদস্তি করার অনুমতি মুসলমানদেরকে কোরআন দেয়নি। প্রত্যেকেরই তার স্ব স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ইসলামে ও ইসলামী রাষ্ট্রে আছে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর মাধ্যমে এই স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না। কোনো সমাজই তার মধ্যে দুর্নীতি পাপাচারকে অবাধে চলতে দিতে পারে না। অসৎ দুর্নীতিবাজ লোকের হাতে সমাজকে জিম্মি করে দিয়ে তাদের রক্ষার জন্য ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই বলার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। ইসলামে বর্ণিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মাধ্যমে দুষ্ট দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের কবল থেকে সমাজের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, ইজ্জত ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায়।

উত্তর :২. বিভ্রান্তদের প্রতি বিশ্বাসীদের আচরণ

কুরআনে একটি আয়াত আছে যে, অবিশ্বাসীরা কি করল তা মুমীনদের দেখার বিষয় নয় (৫:১০৫)। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যে ঈমান আনেনি, আবার তার কাজ বা তৎপরতা দিয়ে সে সমাজের কোনো ক্ষতিও করছে না, মানুষের অধিকারও নষ্ট করছে না, এ অবস্থায় তার ব্যাপারে মুমীনদের করবার কিছুই নেই। কিন্তু যদি একজন

অবিশ্বাসী তার তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামী সমাজের বা ধর্মের গোড়ায় আঘাত হানে তবে তার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা ইসলাম সম্মত নয়। আবুবকর (রা:)-এর খেলাফতের যুগে যখন কিছু মুসলমান পূর্বে উল্লিখিত আয়াতের কথা বলে নিষ্ক্রিয় থাকতে চেয়েছিল তখন তিনি তাদেরকে রাসূল (সা:)-এর এই হাদীস বলে সতর্ক করে দেন যে, সমাজে ক্ষতিকর কিছু হতে থাকলে মুসলমানরা যদি নিষ্ক্রিয় বসে থাকে তবে আল্লাহর আযাব সবাইকে গ্রাস করবে।

উত্তর : ৩. আল্লাহর কথাকে নিজ স্বার্থে ইচ্ছে মতো ব্যবহারের বিরুদ্ধে ইসলামের ব্যবস্থা

যে কোনো ধর্মের ক্ষেত্রে এই গ্যারান্টি দেয়া কঠিন যে, তার অনুসারীদের কেউ স্রষ্টার কথাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করবে না। ইসলামও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে এক্ষেত্রে ইসলামে এমন এক অনুপম ব্যবস্থা আছে যাতে কেউ তার অপকর্মের ব্যাখ্যা হিসেবে এটা বলতে পারবে না যে, সে আল্লাহর ইচ্ছায় এমন কাজ করেছে। ইসলামের মূলনীতি সমূহের আলোকে এমন ব্যক্তির কাজ এবং দাবী যে অবৈধ তা প্রমাণ করা যায়। ইসলামে একমাত্র ওহী (প্রত্যাদেশ যা নবী রাসূলরা লাভ করেন) ছাড়া আল্লাহর সরাসরি আদেশ লাভের সুযোগ কারো জন্য নেই।

আল্লাহর সরাসরি আদেশ একমাত্র কুরআনেই আছে যার ব্যাখ্যা রাসূল (সা:)-এর হাদীসে পাওয়া যায়।

উত্তর : ৪. সামাজিক দায়িত্ব ও আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার

ইসলামে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শুধু নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়। কুরআনে সৎপন্থা (হক্ব) বলতে বুঝায় আল্লাহর প্রতি ঈমান, দরিদ্রদের দান ও যাকাত আদায় (সামাজিক ন্যায় বিচার), নামাজ, রোজা (আনুষ্ঠানিক এবাদত), ওয়াদা রক্ষা করা, সংযম, অধ্যবসায় ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হওয়া। যেহেতু এগুলো সবই ইসলামের বর্ণিত হক্ক-এর অন্তর্ভুক্ত সেহেতু ইসলামে সামাজিক দায়িত্ব ও আনুষ্ঠানিক এবাদতকে পৃথক করার সুযোগ নেই।

উত্তর : ৫. সামাজিক দায়িত্ব কিভাবে কাজে পরিণত হয়

সামাজিক ঐক্য ও সংহতিই মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধকে সম্মিলিত করে বৃহৎকাজে পরিণত করে। নিম্নলিখিত উপায়ে সমাজে ঐক্য ও সংহতি আসে :

ক) **পরিবার :** কারণ পরিবার হচ্ছে সমাজের একক। পরিবারের সদস্যদের মাঝে ঐক্য, ভালবাসা এবং আকর্ষণ সমাজে সঞ্চালিত হয়। আবার পরিবারগুলোতে বিরাজমান অবিশ্বাস ও অশান্তি সমাজকেও আক্রান্ত করে। ইসলাম পরিবার রক্ষার উপর জোর দেয়।

খ) **কর্মক্ষেত্র :** প্রত্যেক মুসলিম কর্মক্ষেত্রে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।

গ) **সমাজ :** সমাজে প্রত্যেক মুসলমান নিজেকে সমাজের একজন দায়িত্বশীল হিসেবে চিন্তা করে এর স্বার্থ সংরক্ষণ করবে।

ঘ) সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সবাই সহযোগিতা করবে।

ঙ) **সামাজিক সচেতনতা :** রাসূল (সা:) বলেন, "ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে খেয়ে ঘুমাতে যায়।"

উত্তর : ৬. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ পৃথিবী এবং মানব জাতিকে যে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন তার বর্ণনা দিতে 'আদল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই একই শব্দ মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও সামাজিক ভারসাম্যের ব্যাপারে আদেশ দেয়ার সময় ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের কুরআন আদেশ দেয় রাষ্ট্র পরিচালনায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে, আর্থিক ন্যায়নীতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে, সমাজের এক অংশ যেন আরেক অংশের উপর শোষণ অবিচার না করে তা নিশ্চিত করতে। বিচারকদের ন্যায়বিচার করতে।

উত্তর : ৭. সত্যিকার ইসলামী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো

ক) সমাজের তথা জগতের মূল কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে।

খ) আল্লাহর আধ্যাত্মিক বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালিত হবে।

গ) সমাজ চালিত হবে আল্লাহর দেয়া মানব কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক মিশন সফল করতে।

ঘ) সমাজ হবে ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়নীতি সমৃদ্ধ। তাতে আত্মিক ও পার্থিব উভয় দিকে উন্নতির ব্যবস্থা থাকবে। সমাজে প্রতিটি সদস্যের মর্যাদা, সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১. আল কুরআন ২:২৫৬

প্রশ্ন ২. আল কুরআন ৫:১০৫

রাসূল (সা:) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ সমাজের ঐসব লোকদেরকে শাস্তি দেবেন যারা সমাজের দুষ্ট লোকদের দমন করতে কোনো চেষ্টা করে না এবং যারা মানুষের উপর জুলুম করে।

প্রশ্ন ৩. 'আল্লাহর ইচ্ছা'- এই দাবিতে যা খুশী তা করার সুযোগ ইসলামী সমাজে নেই। কারণ এখানে এ জাতীয় যে কোনো দাবির সমর্থনে ইজমা (উম্মতের ঐকমত্য) প্রয়োজন। ইজমা মানে উম্মার অধিকাংশ আইন প্রণেতা ও বিশেষজ্ঞের ঐকমত্য। ইজমার

মাধ্যমে গৃহিত সিদ্ধান্ত কোনো ব্যক্তি নিজ হাতে বাস্তবায়ন করতে পারেন না; তা বাস্তবায়ন রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

প্রশ্ন ৪. আল কুরআন ২:১৭৭

রাসূল (সা:) বলেছে, যে ব্যক্তি এতিম অথবা অক্ষম লোকের দেখাশুনা করে সে আল্লাহর পথে জিহাদরত অথবা সারারাত নফল এবাদতরত এবং সারাদিন রোজারত মানুষের সওয়াব পাবে।

প্রশ্ন ৫. আল কুরআন ৫:২

রাসূল (সা:) বলেন, সমগ্র দুনিয়ার মুমীনরা যেন এক শরীর, তার কোনো অংশে ব্যথা হলে সমগ্র শরীরে সে ব্যথা অনুভব হবে।

প্রশ্ন ৬. আল কুরআন ৮২:৭, ৪:৫৮

জি- ৮ দাস প্রথার অবসান প্রসঙ্গ (১)

প্রশ্ন ১. রাসূল (সা:) যখন তাঁর মিশন শুরু করেন তখন ক্রীতদাস প্রথা কোন্ অবস্থায় ছিল?

২. ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে ইসলামের মানবিক আবেদন সম্পর্কে বলুন।

৩. ক্রীতদাসদের সাথে ব্যবহার সংক্রান্ত এবং তাদের অধিকার রক্ষায় ইসলামে আর কোনো শিক্ষা আছে কি?

৪. এসব শিক্ষা মুসলমানদের উপর কি কোনো লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল?

৫. ব্যক্তি পর্যায়ে আহ্বান ছাড়া দাস প্রথা উচ্ছেদে ইসলামে কোনো আইনগত ব্যবস্থা ছিল কি?

৬. ইসলাম সরাসরি দাস প্রথা উচ্ছেদ করেনি কেন?

৭. রাসূল (সা:)-এর জীবদ্দশায় যেমন মদপান নিষিদ্ধ করা হল, তেমনি তাঁর জীবদ্দশায় দাস প্রথা উচ্ছেদ করা হল না কেন?

উত্তর : ১. রাসূল (সা:)-এর মিশনের শুরুতে দাস প্রথার অবস্থা

সপ্তম শতকে যখন রাসূল (সা:) তাঁর মিশন শুরু করেন তখন দাস প্রথা বহুলভাবে চালু ছিল, যদিও তার ধরন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ছিল। তিনভাবে ক্রীতদাস সংগৃহীত হত। যথা- ১. যুদ্ধবন্দী, ২. অপহরণ, ৩. ঋণগ্রস্ত মানুষ যখন ঋণ পরিশোধ করতে পারত না তখন মহাজনরা তাদের দাস বানাত। এটা ছিল এমন এক সময় যখন দাসরা পণ্যের মতো ব্যবহৃত হত। নির্মম নির্যাতনের শিকার হত। মালিক তার দাসকে ইচ্ছেমতো মারার এমনকি হত্যা করার অধিকার রাখত। রোমানদের মধ্যে তো দাস হত্যা একটি আনন্দদায়ক খেলা ছিল। এমন সময়ে ইসলামের অভ্যুদয় শুধু দাস প্রথার উচ্ছেদেরই সূচনা করেনি বরং মানুষের অন্তরে এমন পরিবর্তন আনে যা দাস এবং তার মালিক উভয়ের মধ্যে সমতার অনুভূতি নিয়ে আসে। উভয়ের মাঝে মানব সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

উত্তর : ২. দাসপ্রথা উচ্ছেদে ইসলামের মানবিক আবেদন

প্রথমত: ইসলামের মূলকথাই হচ্ছে সকল মানুষ একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবে না। ইসলাম অর্থ আল্লাহতে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন।

দ্বিতীয়ত: কুরআন বলে সকল মানুষ এক আত্মা থেকে সৃষ্ট। একথা আবার হাদীসে এভাবে সমর্থিত হয়েছে যে সকল মানুষ হচ্ছে আদমের (আ:) থেকে উদ্ভূত এবং আদম

(আ:) মাটি থেকে সৃষ্ট। এ থেকে মানব সমতা ও ভ্রাতৃত্বের যে দর্শন উৎসারিত হয় তা মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্বের ধারণাকে উৎখাত করে। সর্বোপরি ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহ শুধু বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই মানুষকে বিভিন্ন বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও জাতিতে ভাগ করেছেন; কারো উপর কারো প্রভুত্বের জন্য নয়। তদুপরি আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই শ্রেষ্ঠ যে বেশী তাকওয়া (খোদাভীতি) সম্পন্ন। রাসূল (সা:) মুমীনদের ভাল বংশের অবিশ্বাসী নারীকে বিয়ে করার চেয়ে বিশ্বাসী দাসীকে বিয়ে করতে উৎসাহিত করেছেন। ইসলামের এসব ব্যবস্থা মানুষের মন থেকে দাস প্রথার অনুকূল দর্শনকে ভ্রাতৃত্ব ও সমতার অনুভূতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে তা মূলত: অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা।

উত্তর : ৩. দাসদের সাথে ব্যবহার সংক্রান্ত ইসলামের শিক্ষা

কুরআন ও হাদীসে দাসদের সাথে সুব্যবহার সংক্রান্ত অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে। কুরআনের আয়াতে আল্লাহর উপর বিশ্বাসের সাথে দাসদের সাথে সুব্যবহারের কথা এক বাক্যে এসেছে। কুরআন দাসপ্রথাকে এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবেই নির্দেশিত করে। এক হাদীসে রাসূল (সা:) বলেন, দাসরা তোমাদের ভাই, আল্লাহ যদি চাইতেন তবে পরিস্থিতি উল্টো করেও দিতে পারতেন (অর্থাৎ মালিক নিজে দাস এবং দাস মালিক হতে পারত)। ইসলাম দাসদের নির্দিষ্ট যে সব অধিকার দেয় তা হচ্ছে–

ক) তাদের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখতে এবং তা চর্চা করতে।

খ) খাদ্য ও বস্ত্রের অধিকার। মালিক যা খাবে এবং পরবে দাসদেরও তা খেতে এবং পরতে দিতে হবে। তাদের সাধ্যাতীত কোনো কাজ দেয়া যাবে না। যদি মালিকের কোনো কঠিন কাজ থাকে তবে দাসকে ঐ কাজ করতে মালিক নিজে সাহায্য করতে হবে।

গ) মালিক তার দাসের প্রতি ক্ষমাসুলভ হবেন।

ঘ) একজন প্রাক্তন ক্রীতদাস মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হতে পারেন এবং তিনি নামাযে ইমামতি করতে পারেন। এক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা সব মুসলমানের দায়িত্ব।

ঙ) রাসূল (সা:) শিখিয়েছেন যে, কেউ তার দাসদের আমার দাস বা আমার লোক এভাবে না ডেকে আমার পুত্র বা আমার কন্যা এভাবে ডাকবে।

উত্তর : ৪. এসব শিক্ষা কিভাবে মুসলমানদের আচরণ পরিবর্তন করে

ইসলামের মানবিক আবেদন যে তৎকালীন আরববাসী মুসলিমদের আচরণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথমদিকের ইসলাম কবুলকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেলাল (রা:) যিনি ছিলেন একজন হাবশী

গোলাম। তাঁর মালিক যখন ইসলাম কবুল করায় তাঁর উপর চরম অত্যাচার চালাচ্ছিল তখন আবুবকর (রা:) তাকে দ্বিগুণ দামে কিনে নেন এবং মুক্ত করে দেন। পরবর্তীতে তিনি সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন। একদিন মানুষ দেখলেন আবুবকর (রা:) তার ক্রীতদাসের চেয়েও কমদামী পোশাক পরে আছেন। লোকজন যখন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল তখন তিনি বললেন যে, তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ কিন্তু ক্রীতদাস তো যুবক। তার ভাল কাপড় পরতে শখ হয়েছে তাই তিনি নিজে কমদামী কাপড় পরে ক্রীতদাসকে দামী কাপড় দিয়েছেন। একবার সাহাবী আবুযর (রা:) একজন কাল মানুষের ঝগড়ার এক পর্যায়ে রেগে বললেন, তুমি একজন কাল মায়ের পুত্র। এ কথা শুনে রাসূল (সা:) ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "কাল এবং ফর্সা মায়ের পুত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।" রাসূলের এই নসীহত শুনে সাহাবী আবুযর (রা:) এত অনুতপ্ত হলেন যে, তৎক্ষণাৎ বালুতে শুয়ে নিজের মুখে ঐ কাল ব্যক্তিকে পা রাখতে বললেন।

এছাড়া আরও বলা যায় তৎকালীন ধনী মুসলিমরা দাস কিনতেন তাদের মুক্ত করার জন্য। আর অনেক প্রাক্তন দাস ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেছিলেন।

উত্তর : ৫. দাস প্রথা উচ্ছেদে ইসলাম গৃহীত আইনগত ব্যবস্থা

ক) দাস পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। দাস পরিবারের কারো বিরুদ্ধে আক্রমণ মোকাবেলায় পুরো পরিবার ব্যবস্থা নিতে পারত।

খ) দাস মুক্ত করাকে আখেরাতে মুক্তির অন্যতম উপায় বলে উল্লেখ করে কুরআন দাস প্রথা উচ্ছেদের সূচনা করে।

গ) বিভিন্ন পাপের জরিমানা (কাফ্ফারা) হিসেবে কুরআন দাস মুক্তিকে উল্লেখ করে। যেমন- অনিচ্ছাকৃত হত্যা, ওয়াদা ভঙ্গ, ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ এবং আদজিহার-এর মাধ্যমে তালাক। এভাবে যখনই কেউ এসব পাপ করত তখন সে তার কাফফারা হিসেবে দাসমুক্ত করত। এছাড়াও এ বিধান ছিল যে, কেউ ঠাট্টাবশত: কোনো দাসকে যদি বলত, তুমি মুক্ত হবে সে মুক্ত হয়ে যেত।

উত্তর : ৬. ইসলাম এককথায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করেনি কেন

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখেছি যে, সপ্তম শতকে বিশ্ববাসী দাসপ্রথা এক দৃঢ় আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই অষ্টাদশ শতকে আমেরিকায় যখন দাসপ্রথা উচ্ছেদ করা হল তখনকার গৃহযুদ্ধ এবং কর্মচ্যুত দাসদের নির্মম বেকারত্ব ও দারিদ্রের কথা আমরা ভুলে যাইনি। কাজেই দাসপ্রথা উচ্ছেদের আগে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক কাজ দরকার ছিল। এ ব্যাপারে ইসলাম সফল ছিল। ইসলাম

মানুষের মনকে দাসপ্রথার প্রতিকূলে নিয়ে যায়। তার উপর দাস-এর উৎস- ইসলাম বন্ধ করে দেয়। যেমন, মানুষকে দাসত্বের জন্য অপহরণ নিষেধ করা হয়। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ শোধে রাষ্ট্র এগিয়ে আসে আর যুদ্ধবন্দিদের মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের সাথে বিনিময় ও পণ্যের মাধ্যমে মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। এসব কারণে ইসলামের অভ্যুদয়ে দাসের উৎস বন্ধ হয়ে যায়।

উত্তর : ৭. রাসূল (সা:)-এর জীবদ্দশায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হল না কেন

যদিও রাসূল (সা:)-এর জীবদ্দশায় মদপান নিষিদ্ধ হয় তবুও তাঁর জীবদ্দশায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হয়নি। কারণ মদপান ছিল একটি ব্যক্তিগত সমস্যা, যা ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির মাধ্যমে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞার আগেই সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে দাসপ্রথা ছিল একটি গভীর সামাজিক সমস্যা, এমনকি রাসূলের (সা:) মৃত্যুর এক প্রজন্ম পরেই অনেক মুসলমান দাসদের ব্যাপারে ইসলামের আইন ভঙ্গ শুরু করে।

সূত্র :

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ৪:১, ২:২২১, ৪:২৫

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ৪:৩৬, ২:২৫৬

রাসূল (সা:) বলেন, "আমি তোমাদের দু'টি বিষয় মনে রাখতে বলি- একটি নামাজ এবং অন্যটি তোমাদের ডান হাতের মালিকানাভুক্তদের (অর্থাৎ দাসদের সাথে সুব্যবহার)।"

প্রশ্ন ৫ : এক হাদীসে রাসূল (সা:) বলেন, "যে ব্যক্তি দাসকে হত্যা করে আমরা তাকে হত্যা করব, যে দাসকে কষ্ট দেয় আমরা তাকে কষ্ট দিব, যে দাসকে খোজা করে (Sterilize) আমরা তাকে খোজা করব।"

জি-৯ দাসপ্রথার অবসান প্রসঙ্গ (২)

প্রশ্ন ১. এটা কি সত্য যে ইসলাম যুদ্ধবন্দি ছাড়া আর সব দাসের উৎস বন্ধ করেছিল?

২. যদিও ইসলাম দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করেনি তবুও এমন কোনো প্রমাণ আছে কি যাতে বোঝা যায় ইসলাম এটাকে একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বহাল রেখেছিল?

৩. দাসী (Concubines) প্রশ্নে ইসলামের অবস্থান কি?

৪. ইসলামে দাসের পক্ষে নিজকে মুক্ত করার কোনো সুযোগ ছিল কি? নাকি সে মালিকের ইচ্ছার অধীন ছিল?

৫. মুক্তিমূল্য গ্রহণের বিনিময়ে দাসের মুক্তি দিতে মালিক কি বাধ্য?

৬. কিভাবে একজন দাস তার মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবে?

উত্তর : ১. যুদ্ধবন্দি ছাড়া আর সব দাসের উৎস কি ইসলাম বন্ধ করেছিল

এটা সত্য যে, ইসলাম শুরুতেই যুদ্ধবন্দি ছাড়া আর সব দাসের উৎস বন্ধ করে। যদিও মুসলমানরা কখনও শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে না। তারা জাতীয়তা ও প্রভুত্ব কায়েমের জন্য অথবা তাদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতেও যুদ্ধ করে না। তারা এ উদ্দেশ্যেও অন্য রাজ্য আক্রমণ করে না যে সেখান থেকে মানুষ ধরে দাস বানাবে। ইসলামী আইনে শুধু দুটো ক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুমোদন আছে–

ক) আগ্রাসন প্রতিহত করতে।

খ) নির্যাতিত মানুষকে উদ্ধার করতে।

এসব যুদ্ধে মুসলমানরা যাদের বন্দি করত তারা মূলত: আগ্রাসী বা হামলাকারী। কাজেই এদের বন্দি করার যৌক্তিক কারণ আছে। এদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ছিল যে, এদের সাথে প্রথমত: সৎ ব্যবহার করতে হবে। দাসত্বই তাদের একমাত্র পরিণতি ছিল না। মুসলিম বন্দির সাথে বিনিময়, অর্থমূল্যে মুক্তি এবং মুসলমানদের লেখাপড়া শেখানোর বিনিময়ে মুক্তির ব্যবস্থা ছিল। তারপরও এটা বলা যায় যে, তখন এমন একটা যুগ যখন জেলখানা গড়ে উঠেনি। ফলে যুদ্ধবন্দিদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোনো মুসলিমের জিম্মায় দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

উত্তর : ২. ইসলাম যে দাসপ্রথাকে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে নিয়েছিল তার প্রমাণ

প্রথমত: ইসলাম যুদ্ধবন্দি ছাড়া আর সব দাস সংগ্রহের উৎস নিষিদ্ধ করে। অত:পর যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে কুরআন নীচের দুটো ব্যবস্থার যে কোনো একটি নিতে বলে–

ক) তাদের নি:শর্ত মুক্তি ও ক্ষমা।

খ) অর্থের বিনিময়ে অথবা মুসলিম যুদ্ধবন্দির বিনিময়ে তাদের মুক্তি দেয়া অথবা মুসলমান সমাজের উন্নয়নে তাদের মেধা বা শ্রম খাটাবার বিনিময়ে মুক্তি দেয়া।

উত্তর : ৩. দাসীদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন সেমেটিকদের মধ্যে এই প্রথা ছিল। নারীদের এই বিশেষ দাসত্ব ইসলামে অন্য সব দাসত্বের মতই গ্রহণযোগ্য নয়। দাস প্রথা অবসানে ইসলাম যেমন ব্যবস্থা নিয়েছে, তেমনি এই ঘৃণ্য ব্যবস্থার ব্যাপারেও ইসলাম একই ব্যবস্থা নিয়েছে।

ইসলাম নারী যুদ্ধবন্দিদের সাথে সাথে পুরুষ যুদ্ধবন্দিদের মতই সুব্যবহার করতে বলেছে। নারী যুদ্ধবন্দিদের বিপদের সম্ভাবনা বেশী কারণ তারা প্রায় সবাই পিতা/স্বামী/ভাইকে যুদ্ধে হারায়। ফলে তারা যুদ্ধ শেষে আর্থিক নিরাপত্তার সংকটে পড়ে পতিতাবৃত্তির শিকার হতে পারে। এসব বিপদের কথা চিন্তা করেই ইসলাম তাদের সাথে অনুমোদিত বসবাসের সুযোগ দিয়েছে। এই অনুমোদিত বসবাসের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

ক) অনুমোদিত বসবাসের সুযোগটা প্রায় বিয়ের অনুরূপ কিছু আলেম মনে করেন যে, বিবাহ ছাড়া এ রকম মিলনের অনুমতি ইসলামে নেই।

(দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আসাদ- 'দি মেসেজ অব দি কুরআন', টিকা ২৬, সূরা নিসা – অনুবাদক) মহিলা যুদ্ধবন্দি প্রায় সকল বিষয়েই স্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করত।

খ) বৈধ বিয়ের সাথে এর একটি মাত্র পার্থক্য ছিল যে এখানে স্ত্রীর মতামত (কবুল)-এর প্রয়োজন থাকত না। যুদ্ধোত্তর ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

গ) মহিলা 'বন্দি' হিসেবে থাকত না বরং সব ধরনের চলাফেরার স্বাধীনতাই পেতেন, এবং ভরণপোষণের নিশ্চয়তাসহ নিরাপত্তা পেতেন।

ঘ) প্রাচীন যুগের মতো মহিলা বন্দি অগণিত সৈনিকের ভোগ লালসার শিকার হতো না বরং একজন স্বামী-সংসার দুটোই পেত। এতে মহিলা বন্দি এবং সৈনিক উভয়েই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হত।

ঙ) দাসীদের মতো এদের সন্তানরা দাস হতো না বরং মহিলা বন্দির কোনো সন্তান হলে সে হতো মুক্ত এবং তার স্বামীর/ আশ্রয়দাতার মৃত্যুর পর সেও মুক্তি পেত।

উত্তর : ৪. দাসের পক্ষে নিজকে মুক্ত করার সুযোগ

সর্বপ্রথম ইসলামই 'মুকাতাবা' নামে এক স্কীম ঘোষণা করে। যার মাধ্যমে ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে আলাপ করে উভয়ে সম্মত একটি মুক্তিমূল্য ঠিক করবে এবং ক্রীতদাস ধীরে ধীরে উক্ত অর্থ পরিশোধ করে মুক্ত হবে। এভাবে মুকাতাবা দাসমুক্তির সূচনা করে।

উত্তর : ৫. মুক্তিমূল্য গ্রহণের বিনিময়ে দাসের মুক্তি দিতে মালিক কি বাধ্য

(মালিক কি পূর্বের চুক্তি অমান্য করতে পারে)

কুরআনের যে আয়াতে মুকাতাবার বিনিময়ে দাসমুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে আদেশ সূচক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'তাদের মুক্তি দাও'; এমন বলা হয়নি যে, 'তাদের মুকাতাবার বিনিময়ে মুক্তি দিতে পার'। বরং কুরআনে মালিককে এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন দাসকে তার মুক্তিমূল্য অর্জনে সাহায্য করে। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা:) তাঁর একজন সহযোগীকে যিনি মুকাতাবা অস্বীকার করতে চাচ্ছিলেন, তাকে অবিলম্বে দাস মুক্ত করার আদেশ দেন। যদি কুরআনের আইনে এমন বাধ্যবাধকতা না থাকত তবে খলিফা এমন আদেশ করতেন না।

উত্তর : ৬. দাস কিভাবে তার মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবে

কুরআন যাকাত বিতরণের কিছু নির্দিষ্ট খাত উল্লেখ করেছে যার একটি হল 'ক্রীতদাসকে মুক্ত করা' কাজেই প্রত্যাশী ক্রীতদাস যাকাতদাতা মুসলমানদের কাছ থেকে সহজেই যাকাত সংগ্রহ করে তার মুক্তিমূল্য অর্জন করতে পারত।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দি মুশরিকরা মুসলমানদের ব্যবহারে এত মোহিত হয়েছিল যে তাদের অনেকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ৪৭:৪

প্রশ্ন ৩ : রাসূল (সা:)-এর হাদীসে আছে, যদি কোনো ব্যক্তি তার অধীনা যুদ্ধবন্দিকে ইসলাম শিক্ষা দিয়ে মুসলমান বানায় এবং তাকে মুক্ত করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে করে, তবে সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।

প্রশ্ন ৫ : আল কুরআন ২৪:৩৩

প্রশ্ন ৬ : আল কুরআন ৯:৬০

আলী (রা:)-এর খেলাফতের সময় জনৈক ক্রীতদাস তাঁকে এসে জানায় যে সে মুকাতাবার অর্থ সংগ্রহ করতে পারছে না। তখন আলী (রা:) জনগণের কাছ থেকে তার মুক্তির প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে দেন।

জি-১০ ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব

প্রশ্ন ১. পরিবারের গুরুত্ব কি এবং ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থায় এর অবস্থান কোথায়?

২. ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব আলোচনায় মূলত: কোন্ বিষয়গুলো আসে?

৩. ইসলামী মতে পরিবারের সংজ্ঞা কি?

৪. এটা কি সত্য যে মুসলিম পরিবার মূলত: একটি বর্ধিত পরিবার (Extended Family)?

৫. কেউ যদি বলে যে পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য ও সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে কোনো আইনের প্রয়োজন নেই তবে তার উত্তর কি হবে?

৬. ইসলামের পারিবারিক কাঠামোতে রক্ত সম্পর্কের ভূমিকা কি?

৭. কোনো পালিত সন্তানের পিতৃ পরিচয় পাওয়া না গেলে পালনকারী পরিবারের নামে তার নাম রাখা যাবে কি?

৮. সন্তান পালক নেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ?

৯. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের মূল উদ্দেশ্য ও কাজ কি?

উত্তর : ১. ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব

ইসলাম পরিবারকে সমাজের একক (The cornerstone of the social system) হিসেবেই চিন্তা করে। পরিবারের শান্তি, ঐক্য ও সংহতি সমাজকেই সুসংহত ও শান্তিময় করে। আবার পরিবারের বিপর্যয় সমাজে বিপর্যয় আনে। পরিবারের দুর্বলতা শুধুমাত্র কিশোর-অপরাধ, মাদকাসক্তি, অবাধ যৌনাচার ও তালাকেরই সৃষ্টি করে না বরং সমাজ ব্যবস্থারও ধ্বংসের সূচনা করে।

উত্তর : ২. ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় মূলত: যেসব প্রসঙ্গ আসে

ক) পরিবারের সংজ্ঞা, রক্তের সম্পর্ক (Lineage) এবং পালিত সন্তান সংক্রান্ত।

খ) পরিবারের ভিত্তি এবং কেন্দ্র হিসেবে নারীর ভূমিকা।

গ) ইসলামে নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব।

ঘ) পরিবারের গঠন।

ঙ) পরিবারে পিতা-মাতা ও সন্তানের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য।

চ) পারিবারিক সমস্যা : বৈবাহিক সমস্যা, তালাক ও পুনর্বিবাহ

ছ) ইসলামের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন।

উত্তর : ৩. ইসলামে পরিবারের সংজ্ঞা

ইসলামে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতিকে এক পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে এক পরিবার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে প্রায়ই মানব জাতিকে 'আদমের (আ:) সন্তান' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। এরপর ঈমানদারদের এক পরিবারের সদস্য হিসেবে বলা হয়েছে। উম্মাহ অর্থ যারা এক আল্লাহ এবং তাঁর কিতাবসমূহ ও নবী-রাসূলদের উপর ঈমান আনেন। সর্বোপরি ইসলামে পরিবার বলতে বিবাহিত ও রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধদের বুঝানো হয়েছে।

উত্তর : ৪. মুসলিম পরিবার কি প্রকৃত অর্থে বর্ধিত পরিবার (Extended Family)

নিউক্লিয়াস পরিবারের ধারণাটি আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের। যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানরাই থাকেন। বর্ধিত পরিবারের ধারণাটি প্রাচ্য দেশীয় যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সন্তান, পিতামাতা, পিতামহ, মাতামহ এবং কখনো কখনো এক বাড়ীতে বাসরত জ্ঞাতি ভাইদের পরিবারসমূহ। মুসলিম পরিবার-নিউক্লিয়ার পরিবার অথবা বর্ধিত পরিবার- কোনটি হবে এমন কোনো আদেশ ইসলামে নেই। এখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান ও সন্তানের পিতামহ-মাতামহ (First degree relatives) নিয়েই সাধারণত: পরিবার গঠিত হয়। এছাড়া দ্বিতীয় ধারা (Second degree relatives) বা তৃতীয় ধারার (Third degree relatives) আত্মীয়রাও একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই। ইসলামে প্রথম ধারার আত্মীয়দের অধিকারের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান আছে, যা অন্যদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাজহাবে (Schools of jurisprudence)-এ বিভিন্নভাবে উল্লিখিত।

উত্তর : ৫. পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে আইনের প্রয়োজন কেন

যদিও পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক দায়িত্ব কি হবে তা মানুষ সহজাতভাবেই অবহিত, তবুও এই সহজাত প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিকভাবে চালিত করতেই আইনের প্রয়োজন আছে। পরিবারের সকল সদস্যদের অধিকার রক্ষার গ্যারান্টি হিসেবেই আইন আবশ্যক। নচেৎ কোনো সন্তানের প্রতি বেশি আবেগবশত: বাবা-মা অন্য সন্তানকে বঞ্চিত করেও বসতে পারেন। মুসলিম পারিবারিক আইন পরিবারের সকল সদস্যের ন্যূনতম অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। এজন্য ইসলামে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক-সহজাত অনুভূতি ও আইন-উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে তৈরী হয়।

উত্তর : ৬. ইসলামের পারিবারিক কাঠামোতে রক্ত সম্পর্কের ভূমিকা

মুসলিম পরিবারে রক্তের সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এ থেকেই পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিধান সৃষ্টি। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে কেউ তার পালক সন্তানকে নিজের সন্তানরূপে দাবি করতে

পারবে না। কোনো পালক সন্তানও নিজকে তার পালক পিতা-মাতার সন্তান বলে দাবি করতে পারবে না।

এক্ষেত্রে ইসলামের আর দু'টি বিধান হলো :

ক) কেউ তার নিজ পরিবারের নামে পালিত সন্তানের নাম রাখতে পারবে না।

খ) কেউ প্রাচীন যুগের 'আজ-জিহার' পন্থায় তালাক দিতে পারবে না (স্বামী রাগের বশে স্ত্রীকে বলবে তুমি আমার মায়ের মতো তা হলে তালাক হয়ে যাবে) কারণ এটা হচ্ছে মিথ্যাচার।

উত্তর : ৭. পালিত সন্তানের পিতৃ পরিচয় পাওয়া না গেলে পালক পিতা-মাতার পরিবারের নামে তার নাম রাখা যাবে কি?

কুরআন পালক সন্তান পালনকারী মুসলমানদের আদেশ দেয় 'তাদের পিতৃ পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে'। যদি তাদের পিতৃপরিচয় না থাকে তবে কুরআন বলে, 'তারা তোমাদের ঈমানী ভাই, এবং তোমাদের পোষ্য, তাদের দয়ার সাথে লালন কর। কিন্তু তাদের পরিবারের নামে নাম রাখা ঠিক নয়।

উত্তর : ৮. সন্তান পালক নেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ?

যদি পালক নেয়া বলতে কেউ এটা বুঝাতে চান যে, তিনি সন্তান দত্তক নেবেন, তাকে নিজের সন্তান পরিচয়ে বড় করবেন, তাকে নিজের সন্তানের মতো সম্পদে উত্তরাধিকার দেবেন- তবে এই অর্থে সন্তান পালক নেয়া অবৈধ। কারণ এক্ষেত্রে পালিত সন্তানের নিজ বংশ পরিচয় লুকান হয় বা হারিয়ে যায় এবং নিজ সন্তান ও আত্মীয়দের হক নষ্ট করা হয়। আর যদি পালক নেয়া বলতে কেউ এটা বোঝান যে, কোনো অসহায় ও এতিম বাচ্চাকে দয়াবশত: লালন পালন করে বড় করা হল তার পূর্ব পরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে, তবে এটা ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু বৈধই নয় বরং পরম সওয়াবের কাজ। আল্লাহ এমন ব্যক্তিদের জন্য বড় পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও পালিত শিশু সম্পদে উত্তরাধিকার পায় না তবুও পালনকারী ইচ্ছে করলে তার সম্পদের অংশ (সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ) দান করতে পারেন।

উত্তর : ৯. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের মর্যাদা ও বিশেষত্ব

ক) ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার শুধু মানুষের ঐচ্ছিক বা স্বত:স্ফূর্ত কোনো প্রতিষ্ঠান নয় বরং আল্লাহ নির্ধারিত আধ্যাত্মিক ইনস্টিটিউশন। পরিবারের নামে কোনো কোনো সমাজে যে সব বিকৃত চর্চা চলছে (যৌথ বিবাহ, সমকামী বিবাহ ইত্যাদি) ইসলামে তা নিষেধ।

খ) পরিবার এবং বিয়ে ইসলামে এক পবিত্র বন্ধন হিসেবে স্বীকৃত, যা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মর্যাদা ও দায়িত্ব নিশ্চিত করে।

গ) পরিবারের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস আল্লাহর বিশ্বাস ও আনুগত্যকে অতিক্রম করতে পারবে না।

ঘ) ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে 'সমমর্যাদা' (equality) প্রদান করে। স্বামী-স্ত্রী সম্মতির ভিত্তিতে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমার মধ্যে পরিবারের সকল দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারেন।

উত্তর : ১০. পরিবারের কাজ ও লক্ষ্য

ক) সন্তান জন্মের মাধ্যমে মানব বংশধারা রক্ষা।

খ) একমাত্র বৈধ যৌনানন্দ লাভের সুযোগ দিয়ে সমাজ এবং ব্যক্তির নৈতিক জীবন রক্ষা করা।

গ) সন্তানের সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি।

ঘ) মানুষের মানবিক এবং আবেগপ্রসূত চাহিদা পূরণ।

ঙ) সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

চ) মানুষকে কঠোর পরিশ্রমী করা, দায়িত্ব অনুভূতি জাগ্রত করে পরিবারের স্বার্থে ত্যাগ করার মানসিকতা তৈরী করা।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ৪:১, ৪৯:১০

প্রশ্ন ৬ : আল কুরআন ৩৩:৪-৬

প্রশ্ন ৭ : আল কুরআন ৩৩:৫

রাসূল (সা:) তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ (রা:)-এর নাম দিয়েছিলেন যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ। কিন্তু যখন পালিত সন্তানকে নিজ পরিবারের নামে নাম না দেবার আদেশ আসে তখন তাঁর নাম তাঁর পিতার নামে রাখেন যায়েদ ইবনে হারিস।

জি-১১ প্রাচীন সভ্যতায় নারীর অবস্থান

প্রশ্ন ১. প্রাচীন বিভিন্ন সভ্যতায় নারীর মর্যাদা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন কোথায়?

২. প্রাচীন প্রাচ্য দেশীয় সভ্যতা সমূহে নারীর অবস্থান কেমন ছিল?

৩. প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা সমূহে নারীর অবস্থান কি কিছুটা ভাল ছিল?

৪. প্রাচীনকালে মধ্যপ্রাচ্যে নারীরা কি মর্যাদা পেত?

৫. নারীর প্রতি এই বিশ্বজনীন নেতিবাচক আচরণের কোনো ব্যতিক্রম কি প্রাচীন সভ্যতার কোথাও দেখা যায়?

৬. বাইবেল এবং কুরআনে নারীর অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উত্তর : ১. বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় নারীর মর্যাদা

নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রদানে তৎকালীন সকল সভ্যতার চেয়ে ইসলাম যে কত অগ্রগামী ছিল তা অনুধাবন করার জন্যেই বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় নারীর মর্যাদা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। যেহেতু ইসলাম ছিল আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান সেহেতু এমন হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

উত্তর : ২. প্রাচীন প্রাচ্য দেশীয় সভ্যতা সমূহে নারীর অবস্থান

নারীদের প্রতি প্রাচীন চীনাদের আচরণের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে হু সুয়ান নামক কবির লেখায়, "নারী হওয়া বড় দু:খের, পৃথিবীতে কোনো কিছুই নারীর মতো এত সস্তা নয়।" কনফুসিয়াস বলেন, "নারীর মূল কাজ আনুগত্য, শৈশব কৈশোরে পিতার, বিয়ের পর স্বামীর এবং বিধবা হবার পর পুত্রের।" তিনি আরও বলেন যে, এই আনুগত্য হবে প্রশ্নাতীত এবং একচ্ছত্র (অথচ ইসলামে আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রশ্নাতীত এবং একচ্ছত্র আনুগত্য হারাম)। বৌদ্ধ ধর্মেও নারীকে নীচ এবং পাপে পূর্ণ হিসেবেই দেখানো হয়েছে, বলা হয়েছে নারীর মতো ভয়াবহ আর কিছুই নেই।

হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থা আরও খারাপ ছিল। বেদ বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়া অথবা কোনো ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে নারীর কোনো ভূমিকা ছিল না। বিধবা হবার পর পুনর্বিবাহ বা সম্পত্তির অধিকার তো দূরের কথা, স্বামীর সাথে এক চিতায় সহমরণই ছিল তার একমাত্র পরিণতি।

উত্তর : ৩. পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী

গ্রীক সভ্যতায় নারী ছিল পিতা, ভাই বা অন্য পুরুষ আত্মীয়ের অধীনা, কেননা তাদেরকে minor মনে করা হত। বিয়ের সময় তাদের মতামতের কোনো প্রয়োজন হতো না এবং পিতার কাছ থেকে সে যেত তার স্বামী নামক প্রভুর ঘরে। রোমান সভ্যতায় নারী যে পৃথকভাবে কিছু করতে সক্ষম তাই বিশ্বাস করা হতো না (regarded as 'babes')। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা অনুসারে কোনো মহিলা বিয়ে করলে স্বাভাবিকভাবেই তার সম্পদের মালিক হত তার স্বামী। সেই সম্পত্তি আর সে ফেরত নিতে বা স্বামীর অনুমতি ছাড়া খরচ করতেও পারত না। মহিলারা কোনো উইল বা চুক্তি করতে পারত না; এমনকি নিজের সম্পদের ব্যাপারেও না।

উত্তর : ৪. প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে নারীর অবস্থান

প্রাচীন আরবে হিব্রু এবং আরবী রীতি চালু ছিল। প্রাচীনকালে আরবরা যখন শুনতো তার কন্যা সন্তান হয়েছে তখন রাগে তাদের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করতো। এটা ছিল এমন একটা যুগ যখন কন্যাশিশুদের জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করা হত। ধারণা করা হতো যে কন্যাশিশু পিতার অসম্মানের কারণ হবে। পক্ষান্তরে পুত্রের জন্ম সংবাদে তারা আনন্দে মতোয়ারা হত। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সন্তানরা পিতার বিধবা স্ত্রীদেরও মালিক হত।

উত্তর : ৫. বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি এই নেতিবাচক আচরণের ব্যতিক্রম

এটা ঢালাওভাবে বলা ভুল হবে যে, সকল প্রাচীন সভ্যতাই সকল ক্ষেত্রে নারীকে অবমূল্যায়ন করত বা তার প্রতি নেতিবাচক আচরণ দেখাত। এর কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয় ছিল। কোনো কোনো সভ্যতায় ভদ্র ঘরের নারীদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। স্বীয় অধ্যবসায় ও মেধার গুণে কোনো কোনো নারী সমাজে বিশেষ প্রভাবও বিস্তার করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত বেশ কিছু সভ্যতায় দেখা যায় প্রভুকে নারীর আকৃতিতে কল্পনা করা হয়েছে। মিসর, বেবিলন, গ্রীস, সুমারিয়া ও রোমে একজন মহিলা দেবীর পূজা করা হতো যার থেকে অন্য দেব-দেবীর সৃষ্টি। এসব মিথলজির সাথে বাইবেলে বর্ণিত গড-দি-মাদার এবং তাঁর 'পবিত্র পুত্রের' মিল লক্ষ্য করা যায়।

উত্তর : ৬. বাইবেল ও কুরআনে নারীর তুলনামূলক অবস্থান

বিভিন্ন সভ্যতায় নারীর অবস্থান আলোচনার পর তিনটি প্রধান ধর্মে যথা ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে। এখানে ভূমিকায় এতটুকু বলা যায় যে, এই তিন ধর্মে প্রদত্ত নারীর অধিকারে কোথাও কোথাও মিল আছে, আবার কোথাও অমিল আছে। কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টান প্রচার মাধ্যমে ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে এত বেশী নেতিবাচক প্রচারণা পাশ্চাত্যে রয়েছে যা পাশ্চাত্যের বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিচ্ছে।

সূত্র :

প্রশ্ন ২-৪ : Encyclopaedia Britannica

Marriage East and West by- 'David and Vera Mace History of Civilizations.- Vol, 13, E.A Allen

প্রশ্ন ৫ : প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় এই দেবির নাম ছিল আইসিস (Isis), ব্যাবিলনে তিয়ামাত (Tiamat), গ্রীসে দ্যামত্রি (Demetre) এবং রোমে ম্যালেন (Malen)।

জি-১২ ইহুদী-খ্রিস্টান এবং মুসলিম ধর্মগ্রন্থে নারী (১)

প্রশ্ন ১. কুরআন এবং বাইবেলে বর্ণিত নারীর মর্যাদা ও অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনায় কোন্ কোন্ বিষয় আসে?

২. বিবি হাওয়া (আ:)-এর জন্ম সংক্রান্ত বিষয়ে দু'টো ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায় কি কি মিল এবং অমিল আছে?

৩. প্রথম পাপের জন্য কে দায়ী ছিল? আদম (আ:) নাকি বিবি হাওয়া (আ:)?

৪. প্রথম পাপের সাথে সংশ্লিষ্ট সরীসৃপ (সাপ)-এর কথা কি শুধু বাইবেলেই আছে?

৫. গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব প্রসঙ্গে ইসলাম, ইহুদী ও খ্রিস্ট ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিতে কি কি মিল-অমিল আছে?

৬. মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব সম্পর্কে ইসলাম যে বিধান দেয় ইহুদী-খ্রিস্ট ধর্মেও কি একই রকম বিধান দেয়?

উত্তর : ১. নারীর মর্যাদা ও অবস্থান প্রশ্নে কুরআন ও বাইবেলের নির্দেশনার তুলনামূলক আলোচনায় যেসব বিষয় আসে

ক) বিবি হাওয়া (আ:)-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গ।

খ) পৃথিবীর প্রথম পাপ ও তার জন্য কে দায়ী।

গ) গর্ভাবস্থা এবং প্রসবকালীন যন্ত্রণার প্রসঙ্গ।

ঘ) মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব সংক্রান্ত প্রসঙ্গ।

উত্তর : ২. বিবি হাওয়া (আ:)-এর জন্ম প্রসঙ্গে বাইবেল ও কুরআন

বাইবেল ও কুরআন উভয়ই এ বিষয়ে একমত যে, প্রথমে আদম (আ:)-কে সৃষ্টি করা হয়, অত:পর বিবি হাওয়া (আ:)-এর সৃষ্টি। এখানে বাইবেল আরো একটু বর্ণনা দেয় যে, আদম (আ:)-এর পাঁজরের হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয় (যার ভিত্তিতে অনেকে নারীকে বাঁকা ও ভঙ্গুর স্বভাবের বলে থাকে)। কিন্তু কুরআনে এরকম কিছুর উল্লেখ নেই। বরং কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ প্রথমে এক আত্মার সৃষ্টি করেন এবং তা থেকেই উভয়ের সৃষ্টি। কাজেই এক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনায় নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা এবং সম অধিকারের ইঙ্গিত আছে।

উত্তর : ৩. প্রথম পাপ (আদি পাপ)-এর জন্য দায়ী কে

ইহুদী, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মে এ বিষয় উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ্ আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:)-কে একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে নিষেধ করেন (কুরআনে অবশ্য গাছের নাম ও প্রকৃতি উল্লেখ করা হয়নি)। এই নিষেধাজ্ঞা যে অমান্য করা হয়েছিল তাও সব ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের কাজটি কীভাবে হয়েছিল তার বর্ণনায় ধর্ম গ্রন্থগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে। বাইবেল এ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য প্রাথমিকভাবে বিবি হাওয়াকে দায়ী করে। বাইবেল বলে বিবি হাওয়া (আ:) এক সরীসৃপ কর্তৃক উক্ত গাছ থেকে ফল খেতে প্রলুব্ধ হন এবং তিনি নিজে আদম (আ:)-কে প্রলুব্ধ করেন। কুরআনের বর্ণনায় এমন কোনো সরীসৃপের উল্লেখ নেই। কুরআন বলে আদম (আ:)-এর বিশেষ মর্যাদায় হিংসাগ্রস্ত শয়তান প্রথম থেকেই তাদের ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। কুরআনের পর পর আটটি আয়াতে যেখানে আদম-হাওয়ার ঘটনা বিবৃত হয়েছে সেখানে পনের বার তারা দু'জন (Both of them) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই ভুলের জন্য কুরআনে নির্দিষ্টভাবে কাউকে দায়ী করা হয়নি। বরং কুরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রাথমিক দায়িত্ব কিছুটা হলেও আদম (আ:)-এর উপর দেয়া হয়েছে। কুরআনে আরও বলা হয়েছে যে, আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:) অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করেন। কাজেই কুরআনে কোনো আদিপাপের ধারণা নেই।

উত্তর : ৪. সরীসৃপের ধারণাটি কি শুধু বাইবেলেই এসেছে?

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে বহু প্রাচীন ধর্মে সাপকে শয়তানের প্রতীক রূপে দেখান হয়েছে। এমনকি দেবমাতার প্রাচীন চিত্রে দেখা যায় জীবন বৃক্ষকে পেঁচিয়ে রেখেছে সাপ। সাপ প্রসঙ্গে এই ধারণা হিব্রু ধর্মগ্রন্থ উদ্ভবের বহু আগেই প্রচলিত ছিল।

উত্তর : ৫. গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব প্রসঙ্গে ইহুদী-খ্রিস্ট মতো ও ইসলাম

বাইবেল বলে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে আদি পাপ করায় বিবি হাওয়াকে স্রষ্টা এই অভিশাপ দেন যে, তার পাপের জন্য তিনি তার কষ্টকে বহুগুণে বাড়াবেন। এই কষ্টই প্রত্যেক নারী গর্ভাবস্থায় ও সন্তান জন্মের সময় ভোগ করে। সন্তান জন্মের পর নারীর পবিত্রতা সম্পর্কে বাইবেল যা বলে তা লক্ষ্য করার মত। যদি মহিলা পুত্র সন্তান জন্ম দেয় তবে সে এক সপ্তাহ ও আরও তেত্রিশ দিনের জন্য অপবিত্র (অশুচি)। যদি সে কন্যা সন্তান জন্ম দেয় তবে দুই সপ্তাহ ও আরও ছেষট্টি দিনের জন্য অপবিত্র। এই অপবিত্র মেয়াদ শেষে সে ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে নিজের অপবিত্রতা এবং পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে।

পক্ষান্তরে ইসলাম নারীর গর্ভাবস্থাকে মর্যাদা ও সহানুভূতির সাথে বর্ণনা করেছে। ইসলাম বলে এই সময় স্বামী-স্ত্রী ধার্মিক সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে যৌথভাবে দোয়া

করবে। ইসলাম সন্তানদের আদেশ দেয় পিতা-মাতার প্রতি, বিশেষভাবে মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে কারণ তিনি কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন। হাদীসে গর্ভাবস্থাকে জেহাদের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে প্রসবকালীন মৃত্যুবরণকারী নারী শহীদের মর্যাদা পাবে! সন্তান জন্মের পর নামাজ, রোজা এবং স্বামীর সহবাসের পূর্বে অপেক্ষার সময়টি ইসলামে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের এবং এটি কোনো ঘৃণার বা প্রায়শ্চিত্তের বিষয় নয়। শুধু স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার বিষয় (Cleanliness & Hyegine)।

উত্তর : ৬. মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব সম্পর্কে দুই ধারার দৃষ্টিভঙ্গি

বাইবেল বলে মহিলাদের মাসিকের সময় তাদের সাতদিন 'পৃথক' রাখতে হবে। যদি এর মাঝে কেউ তাদের স্পর্শ করে অথবা তাদের বিছানা স্পর্শ , এমনকি তারা যে জায়গায় বসেছে সে জায়গা স্পর্শ করে তবে সেও পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র হবে এবং তাকে গোসল করতে হবে। এই সাতদিন পর মহিলাকে ধর্মযাজকের কাছে উপস্থিত হয়ে দু'বার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে- একটি অপবিত্রতার জন্য, অপরটি পাপের জন্য, কারণ ঋতুস্রাব একটি পাপ।

পক্ষান্তরে কুরআন নারীর ঋতুস্রাবকে কোনো পাপ বা নোংরামী হিসেবে বর্ণনা করেনি। বা এর জন্য কোনো প্রায়শ্চিত্তও নির্ধারণ করেনি। যৌক্তিক কারণেই স্বামীর সাথে সহবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে পৃথক বসবাস বা পরিবারের অন্যান্য কাজ থেকে দূরে থাকতে বলা হয়নি। খোদ রাসূল (সা:) তাঁর স্ত্রীদের ঋতুস্রাবের সময় আলাদা বিছানায় থাকতেন না। কুরআনে এটাকে 'ব্যাথা' হিসেবে বর্ণনা করেছে যাতে মেয়েদের প্রতি আরও সহানুভূতি প্রকাশ পায়। পরিশেষে মাসিক ঋতুস্রাব শেষ হলে প্রায়শ্চিত্ত (atonement) করার কোনো প্রশ্নই আসে না, বরং কেবল গোসল করলেই হয়।

সূত্র :

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ৪:১ জেনেসিস ২:২-১২

প্রশ্ন ৩ : জেনেসিস-৩ (Chapter-3), ৩৮:৭১, ৭:১১, ২:৩১, ১৫:২৮, ১৭:৬১, ২০:১১৫
রাসূল (সা:) বলেন যে, হাশরের দিন মানুষ আদম (আ:)-এর কাছে যাবে এবং তাঁকে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সুপারিশ (শাফায়াত) করতে বলবে, তখন তিনি বলবেন, "আমি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছি, কাজেই আমি সুপারিশ করতে পারবো না।"

প্রশ্ন ৫ : জেনেসিস ৩:১৬, ৭:১৮৯, ৩১:১৪, ৪৬:১৫
রাসূল (সা:) বলেন, যে মহিলা সন্তান জন্মের পর মারা যায়, তার সন্তান তাকে বেহেস্তে টেনে নিয়ে যায়'।

প্রশ্ন ৬ : LeV) Ch. 15 V) 19

জি-১৩ ইহুদী-খ্রিস্টান এবং মুসলিম ধর্মগ্রন্থে নারী (২)

প্রশ্ন ১. ধর্ষণের শিকার নারীর প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কুরআন ও বাইবেল কি বলেছে?

২. যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনে তবে সে ক্ষেত্রে দুই ধর্মগ্রন্থে কি বিধান দেয়?

৩. দুই ধর্মগ্রন্থে বিয়ে সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়?

৪. অনেক খ্রিস্টান বলেন যে, যেহেতু ওল্ড টেস্টামেন্ট এখন চালু নেই সেহেতু এর সাথে কুরআনের তুলনা করা ঠিক না, এই যুক্তির ব্যাপারে কি বলবেন?

৫. নিউ টেস্টামেন্ট অনুসারে যিশু খ্রিস্টের মতে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান কেমন?

৬. যিশুর অনুসারীরা কি এই প্রশ্নে যিশুর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছিল?

৭. মেরী (রা:)-এর ব্যাপারে সম্মান (Veneration) পোষণকারী পল-এর নারীর অধিকার প্রশ্নে অবস্থান কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

৮. নারী সংক্রান্ত পল-এর দৃষ্টিভঙ্গি যে চার্চকে প্রভাবিত করেছিল তার কোনো প্রমাণ আছে কি?

উত্তর : ১. ধর্ষণের শিকার নারীর প্রতি আচরণ প্রশ্নে ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ

ওল্ড টেস্টামেন্ট মতে যদি কেউ কোনো বিবাহিত মহিলাকে ধর্ষণ করে তবে উভয়কেই পাথর ছুঁড়ে মারতে হবে। যদি ধর্ষিতা অবিবাহিতা হয় তবে ধর্ষক ধর্ষিতার পিতাকে জরিমানা দেবে এবং ধর্ষিতাকে বিয়ে করবে এবং তাকে কখনো তালাক দিতে পারবে না। কিন্তু ইসলাম বলে ধর্ষিতা হচ্ছে আক্রমণের শিকার; কাজেই তার কোনো শাস্তির প্রশ্ন উঠে না। ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্ষিতার পিতাকে বিপুল অর্থ জরিমানা দিয়ে সে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। ইসলাম কখনই ধর্ষকের সাথে ধর্ষিতার বিয়ের বিধান দেয় না কারণ এটা তো ধর্ষকের জন্য শাস্তি না হয়ে উল্টো পুরস্কার হয়ে দেখা দেয়। বরং ইসলাম নর-নারী উভয়কে অসৎ লোককে (Unchaste) বিয়ে না করতে বলে, আর ধর্ষক তো নি:সন্দেহে অসৎ।

উত্তর : ২. স্বামী কর্তৃক ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত স্ত্রী সম্পর্কে দুই ধর্ম যা বলে

এক্ষেত্রে ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে অভিযুক্ত স্ত্রীকে ধর্মযাজক নানাভাবে জেরা করবেন। যার এক পর্যায়ে তিনি কিছু ময়লা, তিক্ত পানি নিয়ে তাকে স্বীকারোক্তি দিতে বলবেন। যদি

সে না দেয় তবে তার পেট ফুলে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে ঐ ময়লা, তিক্ত পানি খেতে বাধ্য করা হবে। অর্থাৎ সেখানে স্বামীর অভিযোগ সত্য ধরে নিয়েই এগিয়ে যাওয়া হয়।

পক্ষান্তরে ইসলাম বলে এক্ষেত্রে স্বামীকে তার বক্তব্যের সত্যতার বিষয়ে পাঁচবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলতে হবে যে, তার দাবি সত্য। এর জবাবে মহিলাও যদি পাঁচবার কসম খেয়ে বলে যে, সে নির্দোষ তবে আইনের চোখে সে নির্দোষই থেকে যাবে এবং অবশেষে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো স্ত্রীলোক সম্পর্কে ব্যাভিচারের অভিযোগ উত্থাপনই করতে পারবে না যদি তার দাবির সমর্থনে আরও কমপক্ষে তিনজন ধার্মিক এবং সত্যবাদী চাক্ষুষ সাক্ষী না আনতে পারে। যদি এমন অভিযোগকারী তিনজন সাক্ষী না আনতে পারে তবে অভিযোগকারীকে কমপক্ষে আশি ঘা দোররা মেরে শাস্তি দিতে বলা হয়েছে। ইসলাম মূলত:ই নারীদের সম্মানিত এবং সতী মনে করে, তাই কোনো নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপনের এমন কড়া পূর্বশর্ত আরোপ করেছে। এতে সমাজে সবসময় নারীদের ব্যাপারে সু ধারণা বিরাজ করবে। [এ পদ্ধতি হদযোগ্য ব্যভিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাযীরযোগ্য ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নয় (দ্রষ্টব্য- পাকিস্তান ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের হদুদ আইন)- অনুবাদক]

উত্তর : ৩. দুই ধর্মে বিয়ের প্রসঙ্গ যেভাবে এসেছে

ইহুদী আইন এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট মতে সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত যে বিয়ে, তাতে স্ত্রী স্বামীর লর্ডশীপে (রাজত্বে) প্রবেশ করে। শাইয়ান সম্পাদিত এন্সাইক্লোপেডিয়া বাইব্লিকা বলে, "বিয়েতে মেয়েদের মতামত অপ্রয়োজনীয়....."। একই পুস্তকে বেট্রোথাল (Betrothal) নামক বিয়ের কথা এসেছে যেখানে ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে স্ত্রী লাভ করা হয়। এক্ষেত্রে তালাকের একমাত্র অধিকার স্বামীর। কারণ তার স্ত্রী 'তার সম্পত্তি (property)"।

পক্ষান্তরে ইসলামে বিয়ের জন্য মেয়ের মতামত 'অত্যাবশ্যক শর্ত'। মোহরানার অর্থ স্ত্রী উপহার হিসেবেই লাভ করে, কোনো 'ক্রয়মূল্য' হিসেবে নয়। তালাকের অধিকার উভয়েরই সমান (যদিও পদ্ধতি ভিন্ন- অনুবাদক)।

উত্তর : ৪. ইসলামের সাথে ইহুদী-খ্রিস্টান রীতির তুলনায় ওল্ড টেস্টামেন্টের উদ্ধৃতি গ্রহণ প্রসঙ্গে

যদিও এটা সত্য যে, ওল্ড টেস্টামেন্টের ইহুদি আইনগুলো এখন আর চালু নেই তবু নিম্ন লিখিত কারণে এর উদ্ধৃতি নেয়া যায় :

ক) নিউ টেস্টামেন্ট লেখকরা প্রায়ই যিশুখ্রিস্টের আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যতবাণী প্রশ্নে ওল্ড টেস্টামেন্টের উদ্ধৃতি নিয়েছেন; কাজেই অন্যান্য বিষয়েও এর উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য।

খ) যিশু বলেছেন তিনি মূসার (আ:) আইনকে পূর্ণতা দিতে এসেছেন; একে ধ্বংস করতে নয়। কাজেই সেই আইনের আবেদন এখনো আছে।

গ) তদুপরি ওল্ড টেস্টামেন্টের আবেদন যিশুর অন্তর্ধানের পরও বহাল ছিল বিশেষত: সেন্ট পলের কাছে।

উত্তর : ৫. নারীর মর্যাদা ও অবস্থান প্রশ্নে যীশু'র দৃষ্টিভঙ্গি

নারীর প্রতি যিশু কোনো নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন না। শোনা যায় তিনি আদি পাপের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। মেয়েরা এই পাপ বয়ে চলছে বলে তিনি মনে করতেন না। প্রসবকালীন যন্ত্রণা প্রসঙ্গে তিনি বলতেন এটা যন্ত্রণার হলেও সন্তান জন্মের পর মা সুখী হয়। তাঁর এই সহানুভূতিশীল মন্তব্যও ওল্ড টেস্টামেন্টের নেতিবাচক মন্তব্য থেকে পৃথক। তাঁর অনুসারীদের কয়েকজন মহিলা ছিলেন যারা তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী।

উত্তর : ৬. যিশুর অন্তর্ধানের পর নারী প্রসঙ্গে তাঁর শিষ্যদের অবস্থান

যদিও যিশুর কয়েকজন অনুসারী নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন কিন্তু তবুও সেন্ট পলসহ অধিকাংশই নারীর ব্যাপারে যিশুর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন। সেন্ট পল বলেন, "নারী নিরবতার মধ্যেই জীবন যাপন করবে, তাকে শিক্ষিত করার বা পুরুষের উপর কর্তৃত্বের সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই।" তিনি নারী প্রসঙ্গে ওল্ড টেস্টামেন্টের দৃষ্টিভঙ্গিই পুনর্ব্যক্ত করেন যে, আদম (আ:)-কে প্রথম সৃষ্টি করা হয় এবং তাঁর পাঁজরের হাড় থেকেই বিবি হাওয়া (আ:)-কে সৃষ্টি করা হয়। বিবি হাওয়া (আ:) সাপের প্ররোচনায় আদম (আ:)-কে আদি পাপ করতে উৎসাহিত করেন। এই আদি পাপের গ্লানি সকল মহিলাকে বহন করতে হবে। শুধু সন্তান জন্ম, সততা এবং সেবার মাধ্যমেই পাপ মোচন সম্ভব। তিনি আরও বলতেন আল্লাহ নিজের মতো করে পুরুষকে বানিয়েছেন আর পুরুষ থেকে নারী। ফলে নারী অবশ্যই পুরুষের চেয়ে নিম্নমানের। নারীর প্রতি ঘৃণাবশত: তিনি চিরকুমার থেকে যান এবং তাঁর অনুসারীদেরও চিরকুমার থাকতে আদেশ করেন।

উত্তর : ৭. নারীর প্রতি এই নেতিবাচক আচরণকে মেরী (আ:)-কে সম্মান করার সাথে তুলনা প্রসঙ্গে

যদিও যিশুর শিষ্যরা নারীর প্রতি চরম নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন কিন্তু তারা মেরী (আ:)-কে বিশেষ সম্মান করতেন কারণ তিনি 'ঈশ্বরের জন্মদাত্রী'। এ ধরনের দ্বিমুখী আচরণ কিন্তু বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায়ও দেখা যায় যেখানে নারীকে দেব-দেবীর জন্মদাত্রী ভাবা হত, নারীমূর্তির পূজা হতো অথচ সেসব সমাজের নারীর কোনো মর্যাদা বা অধিকার ছিল না।

উত্তর : ৮. পল-এর দৃষ্টিভঙ্গি চার্চকে প্রভাবিত করার প্রমাণ

প্রাথমিক কালের খ্রিস্টান যাজকদের উপর পল-এর চিন্তাধারার ব্যাপক প্রভাব সর্বক্ষেত্রে ছিল। নারীর প্রতি পল-এর নেতিবাচক ধারণার প্রভাব প্রথম যুগের যাজকদের বিভিন্ন লেখায় দেখা যায় যেমন Lecki তে আছে 'নারী হচ্ছে সমস্ত দোজখের দরজা, সকল রোগের জননী।' আরও বলা হয় নারী হয়ে জন্ম নেয়ার জন্য তাকে সার্বক্ষণিক অনুশোচনায় থাকা উচিৎ (Lecki)। সেন্ট গাষ্টিনসহ প্রথম প্রায় সকল যুগের ফাদার বিবি হাওয়ার আদি পাপে বিশ্বাস করতেন এবং সব নারীই যে এই পাপ বয়ে চলছে তা মানতেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : Deut. CH.22 V. 22; CH. 24 V. 26

প্রশ্ন ২ : Numb. Ch. 5 V. 12-28.

প্রশ্ন ৩ : Gen. CH. 3 V. 16. Gen. CH. 24 V. 58, CH. 4. V.4

এটা লক্ষণীয় যে, ইহুদী পুরুষরা একটি প্রাচীন ইসরাইলীয় দোয়া পড়েন, "ও ইশ্বর, আমাকে নারী না বানানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

প্রশ্ন ৫ : John. CH. 16

প্রশ্ন ৬ : 1st Peter. CH. 3

1st Tim. CH. 2. V. 11

1st Corinth. CH. 11. V. 3

2nd Corinth. CH. 11.

জি-১৪ ইসলামে নারীর মর্যাদা আধ্যাত্মিক প্রেক্ষিত

প্রশ্ন ১. ইসলামে নারীর অবস্থান কোথায়?

২. আধ্যাত্মিক প্রেক্ষিতে ইসলামে নারীর অবস্থান কেমন?

৩. বিশ্বাসী মহিলারা যে বিশ্বাসী পুরুষের সমান পুরস্কার পাবেন এমন কোনো প্রমাণ কুরআনে আছে কি?

৪. এই আধ্যাত্মিক সমতা কি প্রথাগত ধর্মীয় কাজের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে?

৫. ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে ইসলাম মেয়েদের কোনো সুবিধা বা ছাড় দিয়েছে কি?

৬. যদি কেউ বলে যে এসব ছাড় নারীর অবস্থানকে নীচু করেছে এবং কিছু মেয়েলী সমস্যায় তাদের আল্লাহর এবাদতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে তবে তার উত্তরে কি বলবেন?

৭. নারীর ধর্মীয় ক্ষমতায়ন (Ordination)-এর ধারণাটি খ্রিস্টানদের মধ্যে বিশ্বস্তমত হচ্ছে, ইসলামে এমন কোনো সুযোগ আছে কি?

৮. যদি কেউ অভিযোগ করে যে নামাজের জামাতে মেয়েদের পুরুষের পেছনে স্থান দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তবে কি বলবেন?

৯. কেন সকল নবীরা পুরুষ এবং তা থেকে একথাই কি বলা যায় যে, সকল ধর্মই পুরুষ কেন্দ্রিক?

উত্তর : ১. ইসলামের নারীর অবস্থান

ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে এবং তার মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। যদিও কোনো কোনো 'মুসলিম' সমাজ অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে নারীর ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা দিচ্ছে না' তথাপি কুরআন এবং হাদীস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, একমাত্র ইসলামই নারীকে আধ্যাত্মিক, আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অনুপম মর্যাদা দিয়েছে।

উত্তর : ২. ইসলামে নারীর আধ্যাত্মিক অবস্থান

প্রথমত: ইসলামে কোনো আদিপাপের ধারণাই নেই এবং এর দায়ভার বিবি হাওয়া (আ:) থেকে সকল মহিলাদের উপর আসবারও কোনো সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত: যখন খ্রিস্টান বিশ্ব নারীর আত্মা আছে কি না এবং নারী মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা- এই বিতর্ক ছিল। তখন ইসলামই ঘোষণা করে যে, প্রথম মানব-মানবী একই রূহ

(Essence) থেকে সৃষ্টি। আল্লাহ মানব-মানবী উভয়কে সৃষ্টি করে নিজের নূর থেকে তাদের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। এভাবে ইসলাম মানব-মানবী উভয়কে মূলত: একই মর্যাদা দেয়।

উত্তর : ৩. বিশ্বাসী নারী এবং বিশ্বাসী পুরুষ যে সমান পুরস্কার পাবেন তার প্রমাণ

কুরআনে বহু আয়াতে আছে যাতে দেখা যায় বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীর পুরস্কার সমান। সূরা আল ইমরান-এর ১৯৫ নং আয়াতে নারী-পুরুষের আধ্যাত্মিক সমতা (spiritual equality)-র একটি উদাহরণ। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক কি নারী, যদি সে মুমীন হয় আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন-যাপন করাবেন, আর (পরকালে) এ ধরনের লোকদেরকে উত্তম আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করবেন।" (১৬:৯৭)

উত্তর : ৪. প্রথাগত ধর্মীয় কাজে আধ্যাত্মিক সমতার প্রতিফলন

ইসলামে পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য একই ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে বলা হয়েছে। ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত উভয় (সামর্থ্যবানদের জন্য)-এর জন্যই সমানভাবে ফরজ। অবশ্য মহিলাদের কিছু প্রাকৃতিক অসুবিধার জন্য কিছু ছাড় দেয়া হয়েছে।

উত্তর : ৫. মহিলাদের জন্য সুবিধা/ছাড়

মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব এবং প্রসবোত্তর সময়ে নামাজ এবং রোজা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে রোযা পরে কাজা করতে হয় আর নামাজ কাযা করতে হয় না। এমনকি স্তনদানকারী ও গর্ভবতী মায়েদেরও রোযা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যা পরে কাজা আদায় করে নিতে হয়।

সমাজের দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ জেহাদ-এর বাধ্যবাধকতা থেকেও মেয়েদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

উত্তর : ৬. এসব ছাড়/সুবিধা কি মেয়েদের মর্যাদা নীচু করে?

এসব ছাড় মেয়েদের অসুবিধার সময় স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত সুবিধা, এতে মর্যাদা খাটো হবার প্রশ্নই উঠে না। গর্ভবতী অবস্থায় বা প্রসবোত্তর কালে বা ঋতুস্রাবের সময় সারাদিন রোযা রাখা মেয়েদের স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে; এজন্যেই আল্লাহ এই ব্যবস্থা রেখেছেন। এর মানে এবাদত থেকে বঞ্চিত রাখা নয়। কারণ, এবাদত বলতে ইসলামে নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালনকে বুঝায় না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে যেকোন বৈধ কাজ করা হোক না কেন, তা-ই এবাদত। আল্লাহর আদেশ পালনই এবাদত। এসব বিশেষ অবস্থা শেষে খ্রিস্টানদের মতো মুসলিম মহিলাদের কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়না শুধু গোসল করতে হয়।

উত্তর : ৭. নারীর ধর্মীয় ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে ইসলাম

খ্রিস্টবাদের মতো ইসলামে কোনো 'চার্চ' বা যাজক নেই। কাজেই ধর্মীয় ক্ষমতাবান (Ordination)-এর সুযোগ ইসলামে কারোর জন্যেই নেই। যদিও ইসলাম মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে বলে কিন্তু সেটা সাধারণের উপর ধর্মীয় প্রভুত্ব করার কোনো সুযোগ বুঝায় না- তাঁরা বিশেষজ্ঞ বা নেতা হতে পারেন মাত্র।

খ্রিস্টবাদে যাজকদের দু'টো প্রধান দায়িত্ব, ক) প্রথাগত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা এবং খ) সমাজের সেবা দেয়া এবং সমাজকে ধর্মীয় নির্দেশনা দেয়া।

ইসলামে ইবাদতের ধারণা নিছক কিছু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবনের সকল কাজের মাঝে পরিব্যাপ্ত। সমাজের ও জীবনের অধিকাংশ কাজে নারীর অগ্রণী ভূমিকায় ইসলাম বাধা দেয় না।

উত্তর : ৮. মেয়েরা কেন পুরুষের পেছনে নামায পড়বেন?

মুসলমানদের নামাজ শুধুমাত্র এক আসনে (শুধু বসে অথবা শুধু দাঁড়িয়ে) সম্পন্ন করা যায় না। নামাজের অন্তর্ভুক্ত আছে রুকু, সেজদা, তাশাহুদ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ। শুধু এই এক এবাদতে মেয়েদের পুরুষের পেছনে স্থান দেয়া হয়েছে যৌক্তিক কারণে। মেয়েরা পুরুষের সামনে অথবা পাশে দাঁড়িয়ে রুকু, সেজদা করলে উভয়েরই নামাজের প্রতি মনোযোগ নষ্ট হতে পারে, নামাজের গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হতে পারে। কাজেই জামাতে নামাজে মেয়েদের পেছনে জায়গা দেয়ার মধ্যে তাদের প্রতি কোনো অসম্মানের দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামে নেই বরং এখানে ভদ্রতা ও রুচিশীলতাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

উত্তর : ৯. নবীরা সবাই পুরুষ কেন?

ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, কে নবী হবেন তা মানুষ নির্বাচন করে না এবং তা নির্ধারণ করেন স্বয়ং আল্লাহ যিনি পুরুষ বা নারী নন। কাজেই এখানে পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নই উঠে না। শুধুমাত্র পুরুষদেরই নবী হিসেবে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত: এটাই যে, নবুয়তের দায়িত্ব শুধু উপদেশ প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটা ছিল সার্বিক জীবন ব্যবস্থা কায়েমের মিশন। প্রতিষ্ঠিত শয়তানী শক্তি নবুয়তের মিশনে বাধা দিত। তাদের হাতে প্রায় সব নবীকে শারীরিক নির্যাতন, লাঞ্ছনা এমনকি মৃত্যুও বরণ করতে হয়েছে। একজন নারীর পক্ষে এসব বহুমুখী দায়িত্ব পালন ও ঝুঁকি গ্রহণ সম্ভব হতো না বলেই আল্লাহ হয়তো নবী হিসেবে তাদের দায়িত্ব দেন নি। এর অর্থ এই নয় নারীরা আধ্যাত্মিকভাবে অযোগ্য বরং এর অর্থ এই যে, নবুওয়তের দায়িত্ব ব্যাপক ঝুঁকি, পরিশ্রম ও বিপদসংকুল।

সূত্র :

প্রশ্ন ২ : কুরআন যখন নাযিল হচ্ছিল তখন রোমে খ্রিস্টান বিশপদের সম্মেলন চলছিল এ বিষয়ে যে নারীদের আত্মা আছে কি না এবং তারা মানুষ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কি না। সম্মেলনে বহু বিতর্কের পর মাত্র কয়েক ভোটে হাঁ বাচক রায় হয়।

আল কুরআন ৭:১৮৯, ৪২:১১, ৪:১, ১৬:৭২, ৩০:২১, ৩২:৯, ১৫:২৯

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ৭৪:৩৮, ৩:১৯৫, ১৬:৯৭

প্রশ্ন ৬ : জানুব (স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার পর) অবস্থায় পুরুষেরাও নামায আদায় করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা গোসল সেরে নেয়।

জি-১৫ ইসলামে নারীর মর্যাদা
অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

প্রশ্ন ১. স্বামীর উপর নির্ভরশীলতা ছাড়া স্বাধীনভাবে নারীর সম্পদ অর্জন কি ইসলাম সমর্থন করে?

২. ইসলামে দেয়া এ অধিকারের সাথে শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপের তুলনা করুন।

৩. ইসলামী আইনে স্বামী এবং অন্য আত্মীয়দের (পিতা-মাতা) সম্পদে নারীর অংশ আছে কি?

৪. নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক হবার বিষয়টি কি নারীর প্রতি জুলুম নয়?

৫. মুসলিম মেয়েদের চাকুরী করার অধিকার আছে কি? সেক্ষেত্রে তারা কি পুরুষের সমপরিমাণ বেতন পাবে?

৬. যে মহিলা বাইরে কাজ না করে ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকেন, তিনি কি অনুৎপাদনশীল ভাবে সময় নষ্ট করছেন?

৭. এভাবে ঘরে বসে থাকার যুক্তি কি নেতিবাচক ঐতিহ্য থেকেই এসেছে?

উত্তর : ১. নারীর সম্পদ অর্জন প্রসঙ্গে

ইসলামী মতে একজন নারী বিয়ের পূর্বে বা পরে যে কোনো পরিমাণ সম্পদ অর্জন করতে পারেন। তাঁর সম্পদ তিনি কারো পরামর্শ ছাড়া ইচ্ছেমতো বিক্রী করতে, ভাড়া দিতে, ঋণ দিতে, দান করতে পারেন। ইসলাম আরও বলে যে, বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর নামে নাম রাখার প্রয়োজন নেই। এটি একটি প্রতীকী প্রমাণ যে, ইসলাম তার ব্যক্তিত্ব সবসময়েই হেফাজত করে।

উত্তর : ২. নারী ও তার সম্পদের ব্যাপারে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি

এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানার মতে ইংরেজী সাধারণ আইনে একজন মহিলার যাবতীয় সম্পত্তি তার বিয়ের পর স্বামীর মালিকানায় চলে আসত। স্বামী তার জমি থেকে ভাড়া গ্রহণ বা যে কোনো লাভ তোলার সামর্থ্য রাখতেন। পরবর্তীতে ১৮৭০ সালের পর ইংল্যান্ডে; তারও পর ইউরোপে এই আইনের সামান্য সংশোধন করা হয় যে স্বামী, স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া এই সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন না। এই সংশোধনীর পর বিবাহিত মহিলারা সম্পত্তি ক্রয় ও চুক্তি করার অধিকার পায়। ফ্রান্সে ১৯৩৮ সালের পূর্বে এ

অধিকার স্বীকৃত ছিল না। অথচ সপ্তম শতকের অন্ধকার যুগে ইসলাম নারীকে এর চাইতে অনেক বেশী অধিকারই দিয়েছিল। তা দেখে অনেক পশ্চিমা লেখকই অবাক হন যে, সেই অন্ধকার যুগে মুহাম্মদ (সা:) কিভাবে এত সুন্দর আইন প্রণয়ন করলেন। তারা জানতেন না যে, এ আইন মুহাম্মদ (সা:) প্রণয়ন করেননি; এই আইন সমগ্র বিশ্ববিধাতা আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালার যিনি সুবিচক্ষণ ও সুবিচারক।

উত্তর : ৩. সম্পদে মুসলিম নারীর উত্তরাধিকার

রাসূল (সা:) এর আগমনের সময় সম্পত্তিতে নারীর তো কোনো অধিকার ছিলই না বরং নারী নিজেই ছিল সম্পত্তির অংশ। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ছেলে সন্তানরা অন্য সম্পত্তির সাথে স্ত্রীদেরও ভাগ করে নিত। শুধু যে আরবদের মধ্যেই এমন ছিল তা নয়। সে যুগেই কুরআন সম্পদে নারী পুরুষ উভয়ের ন্যায্য অধিকার ঘোষণা করে। তাদের পাওনা অংশ স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, যা কারো পক্ষে বদলানো সম্ভব নয়। কেউ চাইলে তার কোনো বংশধরকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

আরও লক্ষ্য করার বিষয়, কুরআনে যে আয়াতে সম্পদ বন্টন সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে তা নাযিল হয়েছিল একজন মহিলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন কুরআনেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তার দু'টো প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

ক) এখানে সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পদ বন্টিত হয়।

খ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের অংশ মহিলাদের দ্বিগুণ, এটা পুরুষের বহুমুখী দায়-দায়িত্বের কারণেই হয়েছে।

উত্তর : ৪. সম্পদে নারীর অংশ অর্ধেক হওয়া কি জুলুম?

শুধুমাত্র সম্পদ বন্টনে প্রাপ্ত অংশের ভিত্তিতে এমন মন্তব্য করা অজ্ঞতাপ্রসূত এবং অন্যায়। কারণ নারী শুধু এই এক উৎস থেকেই সম্পদ পায় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাকে আরও আয়ের উৎস দিয়েছেন। দিয়েছেন অনেক দায়িত্ব থেকে মুক্তি, পক্ষান্তরে পুরুষের রয়েছে অনেক আর্থিক দায়িত্ব। নীচে নারীর আর্থিক সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হল:

ক) বিয়ের পূর্বে বাগদানে (Engagement) নারী যা উপহার পায় তা সবই তার।

খ) বিয়ের সময় সে স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা পায়, যা সাধারণত: নগদ অর্থে দেয়া হয়। (মোহরানা বকেয়া থাকলে তা স্বামীর সম্পদ থেকে দিতে হবে এবং এটা তার নিজের সম্পত্তি। - অনুবাদক)

গ) বিয়ের পূর্বে সে কোনো সম্পদের মালিক থাকলে সে মালিকানা বিয়ের পরও অব্যাহত থাকবে। তার স্বামী ঐ সম্পদ দাবি করতে পারবেন না।

ঘ) স্ত্রী যদি আর্থিকভাবে স্বামীর চেয়ে ধনীও হন তবুও তার উপর সংসারের কোনো খরচের দায়িত্ব নেই। তার এবং সন্তানদের খাবার, পোশাক, বাসস্থান, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, বিনোদনসহ সকল খরচের দায়িত্ব স্বামীর।

ঙ) বিবাহিত জীবনে সে চাকরী করে বা টাকা খাটিয়ে যা আয় করবে তা সবই তার এবং নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারবে।

চ) কোনো কারণে তালাক হলে মোহরানার অবশিষ্ট অংশ সে তাৎক্ষণিকভাবে পাবে।

ছ) তালাকের পর ইদ্দত কালে সে পুরো ভরণ-পোষণ পাবে এবং পরবর্তীতেও সন্তানদের পুরো খোরপোষের খরচ পেতে থাকবে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, সার্বিকভাবে ইসলাম নারীকে আর্থিকভাবে লাভবান করেছে। পুরুষের উপর সব আর্থিক দায়িত্ব দিয়ে নারীকে তা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পুরুষের এতসব দায়িত্বের জন্যই পিতার সম্পদ বন্টনের সময় তার অংশ একটু বেশী ধরা হয়েছে। এ দায়িত্ব কেবল পরিবার ভরণ-পোষণের জন্যেই নয়, দরিদ্র আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও বর্তায়। মনে রাখা দরকার যে, এই বন্টন ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ করেছেন। যিনি নারী বা পুরুষ নন। যিনি সারা জাহানের প্রভূ, সর্বস্রষ্টা ও ন্যায়ের প্রতীক (আল মীজান)।

উত্তর : ৫. মেয়েদের কাজ করা প্রসঙ্গে

কুরআন এবং সুন্নাহ মতে মেয়েদের কাজ করায় কোনো বাধা নেই। বরং একটি আদর্শ ইসলামী সমাজে কিছু কাজ মেয়েদের জন্যই বেশী উপযুক্ত। যেমন, প্রাইমারী স্কুল (যেথায় বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা তাদের শিক্ষিকা থেকে জ্ঞান অর্জন করবে) থেকে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া মেয়েরাই করাবে; এছাড়া নার্সিং, চিকিৎসা ইত্যাদি। ইসলামী আইনে নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মাতৃত্ব, শিশু পালন ও সংসার পরিচালনা। যদি বইরের কাজ ও ঘরের কাজে দ্বন্দ্ব বাধে তবে সামাজিক গুরুত্বের কথা ভেবে, ঘর রক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে মেয়েদের চাকরী বাকরী করায় ইসলামে কোনো বাধা নেই। কর্মস্থলে তারা পুরুষদের মতো একই হারে মজুরী পাবে।

উত্তর : ৬. মাতৃত্ব ও ঘরগৃহস্থালীর কাজ কি অনুৎপাদনশীল কাজ?

সামাজিক উন্নতি ও উৎপাদনকে যারা শুধু টাকা উপার্জনের মাপকাঠিতে বিবেচনা করেন তারা মনে করতে পারেন মাতৃত্ব অনুৎপাদনশীল কাজ। কিন্তু যখন মানবিকতা আর নৈতিকতার বিবেচনায় এটা মাপা হয় তখন শিশু পরিচর্যা ও সংসার রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা কেন ভাবা হয় যে, যখন নারী ঘর

অরক্ষিত রেখে ক্যারিয়ার তৈরী করতে যায় তখন সে উৎপাদনশীল কাজ করছে, আর যে নারী ঘরে কাজ করছে সে উৎপাদনশীল কিছু করছে না? একটা মেয়ে ঘর ছেড়ে হোটেলে রান্না করে অর্থ উপার্জন করলে তবে সেটা কাজ, আর যে মেয়েটি ঘরে আপনজনদের রান্না করে খাওয়াচ্ছে, সেলাই করছে ও পরিচর্যা করছে সেটা কাজ নয়? আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের সবচেয়ে বিপর্যয় হয়েছে এখানেই যে, মাতৃত্বের দায়িত্বটিকে সেখানে ছোট করে দেখা হচ্ছে। যদি মাতৃত্ব, শিশুপালন ও ঘর রক্ষার জন্য পারিশ্রমিক দেয়ার বিধান থাকত তাহলে একজন স্বামী তার স্ত্রীর পারিশ্রমিক দিতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যেতেন। বিশেষ করে যিনি প্রয়োজনে দিনে ২৪ ঘণ্টাই যাবতীয় সেবা দিয়ে যান! সুখী সংসার গড়া আর সন্তানদের ভালভাবে মানুষ করার চেয়ে বড় আনন্দ জগতে আর নেই।

উত্তর : ৭. উপরের যুক্তি কি নেতিবাচক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত?

ঐতিহ্যকে 'খারাপ' এবং আধুনিকতাকে 'ভাল' মনে করা সঠিক নয়। ঘরের কাজকে গুরুত্ব না দেয়ায় এবং সন্তানদের প্রতি খেয়াল না করায় পাশ্চাত্যের নতুন প্রজন্মের কী অধ:পতন হচ্ছে তার দিকে একবার তাকালে মাতৃত্বের ঐতিহ্যকে নেতিবাচক বলা যায় না। তাদের পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে যাওয়ায় আদরের সন্তান পথে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, দুষ্ট লোকের শিকারে পরিণত হচ্ছে। ড্রাগ এবং মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। (এর ফলস্বরূপ যুবসমাজের অবিবাহিত থাকার প্রবণতাসহ আরো অন্যান্য সমস্যা তৈরি করছে। - অনুবাদক)

সূত্র :

প্রশ্ন ২ : Encyclopaedia Americana (International Edition), ১৯৬৯, Vol. ১৯, Page- ১০৮

'Muslim Institutions,' Maurice Gaudefroy Demombynes (অনুবাদক, জন ম্যাকগ্রেগর)

Muslim Institutions গ্রন্থে Demombynes লিখেছেন, কুরআনের আইন স্ত্রীকে এমন মর্যাদা দেয় যা প্রায় সকল ক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপীয় আইনের চেয়েও অগ্রসর'

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ৪:৭ (এই আয়াত নাযিল হয় তখন যখন একজন বিধবা মহিলা রাসূল (সা:)-এর কাছে নালিশ করেন যে তাঁর স্বামীর ভাই তাঁর স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করছে তাঁর ২টি মেয়ে থাকা সত্ত্বেও)

প্রশ্ন ৫ : রাসূল (সা:) বলেন, আল্লাহ ভালবাসেন ঐ সকল মানুষকে যারা তাদের কাজ ঠিকমতো করেন। যদি কোনো মহিলার সন্তান থাকে যার যত্ন নিতে হবে, তবে সে ঠিক সিদ্ধান্ত নিবে যদি তার ক্যারিয়ার সৃষ্টির চিন্তাকে আপাতত: তুলে রেখে শিশুর প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়।

জি-১৬ ইসলামে নারীর অবস্থান
সামাজিক প্রেক্ষিত

প্রশ্ন ১. কন্যা সন্তান জন্ম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এ ব্যাপারে জনমত কেমন ছিল?

২. নারীর প্রতি নমনীয় হতে কোনো নির্দিষ্ট আদেশ ইসলামে আছে কি?

৩. মেয়েরা কি ছেলেদের মতই লেখাপড়া করতে পারে?

৪. এমন কোনো ক্ষেত্র আছে কি যেসব বিষয়ে মেয়ে অথবা ছেলেদের জ্ঞান অর্জন নিষেধ?

৫. স্ত্রী হিসেবে নারীদের সম্পর্কে ইসলাম কি বলে?

৬. ইসলামী আইনে মায়ের কোনো সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার আছে কি?

৭. কোনো মুসলিম পুরুষের জন্য এটা কি ঠিক যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পোশাক পরতে বাধ্য করবেন অথচ নিজে পোশাক সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকবেন?

৮. কোনো কোনো লেখক বলেছেন যে, আদর্শ মুসলিম নারী ঘরেই আবদ্ধ থাকেন। এটা কি ঠিক?

উত্তর : ১. কন্যা সন্তান জন্ম সম্পর্কে ইসলাম

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে কন্যা সন্তানদের হত্যা করা হত। অন্যান্য স্থানেও কন্যা সন্তানকে অশুভ হিসেবে দেখা হত। ইসলাম এই খারাপ চর্চাকে শুধু বন্ধই করেনি বরং কুরআন একে সরাসরি 'খুন' বলে ঘোষণা করেছে এবং মানুষকে এই ধারণায় দীক্ষিত করেছে যে, পুত্র-কন্যা দুই ধরনের সন্তানই আল্লাহর উপহার।

উত্তর : ২. মেয়েদের প্রতি সদয় হবার নির্দেশনা

হাদীসে রাসূল (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে লালন পালন করে বড় করবে, "সে এবং আমি এমনই কাছাকাছি থাকব" (এই বলে তিনি তাঁর হাতের পাশাপাশি দু'আঙ্গুলের অন্তরঙ্গতাকে দেখালেন)। তিনি আরও বলেন যে, যার একটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাকে জীবন্ত কবর দিল না, তাকে অপমানিত করল না এবং পুত্রদেরকে তার উপর প্রাধান্য দিল না, আল্লাহ তাকে বেহেশতে দাখিল করবেন। মুহাম্মদ (সা:) তাঁর নিজের জীবনে তিনি এসব শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

উত্তর : ৩. নারীর শিক্ষা প্রসঙ্গে ইসলাম

এটা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে ইসলামে জীবিকার প্রয়োজনে নারীর যে কোনো বৈধ কাজ করতে বাধা নেই। বরং ইসলামী রাষ্ট্রে কিছু কাজে মহিলাদেরই অগ্রাধিকার

দেয়া হয়। এসব প্রয়োজনেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ নারীর জন্য আবশ্যক। যে সব কাজে মেয়েদের অগ্রাধিকার থাকে তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে শিক্ষকতা, চিকিৎসা, নার্সিং ইত্যাদি। ইসলামে জ্ঞানার্জন শুধু প্রত্যেক নারী পুরুষের অধিকার নয় বরং তা বাধ্যতামূলক কর্তব্য। রাসূল (সা:) বলেন, জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। কুরআনেও এর সমর্থনে বলা হয় জ্ঞানীদের আল্লাহ বিশেষ মর্যাদা দেবেন।

উত্তর : ৪. মেয়েদের কোনো বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণে কোনো বাধা বা সীমাবদ্ধতা আছে কি?

ইসলামে এমন কোনো আইন নেই যা বিশেষভাবে মেয়েদের কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ নষ্ট করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য যার চর্চা নিষিদ্ধ এমন দু'একটি বিষয় আছে যেমন যাদুবিদ্যা। আবার কয়েকটি বিষয় আছে যার জ্ঞান অর্জন নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ, তা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় কাজগুলো, নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি। কিছু বিষয় আছে যা বিশেষভাবে মেয়েদের শিখতে উৎসাহিত করা হয় যা তাদের আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে দক্ষ করে, যেমন- শিশু পরিচর্যা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, নার্সিং, চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। এছাড়া বিজ্ঞান, কলা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানের সুযোগ পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য উন্মুক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো উপকারী ও প্রয়োজনীয়।

উত্তর : ৫. স্ত্রী হিসেবে নারী: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে এক পবিত্র বন্ধন। বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী তার স্বামীর দাসী বা স্বামী তার প্রভুতে পরিণত হয় না। ইসলামে আল্লাহই একমাত্র প্রভু এবং সকল মানব মানবী তাঁর দাস-দাসী। কুরআন বিবাহ বন্ধনকে মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে বর্ণনা করে যা হচ্ছে স্থিতিশীলতা, শান্তি, পারস্পরিক ভালবাসা ও আকর্ষণের উৎস। এজন্যেই ইসলামে বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি (Consent)-এর এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর সাথে ব্যবহারে রাসূলের (সা:) কথা এবং জীবন ছিল অনুপম আদর্শ। তিনি বলেন, "সবচেয়ে সঠিক বিশ্বাসী সে যার ব্যবহার ভাল এবং তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তাঁর স্ত্রীর প্রতি উত্তম" (অর্থাৎ উত্তম আচরণ করে।- অনুবাদক)

উত্তর : ৬. ইসলামে মায়ের অগ্রাধিকার

কুরআন আল্লাহর এবাদতের পরেই পিতামাতার প্রতি বিশেষভাবে মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সদয় হতে পরামর্শ দেয়। মুসলমানের জন্য পাশ্চাত্যের মতো বৃদ্ধ-পিতামাতাকে নার্সিং হোম বা বৃদ্ধ আশ্রমে রাখা নিষ্ঠুর, নির্দয় ও অনৈসলামিক আচরণ। রাসূল (সা:) বলেন, "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত"। তিনি আরও বলেন, উত্তম চরিত্রের মানুষ মহিলাদের প্রতি দয়াশীল হয় এবং একমাত্র খারাপ লোকেরাই তাদের অপমান করে।

উত্তর : ৭. নারীর ইসলামসম্মত পোশাক প্রসঙ্গে

মুসলিম মেয়েরা ইসলাম সম্মত পোশাক পরেন শুধু আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য, আল্লাহর প্রতি আন্তরিক সম্মান থেকে এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য, স্বামী বা অন্য কোনো পুরুষ আত্মীয় বা সমাজের চাপে নয়। বরং অনেক সেক্যুলার মুসলিম দেশে যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ হিজাব পরা মেয়েদেরকে লজ্জিত ও অপমানিত করে সেসব স্থানেও ধার্মিক মেয়েরা রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু, এমনকি স্বামীর বাধা উপেক্ষা করে ইসলাম সম্মত পোশাক পরেন। এটা বলা ভুল যে, হিজাব মানে মেয়েদের একটা নির্দিষ্ট ধরনের পোশাকই পরতে হবে অথচ অন্যদিকে ছেলেদের পোশাকে কোনো বিধি নিষেধ থাকবে না। ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়কেই তাদের শরীরের কিছু অংশ নির্দিষ্ট ভাবে আবৃত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কি ধরনের কাপড় দিয়ে আবৃত করতে হবে তা (রং বা ডিজাইন) বলা হয়নি। এ ব্যাপারে ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দই প্রাধান্য পাবে। (অবশ্য আটসাট বা ফিনফিনে পোশাক পরা যাবে না; এ কথা আল্লামা জামাল বাদাবী এ সিরিজের অন্যত্র আলোচনা করেছেন।- অনুবাদক)।

উত্তর : ৮. আদর্শ মুসলিম নারী কি ঘরেই আবদ্ধ থাকেন?

মুসলিম মেয়েরা ঘরেই আবদ্ধ থাকবেন- এ ধারণা ভুল। এটা বলাও ভুল হবে যে, ইসলাম মেয়েদের অন্দরে থাকা পছন্দ করে। জ্ঞানার্জন মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক, পরিবারের প্রয়োজনে উপার্জনের জন্য বাইরে যাবার অনুমতি তাদের রয়েছে। ঘরে আবদ্ধ থাকার ধারণা সম্ভবত: কুরআনের একটি আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা থেকে এসেছে যাতে বলা হয়েছে, "তোমরা ঘরে থাক এবং জাহেলী যুগের মেয়েদের মতো নিজেদের প্রদর্শন করো না।" এই আয়াত শুধু রাসূল (সা:)-এর স্ত্রীদের লক্ষ্য করে নাজিল হয়েছে। ধার্মিক মেয়েদের জন্য এটা বলা যেতে পারে যে, অপ্রয়োজনে বাইরে ঘোরাঘুরি না করে ঘরে থেকে শান্তিপূর্ণ আবাস গড়ে তোলাই উত্তম। রাসূলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, মেয়েদের শুধু ঘরে আবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই; যেখানে রাসূল (সা:) বলেন, "আল্লাহ তোমাদের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন।"

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ৮১:৮-৯, ১৬:৫৮

প্রশ্ন ৬ : আল কুরআন ১৭:২৩, ৩১:১৪

হাদীসে আছে জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা:)-এর কাছে এসে বললেন, "সব মানুষের মধ্যে কাকে আমি বেশী গুরুত্ব দিব" রাসূল (সা:) বললেন, "তোমার মাকে"। তিনি তিনবার এই প্রশ্ন করলে তার জবাবে রাসূল (সা:) বলেন, 'তোমার মাকে' চতুর্থ বার বলেন, 'তোমার পিতাকে'। আরেক হাদীসে আছে, রাসূল (সা:) বলেন, 'নারীরা পুরুষের সমজাতের' (twin half or other half of men) কাজেই তাদের সাথে সুব্যবহার কর।

জি-১৭ ইসলামে নারীর মর্যাদা
রাজনৈতিক প্রেক্ষিত (১)

প্রশ্ন ১. দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ কি মুসলিম মেয়েদের জন্য অনুমোদিত?

২. সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার অধিকার কি মুসলিম মেয়েদের আছে?

৩. মেয়েদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৪. যারা বলেন, "বাইয়াত হচ্ছে রাসূল (সা:) এর প্রতি ধর্মীয় আনুগত্যের শপথ, এর সাথে রাজনৈতিক ভোটাধিকার এর কোনো সম্পর্ক নেই"- তাদের এ মন্তব্যের ব্যাপারে কি বলবেন?

৫. আইন প্রণেতা ও নেতা হিসেবে মেয়েদের নির্বাচিত হবার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৬. ইসলামের প্রাথমিক যুগে মেয়েরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এমন কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি?

উত্তর : ১. মেয়েদের রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত হওয়া প্রসঙ্গে ইসলাম

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যাতে আছে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক বিষয়সহ জীবনের সব কিছুর পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা। কুরআন এবং হাদীস থেকে এটা নিশ্চিত যে, শান্তিপূর্ণ সমন্বিত ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠা মুসলিম নারী এবং পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব। সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বন্ধু এবং অভিভাবকের মতো একে অপরকে সহযোগিতা করবে। এই সহযোগিতা আর সবক্ষেত্রের মতো রাজনীতিতেও প্রযোজ্য। কুরআন ও হাদীসে যেসব স্থানে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে বলা হয়েছে, তা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। আর এই সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ব্যক্তি জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত সর্বত্র ব্যাপ্ত। প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর সামাজিক কার্যকলাপে সক্রিয় ভূমিকা রাখা আবশ্যক।

উত্তর : ২. সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে মুসলিম মেয়েদের নিজের মতো তুলে ধরা প্রসঙ্গে

রাসূল (সা:)-এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে মুসলমানরা নিজেদের পুরোপুরি ইসলাম সম্মতভাবে পরিচালিত করত। সেই সময়ের ইতিহাসে দেখা যায়

মুসলিম মেয়েরা সমাজে তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ছিল এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত ও অভিযোগ তুলে ধরত। কুরআনের ৫৮ নং সূরায় প্রথম কয়েক আয়াত রাসূল (সা:)-এর কাছে একজন মহিলার আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে নাযিল হয়। আল্লাহ সেই মহিলার বক্তব্য শুনেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। ওসমান (রা:)-এর শাসনকালে বিভিন্ন বিষয়ে আয়েশা (রা:) সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন। কিন্তু ওসমান (রা:) বা কেউ সে সমালোচনার জবাবে একথা বলেননি যে নারী রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তব্য দিতে পারে না। ওসমান (রা:)-এর শাহাদাতের পর আলী (রা:) এর খলিফা হিসেবে মনোনয়নের বিরুদ্ধে আয়েশা (রা:) দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন, কিন্তু কেউই তার মতামতের অধিকারের বিপক্ষে কিছু বলেননি। যদিও পরবর্তী সময়ে আয়েশা (রা:) এর জন্যে অনুশোচনা করেন, কেননা আলী (রা:)-এর বিরোধিতা করা ভুল (bad judgement) ছিল। একবার ওসমান (রা:)-এর স্ত্রী রাজনৈতিক বিষয়ে বলতে চাইলে তাঁর একজন সহযোগী বাধা দিলে ওসমান (রা:) বলেন, "তাঁকে বলতে দাও, সে তাঁর উপদেশ প্রদানে তোমার চেয়েও আন্তরিক।" কাজেই মুসলিম মেয়েরা রাজনৈতিক বিষয়ে অংশ নিতে পারে। যদিও তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ঘর রক্ষা, তবুও এটা তাদের সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয় না।

উত্তর : ৩. মেয়েদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম

রাসূল (সা:) প্রতিষ্ঠিত ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভোটের প্রচলন ছিল না। তখন জনগণের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি জনগণের কাছে বাইয়াৎ (আল্লাহর অনুগত শাসক হিসেবে তার আনুগত্যের শপথ) আহ্বান করতেন। কুরআন এবং হাদীসে দেখা যায় তখন মেয়েরাও বাইয়াত করতেন। ৬০ নং সুরার ১২ নং আয়াতে দেখা যায় একদল নারী রাসূল (সা:)-এর হাতে বাইয়াৎ নিতে চাইলে কুরআন নবীকে 'তাদের' বাইয়াৎ নিতে আদেশ' করে। ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, আকাবা নামক স্থানে একদল মদিনাবাসী তাঁর নিকটে বাইয়াৎ হন। তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন।

উত্তর : ৪. বাইয়াৎ কি শুধু রাসূল (সা:)-এর প্রতি ধর্মীয় আনুগত্যের শপথ নাকি ভোট প্রয়োগের বিকল্প?

যখন মহিলারা রাসূল (সা:)-এর কাছে বাইয়াৎ নিচ্ছিলেন তখন তারা শুধু মুহাম্মদ (সা:)-এর আল্লাহর রাসূল হবার স্বীকৃতিই দিচ্ছিলেন না বরং মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র প্রধানের স্বীকৃতিও দিচ্ছিলেন। তাদের এ বাইয়াৎ শুধু এই স্বীকৃতিই ছিল না যে, তারা ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলবে বরং এই শপথ ছিল যে, তারা রাসূলের (সা:) সকল আদেশ (যার অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক আদেশও) নির্দ্বিধায় মেনে চলবে। বস্তুত: ইসলামে ধর্মকে রাজনীতি ও সমাজনীতি থেকে পৃথক করার কোনো উপায় নেই।

উত্তর : ৫. আইন প্রণেতা ও নেতা হিসেবে মেয়েদের নির্বাচিত হওয়া প্রসঙ্গে

যদিও ইসলামে নেতা নির্বাচনের নিয়ম ভিন্নতর তবুও পাশ্চাত্য নির্বাচন পদ্ধতির সাথে এর কিছু মিল আছে। ইসলামে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শুরা অর্থাৎ পরামর্শের মাধ্যমে করতে হয়। যদিও প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা কোনো বিশেষ ভবন তৈরি করেনি যার নাম 'পার্লামেন্ট' বা সংসদ ভবন বলবে- যেখানে সংসদীয় আলোচনা ও মিটিং হবে, খলিফারা জনগণকে ডাকতেন এবং কোনো বিষয়ে পরামর্শ নিতেন।

রাসূল (সা:)-এর মৃত্যুর পর, খলিফারা একদল লোকের পরামর্শ নিতেন, যাদের সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়ার অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ও দক্ষতা ছিল। মুসলমানদের জন্য সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করার গুরুত্ব আরো ব্যাপকতর হয় এ হাদীসে, যেখানে রাসূল (সা:) বলেন, "সত্য ঈমান হচ্ছে উপদেশ দেয়া" (True faith is advice)। স্বয়ং রাসূল (সা:)-এর সময়েও কোনো কোনো বিষয়ে মহিলাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার নজির আছে। মহিলাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার ব্যাপারে কেউ বৈধতার প্রশ্ন তুলেছে এমন নজির নেই। তবে পরামর্শ নেবার পদ্ধতি ছিল ইসলামের আদব অনুযায়ী।

উত্তর : ৬. প্রথম যুগের মুসলিম নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদাহরণ

দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা:) যখন দেখলেন যে, জনগণ বেশী অংকের মোহরানা (কাবিন) দিচ্ছে, তখন তিনি মোহরানাকে সর্বোচ্চ ৪০০ দিরহামে স্থির করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর বেশী যেই দেবে সেই টাকা বায়তুল মালে জমা করার সিদ্ধান্ত তিনি দিলেন। তিনি যখন মসজিদুন নববীতে এই ঘোষণা দিচ্ছিলেন তখন একজন মহিলা আপত্তি করে বললেন, 'হে ওমর তোমার এ কাজের অধিকার নেই"। এই প্রসঙ্গে মহিলা কুরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করলেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে অঢেল স্বর্ণ পরিমাণ মোহরানা দেয় তবুও সে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। রাষ্ট্রপ্রধানের মুখের উপর এই কথা বলার জন্য মহিলার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করেনি। বরং ওমর (রা:) বললেন, "মহিলা যা বলেছে তাই ঠিক এবং উমর ভুল বলেছে"। ওমর (রা:) আরও আক্ষেপ করে বললেন, "হে ওমর, তোমার চেয়ে অনেকে বেশী জানে"। এভাবেই প্রাথমিক যুগের মহিলারা রাষ্ট্রীয় পলিসি নির্ধারণেও ভূমিকা রাখতেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ৯:৭১ রসূল (সা:) বলেছেন, 'সৎ উপদেশই 'আসল ঈমান'

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ৮:১, ৬০:১২

জি-১৮ ইসলামে নারীর মর্যাদা
রাজনৈতিক প্রেক্ষিত (২)

প্রশ্ন ১. এটা কি বলা যেতে পারে যে, যেভাবে একজন মহিলা মোহরানা সম্পর্কে ওমর (রা:) আনীত প্রস্তাব বাতিল করলেন তা আধুনিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থারই অনুরূপ?

২. ইসলামী আইন কি মেয়েদের বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের পদে আসীন হতে বাধা দেয়?

৩. মেয়েদের রাষ্ট্রপ্রধান হতে কুরআন অথবা শরীয়তের কোথাও নিষেধ আছে কি?

৪. মেয়েদের বিচারক হিসেবে কাজ করতে বাধা কোথায়?

৫. একজন পুরুষের সমান দুইজন মেয়ের সাক্ষ্য রাখাটা কি মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞা নয়?

উত্তর : ১. ওমর (রা:) এবং উক্ত মহিলার যুক্তিতর্ক- আধুনিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার প্রতীক

ওমর (রা:)-এর সময়কার উল্লিখিত ঘটনার সাথে আধুনিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার অনেক মিল আছে। যেমন-

ক) ওমর (রা:) কর্তৃক মসজিদে দাঁড়িয়ে মোহরানার সীমা নির্ধারণ করার প্রস্তাব আধুনিক পার্লামেন্টে সংসদ নেতা কর্তৃক কোনো আইন সংশোধন প্রস্তাব আনার অনুরূপ।

খ) এই প্রস্তাব আনার স্থানটি আধুনিক পার্লামেন্ট ভবনে ছিল না। এটা মসজিদে ছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ইসলামে মসজিদ শুধু নামাজেরই স্থান নয় বরং খেলাফতের যুগে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজ নেতারা মসজিদে বসেই করতেন। মসজিদে বসেই যুদ্ধ পরিচালনা, বিদেশী কূটনৈতিক মিশনকে গ্রহণ করা, সবই হত। এখানে জনগণ যেতেন রাষ্ট্র নায়কদের কথা শুনতে ও প্রয়োজনে পরামর্শ দিতে। কাজেই সব মুসল্লীই পার্লামেন্ট সদস্যদের সমান মর্যাদা পেতেন।

গ) ওমর (রা:) জনগণের কাছে তাঁর প্রস্তাব রাখায় বোঝা যায় তাঁর সিদ্ধান্তের উপর মতামত দেবার অধিকার জনগণের ছিল।

ঘ) সমাজের সব স্তরের মানুষই মসজিদে উপস্থিত থেকে তাদের মতামত সমানভাবে প্রয়োগের সুযোগ পেত।

ঙ) উক্ত মহিলা ওমর (রা:)-এর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন যে, ঐ প্রস্তাব সংবিধান পরিপন্থী। ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআনই হচ্ছে সংবিধান, যা কোনো মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না।

চ) মহিলার সংশোধনী শুনে তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে ওমর (রা:) সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

এ ঘটনার বর্ণনাকারী তার বর্ণনায় মহিলার নাম উল্লেখ করেননি। তাতে প্রতীয়মান হয় মহিলা তদানীন্তন সমাজের কোনো উল্লেখযোগ্য কেউ ছিলেন না। তখন মসজিদে সমবেতদের মধ্যে রাসূল (সা:)-এর পরিবারের সদস্য এবং অনেক সাহাবাও ছিলেন। কিন্তু কেউ কোনো মহিলার রাজনৈতিক মত প্রদানের বৈধতার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেননি। এতে বুঝা যায় তখনকার সমাজে আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বাধীনভাবে তাদের মত দিতে পারত। শুধু এই ঘটনাতেই নয় এমন আরও অনেক ঘটনারই উল্লেখ পাওয়া যায়। ওমর (রা:)-এর শাহাদাতের পর নতুন খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা:) মহিলাদেরও পরামর্শ নিয়েছিলেন।

উত্তর : ২. বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নারী

সাধারণ অর্থে 'নেতৃত্ব' বলতে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে নেতৃত্ব বলতে যেকোনো গুরত্বপূর্ণ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণকারী পদকেই বুঝায়। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম মেয়েদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা, নার্সিং ইত্যাদি এসবই গুরুত্বপূর্ণ, দায়িত্বসম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী কাজ। এগুলো কি সমাজ তথা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণকারী পদ নয়? এসব পদে অধিষ্ঠিত থেকে কি জনগণকে নেতৃত্ব দেয়া যায় না? শুধু এসব পদ কেন, যে মহিলা ঘরে বসে জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তুলছেন তিনি কি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালন করছেন না?

ব্যাপকভাবে নেতৃত্বের এই আলোচনার পরও বলা যায় নির্দিষ্টভাবে কোনো জন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নারীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শরীয়তে কোনো সর্বসম্মত বাধা নেই। বরং চিকিৎসা শিক্ষাসহ কিছু বিষয়ে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব মেয়েদেরই থাকা উচিৎ। অন্যদিকে বেশীরভাগ আলেমের মতে যে তিনটি পদে নারীর অধিষ্ঠিত হতে বাধা আছে তা হচ্ছে–

ক) রাষ্ট্রপ্রধান
খ) বিচারক
গ) সেনাপ্রধান (অবশ্য এই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে ভিন্নমতও আছে – অনুবাদক)

উত্তর : ৩. এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে দলিল আছে কি?

যদিও কুরআনে নারীর রাষ্ট্রীয় শীর্ষপদে আসীন হবার বিপক্ষে কোনো দলিল পাওয়া যায় না, তবুও আলেমরা একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেন যেখানে রাসূল (সা:) বলেন, সে জাতি উন্নতি করতে পারে না যারা তাদের নেতা হিসেবে একজন নারীকে নির্বাচিত করেন। পারস্যের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শাহজাদী 'পুরান'-এর মনোনয়নের প্রেক্ষিতে রাসূল (সা:) এই মন্তব্য করেন বলে উল্লেখ করা হয়। (যদিও এই হাদিসের যথার্থতা এবং এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে বেশ কিছু আলেম দ্বিমত পোষণ করেছেন- অনুবাদক)

রাসূল (সা:) কর্তৃক নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে এই মন্তব্যের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে প্রথমত: এই যে, রাসূল (সা:) ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব সম্পর্কে বলছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা শুধু জনগণের মুখপাত্রই নন; তিনি প্রধান নামাজের জামাতেরও ইমাম এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, নামাজ এমন একটি কাজ যাতে নারীর ইমামতি করা তো দূরের কথা, পুরুষের সামনে মেয়েদের দাঁড়ানোটাই দৃষ্টিকটু। আর সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নারীকে এখনো পর্যন্ত খোদ পাশ্চাত্যও মনোনীত করেনি। আরও একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, ইসলামী মতে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কোনো পুরস্কার তো নয়ই বরং চরমতম পরীক্ষা ও বোঝা। কেউই এই দায়িত্ব আগ্রহ করে নেয় না।

উত্তর : ৪. মেয়েদের বিচারক হতে বাধা কোথায়

এ বিষয়ে আলেমদের ঐক্যবদ্ধ কোনো মত নেই। যারা এর বিপক্ষে বলেন তাদের যুক্তি হচ্ছে :

ক) বিচারকদের দায়িত্বটা তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বের অনুরূপ এবং যেহেতু মেয়েদের রাষ্ট্রপ্রধান হতে বারণ করা হয়েছে সেহেতু তাদের বিচারক হওয়াও নিষেধ।

খ) যেহেতু পরিবারের প্রধান হিসেবে ইসলামে পুরুষকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেহেতু বিচারকের আসনে নারী বসাটা এই শৃঙ্খলার পরিপন্থী। কিন্তু এর বিপক্ষে মত হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান বাদে আর সব পদ এমনকি বিচারক পদেও নারী আসীন হতে পারবে (আত-তাবারী) অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা বলেন, যেহেতু মেয়েদের আদালতে সাক্ষী হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে সেহেতু তারা বিচারকও হতে পারবে।

উত্তর : ৫. নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক- নারীর প্রতি কি অবজ্ঞা?

কুরআনের আর্থিক লেনদেন ও চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর সাক্ষ্যকে পুরুষের অর্ধেক ধরা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, নারীর মান পুরুষের অর্ধেক। মনে রাখা দরকার যে, তখন সময়টা এমন ছিল যে, মেয়েরা মূলত: ঘর গৃহস্থালীর কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা বেশী জড়িত হতেন না। এ ধরনের চুক্তির খুঁটিনাটি বিষয় ঘরোয়া কাজের ব্যস্ততায় মনে নাও থাকতে পারতো। তাই বলা হয়েছে, "... কারণ তাদের একজন ভুলে গেলে আর একজন মনে করিয়ে দিতে পারবে" (২:২৮২)।

এখানে বলা হয়নি যে নারীর স্মরণশক্তি কম। এখানে মূলত: অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে, কেননা মানুষের কাছে ঋণ ও অর্থনৈতিক বিষয় খুবই স্পর্শকাতর এবং একজন নারী, যে ঘরের কাজে ব্যস্ত, তার পক্ষে আর্থিক চুক্তির জটিল ধারাগুলো সব মনে নাও থাকতে পারে।

সূত্র :

প্রশ্ন ২ : রাসূল (সা:) বলেন, "তোমাদের সবাই নেতা (দায়িত্বশীল) এবং তার কাজের জন্য দায়ী: শাসক তার জনগণের জন্য, পুরুষ তার পরিবারের জন্য, নারী তার সন্তান ও সংসারের জন্য, কর্মচারী তার কাজের জন্য- প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপর অর্পিত কাজের জন্য দায়িত্ববান।"

প্রশ্ন ৩ : এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে, কারণ এই হাদীসের ব্যাপারে ও তার ব্যাখ্যাতে বেশ কয়েক জন বিশেষজ্ঞ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন ৫ : আল কুরআন ২:২৮২

জি-১৯ ইতিহাসে মুসলিম নারী (১)

প্রশ্ন ১. আর্থিক লেনদেনের বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও কি মুসলিম মহিলারা সাক্ষী হতে পারেন?

২. ইসলামের ইতিহাসে ধর্মীয় বিষয়ে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দৃষ্টান্ত আছে কি?

৩. খাদিজার (রা:) ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে কোনো খোদায়ী স্বীকৃতি আছে কি?

৪. খাদিজা (রা:)-এর যোগ্যতা সম্পর্কে রাসূল (সা:) কিছু বলেছেন কি?

৫. স্বামীর সহায়তা ছাড়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়েছে এমন মুসলিম নারীর উদাহরণ আছে কি?

৬. ইসলাম গ্রহণের জন্য নির্যাতিত হয়েছেন এমন নারীর উদাহরণ আছে কি?

৭. আল্লাহর পথে বিপদ বরণ করেছেন এমন মুসলিম নারীর উদাহরণ আছে কি?

উত্তর : ১. সাক্ষী হিসেবে নারী

ইমাম আবু হানিফাসহ আরও কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যে, শুধুমাত্র ফৌজদারী (Criminal) মামলা ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে যে, যেহেতু নারীরা সাধারণত: বেশী আবেগপ্রবণ সেহেতু অপরাধ বা সন্ত্রাসের ঘটনা দেখে তাঁরা মুষড়ে পড়তে পারেন, ফলে যথার্থ সাক্ষ্য নাও দিতে পারেন।

অন্যদিকে আল জুহরীসহ অন্য বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, সকল ক্ষেত্রেই নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কারণ এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীসে কোনরকম নিষেধাজ্ঞা নেই।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, আর্থিক বিষয়ের মতো অন্য বিষয়ে নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক হবে না। বরং সমান হবে। তারা এ ব্যাপারে যে যুক্তি দেন তা নিম্নরূপ :

ক) কুরআনের সাত জায়গায় সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা এসেছে, এর মধ্যে মাত্র এক জায়গায় (আর্থিক বিষয়ে) দুইজন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর কথা বলা হয়েছে (আলকুরআন ২:২৮২)।

খ) ২৪ নং সূরায় ৬ থেকে ৯ নং আয়াতে এটা স্পষ্ট যে, নারী এবং পুরুষের সাক্ষ্য সমান মানের, যেখানে স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক অপরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলে একজনের কসম খাওয়া অভিযোগ নাকচ হয়ে যায় অপরজনের কসম খাওয়ার মাধ্যমে। (জি-১০ এর প্রশ্ন ২ এর আলোচনা দেখুন)।

গ) সাক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কুরআনের বাকী পাঁচ জায়গায় নারী পুরুষের বেলায় ভিন্ন করে বা নির্দিষ্ট করে (পুরুষ হবে বা নারী হবে বা দু'জনেই হবে এমন) কিছু বলা হয়নি। (সূত্র নির্দেশিকা দেখুন)

ঘ) রাসূলের জীবনে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যখন তিনি শপথের ভিত্তিতে মাত্র একজন পুরুষ বা মহিলা সাক্ষীর বক্তব্যের ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন।

ঙ) কুরআনের শিক্ষা থেকে এটাও স্পষ্ট যে, সাক্ষী হওয়াটা কোনো অধিকার বা সুযোগ নয় *বরং এক দায়িত্ব বটে*। কুরআন বলে কেউ সাক্ষ্য দেবার ডাক পেলে যেন অনুপস্থিত না থাকে কারণ সত্য গোপন করা অপরাধ।

চ) সর্বশেষে এই কথা বলা যায় যে, সাক্ষ্য প্রদান সকল মুসলমানের দায়িত্ব। কাজেই যদি এমন হয় যে, কোনো অপরাধ সংঘটিত হল যার সাক্ষী এক বা একাধিক নারী। এ অবস্থায় কি শুধু সাক্ষী নারী এই অযুহাতে বিচার বন্ধ থাকবে?

উত্তর : ২. ধর্মীয় বিষয়ে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উদাহরণ

আল্লাহ প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীর ভাগ্য কোনো পুরুষকে দেননি, দিয়েছিলেন একজন মহিলাকে। তিনি রাসূল (সা:)-এর প্রথমা স্ত্রী বিবি খাদিজা (রা:) যিনি রাসূল (সা:)-এর কাছে জিবরাইলের আগমন সংবাদ শুনে কোনো দ্বিধা না করেই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। রাসূল (সা:) জিবরাইল (আ:)-এর আগমনের পূর্বে প্রায়ই হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এসময় তাঁকে দিনের পর দিন খাবার-পানীয় সরবরাহ করতেন বিবি খাদিজা (রা:)। তিনি কখনও রাসূল (সা:)-কে সংসার ত্যাগ করে রাতদিন ধ্যান মগ্ন থাকতে বাধা দেননি। যে দিন প্রথম ওহী নাযিল হলো তখন আবিষ্ট অবস্থায় রাসূল (সা:) কাঁপতে কাঁপতে বিবি খাদিজার কাছে উপস্থিত হলেন। বিবি খাদিজা (রা:) তাকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, যেহেতু তিনি সব সময়েই ভালমানুষ ছিলেন, মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন সেহেতু আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষতি করবেন না। ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে যখন মক্কার সব কাফেররা রাসূল (সা:)-এর উপর চড়াও হল তখন বিবি খাদিজা সারাক্ষণ রাসূল (সা:)-কে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা করতেন। কোরাইশরা যখন তাদের বয়কট করে তখন সেকালের আরবের অন্যতম ধনী মহিলা বিবি খাদিজা রাসূল (সা:)-এর সাথে হাসিমুখে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটান।

উত্তর : ৩. খাদিজা (রা:)-এর ধর্মনিষ্ঠার ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি

খাদিজা (রা:) তাঁর বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পান আল্লাহর কাছ থেকে জিবরাইল (আ:)-এর মাধ্যমে। এক সন্ধ্যায় তিনি যখন পর্বতগুহায় রাসূল (সা:)-এর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জিবরাইল (আ:) উপস্থিত হন এবং তাঁর (খাদিজার) কাছে

আল্লাহর তরফ থেকে শুভেচ্ছা ও শান্তির বার্তা পৌছান। তাঁকে এই সুসংবাদ দেন যে, আল্লাহ তাঁর জন্য বেহেশতে এক মুক্তার প্রাসাদ তৈরী করেছেন যাতে কোনো কোলাহল, অবসাদ ও যন্ত্রণা নেই।

উত্তর : ৪. খাদিজা (রা:)-এর যোগ্যতা সম্পর্কে রাসূল (সা:)-এর মন্তব্য

তাঁদের বিবাহিত জীবনে খাদিজার (রা:) প্রতি রাসূলের (সা:) আকর্ষণ ও ভালবাসা ছিল চোখে পড়ার মত। রাসূল (সা:) মাত্র ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়স্কা বিবি খাদিজাকে বিয়ে করেন। অত:পর বিবি খাদিজার প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূল (সা:) আর বিয়ে করেননি। রাসূল (সা:) তাঁর জীবনের সবচাইতে তরুণ উজ্জ্বল এবং কর্মক্ষম সময়টিই বিবি খাদিজার সাথে সংসার জীবনে ব্যয় করেন। এতে বুঝা যায় তাঁদের বিবাহিত জীবন কত মধুর ও সুখের ছিল। রাসূল (সা:) প্রায়ই আল্লাহর চোখে সফল নারীর উদাহরণ দিতে গিয়ে বিবি আসিয়া (মূসা (আ:)-এর পালক মাতা), বিবি মারইয়াম, (ঈসা (আ:)-এর জননী) এর সাথে বিবি খাদিজার নাম বলতেন। খাদিজার মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও রাসূল (সা:) বারবার তাঁর কথা স্মরণ করতেন। তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের উপহার পাঠাতেন। খাদিজার প্রতি রাসূলের অনুভূতি দেখে একবার বিবি আয়েশা তাঁর পরলোকগত সতীনের প্রতি খানিকটা ঈর্ষা অনুভব করেন। তখন রাসূল (সা:) বলেন, "খাদিজা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করে যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি, সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল যখন অন্যরা অবিশ্বাস করত, যখন সবাই আমার উপর আর্থিক সমর্থন তুলে নেয় তখন সে তাঁর সমস্ত সম্পদ আমাকে দেয় আর আমার সকল সন্তান তার গর্ভে জন্ম নেয়"। এই বলে রাসূল (সা:) তাঁর সকল স্ত্রীর উপর বিবি খাদিজার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা দেন। (খাদিজা ব্যতীত অন্য একজন স্ত্রীর গর্ভে ১টি সন্তান জন্ম হয় যার অকাল মৃত্যু হয়)

উত্তর : ৫. স্বামীর উপর নির্ভরতা ছাড়া শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী মুসলিম নারী

রাসূল (সা:)-এর কন্যা জয়নাব রাসূলের (সা:) ইসলাম প্রচার শুরুর পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর স্বামী ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে জয়নাব (রা:) স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে চলে আসেন। কারণ মুশরিকের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ। উম্মে হাবিবা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর পিতা কঠোর ভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পিতা-মাতার আনুগত্যের চেয়েও উর্ধ্বে।

উমর ইবনে খাত্তাবের বোন ফাতিমা ও তার স্বামী মুসলমান হয়েছে জানতে পেরে উমর উত্তেজিত ও রাগান্বিত হয়ে তাদের বাড়িতে ছুটে আসেন। ফাতিমা দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন যদিও ওমর তার মুখে আঘাত করে রক্তাক্ত করেন। এ ঘটনার পরই উমর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

উত্তর : ৬. ইসলামের স্বার্থে মুসলিম নারীর নির্যাতিতা হবার উদাহরণ

ইসলামের প্রথম শহীদ ছিলেন একজন মহিলা। তিনি হচ্ছেন সুমাইয়া (রা:) যাকে কাফেরদের নেতা আবু জেহেল প্রচণ্ড অত্যাচার করে তাঁর মুখ থেকে ইসলাম বিরোধী স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু আবু জেহেলের চেষ্টা ব্যর্থ হলে সে নিজ হাতে সুমাইয়া (রা:)-কে হত্যা করে। আরেকজন মহিলার চোখ অন্ধ হয় ইসলাম কবুলের জন্য অনেক নির্যাতন করার ফলে। আরও অসংখ্য মহিলা আছেন যারা অত্যাচারিত হয়েছেন এবং চোখের সামনে পিতা, স্বামী, ভাই অথবা সন্তানকে নির্যাতিত হতে দেখেছেন তবু কাফেরদের কাছে মাথা নত করেননি।

উত্তর : ৭. ইসলামের স্বার্থে বিপদ বরণ করার উদাহরণ

ইসলামের স্বার্থে বিপদজনক কাজে মেয়েদের ঝাঁপিয়ে পড়ার বহু উদাহরণ আছে। আবু বকর (রা:) যখন রাসূল (সা:)-এর সাথে মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হন তখন তাঁর কিশোরী কন্যা আসমা (রা:)-কে আবু জেহেল তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু আসমা (রা:) কাফেরদের শত চাপেও রাসূলের (সা:) অবস্থান জানাননি। এমনকি আবু জেহেল তাঁকে প্রহার করলেও আসমা (রা:) অটল থাকেন। পরবর্তীতে অত্যন্ত গোপনে আসমা (রা:) সওর গিরি গুহায় গিয়ে তাঁদের খাবার পৌছান ও কাফেরদের তৎপরতা সম্পর্কে খবর দেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : Justice Abdul Qader Auda 'Criminal Law in Islam'. পৃষ্ঠা- ৩১৫
আল কুরআন- ২:২৮২, ২৪:৬-৯, ৪:১৫, ৫:১০৬-৭, ২৪:৪, ২৪:১৩, ৬৫:২।

প্রশ্ন ২ : ইতিহাসে উল্লিখিত আছে প্রথম ওহী লাভের পর যখন রাসূল (সা:) কম্পিত ভাবে হেরা গুহা থেকে বাড়ীতে আসেন তখন বিবি খাদিজা (রা:) তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, 'আপনি আপনার প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের প্রতি দয়াশীল, আপনি অসহায় মানুষকে সাহায্য করেন, আপনি দানশীল, আপনি সত্যবাদী, আপনি বন্ধুবৎসল এবং রোগাক্রান্ত মানুষের সেবা করেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনার ক্ষতি করবেন না'।

প্রশ্ন ৩ : বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, যখন কাফেররা রাসূল (সা:)-এর চারিদিকে কোলাহল হট্টগোল করতেন তখন খাদিজা (রা:) তাঁর সাথে কোমল ছিলেন, তাই বেহেশতে তাঁর প্রাসাদ হবে কোলাহল মুক্ত। তিনি কখনও রাসূল (সা:)-কে কষ্ট দেননি বরং সকল অবসাদ ও যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন, তাই বেহেশতেও অবসাদ ও যন্ত্রণা তাঁকে স্পর্শ করবে না।

জি-২০ ইতিহাসে মুসলিম নারী (২)

প্রশ্ন ১. ইসলামের প্রচারে মুসলিম নারীদের অংশ গ্রহণের কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি?

২. জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় খ্যাত মুসলিম নারীর উদাহরণ ইতিহাসে আছে কি?

৩. সমাজ কল্যাণ ও দানশীল কর্মকাণ্ডে মুসলিম মেয়েরা জড়িত ছিল কি?

৪. মুসলিম মেয়েরা যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে অংশ নিত কি?

৫. প্রত্যক্ষ যুদ্ধে মুসলিম মেয়েদের অংশ নেবার কোনো ঘটনা আছে কি?

৬. যারা বলে ঐ সময় ইসলাম ছিল নতুন এবং দুর্বল সেহেতু মেয়েদের এসব কাজে অংশ নিতে হয়েছে, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এটা নিষ্প্রয়োজন- এর জবাবে কি বলবেন?

উত্তর : ১. ইসলামের প্রচারে মুসলিম নারী

ইসলাম প্রচার ও অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছান প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। শিক্ষার মতই এটা কোনো সুযোগ বা অধিকার নয় বরং প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য কর্তব্য ও দায়িত্ব। ইসলাম প্রচারে নিবেদিতা কয়েকজন মহিলার উদাহরণ :

উরওয়া বিনতে আবদুল মোতালেব রাসূলের (সা:) মিশনের প্রথম দিকে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ ও প্রচার করেন যখন কাফেররা কঠোরভাবে ইসলামের বিরোধিতা করছিল।

প্রখ্যাত সাহাবা আনাস (রা:)-এর মা উম্মে সালিম তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তৎকালীন মক্কার প্রখ্যাত ধনী আবু তালহার (যিনি তখনও মুশরিক) পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পান। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, আবু তালহা মুশরিক। আবু তালহা যখন তাঁর সম্পদের উল্লেখ করেন তখন তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বলেন, "আপনার সোনা রূপার আমার কোনো প্রয়োজন নেই বরং যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আপনার ঈমানই হবে আমার মোহরানা। আপনার কাছ থেকে আর কোনো উপহার আমি চাই না।" পরবর্তীতে আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন ও তাকে বিয়ে করেন।

উম্মে শারিক বিপদ নিশ্চিত জেনেও মুশরিকদের বাড়ী যেতেন এবং তাদের স্ত্রী কন্যাদের দ্বীনের দাওয়াত দিতেন।

উত্তর : ২. জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শিক্ষায় মুসলিম নারী

রাসূল (সা:)-এর যুগে এবং পরবর্তীতে বহু মুসলিম নারী জ্ঞান অর্জন করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েকজন হচ্ছেন : রাসূল (সা:)-এর স্ত্রী বিবি

আয়েশা (রা:) যিনি রাসূলের হাদীসের অন্যতম উৎস ছিলেন। প্রখ্যাত সাহাবা আবু মূসা আশআরী (রা:) বলেন, আমরা সাহাবারা যখনই ইসলামী আইনের জটিল কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতাম তখনই আয়েশার (রা:) কাছে যেতাম এবং সমাধান পেতাম। আয়েশা (রা:) প্রায়ই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত বিষয়ে ফতওয়া ও সিদ্ধান্ত দিতেন।

মদীনার আসমা বিনতে ইয়াজিদ রাসূল (সা:)-এর নিকট বায়াত নেন মদীনাতে। তিনি এত ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেছিলেন যে, জ্ঞান বিতরণ করা তার পেশায় পরিণত হয়েছিল এবং পরবর্তী অনেক পণ্ডিত তার কাছ থেকে জ্ঞানাহরণ করেছিল।

উত্তর : ৩. সমাজকল্যাণমূলক কাজে মুসলিম নারী

নারী স্বভাবতই: কোমল, দয়ালু এবং ত্যাগী; কাজেই দান, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি কাজে তারা সব সময়ই অগ্রণী। ইসলামের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায় মানুষ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই ত্যাগী, পরোপকারী ও সমাজসেবী হয়ে উঠে। মেয়েরাও এ ধরনের কাজে সমানভাবে অংশ নিয়েছে।

রাসূল (সা:)-এর মৃত্যুর পর আয়েশা (রা:)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের তাঁর জন্য এক লক্ষ দিরহাম উপহার নিয়ে আসেন। সাথে সাথেই সমুদয় অর্থ তিনি গরীবদের মাঝে বণ্টন করেন। সেদিনটিতে তিনি রোযা ছিলেন। সারাদিন সমস্ত অর্থ গরীবদের বিলিয়ে ইফতারের সময় যখন তিনি ঘরে ফিরেন তখন দেখেন যে, ঘরে এতটুকুও খাবার নেই, কোনো টাকা পয়সাও নেই; লক্ষ দিরহাম পেয়ে একবারের জন্যও তিনি নিজের কথা ভাবেননি।

ফাতিমা (রা:) ছিলেন রাসূলের অত্যন্ত স্নেহের কন্যা। একবার তিনি এবং আলী (রা:) রাসূল (সা:)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের অভাব দারিদ্র্যের কথা বলেন এবং একজন কাজের লোক দিতে বলেন। এটা কোনো বিলাসিতার দাবি ছিল না। ফাতিমা-আলীর অভাবের সংসারে সব কাজ তাদের করতে হত। যাঁতায় গম পিষে আটা বানাতে গিয়ে ফাতিমার (রা:) হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল আর পানির ভিস্তি বহন করতে করতে আলী (রা:)-এর পিঠে দাগ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও রাসূল (সা:) তাঁদের বলেন, "আমি তোমাদের কাজের লোক দিতে পারব না, যেখানে অনেক মুসলিম এখনো অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে"। বরং তিনি তাঁদের কয়েকটি দোয়া পড়তে বলেন। ফাতিমা এবং আলী (রা:) সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান। তাঁদের কাছে আধ্যাত্মিক মুক্তি ও শান্তি দুনিয়ার আরামের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান ছিল। এই চিত্রের সাথে যদি বর্তমান সময়ের প্রশাসকদের তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যায় এরা নিজের ও পরিবারের কল্যাণে অকাতরে রাষ্ট্রের অর্থ ও জনবল ব্যয় করছে।

খলিফা উমর (রা:) বাজারের দোকানীরা যাতে ক্রেতাদের ঠকাতে না পারে তা দেখার জন্যে উম্মে শিফা নামে একজন মহিলাকে নিযুক্ত করেছিলেন। উমর (রা:) তার মতামতকে খুবই গুরুত্ব দেন।

উত্তর : ৪. যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ

শুরু থেকেই ইসলামের সাথে বাতিলের সকল যুদ্ধে মুসলিম মেয়েরা ইসলামের স্বার্থে অংশ নিয়েছে। রণাঙ্গনে তারা পুরুষের পাশে থেকে তাদের খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা সহ অন্যান্য সাহায্য করেছে। অসংখ্য হাদীসে এমন অনেক নেতৃস্থানীয় মহিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে ছিলেন রাবিয়া বিনতে মাউদ, উম্মে আতিয়া, আয়েশা, উম্মে আইমান, উমাইয়া বিনতে কায়েস গাফারিয়া, উম্মে সালিম, নুসাইবা বিনতে কা'ব, উম্মে তাহের, হামনা বিনতে যাশ, সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব প্রমুখ। এরা ছিলেন আরো অনেক নাম না জানা মুসলিম মুজাহিদা নেত্রী। উমাইয়া বিনতে কায়েস গাফারিয়া বলেন, তিনি প্রথম যুদ্ধে যোগ দেন খুব অল্প বয়সে। তিনি যখন রাসূল (সা:)-এর কাছে এসে আরো কয়েকজন নারীসহ যুদ্ধে যাবার অনুমতি চান তখন রাসূল (সা:) বলেন, 'আল্লাহর রহমতে এগিয়ে এসো'।

উত্তর : ৫. প্রত্যক্ষ যুদ্ধে মুসলিম নারী

হুনায়েনের যুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত অবস্থায় তখন উম্মে সালিম তার কোমরে ছোরা বেধে তাঁর স্বামী আবু তালহাকে বলেন, যে তিনি তার কাছে যে কোনো কাফের এলে হত্যা করবেন। তাঁর স্বামী আবু তালহা (রা:) অথবা রাসূল (সা:) কেউ তাঁকে এ কাজে বাধা দেননি। উহুদ যুদ্ধে যখন কাফেররা রাসূল (সা:)-কে ঘিরে ফেলেছিল তখন আরও কয়েকজন মুসলিম পুরুষের মধ্যে নুসাইবা বিনতে কা'ব তলোয়ার হাতে রসূল (সা:)-কে আড়াল করে দাঁড়িয়ে কাফেরদের মোকাবেলা করেন।

খন্দকের যুদ্ধে সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব একজন শত্রু সৈন্যকে তাঁবুর খুঁটির আঘাতে হত্যা করেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যখন বিপন্ন অবস্থায় তখন আসমা বিনতে ইয়াজিদ তাঁবুর খুঁটির সাহায্যে দশ জন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেন।

উত্তর : ৬. বর্তমান সময়ে ইসলাম রক্ষায় মুসলিম নারীর ভূমিকা

বিপদ এবং আগ্রাসন কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। অতীত যুগে ইসলাম রক্ষায় মেয়েরা যোগ দিয়েছে এখন তারা যুদ্ধে যেতে পারবে না এমন বলা ভুল। বরং বর্তমান সময়েই ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, মিসর, সিরিয়া, তুরস্ক এসব দেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে মেয়েরাও ছেলেদের পাশে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তবে যুদ্ধে যাওয়া মেয়েদের জন্য ছেলেদের মতো *ফরয* নয়। তাই বলে তারা স্বেচ্ছায় যেতে চাইলে তাদের বাধা দেবার কোনো যুক্তি নেই। উল্লেখ্য যে, ঘরে ছোট সন্তানকে অযত্নে রেখে মেয়েদের যুদ্ধে যাওয়া ইসলাম চায় না। তাই বলে যাদের অবসর আছে তাদের যুদ্ধে যেতে বাধা দেয়া যাবে না।

সূত্র :

প্রশ্ন ৪ : উম্মে আতিয়া বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় তিনি রাসূল (সা:)-এর সাথে ৭টি যুদ্ধে অংশ নেন। তার কাজ ছিল যুদ্ধাস্ত্র, খাদ্য, পানীয় সরবরাহ, চিকিৎসা এবং সেবা প্রদান করা।

প্রশ্ন ৫ : রাসূলের (সা:) হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে তিনি বলছেন, "আমি ডানে কিংবা বায়ে যেদিকেই তাকিয়েছি, দেখি নুসাইবা বিনতে কা'ব আমাকে রক্ষার জন্য লড়ছে।" ওহুদ যুদ্ধে নুসাইবা বিনতে কা'ব ১২ জায়গায় আঘাত পান।

প্রশ্ন ৬ : কিছু লোক মেয়েদের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে একটি হাদীস উদ্ধৃত করে। যখন উম্মে কাবশা যুদ্ধে যেতে চান তখন রাসূল (সা:) তাঁকে নিষেধ করে বলেন যে, যদি তাঁকে অনুমতি দেয়া হয় তবে সেটাই রীতি হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যেহেতু ইতোপূর্বে উল্লিখিত অনেক হাদীসে এবং ঘটনায় এটা দেখা যায় যে, রাসূল মেয়েদের যুদ্ধে গমনকে অনুমোদন করেছেন সেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে একটি হাদীসকেই এ ব্যাপারে শিক্ষার উৎস করা ঠিক নয়।

জি-২১ ইতিহাসে মুসলিম নারী (৩)

প্রশ্ন ১. ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিখ্যাত মহিলাদের কথা গুরুত্বের সাথে আলোচনার কি প্রয়োজন?

২. পরবর্তী যুগের মুসলিম নারীদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে কি জানা যায়?

৩. এই অবনতির কারণ কি?

৪. ইসলামী আইনে প্রাপ্য অধিকার থেকে নারীকে পরবর্তী যুগে বঞ্চিত করার উদাহরণ দিন।

৫. নারীর প্রতি এই বঞ্চনা যে ইসলাম বিরোধী এ ব্যাপারে যুক্তি কি?

৬. উপরের প্রশ্নের উত্তরে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিন।

৭. নারীর কণ্ঠ শোনা যে পুরুষের জন্য হারাম নয় তা প্রমাণ করুন।

৮. কিছু মুসলিম কিসের ভিত্তিতে দাবি করে যে নারীর কণ্ঠ শোনা হারাম?

উত্তর : ১. ইসলামের প্রাথমিক যুগের মহিলাদের কথা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের জীবনধারা আধুনিক মুসলমানদের জন্য আদর্শ। কারণ তখন স্বয়ং রাসূল (সা:)-এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় মুসলমানরা জীবন পরিচালিত করত। ইসলামের এই প্রাথমিক যুগ এবং সেই সময়ের মহিলাদের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যখন সমগ্র বিশ্বে নারীর অধিকার ছিল উপেক্ষিত নারীর প্রতি আচরণ ছিল নেতিবাচক সেই সময় ইসলামই নারীকে যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছিল। আর সে সময়কার নারীরা সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উত্তর : ২. পরবর্তী যুগে মুসলিম নারীদের অবস্থা

যদিও ইসলাম নারীদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং প্রাথমিক যুগের সকল মুসলিম তা মেনে চলত, কিন্তু পরবর্তী যুগে এই চর্চা অনেকাংশে রক্ষিত হয়নি। ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, জাতিতে প্রসারিত হয়েছে। যুগের আবর্তনে সেসব জাতির বিভিন্ন কুসংস্কার ইসলামের নিজস্ব নীতি-নিয়মকে অনেক ক্ষেত্রে গ্রাস করেছে। বর্তমানে ৫০টিরও বেশী দেশ জুড়ে বিস্তৃত মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানেই নারীর অধিকার বলতে ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সেই দেশের বা জাতির মূল্যবোধের এক সমন্বিত রূপ বিরাজ করছে।

উত্তর : ৩. ইসলামী সভ্যতার অবনতির কারণ

মুসলমানদের ঈমান তথা বিশ্বাসের প্রতি আন্তরিকতার অভাবই ইসলামী সভ্যতার পতনের মূল কারণ। যখন থেকে মুসলমানরা ঈমানের বাস্তব অনুশীলন কমিয়ে শুধু মুখের স্বীকৃতির (Lip service) মাঝে ঈমানকে সীমাবদ্ধ করা শুরু করল তখন থেকে সব ক্ষেত্রেই তাদের পতনের শুরু। ফলশ্রুতিতে অজ্ঞতা ও মূর্খতা বেড়েছে এবং বিভিন্ন কুসংস্কারে তারা আচ্ছন্ন হল। যার পরিণতিতে মুসলিম নারী এবং পুরুষ উভয়েরই মর্যাদা এবং অধিকার নষ্ট হল, যদিও নারীর ক্ষতিই ছিল বেশী। এভাবেই মুসলিম পুরুষরা একসময় নারীদের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা শুরু করল। আর নারীরাও এসব অধিকার ফিরে পেতে নিশ্চেষ্ট বসে রইল।

উত্তর : ৪. খোদা প্রদত্ত নারীর অধিকার হরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

অনেক ক্ষেত্রেই নারীর অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়। তবে তার মধ্যে চারটি উল্লেখযোগ্য-

ক) মেয়েদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত করা

খ) কনের মত ছাড়াই বিয়ে দেয়া

গ) হিজাবের পরিবর্তে পর্দা (অবরোধ) আরোপ

ঘ) নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষের জন্য হারাম (আওরা) ঘোষণা

উত্তর : ৫. সব অধিকার হরণ ইসলাম বিরোধী কেন?

ক) রাসূল (সা:)-এর বহু সহীহ হাদীস আছে যাতে তিনি মেয়েদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে তাদের পিতা-স্বামীদের নিষেধ করেছেন।

খ) ইসলামী আইন অনুসারে বর ও কনে উভয়ের মত না থাকলে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়।

গ) পর্দার নামে যে, অবরোধ প্রথা চলছে তা ইসলামসম্মত নয়। এটা হিন্দু, পার্সিয়ান এবং বাইজান্টাইন সভ্যতায় এবং কোনো কোনো খ্রিস্টান সমাজে দেখা যেতো। কুরআনে পর্দা শব্দটি নাই এবং কুরআনে যে, হিজাব শব্দ এসেছে তার ব্যাখ্যা অন্য। হিজাব হচ্ছে পোশাক, মন ও আচরণে শালীনতা এবং অবাধ মেলামেশা এড়িয়ে নৈতিকতা ও নারীর পবিত্রতা রক্ষা করা। হিজাব মেয়েদের প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়াকে বন্ধ করে না।

এই সাথে আর একটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন যা হচ্ছে 'হারেম'। এই শব্দটিও নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। হারেম শব্দটি 'হারাম' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ নিষিদ্ধ। যা মূলত: ছিল মুসলমানের বাড়ির যে অংশে পরিবারের মহিলারা থাকেন এবং

যেখানে বাইরের পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এই হারেম শব্দ মুসলিম নামধারী কিছু রাজা-বাদশা ও ধনী ব্যক্তির রক্ষিতাদের আবাসস্থলের নামে ব্যবহৃত হয়, যা সম্পূর্ণ অনৈসলামী চর্চা।

উত্তর : ৬. উপরিউক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি

কুরআন এবং হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে পারবে। ৩৩ নং সূরার ৫৯ নং আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে বারণ করেননি বরং তাদের শালীনতা বজায় রেখে যেতে বলেছেন। রাসূল (সা:) বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদের বৈধ প্রয়োজনে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন"। রাসূলের (সা:) জীবনে এমন ঘটনাও দেখা যায় যে, তিনি তাঁর আত্মীয় অথবা বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গেছেন যেখানে প্রধান মেজবান ছিলেন মহিলা। তিনি সেখানে তাদের সাথে কথা বলতেন, একসাথে খেতেন এবং তাঁদের খুঁটিনাটি খবর নিতেন। যেমন তিনি রাবিয়া বিনতে মাউদ-এর বাড়ী গিয়ে তাঁর কাছে অযুর জন্য পানি চাইলেন। যদিও এসব সাক্ষাতে নারী পুরুষ উভয়েই থাকত তবুও তারা ইসলামের শালীনতার আইন মেনে চলতেন। এতে পরিষ্কার হয় যে, নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারবে।

উত্তর : ৭. নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ (আওরা) না হবার প্রমাণ

যদি নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষের জন্য নিষিদ্ধই হতো তবে ৩৩ নং সুরার ৩২ নং আয়াতে রাসূলের স্ত্রীদের এভাবে বলা হতো না যে, পুরুষের সাথে কোমল (আকর্ষণীয়) ভাষায় কথা বলোনা বরং স্বাভাবিকভাবে (Customary ভাষায়) কথা বলো। এছাড়াও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অনেক সাহাবা ও ইসলামের পণ্ডিত নারীর কাছ থেকে হাদীসসহ অনেক বিষয় শিখেছেন। রাসূলের কাছে নারীরা আসতো এবং তাদের সমস্যা ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করত। বস্তুত: নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষের জন্য নিষেধ এমন কোনো উদ্ধৃতি কুরআনে বা হাদীসে নেই।

উত্তর : ৮. যার ভিত্তিতে কিছু মুসলিম নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষের জন্য হারাম হবার কথা বলে

এ বিষয়ে কুরআন এবং সুন্নায় প্রাপ্ত শিক্ষা অপরিবর্তনীয় এবং তা আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু তারপরও কিছু ব্যক্তি এসব শিক্ষার নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয়। তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে রাসূলের (সা:) উপস্থিতিতে মানুষ বেশী ধার্মিক ছিল ফলে তাদের জন্য অনেক সুযোগ অবারিত ছিল, যার অপব্যবহার তারা করত না। এখনকার যুগে এসব সুযোগ উন্মুক্ত থাকলে সমাজ পাপে সয়লাব হয়ে যাবে। কারণ মানুষের নৈতিক মান নেমে গেছে। (মূলত: এসব যুক্তি আমার ও ইসলামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য- অনুবাদক)

সূত্র :

প্রশ্ন ৩ : আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে (অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশনা ও আদেশ মতো না চলে।"। (১৩:১১)

প্রশ্ন ৫ : আয়েশা (রা:) প্রায়ই রাতে জামাতে নামাজ পড়তে অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে মসজিদে যেতেন এবং কেউ এতে বাধা দিতেন না।

ঐতিহাসিকরা বলেন হারেম কোনো বন্দিশালা ছিল না বরং মুসলমানের বাড়ীর সবচাইতে সুন্দর অংশ যেখানে বাগান ও ঝর্ণা পর্যন্ত থাকত।

প্রশ্ন ৬ : আল কুরআন ৩৩:৫৯

হাদীসে রাসূল (সা:) সতর্ক করেন যে, মুসলমানরা কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন না করে যেন পথে বের না হয়, তা হচ্ছে যথা: 'দৃষ্টিকে সংযত করা, মানুষকে আঘাত না করা, সালামের জবাব দেয়া, মেয়েদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা'। এই হাদীসের বাচনভঙ্গী দেখে বুঝা যায় রাসূল (সা:) আশা করছেন মেয়েরা ঘরের বাইরে থাকবে।

প্রশ্ন ৭ : আল কুরআন ৩৩:৩২, সূরা মুজাদালা।

জি-২২ সাম্প্রতিক ইতিহাসে মুসলিম নারী

প্রশ্ন ১. সাম্প্রতিক ইতিহাসে মুসলিম নারীদের মধ্যে কোন্ কোন্ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে?

২. এর মধ্যে প্রথম ধারাটি কেন ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে?

৩. যারা এর মাঝে স্থিতাবস্থা (Status quo) বজায় রাখতে চায় তাদের যুক্তি কি?

৪. রাসূলের (সা:) ঐ হাদীসের ব্যাপারে মন্তব্য করুন যেখানে বলা হয়েছে মেয়েরা শুধু সতীত্ব বজায় রেখে নামাজ, রোযা আর স্বামীর আনুগত্য করলেই বেহেশতে যাবে।

৫. এটা কি সত্য যে, রাসূল (সা:) বলেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর 'পুরুষরা নারীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হবে? এ কথার অর্থ কি?

৬. কিছু মানুষ রাসূলের (সা:) উদ্ধৃতি দিয়ে বলে যে, মেয়েরা ধর্ম ও মনের দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে অসুবিধাজনক অবস্থানে- এ ব্যাপারে মন্তব্য করুন।

৭. রাসূল (সা:)-এর ঐ হাদীসের ব্যাখ্যা করুন যেখানে বলা হয়েছে 'মেয়েরা পাঁজরের বাঁকা হাড়'।

৮. উপরের প্রশ্নগুলোয় রাসূলের হাদীসের যে, ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা কিভাবে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

উত্তর : ১. সাম্প্রতিক ইতিহাসের মুসলিম নারীদের প্রবণতা সমূহ

সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিশ্বে মুসলিম নারীদের মাঝে তিনটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে :

ক) একদল সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের আদর্শে বিশ্বাসী,

খ) একদল বর্তমান অবস্থায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চাইছেন,

গ) ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য একদল কাজ করছেন (এর পক্ষেই দ্রুত সমর্থন বাড়ছে)

উনবিংশ শতকের শেষভাগে এসে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও নেদারল্যান্ডের উপনিবেশে পরিণত হয়। সমগ্র বিশ্বে পাশ্চাত্যের দোর্দণ্ড আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে কিছু মুসলমানের মধ্যে এই ধারণা জন্ম নেয় যে, তাদের এই পিছিয়ে

পড়ার কারণ হচ্ছে তাদের ধর্ম ইসলাম। পশ্চিমা বুদ্ধিদাতারাও তাদের এই মন্ত্রণা দিতে থাকে যে, ইসলামই মুসলিম বিশ্বকে পশ্চাতে নিয়ে যাচ্ছে। যেসব মুসলমানের ঈমান ছিল দুর্বল এবং বিশেষভাবে যারা সাম্রাজ্যবাদের দালাল ছিল তারাই ইসলাম বাদ দিয়ে অবাধ পাশ্চাত্যকরণের পক্ষে বেশী সাফাই গায়। এর অংশ হিসেবেই মুসলিম মেয়েদের শালীন পোশাক বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে অশালীন পোশাক পরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

উত্তর : ২. পশ্চিমাকরণ কেন ব্যর্থ প্রমাণিত হল

ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মের সীমা ও বিশ্বাসের আওতায় যে, কোনো উন্নয়ন বা আধুনিকায়ন বৈধ। কিন্তু যখন মানুষ তার ধর্ম বিশ্বাস ও রীতি-নীতি ভুলে অন্ধের মতো পাশ্চাত্যের অনুকরণ শুরু করে তখন সে ভুলে যায় কোন্‌টা প্রয়োগযোগ্য আর কোন্‌টা প্রয়োগযোগ্য না। নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতা তাকে আরও পিছিয়ে দেয়। ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করে কোনো আধুনিকায়ন প্রক্রিয়াই সফল হতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী নেতারা এটাই করেন। তারা যদি এমন না করে নিজের ধর্মের দিকে তাকাতেন তাহলে দেখতেন পাশ্চাত্যের সব চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব ইসলামেই আছে। সমাজের উন্নয়নে আধুনিকায়নে পাশ্চাত্যের কাছে না গিয়ে ইসলামের কাছেই সমাধান পাওয়া যেতো, বিশেষভাবে নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেখানে বিশ্বে একমাত্র ইসলামই নারীর সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে।

উত্তর : ৩. বর্তমান অবস্থায় স্থিতাবস্থা যারা বজায় রাখতে চায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি

পাশ্চাত্যের আগ্রাসনে ভীত একদল সমাজবিদ আশংকা করছেন যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এই অপস্রোতকে ইসলামী আদর্শ রোধ করতে পারবে না। তারা আরো ভয় পাচ্ছেন যে, এই পাশ্চাত্যকরণের ফলে সৃষ্ট অবাধ মেলামেশা মুসলিম সমাজের নৈতিক মানকে ধ্বংস ও পর্যুদস্ত করবে; ইসলামের ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে দেবে। তাই তারা এই অপস্রোত থেকে নারীকে দূরে রাখতে তাকে আরও ঘরে আবদ্ধ করে শিক্ষা দীক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখতে চাচ্ছেন। এজন্য তারা কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত নারী অনেক অধিকার রদ করে দিচ্ছেন এবং কিছু হাদীসের ভুল ও বিভ্রান্ত ব্যাখ্যা ব্যবহার করছেন।

উত্তর : ৪. নারীর বেহেশতে যাবার জন্য কি শুধু সতীত্ব রক্ষা, নামাজ, রোযা আর স্বামীর আনুগত্যই যথেষ্ট?

এ ধরনের একটি হাদীসে আছে যে, কয়টি কাজ করেই নারী বেহেশত লাভ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে এই হাদীসের এমন ব্যাখ্যা করা ভুল যে, মুসলিম নারীর বেহেশত লাভের জন্যে একটি কাজই করতে হবে। কারণ-

ক) ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভ আছে যা সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয।

কিন্তু ঐ হাদীসের ব্যাখ্যা করে যারা নারীর অন্যান্য কাজ বাদ দিতে চান তারা কী নারীর উপর আল্লাহর আরোপিত ফরয যাকাত এবং হজ্জও নিষিদ্ধ করবেন?

খ) স্বয়ং রাসূল (সা:) তাঁর জীবদ্দশায় সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে সব কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন। (কাজেই একটি হাদীসের ভিত্তিতে তাঁর সমগ্র জীবনের বাস্তবতাকে উল্টে দেয়া যায় না -অনুবাদক)।

উত্তর : ৫. পুরুষেরা নারীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন- এর ব্যাখ্যা

এ ধরনের শঙ্কা এক হাদীসে রাসূল (সা:) বলেছেন যা সহীহ। লক্ষ্য করা দরকার যে, এখানে ফিৎনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অনূদিত অর্থ দাঁড়ায় ভ্রান্তি (temptation)। কিন্তু এর আরও অর্থ আছে যার মানে পরীক্ষা (test or trial)। কুরআনে বলা হয়েছে যে, "নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য ফিৎনা (অর্থাৎ পরীক্ষা)" কাজেই এখানে স্বামী-স্ত্রী, সম্পদ বা সন্তান কাউকেই হেয় করা হয়নি বা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। বরং মানুষকে এটাই সতর্ক করা হয়েছে যে, যখন সে আল্লাহর রহমতে স্ত্রী, স্বামী, সন্তান, সম্পদ লাভ করবে তখন এসব যেন তাকে খোদার স্মরণ থেকে দূরে নিয়ে না যায়। জীবনের প্রতিটি বিষয়ই একেকটি পরীক্ষা (test)।

উত্তর : ৬. ধর্ম ও মনের দিক থেকে মেয়েরা কি পুরুষের চেয়ে অসুবিধাজনক অবস্থানে?

কোনো আলোচনার প্রসঙ্গে রাসূল (সা:) এমন উক্তি করেছেন তা জানা প্রয়োজন। রাসূল (সা:) মেয়েদের সৎ কাজের উপদেশ দিতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, আল্লাহ নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে বানিয়েছেন। তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ধর্মের দিক থেকে নারীর পিছুটান কোথায়; তার উত্তরে তিনি বলেন, তাদের ঋতুস্রাবের দিনগুলোয় তারা নামায পড়তে পারে না। (এখানে উল্লেখ্য যে, শরীর থেকে রক্তঝরার সময় নারী পুরুষ উভয়েরই অযু নষ্ট হয়। নামাজ পড়তে পারে না যতক্ষণ না তারা গোসল করে) অত:পর রাসূল (সা:) মেয়েদের ভাল কাজ করার মাধ্যমে নামাজ না পড়ার ঘাটতি (অবশ্যই এ জন্য তারা আদৌ দায়ী নয়) পুষিয়ে নিতে বলেন। (অবশ্য তাঁর এ কথায় মেয়েদের প্রতি মমত্বই ফুটে উঠে, অবজ্ঞা নয় –অনুবাদক)। একই সময়ে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল মেয়েদের মনের দিক থেকে অসুবিধে কোথায়, তখন তার জবাবে তিনি বলেন যে, আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, দু'জন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন মেয়ের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে।

এই সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিষয়টির ব্যাখ্যা আগেই দেয়া হয়েছে। (আরও উল্লেখ্য যে, রাসূলকে যে ভাষায় প্রশ্ন করা হয়েছে উত্তর সেভাবেই এসেছে। প্রেক্ষিত বিবেচনা না করে শুধু উত্তরের বাক্য বিবেচনা করলে চলবে না। -অনুবাদক)। কোনভাবেই রাসূল (সা:)

বলছেন না যে, মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে কম বুদ্ধিমান, বরঞ্চ এ রকম বলা ইসলামের শিক্ষারই বিরুদ্ধ কথা।

উত্তর : ৭. মেয়েরা কি পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মত

এই উক্তি বিভিন্ন হাদীস সংকলনে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও এটা লিখা হয়েছে যে, আল্লাহ্ নারীদের 'পাঁজরের হাড় থেকে' তৈরী করেছেন আর কোথাও লিখা হয়েছে যে, 'নারী পাঁজরের হাড়ের মত'। দ্বিতীয় বর্ণনাটাই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে রাসূল (সা:) যেটা বোঝাতে চেয়েছেন তার অর্থ হচ্ছে পাঁজরের হাড় প্রকৃতই বাঁকা। কেউ যদি তাকে জোর করে সোজা করতে চায় তবে তা ভেঙ্গে যাবে। তেমনি নারীকে আল্লাহ যে, সহজাত বৈশিষ্ট্য ও প্রবৃত্তি দিয়ে তৈরি করেছেন, কোনো মানুষ (সম্ভবত স্বামী) যদি তাকে তার বৈশিষ্ট্য জোর করে বদলাতে চায়, তবে সেও ভেঙ্গে যাবে। একদল আইনবিদ এ ভেঙ্গে যাওয়াকে মনে করছেন যে, তা বিবাহ বিচ্ছেদে রূপ নিতে পারে। কাজেই দেখা যায় যে, এই পাঁজরের হাড়ের কথা বলে রাসূল (সা:) নারীকে অপমান করছেন না বরং তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে পুরুষকে উপদেশ দিচ্ছেন যাতে পুরুষেরা নারীদের (স্ত্রী, কন্যা, বোন) সাথে আরো সহনশীল আচরণ করে।

এর প্রমাণস্বরূপ আর একটি হাদীসে দেখা যায় রাসূল (সা:) বলছেন, "নারীর প্রতি দয়ালু হও কারণ তারা পাঁজরের হাড়ের মত। আমি তাদের প্রতি দয়ালু হতে তোমাদের বলছি"।

উত্তর : ৮. এসব ব্যাখ্যার যথার্থতার প্রমাণ

ইসলামের মূল সূত্রই হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস। সামগ্রিকভাবে কুরআনের কোথাও এমন কোনো কথা নেই যাতে নারীকে খাট করা হয়েছে। আবার এমন কোনো হাদীসও নেই যা কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। কাজেই বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটা হাদীসের দু'একটা বাক্য উদ্ধৃত করে নারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা তৈরীর চেষ্টা করা ভুল। কুরআন স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে যে, নারী ও পুরুষ উভয়ে সৎ কাজের জন্যে সমান পুরস্কার পাবেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : যেমন, মিসরের কাশিম আমীন এবং হুদা শরাভী

প্রশ্ন ৫ : আল কুরআন ৮:২৮, ৬৪:১৪

প্রশ্ন ৮ : আল কুরআন ৭৪:৩৮, ৩৩:৩৫

জি- ২৩ বর্তমান সমাজে মুসলিম নারী

প্রশ্ন ১. পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের মোকাবেলায় ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কি?

২. ইসলামী পুনর্জাগরণের মূলভিত্তি কি?

৩. সামাজিক রীতিনীতি কি ইসলামী আইনের গ্রহণযোগ্য অংশ?

৪. বর্তমান সমাজে নিজের অবস্থার উন্নয়নে মুসলিম নারী কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

৫. পরিবারের মধ্যে থেকে সামাজিক উন্নয়নে মুসলিম নারী কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

৬. বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে মুসলিম নারীর ভূমিকা কি?

৭. নারীর উন্নয়নে মুসলিম পুরুষের কি ভূমিকা রাখা উচিত?

উত্তর : ১. পাশ্চাত্যের মোকাবেলায় ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন

চারটি মূলনীতিকে ভিত্তি করে এই পুনর্জাগরণ আন্দোলন চলছে। তা হলো :

ক) এটা সবার কাছে প্রচার করা যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারী সমাজের সকল স্তরের সব কাজে জড়িত ছিল। ইসলামী সভ্যতা ও মূল্যবোধের পতনের সাথে নারীর উপর বিভিন্ন বিধি নিষেধসহ অবরোধ নেমে আসে। কাজেই এই আন্দোলন নারীকে আবার সমাজে সক্রিয় হতে বলে এবং অবশ্যই তা ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে।

খ) মুসলমানদের মাঝে এই চেতনা জাগ্রত করা যে, তারা হবে পথিকৃৎ, অনুকরণকারী নয়; নেতা, অনুসরণকারী নয়। কাজেই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। সমাজ ব্যবস্থার যে, কোনো উন্নয়ন বা সংস্কার হতে হবে আল্লাহর ও রাসূলের (সা:) অনুমোদিত পন্থায়।

গ) সবার কাছ থেকে এই স্বীকৃতি আদায় যে, ইসলামই নারীর মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলাম প্রদত্ত এই অধিকার আদায়ে মুসলিম মেয়েদের সচেতন করা।

ঘ) সবার মাঝে এই অনুভূতি জাগানো যে, ইসলামী সভ্যতার সমস্যা ও বিপদ ইসলামের ও ইসলামী আইনের কোনো দুর্বলতা বা অপরিপূর্ণতা নয় বরং মুসলমানদের ইসলামের শিক্ষা ও তার প্রয়োগ থেকে দূরে সরে যাবার

পরিণতি মাত্র। কাজেই এ থেকে পরিত্রাণের একটাই উপায়, তা হচ্ছে ইসলামে পরিপূর্ণ প্রত্যাবর্তন। সমস্যা মুসলমানদের নিয়ে এবং এটা ইসলাম ধর্মের সমস্যা নয়।

উত্তর : ২. ইসলামী পুনর্জাগরণের মূলভিত্তি

যে কোনো ধর্মীয় পুনর্গঠন আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। এর অর্থ হচ্ছে মানবজীবনের সার্বিক পুনর্বিন্যাস সাধনে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বা সামষ্টিক ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ নির্দ্বিধায় বাস্তবায়নের দৃঢ় মানসিকতা। এই আধ্যাত্মিক ভিত্তি বিনির্মাণের পর আসে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি নির্মাণের প্রশ্ন। বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি নির্ভর করে ইসলামের 'নির্ভরযোগ্য উৎস' থেকে প্রকৃতভাবে ইসলামকে বুঝা।

এই আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি হচ্ছে মুসলমানদের এমন জ্ঞান অর্জন যার মাধ্যমে তারা আল্লাহ নির্ধারিত মাপকাঠিতে যে, কোনো কিছুর গ্রহণযোগ্যতা, ঠিক বা বেঠিক হবার প্রশ্নের সমাধানে সক্ষম হবে। মূলত: ইসলামের শিক্ষা আক্ষরিক অর্থে ও ভাবার্থে (in letter and spirit) প্রয়োগ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে আঞ্চলিক রীতিনীতি ও চর্চা যা ইসলামী শিক্ষাকে বিতর্কিত করতে পারে তা বেছে চলতে হবে।

উত্তর : ৩. সামাজিক রীতিনীতি (Custom) প্রসঙ্গে

ইসলামী আইনে সামাজিক রীতিনীতি কোনো কোনো সময় অবদান রাখতে পারে। তবে তা কখনই ইসলামী আইনের নি:শর্ত উৎস হতে পারে না। বস্তুত: অনেক স্থানীয় রীতিই অনৈসলামিক হতে পারে। সামাজিক রীতিনীতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে, তা অবশ্যই ইসলামসম্মত হতে হবে বা অন্তত:পক্ষে তাতে ইসলামবিরোধী কিছু থাকতে পারবে না। যদি এমন কোনো রীতি থাকে যা ইসলাম বিরোধী তবে তা অবশ্যই বাতিল বা বর্জন করতে হবে, এর অন্যথা হতে পারবে না।

উত্তর : ৪. সমাজে নিজেদের অবস্থানের উন্নয়নকল্পে মুসলিম নারীর ভূমিকা

পুরুষের মতো প্রত্যেক নারীও এই পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা। পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার ব্যাপক দায়িত্ব তার উপরও সমানভাবে আছে- এই অনুভূতি নিয়ে প্রতিটি মেয়ের কাজ করা উচিৎ। এভাবে কাজ করলে সে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক-এ সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে পারবে।

উত্তর : ৫. পারিবারিক পর্যায়ে কিভাবে মুসলিম নারী সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে?

সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে পরিবার মুসলিম নারীর সবচেয়ে বড় কর্মক্ষেত্র। বধু, মাতা, কন্যা তিনভাবেই নারী পরিবারে সক্রিয়। বিয়ের পূর্বে একটি মেয়ে তার

তৎপরতায় তার পরিবার পিতা, মাতা, ভাই, বোন ও আত্মীয়দের মাঝে ভালবাসা ও শান্তির পরিবেশ তৈরী করতে পারে, যা অবশেষে সমাজেই শান্তি আনবে। বিবাহিত জীবনে সে স্বামীর সৎপথে চলার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণাদাতা হতে পারে। সংসারে যত্নবান থেকে স্বামীকে সৎকাজে উৎসাহ আর অসৎকাজ থেকে দূরে রাখতে পারে। তার যদি সন্তান থাকে তবে তাদের মাধ্যমে সমাজের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের কাণ্ডারীর ভূমিকা রাখতে পারে। সে শুধু সন্তানদের শারীরিকভাবেই বড় করবে না বরং আধ্যাত্মিকভাবেও। বস্তুত: সন্তানের দ্বীন শিক্ষার প্রথম ইনস্টিটিউট মা।

উত্তর : ৬. বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে মুসলিম নারীর ভূমিকা

বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে নারী, সমাজের সবার কল্যাণকামী বোনের ভূমিকা রাখবে। কুরআনে ৯ নং সূরার ৭১ নং আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে। মনে রাখতে হবে যে, এই কাজের জন্য তাকে আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে। এ জবাবদিহিতা এড়ানো যাবে না।

আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য একজন মুসলিম নারী (পুরুষের মতই) প্রথমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, আস্থা অর্জন করে নিজের সব পছন্দ অপছন্দের উপর আল্লাহর ইচ্ছাকে স্থান দিতে হবে।

আর দ্বিতীয় কাজ হবে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পোশাকে, চলাফেরায়, ব্যবহারে, নামাজে, রোযায়, দানশীলতায় তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তবায়ন করা। সমাজে সচেতন মুসলিম হিসেবে ভূমিকা রাখবার জন্য ইসলামের সীমার মধ্যে পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

তৃতীয়ত মুসলিম নারী ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়তার সাথে সমাজে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করবে এবং এই কাজে তার অংশ নেয়ার যৌক্তিকতা অন্য মুসলমানদের বুঝাবে।

সর্বশেষে সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেয়া বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্নের জবাব দেবে। ইসলামই যে, নারীর অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা সরবে প্রকাশ করবে এবং প্রজ্ঞার সাথে এসবের প্রয়োগ ঘটাবে, নতুন কিছু আমদানীর পরিবর্তে।

উত্তর : ৭. মুসলিম নারীর উন্নয়নে পুরুষের ভূমিকা

উপরে নারীর দায়িত্ব হিসেবে যা যা উল্লেখ করা হল তার অধিকাংশই নারী পুরুষ উভয়ের যৌথ দায়িত্ব। ব্যক্তিগত পর্যায়ে নারী এবং পুরুষের দায়িত্ব একই। পারিবারিক পর্যায়ে পুরুষ তার মা, স্ত্রী বা কন্যা ইসলামে বর্ণিত উপায়ে আচার-ব্যবহার করবে। সে তার পরিবারের নারীদের পৃথক ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি দেবে এবং তাদের পরিচয় ও অধিকার

নিশ্চিত করবে। সে এটা স্বীকার করবে যে, নারী তার কাজের জন্য স্বামীর কাছে নয় আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। কাজেই সে তার স্ত্রীর মধ্যে যাতে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহির দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় তার ব্যবস্থা করবে। কোনো কোনো পুরুষ তাদের স্ত্রী-কন্যাদের আল্লাহর প্রতি কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ান। অথচ উচিত হচ্ছে সে তাদের আল্লাহর কাজে শুধু অনুমতিই দেবে না বরং উৎসাহ যোগাবে। ইসলাম বলে যে, নারীর দায়িত্ব শুধু পরিবারেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলাম নারীকে সমাজ সচেতন হিসেবেই দেখতে চায়। কাজেই সমাজ নিয়ন্ত্রণ করার মতো উপযুক্ত জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা, প্রভৃতি অর্জনের জন্যে উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে প্রত্যেক পুরুষ তার স্ত্রী, কন্যা এবং বোনকে তৈরী করবে, যাতে তারা সামাজিকভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩ : ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল সামাজিক রীতির উদাহরণ হচ্ছে আতিথেয়তা বা মহত্ত্ব, যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে মুবাহ সামাজিক রীতি হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট জাতির মধ্যে নির্দিষ্ট বৈধ খাবারের প্রতি আগ্রহ। আর ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ সামাজিক রীতি হচ্ছে মেয়ের মতের তোয়াক্কা না করে বিয়ে দেয়া।

প্রশ্ন ৬ : আল কুরআন ৯:৭১

* যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, রোগব্যাধি, অজ্ঞতা, প্রভৃতি থেকে মুক্ত করা নারীর দায়িত্ব।

জি-২৪ যৌনতার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন ১. এই বিষয়ের সাথে ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব বিষয়ের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২. যৌনতা সম্পর্কে ইসলামের সাধারণ নীতিমালা আলোচনা করুন।

৩. উপরে বর্ণিত ইসলামের যৌনতা বিষয়ক নীতিমালার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিন।

৪. যৌন বিষয়ে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে ইসলামের মত কি?

৫. যৌন বাড়াবাড়ির পরিণতি কি?

৬. যৌনতা বিষয়ে ইসলামের পন্থা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর :উত্তর : ১. এই বিষয়ের সাথে ইসলামে পরিবারের গুরুত্বের সম্পর্ক

ইসলামে পরিবার হচ্ছে সমাজের এবং সমাজ কাঠামোর একক (cornerstone) এবং পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে নারী। তিনি পরিবারের শৃঙ্খলা ও বন্ধন তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আর ইসলামী মতে পারিবারিক বন্ধনই হচ্ছে বৈধভাবে যৌন চাহিদা পূরণের একমাত্র সুযোগ।

উত্তর : ২. যৌনতা সম্পর্কে ইসলামের নীতি

যৌনতা মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। ইসলামে মানুষের সব আচরণই আল্লাহর প্রতি ঈমান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই যে মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, এ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ীত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত এবং আখেরাতের জবাবদিহি ও জীবন সম্পর্কে সজাগ তার প্রতিটা কর্মই হবে পরিমিত ও পরিশালিত। এজন্য ইসলামী পন্থায় যে কোনো অভ্যাস সম্পর্কে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আগে তার ঈমানকে মজবুত করতে হয়।

ইসলামী মতে মানুষের তিনটি চাহিদা আছে : আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দৈহিক। এই তিনটি চাহিদা পূরণের ভারসাম্যপূর্ণ সুষম ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। আধ্যাত্মিক চাহিদার জন্য ইসলাম আল্লাহর স্মরণ এবং নামাজ সহ ধর্মীয় কাজে উৎসাহিত করে। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য পৃথিবী ও বিশ্বজগতের সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে উন্মুক্ত। দৈহিক চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য বাসস্থান ও যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের বৈধ পন্থা

ইসলামে নির্দেশিত আছে। উপরন্তু ইসলাম যৌন চাহিদা পূরণকে আধ্যাত্মিক বিকাশের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে না যা কোনো কোনো ধর্মে মনে করা হয়।

উত্তর : ৩. এই নীতিমালার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের দলিল

কুরআন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং ভাল কাজ ও সঠিক আচরণের নির্দেশনায় ভরা। কুরআনের উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় মানুষের তিন ধরনের চাহিদা আছে : আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দৈহিক (উদ্ধৃতি সংযুক্ত)। কুরআন থেকে এটাও স্পষ্ট যে, আল্লাহ নির্ধারিত পন্থায় এসব চাহিদা পূরণ মানুষের জন্য বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'মানুষের চোখে আকর্ষণীয় সম্পদ হচ্ছে নারী, সন্তান, স্তূপীকৃত রূপা' (৩:১৪)। এখানে কুরআন এসব জাগতিক বিষয়ে আকর্ষণের জন্য মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করেনি; শুধু মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছে যে, এসব যেন তাকে খোদার স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে না নেয়। 'এই হচ্ছে পৃথিবীর সম্পদ, কিন্তু খোদার নৈকট্য এর চেয়ে অনেক উত্তম পাওয়া'। সুতরাং ইসলাম নির্দেশ দেয় বস্তুগত চাহিদা অর্জনের প্রচেষ্টা ও পারলৌকিক জীবনের পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে। ইসলামের দৃষ্টিতে দূষণীয় এবং পরিত্যাজ্য হচ্ছে অনৈতিক এবং অবৈধভাবে পার্থিব আনন্দে জড়িয়ে পড়া এবং প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হওয়া।

উত্তর : ৪. যৌনতা বিষয়ে বাড়াবাড়ি

মানব সভ্যতায় এ ব্যাপারে দুই রকম বাড়াবাড়ি দেখা যায়। একটিতে যে, কোনো যৌন তৎপরতাকে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির পরিপন্থি এবং অশুভ অশুচি বলে ধরে নেয়া হয়, যার ফলে চিরকুমার, সংসারত্যাগী যাজক শ্রেণীর বিকাশ। এরা বিয়ে এবং যৌন সম্পর্ককে কোনো নেয়ামত না মনে করে শয়তানের বাহন হিসেবেই মনে করে। এ ব্যাপারে আর এক রকম বাড়াবাড়ি হচ্ছে সব ধরনের নীতি নৈতিকতার বাধা সরিয়ে প্রবৃত্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়া। প্রথম ধরনের বাড়াবাড়ি বিভিন্ন মানসিক বিকারের জন্ম দেয়। আর দ্বিতীয় ধরনের বাড়াবাড়ি সমাজে ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তির বিস্তৃতির (সাথে সাথে ভয়ংকর রোগের- অনুবাদক) বিস্তার ঘটায়। পরিবার ও মানবিক বন্ধনকে ধ্বংস করে দেয়। উভয় পন্থাই মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়। ইতিহাস থেকে এটাই শিক্ষণীয় যে, এমন ব্যবস্থা থাকা উচিৎ যাতে নৈতিক ও ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যেই মানুষের যৌন চাহিদা পূরণের সুযোগ থাকবে। যা ব্যক্তিকে উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে মুক্তি দেবে এবং পরিবারকে রক্ষা করবে।

উত্তর : ৫. যৌন বিষয়ে বাড়াবাড়ির পরিণতি

অমুসলিমসহ অনেক পর্যবেক্ষকের মতো হচ্ছে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা জন্ম দিয়েছে অসংখ্য অপরাধের। এই বাড়াবাড়ি ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি, চরিত্রহানি এবং মানবিকতাবোধ ধ্বংসের

কারণ হয়েছে। (ইতিহাসে দেখা যায় বহু যুদ্ধে এক বাহিনীর পরাজয় ঘটেছে ঐ বাহিনীর সৈনিকদের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য)। যখন মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয় তখন তার মাঝের মানবিক শিষ্টাচার ধ্বংস হয়ে জন্ম নেয় স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদিতা, পরিবার ও সমাজ সম্পর্কে দায়িত্বহীনতা, মিথ্যাবাদিতা ও সার্বক্ষণিক নিজের বিবেকের সাথে দ্বন্দ্ব। এ থেকেই উদ্ভূত হয় ব্যভিচার, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, সমকামিতা, ইতরকামিতার মতো জঘন্যতা, যার ফলশ্রুতিতে শুধু ব্যক্তিজীবনই কলুষিত ও অশান্ত হয় না বরং গোটা সমাজ বিশেষ করে পরিবার অধ:পাতে যায়।

উত্তর : ৬. যৌনতার বিষয়ে ইসলামের সমাধান

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা রোধে এবং একে ধর্ম ও নৈতিকতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে ইসলাম বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে। ইসলাম প্রথমত ব্যক্তির মধ্যে ঈমান ও খোদাভীতি জাগ্রত করে তাকে নিয়ত আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতিসম্পন্ন করেছে। যার ফলে সে যৌন বিষয়ক যে কোনো লোভের কাছে নত হবে না। তারপর তাকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে সত্য-মিথ্যা, সঠিক-বেঠিক, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্যকে পৃথক করবার। তাকে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইসলামে বিয়ে ভিন্ন আর কোনো যৌন সম্পর্কের ব্যবস্থা নেই। ইসলামে সমকামিতা, ইতরকামিতা নিষিদ্ধ।

এরপর পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে বৈধভাবে যৌনতৃপ্তির সবচাইতে বাস্তব ব্যবস্থা ইসলাম নিয়েছে। কুরআন এবং হাদীস থেকে দেখা যায় যে–

ক) ইসলামী মতে পরিবার ও স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার;

খ) স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মাঝেও ইসলামে কিছু নিয়ম আছে যাতে কেউ স্বার্থপর হয়ে না উঠে;

গ) যারা বিয়েতে অসমর্থ তাদের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য রোযার বিধান রয়েছে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ১৮:১০৭, ১৫:২৯, ৩২:৯, ৩৮:৭২, ২:৩১, ১৬:৭৮, ৬:২, ৩৮:৭১, ৩:১৪-১৫, ২৮:৭৭

প্রশ্ন ৬ : রাসূল (সা:) নিম্নলিখিত হাদীসসমূহে ইসলামের সুস্থ যৌনাচার প্রমাণ পাওয়া যায় :

ক) আমি তোমাদের মাঝে সবচাইতে ধার্মিক এবং খোদাভীরু, তথাপি আমি নামাজ পড়ি এবং ঘুমাই, আমি রোযা রাখি এবং রোযা ভাঙ্গি আর আমি বিবাহিত জীবন যাপন করি এবং তোমাদের মাঝে যে আমার পথ থেকে সরে যায় সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।

খ) যে বিয়ে করেছে সে তার বিশ্বাস অর্ধেক পূর্ণ করেছে, এখন বাকী অর্ধেক বিশ্বাস পূরণে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হও।

গ) তিনি বলেন তিন ধরনের মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য পায় : জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় রত, আর যে ব্যক্তি চরিত্র রক্ষার জন্য বিয়ে করতে চায়। তিনি আরও বলেন স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গতা স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব পায়, কারণ তারা এই আনন্দ বৈধ ও হালাল পন্থায় করছে।

ঘ) রাসূল (সা:) বলেন, মুসলিম পুরুষেরা যেন তাদের স্ত্রীদের কাছে পশুর মতো না যায় বরং তার আগে একজন 'দূত' পাঠাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করল যে, এই 'দূত' কি, তখন তিনি বললেন, ভালবাসার কথা অথবা আদরের চুম্বন। এছাড়া তিনি অন্তরঙ্গ মেলামেশার তথ্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন।

জি-২৫ বাগদান ও পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

প্রশ্ন ১. ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের অবস্থান অত্যন্ত উচ্চে। এর গুরুত্ব ও দর্শন কি?

২. জীবন সাথী নির্বাচনের জন্য ইসলাম কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখতে বলে?

৩. মেয়েদের পাত্র নির্বাচনের জন্যও কি একই বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত?

৪. ইসলামী আইনে মেয়েরা কি নিজেদের জন্য বর সন্ধান করতে পারে?

৫. ডেটিং ও অবাধ মেলামেশার অনুমতি না থাকায় ইসলামসম্মত পন্থায় যোগ্য জীবন সাথী নির্বাচন আদৌ সম্ভব কি?

উত্তর : ১. ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব ও দর্শন

কুরআন বিয়েকে তিনটি প্রেক্ষিতে গুরুত্বের সাথে দেখে :

ক) এটা সামগ্রিকভাবে মানব ঐক্য ও সংহতির প্রাথমিক উৎস;

খ) সমাজের একক পরিবার। পরিবারের সূচনা বিয়ের মাধ্যমে। আর বিবাহ বন্ধন হচ্ছে পৃথিবীতে মানব বংশধারা টিকিয়ে রাখার একমাত্র বৈধ মাধ্যম;

গ) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে।

কুরআন বলে বিয়ে হচ্ছে আল্লাহর মহাজ্ঞানের এক নিদর্শন (Sign)। কারণ বিয়ে হচ্ছে মানবের প্রকৃতি এবং চাহিদার প্রতি আল্লাহর অনুমতি, স্বীকৃতি ও ভালবাসার প্রতীক। এই বক্তব্য অন্যান্য ধর্মের চেয়ে বিয়েকে সম্মানিত করেছে যেখানে বিয়েকে পৃথিবীতে মানবের পতন এবং অব্যাহত পাপের প্রক্রিয়া হিসেবেই চিন্তা করা যায়।

বিয়ে সংক্রান্ত আলোচনায় আযওয়াজ শব্দের ব্যবহার (৩০:২১) লক্ষ্য করার মতো, যার অর্থ স্বামী বা স্ত্রী (Spouse), যার মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক। কোনো কোনো ধর্মের মতে এটা নয় এমন যে, বিয়ে মানে পুরুষ তার যৌন সাথী খুঁজে নিচ্ছে। এর মাধ্যমে নর-নারীর মধ্যে মানবিক ও আধ্যাত্মিক সাম্যেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কুরআনে আরও উল্লিখিত আছে যে, বিয়ে হচ্ছে প্রশান্তি, তৃপ্তি ও নিশ্চয়তার উৎস, যা স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, আকর্ষণ ও ভালবাসা থেকে আসে। ইসলামে মানব-মানবীর পারস্পরিক ভালবাসা বৈধ, অনুমোদিত, পবিত্র এবং আল্লাহর আশীর্বাদ প্রাপ্ত। আল্লাহ মানব-মানবীর এই ভালবাসাকে অনুমতি দেন ও বরকত দেন যতক্ষণ তা অনুমোদিত সীমার মধ্যে চর্চা হয়। বিয়ের পরিণতিতে যে, গর্ভসঞ্চার হয় তা ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রতি কোনো শাস্তি নয় বরং বিবাহিত দম্পতির আশা আনন্দের উৎস এবং তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির পুরস্কার। সবশেষে

বলতে হয় যে, ইসলাম বৈরাগ্যকে বা চিরকৌমার্যকে অনুমোদন দেয়নি। আর অননুমোদিত বিষয়কে অনুমোদিত বানাবার চেষ্টা অপরাধ।

উত্তর : ২. জীবন সাথী নির্বাচনে লক্ষণীয়

এ ব্যাপারে হাদীসে বিশেষ নির্দেশনা আছে। রাসূল (সা:) বলেন বিয়েতে কারো পছন্দের ব্যাপারে মানুষ চারটি বিষয় দেখে, যথা: সম্পদ, আভিজাত্য, সৌন্দর্য এবং খোদাভীতি। এর মধ্যে ভাগ্যবান এবং শ্রেষ্ঠ সেই যে, একজন ধার্মিক মেয়েকে বিয়ে করে। রাসূল (সা:) মানুষকে আরও সতর্ক করে দেয় যে, যদি তারা শুধু সম্পদের আকর্ষণেই কাউকে বিয়ে করে তবে আল্লাহর রোষানলে পড়বে। অবশ্য এর মাধ্যমে রাসূল (সা:) সৌন্দর্য এবং অন্যান্য বিষয়কে উপেক্ষা করতে বলেননি। বরং তিনি খোদাভীতি এবং সৎচরিত্রের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, এ দু'টোই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তিনি আরও বলেছেন যে, মুসলমানরা তাকেই বিয়ে করবে যে প্রেমময় ভালবাসার যোগ্য ও সন্তান ধারণক্ষম।

উত্তর : ৩. মেয়েদের জন্য বর নির্বাচনের পূর্বশর্ত

সাধারণত: ছেলেরাই বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়, আর রাসূল (সা:)-এর কাছে বিয়ে সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে মূলত: তারাই আসত। এজন্যে উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোতে পুরুষদের সম্বোধন করা হয়েছে। আসলে হাদীসে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এছাড়াও কয়েকটি হাদীস আছে যাতে বিশেষভাবে মেয়েদের অথবা তাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। রাসূল (সা:) বলেন, "এমন লোকের কাছে তোমাদের মেয়েদের বিয়ে দেবে না যারা ভাল নয় বরং মন্দ, এমন যারাই করবে তারা পরিবারকে ধ্বংস করবে।" তিনি আরও বলেন, "যদি কেউ তোমার মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয় তবে তার কাছে মেয়ে বিয়ে দেবার পূর্বে তার চরিত্র এবং খোদাভীতি সম্পর্কে নিশ্চিত হও। যদি তোমরা এটা না কর তবে জমিনে অশান্তি সৃষ্টি হবে।" সাধারণভাবে বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে- উভয়ের পূর্বশর্ত একই।

উত্তর : ৪. মেয়েরা কি বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে পারে?

কুরআন কিংবা হাদীসে এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই যে, মেয়েরা বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে পারবে না। বরং এমন কিছু উদাহরণ আছে তাতে বুঝা যায় মেয়েদের এমন প্রস্তাব পাঠাবার অনুমতি আছে। বিবি খাদিজা (রা:) রাসূল (সা:)-এর চরিত্রে, মাধুর্যে এবং সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর এক মহিলা সহযোগীর সাথে পরামর্শ করে রাসূল (সা:)-কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। রাসূল (সা:)-এর জীবনে দেখা যায় একবার এক মহিলা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে সরাসরি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। যদিও রাসূল (সা:) সেই

মহিলাকে বিয়ে করেননি, তবুও তিনি এমন কোনো কথা বলেননি যে, মেয়েরা এভাবে প্রস্তাব দিতে পারে না। তবে সাধারণত: মেয়েরা পুরুষ পক্ষ থেকে প্রস্তাব পেতেই সম্মানিত বোধ করেন।

উত্তর : ৫. ডেটিং এবং অবাধ মেলামেশা ছাড়া জীবন সাথী নির্বাচন প্রসঙ্গে

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা ডেটিং সহ যে কোন ধরনের বিবাহপূর্ব অবাধ ও একান্ত মেলামেশায় নিষেধ করে। যারা বলে যে, বিয়ের পূর্বে ডেটিং ও মেলামেশার মাধ্যমে পরস্পরকে পুরোপুরি জেনে বুঝে বিয়ে করলে এই বন্ধন দৃঢ় হয় তাদের জন্য শুধু এই যুক্তিই কি যথেষ্ট নয় যে, যেসব দেশে এ সুযোগ অবারিত সেসব দেশে বিয়ে বিচ্ছেদের সংখ্যা বিশ্বে সর্বাধিক। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে বর বা কনে বাজারের পণ্য নয় যে, ব্যবহার করে, যাচাই বাছাই করে পছন্দ করতে হবে। বর বা কনে কারো জন্য এটা শোনা সুখবর হবে না যে, তার সাথী বিয়ের আগে অন্য কারও সাথে ঘনিষ্ঠতা করেছে।

যে সব মুসলমান বিয়ের আগে ছেলে-মেয়েকে পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও আলাপের সুযোগ দেয়না তারাও ভুল করেন। রাসূল (সা:) কয়েক জায়গাতেই নারী পুরুষকে আদেশ দিয়েছেন বিয়ের আগে দেখে নিতে। কারণ তিনি বলেন এতে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ তৈরী হয়। ইসলামে সম্ভাব্য বর কনের পরস্পরকে দেখার ও আলাপের অনুমতি আছে তবে তা একাকী বা নিভৃতে নয়, তৃতীয় ব্যক্তি বা পক্ষের উপস্থিতিতে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ২৫:৫৪, ১৬:৭২, ৭:১৮৯, ৫:৯০

প্রশ্ন ২ : রাসূল (সা:) বলেন যে, শুধু মেয়ের সম্পদ দেখে বিয়ে করে আল্লাহ তার দারিদ্র্য বাড়িয়ে দেবেন। যে শুধু মেয়ের বংশ মর্যাদা দেখে বিয়ে করে আল্লাহ তাকে হেয় করবেন। আর যে এমন মেয়ে খুঁজে যে তাকে ভদ্রতা ও সচ্চরিত্র উপহার দেবে অথবা তার এবং তার আত্মীয়দের প্রতি দয়ালু হবে, আল্লাহ তাকে তার স্ত্রীর জন্য এবং তার স্ত্রীকে তার জন্য রহমত হিসেবে উপহার দেবেন।

রাসূল (সা:) আরও বলেন, আল্লাহর আনুগত্যের পর নারীর সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তার স্বামীর প্রতি মমতাময়ী, সুন্দর এবং সহাস্য হওয়া এবং স্বামীর যে কোন যৌক্তিক আদেশ মেনে নেয়া। এমন নারী স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্পদের হেফাজত করে এবং তার সাথে করা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে।

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ২৪:৩২

প্রশ্ন ৫ : এটা বর্ণিত আছে যে, রাসূলের সাহাবী মুগীরা ইবনে শোবা রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, তিনি বিয়ে করছেন, তখন রাসূল (সা:) বলেন যে, তার প্রতি অনুভূতি সৃষ্টির জন্য তাকে দেখ।

জি-২৬ বাগদান

প্রশ্ন ১. বাগদান-এর সময় প্রস্তাবিত বর কনের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও আলাপের সময় উভয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতি প্রয়োজন কেন?

২. কারো বাগদত্তাকে তার পরিবারের অজ্ঞাতে দেখা যায় কি?

৩. বাগদানে কোনো নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা আছে কি?

৪. বাগদান ভেঙ্গে গেলে বাগদানের সময় প্রদত্ত উপহার কি ফেরৎ দিতে হয়?

৫. মেয়ে কর্তৃক প্রদত্ত উপহারও কি বিয়ের প্রস্তাব ভেঙ্গে গেলে ফেরৎযোগ্য?

৬. আনুষ্ঠানিক উপহার প্রদান ছাড়া বাগদানে আর কোনো আর্থিক দায়িত্ব আসে কি?

৭. বাগদানে পালনীয় আর কি মৌলিক দিক আছে?

৮. পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার (Compatibility) গুরুত্ব কি?

৯. কোন্ কোন্ মহিলাকে বিয়ে করা পুরুষের জন্য নিষেধ?

উত্তর : ১. প্রস্তাবিত বর কনের একান্ত ও নিভৃতে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করার কারণ

বাগদান (engagement) বিয়ের প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া কিন্তু কোনভাবেই বিয়ের সমতূল্য নয়। বাগদানের পরিণতিতে বিয়ে নাও হতে পারে। এজন্যেই ভবিষ্যতে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের সুনাম, নির্মলতা ও সততার উপর যেন কোনো প্রশ্ন না আসতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এজন্যই তাদের একান্ত সাক্ষাৎ নিষেধ। এছাড়াও কোনো অসৎ লোক এই সুযোগের অপব্যবহার করতে পারে। বাগদানের নাম করে নিভৃতে কোনো সরল মেয়েকে পেয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে পরে বাগদান ভেঙ্গে দিতে পারে। এজন্যে এই ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয়েছে।

সাধারণভাবে ইসলামে বিবাহিত বা নিকটাত্মীয় ব্যতিত কোনো পুরুষ ও মহিলার একাকী অবস্থান নিষিদ্ধ।

উত্তর : ২. সম্ভাব্য কনেকে দেখার অনুমোদন

রাসূল (সা:)-এর সাহাবা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর বিয়ের পূর্বে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে তাঁর প্রস্তাবিত স্ত্রীকে দেখতেন। বস্তুত: পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ তৈরির জন্য দেখার অনুমোদন ইসলামে আছে।

উত্তর : ৩. বাগদানের আনুষ্ঠানিকতা প্রসঙ্গে

বাগদান পালনের জন্য কোনো নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা ইসলামে নেই। এটা একজন পুরুষ কর্তৃক একজন মহিলাকে দেয়া বিয়ের অঙ্গীকার (informal promise) যা

সাধারণত: নিকটাত্মীয় পরিজনের উপস্থিতিতে কিছু উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

উত্তর : ৪. বাগদান ভেঙ্গে গেলে বাগদানের উপহার ফেরত প্রসঙ্গে

ইসলামে উপহার হিবা সম্পর্কে কিছু আইন আছে। ইসলাম মতে উপহার দুই ধরনের,

ক) অফেরৎযোগ্য নি:শর্ত উপহার (যেমন- গরীব নি:স্ব মানুষকে প্রদত্ত দান/উপহার)

খ) শর্তযুক্ত উপহার (যেমন, বাগদানের উপহার বিয়ের আশাতেই দেয়া হয়)। এই দ্বিতীয় ধরনের উপহারের ক্ষেত্রে আইনবিদরা বলেন যে, যদি মেয়ে পক্ষ থেকে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং উপহার ফেরৎযোগ্য অবস্থায় থাকে তবে তা ফেরৎ দিতে হবে। যদি উপহার ফেরৎযোগ্য অবস্থায় না থাকে (যেমন, ব্যবহৃত হয়ে যাওয়া অথবা বিক্রি করে দেয়া) তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর বিয়ে যদি ছেলেপক্ষ থেকে ভাঙ্গা হয় তবে মালিকী মতে উপহার ফেরত দিতে হবে না। হানাফী এবং অন্যান্য মতে উপহার ফেরতযোগ্য অবস্থায় থাকলে ফেরত দিতে হবে।

উত্তর : ৫. মেয়ে পক্ষ প্রদত্ত বাগদানের উপহার প্রসঙ্গে

যদি মেয়ে পক্ষ ছেলেকে বাগদানে কোনো উপহার দেয় তবে বিয়ে ভেঙ্গে গেলে উপরে বর্ণিত আইন তাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

উত্তর : ৬. বাগদানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য আর্থিক দায়িত্ব

বাগদান হচ্ছে বিয়ের অঙ্গীকার যার সাথে যুক্ত আছে নৈতিক দায়িত্ব যে, কোনো সংগত কারণ ছাড়া কোনো পক্ষ এই অঙ্গীকার থেকে সরবে না। এই নৈতিক দায়িত্ব ছাড়া কোনো আর্থিক দায়িত্ব বাগদানের মাধ্যমে কারো উপর বর্তায় না।

তবে যদি বাগদানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে কোনো চাকুরীরত মেয়ে তার প্রস্তাবিত স্বামীর পরামর্শে চাকুরী ছেড়ে দেয় এবং এ অবস্থায় বিয়ে ভেঙ্গে যায় তবে সেই মেয়েকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রস্তাবিত মোহরানার অর্ধেক হবে। ড: সাবুনী এ কথা বলেন।

উত্তর : ৭. বাগদানে পালনীয় মৌলিক বিধান

ক) রাসূল (সা:) বলেন যে, কোনো পুরুষ অপর পুরুষের বাগদত্তার সাথে বাগদান করতে পারবে না। এটা শুধু ভদ্রতার ব্যাপারই নয় বরং উভয় পরিবারের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক ও ভুল বোঝাবুঝি প্রতিহত করে।

খ) একই আইন মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোনো মহিলা অপর মহিলার সাথে বাগদানে আবদ্ধ পুরুষের সাথে বিয়ের আলোচনা করতে পারবে না।

গ) কোনো পুরুষ কোনো তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সাথে তার ইদ্দত কাল পুরো না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের আলাপ করতে পারবে না। তালাকের পর তিনমাস অপেক্ষা করতে হবে কারণ এই সময়ের মধ্যে তালাকপ্রাপ্ত স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলনও হতে পারে।

ঘ) কোনো মহিলা বিধবা হবার পর একশ ত্রিশ দিন পার হবার আগে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যাবে না। তবে এক্ষেত্রে অথবা সদ্য তালাকপ্রাপ্তা এবং ইদ্দতকালীন সময়ে সম্ভাব্য বিয়ের বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়া যেতে পারে, যা তা'রিদ নামে পরিচিত।

ঙ) বাগদান প্রক্রিয়া আরম্ভের পূর্বে সম্ভাব্য পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা (Compatibility) যাচাই করে নেয়া উচিৎ।

চ) কুরআনে নিষিদ্ধ মহিলাদের সাথে বাগদান নিষিদ্ধ।

উত্তর : ৮. পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার গুরুত্ব

রাসূল (সা:) বলেন, "একজন মহিলাকে তার জন্য উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পুরুষকেই বিয়ে করা উচিৎ"। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, একজন পুরুষ আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় নারীর সমপর্যায়ের হবেন। অবশ্য কুরআনে এর চাইতে উত্তম ব্যাখ্যা আছে যার অর্থ হচ্ছে উভয় পক্ষের মধ্যে বিয়ের সফলতার ব্যাপারে যৌক্তিক অঙ্গীকার থাকলে উভয়েই উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য। কুরআন বলে প্রত্যেক বিশ্বাসী প্রত্যেক বিশ্বাসীর সমপর্যায়ের, এবং গ্রহণযোগ্যতার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হচ্ছে খোদাভীতি। রাসূল (সা:) নিজের তত্ত্বাবধানে এমন অনেক বিয়ে দিয়েছেন যাতে আর্থিক বা সামাজিক সামঞ্জস্য ছিল না। তাহলে এটা নিশ্চিত হয় যে, ঈমান ছাড়া বাকী সব সামঞ্জস্যতার প্রশ্ন কোনো বাধ্যবাধকতা নয়। অবশ্য তাই বলে অন্যান্য বিষয়গুলো উপেক্ষারও নয় এবং এটা সুস্পষ্ট যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সত্তর বছরের বৃদ্ধের সাথে নিশ্চয়ই ২০ বছরের তরুণীর বিয়ে মানানসই হবে না; এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বড় ব্যবধান দু'ব্যক্তির সামঞ্জস্যহীনতা প্রদর্শন করতে পারে।

উত্তর : ৯. যেসব মহিলা (পুরুষ)-কে বিয়ে নিষেধ

স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ :

স্থায়ীভাবে নিম্নবর্ণিত মহিলাদের বিয়ে হারাম :

ক) রক্ত সম্পর্কে উপরের (যেমন, মা, খালা, ফুফু), এবং নীচের (যেমন, কন্যা বা নাতনী), আত্মীয় এবং পিতা মাতার রক্তসম্পর্কিতরা।

খ) বিয়ের মাধ্যমে সম্পৃক্ত আত্মীয়, যেমন- শাশুড়ী, স্ত্রীর পূর্বে পক্ষের কন্যা, পিতার বা পুত্রের বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী।

গ) দুধমাতা এবং তার সূত্রে সম্পৃক্ত মেয়েরা (দুধমাতার কন্যা, বোন, মাতা ইত্যাদি)। রাসূল (সা:) বলেন, 'রক্তের সম্পর্কের কারণে যারা নিষিদ্ধ, একই বক্তব্য দুধমাতার সম্পর্কে।"

অস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ : যে কোনো অবিশ্বাসী বা বিশ্বাসহারা মহিলাকে এবং ইদ্দতকালীন যে কোনো মহিলাকে বিয়ে নিষেধ। অবশ্য অবিশ্বাসী মহিলা ঈমান আনলে তাকে বিয়ে করা যাবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : রাসূল (সা:) বলেন, "কোনো অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা একসাথে থাকলে তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হয় শয়তান।"

প্রশ্ন ৭ : তা'রিদ (Ta'arid)-এর উদাহরণ হচ্ছে কোনো সদ্যবিধবা অথবা ইদ্দতকালীন মহিলার এ আশা ব্যক্ত করা, "আমি খুব শীঘ্রই বিয়ের আশা করছি" অথবা তাকে এভাবে প্রস্তাব করা যে, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাকে তোমার মতো ধার্মিক স্ত্রী উপহার দেন।

প্রশ্ন ৮ : আল কুরআন ৪৯:১০, ৪৯:১৩, ২:২২১।

জি-২৭ ইসলামের বিয়ে সংক্রান্ত আইন (১)

নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

প্রশ্ন ১. কয়েক ধরনের মহিলাকে বিয়ে হারাম ঘোষণার কারণ কি?

২. এছাড়া বিয়ে সংক্রান্ত আর কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

৩. ব্যভিচারী তওবা করলে তার ক্ষমার কোনো সুযোগ আছে কি?

৪. স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ অপরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলে তাদের সম্পর্ক কি ভেঙ্গে যায়?

৫. অমুসলিমকে বিয়ে করতে বাধা কোথায়?

৬. কোনো মুসলিম ছেলে কি আহলে কিতাব (ইহুদী, খ্রিস্টান) মেয়েকে বিয়ে করতে পারে?

৭. অনেকে বলেন যে, যেহেতু খ্রিস্টানরাও আল্লাহর সাথে শরীক করে, সেহেতু তাদের আহলে কিতাব ধরা যায় না- এ ব্যাপারে কি বলবেন?

৮. আহলে কিতাব থেকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে কি সতর্কতা নিতে হবে?

উত্তর : ১. মুসলিম বিয়ে আইনে কয়েক ধরনের মহিলাকে বিয়ে হারাম কেন?

যাদের বিয়ে করা হারাম তাদের তালিকা কুরআনে ৪ নং সূরার ২২ থেকে ২৪ আয়াতে বিস্তারিত দেয়া হয়েছে। এই নিষিদ্ধ হবার পেছনে নিম্নলিখিত যুক্তি দেয়া যায় :

ক) মৃত পিতার বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে নিষিদ্ধ করে প্রাক ইসলামী যুগের আরবদেশের প্রচলিত এক জঘন্য প্রথাকে বাতিল করা হয়। সে যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার ছেলেরা পিতার অন্যান্য সম্পদের সাথে তার বিধবা স্ত্রীদেরও মালিক হয়ে যেত। ইসলাম মাতৃতুল্য এই মহিলাদের বিয়ে নিষিদ্ধ করে তাদের মায়ের মর্যাদাকেই তুলে ধরেছে। ইসলাম আরও নিশ্চিত করেছে যে, নারী সম্পত্তির মতো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার বিষয় হতে পারে না। উপরন্তু, ঐ নারী তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে ভাগ পাবে। বস্তুত: সৎমাকে ইসলাম মায়ের আসনেই নিয়ে এসেছে।

খ) পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যতাতেই মা, কন্যা, ও বোনকে বিয়ে নিষিদ্ধ, কারণ তাদের প্রতি ভালবাসা, সম্মান যৌনতার উর্ধ্বে।

গ) খালা ও ফুফুরাও মায়ের মতই এবং ভাগ্নী, ভাইঝিরাও কন্যার মত, তাই তাদের বিয়ে নিষিদ্ধ।

এই সব মহিলাই 'মাহরিম' যাদের বিয়ে করা হারাম। একইভাবে মহিলাদের জন্যও তাদের ঐরকম সম্পর্কীয়রা মাহরিম। নিকটাত্মীয়দের বিয়ে হারাম করে ইসলাম বিয়ের মাধ্যমে সমাজে মানুষের আত্মীয়তাকে বিস্তৃত করতে চায়। আধুনিক বিজ্ঞান মতেও দেখা যায় যে, আত্মীয়দের মাঝে বিয়ে হলে সন্তানদের মধ্যে জন্মগত ও জীনবাহিত (Genetic) রোগের পরিমাণ বেড়ে যায়।

এছাড়াও মুসলিমদের বিয়ে নিষিদ্ধ তালিকা হচ্ছে :

ঘ) দুধমাতা, ঐ দুধমাতার অন্যান্য দুধসন্তানেরা (কারণ তারা তার বোন/ ভাই), অথবা দুধমাতার বোন- কারণ এসব বোনেরা ছেলের খালা হয়ে যায়।

ঙ) ঐ ব্যক্তির পুত্রবধূ, কারণ ইসলামে সে কন্যার সমতুল্যা।

চ) দু'বোন একই সময়ে এক পুরুষের স্ত্রী হতে পারবে না। কেননা, এক্ষেত্রে বোনদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত, পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতাশূন্য ও অবিশ্বাসপূর্ণ হবে।

ছ) এবং বর্তমানে বিবাহিত (অর্থাৎ অন্যের স্ত্রী)-কে বিয়ে করা যাবে না।

উত্তর : ২. আর কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা ব্যভিচারের অপরাধী তারা সৎ এবং নির্মল কাউকে বিয়ে করার অধিকার রাখে না। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ নিম্নরূপ :

ক) ইসলামের নৈতিক শিক্ষা যেকোন রকম অবৈধ যৌনাচারকে নিষেধ করে। এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ব্যভিচারী অসৎদের এটাই বুঝানো হয়েছে যে, তাদের জন্য কোনো পুরস্কার নেই। বরং সৎ চরিত্রবানদের জন্যই রয়েছে পুরস্কার।

খ) এই কঠোর ব্যবস্থা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে নিবারক (Deterrant)-এর কাজ করবে।

গ) ইসলাম মতে বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রশান্তি এবং বন্ধুত্ব। কাজেই একজন সৎচরিত্রবান খোদাভীরু নারী বা পুরুষ প্রশান্তি পাবেন না যদি তার সাথী দুশ্চরিত্রের হয়। ইসলাম এটা নিশ্চিত করেছে যে এক্ষেত্রে সমকক্ষ নয় এমন দু'জনের বিয়ে সফল হবে না।

ঘ) ব্যভিচারীর সাথে চরিত্রবানের বিয়েতে বিভিন্ন যৌন রোগের বিস্তারের সম্ভাবনাও থাকে যা এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে দূরীভূত হয়।

উত্তর : ৩. ব্যভিচারকারীর তওবা প্রসঙ্গে

ইসলামে আন্তরিক তওবার জন্য তিনটি শর্ত জরুরী : ক) অপরাধের তাৎক্ষণিক অবসান; খ. অপরাধীর তীব্র অনুশোচনা বোধ; এবং গ) ভবিষ্যতে আর একই অপরাধ

না করার দৃঢ় সংকল্প। এভাবে যদি আন্তরিকতার সাথে তওবা করা হয়, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমার সুযোগ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সে সৎ চরিত্রবান মানুষের সাথে বিয়ের অধিকার পাবে কিনা তা কুরআনে স্পষ্ট করে বলা নেই। আইনবিদরা মনে করে যেহেতু তওবার মাধ্যমে বড় অপরাধের ক্ষমার সুযোগ রয়েছে সেহেতু ব্যভিচারীও এই সুযোগ পেতে পারেন। তবে তওবাকারী যদি মহিলা হয় এবং তাকে কোনো পুরুষ বিয়ে করতে চায় তবে আইনবিদরা বলেন তিনমাস অপেক্ষা করে তার গর্ভাবস্থা নিশ্চিত করতে। যদি গর্ভবতী হয় তবে তার সন্তানের জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

উত্তর : ৪. স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ অপরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলে

স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ অপরের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ আনলে ইসলামের শিক্ষা কি তা জি- ১৩ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দুই পক্ষই পাঁচবার কসম খেলে কারোরই শাস্তি হবে না তবে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। ইসলামী আইনে স্বামী এবং স্ত্রীর স্থায়ীভাবে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

উত্তর : ৫. অমুসলিম/ ভিন্নধর্মাবলম্বীকে বিয়ে প্রসঙ্গে

ইসলামী আইনে মুশরিক, নাস্তিক (খাঁটি মার্ক্সবাদীরাও) এবং যারা রাসূল (সা:)-এর খতমে নবুওয়তে বিশ্বাসী নয় তাদের বিয়ে করা হারাম।

উত্তর : ৬. আহলে কিতাবকে বিয়ে

কুরআন মুসলিম পুরুষদের আহলে কিতাবের সতী মেয়ে বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। আহলে কিতাব বলতে ইহুদী-খ্রিস্টানদের বুঝায়। তবে কোন কোন আইনবিদ এদের ছাড়াও যারা আন্তরিকভাবে এক আল্লাহ, রাসূলদের এবং কিতাবে বিশ্বাস করে তাদেরও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অবশ্য এই ছাড় তাদের প্রতি সহনশীলতা ও শুভেচ্ছা প্রদর্শনের একটা সুযোগ মাত্র, কোন নির্দেশনা নয়।

উত্তর : ৭. যারা খ্রিস্টানদের আহলে কিতাব বলে স্বীকার করতে চান না কারণ তারা খোদার সাথে শরীক করে প্রসঙ্গে

রাসূল (সা:)-এর সময়েই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) প্রমুখ সাহাবা অভিযোগ করেন যে, সেই সময়কার খ্রীস্টানরা যেহেতু যীশুকে খোদার পুত্র মনে করে সেহেতু তারাও মুশরিক। এতদসত্ত্বেও কুরআনে কাফেরদের কথা একভাবে এবং ইহুদী খ্রীষ্টানদের কথা অন্যভাবে বলা হয়েছে। ইহুদী খ্রীষ্টানদের 'আহলে কিতাবের' মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আহলে কিতাবদের সতী নারীকে বিয়ের অনুমতি কুরআনে দেবার পরও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) প্রমুখ একে নিরুৎসাহিত করতেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে অন্য মুসলিম পুরুষদের বলতেন।

উত্তর : ৮. আহলে কিতাবীদের সতী নারীকে বিয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী আইনবিদ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী তার 'ফতওয়া মুয়াসিরা'-তে বলেন আহলে কিতাবী মেয়ে বিয়ের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে–

ক) ইহুদী বা খ্রীষ্টান মেয়ে 'স্বধর্মে ধার্মিক' হতে হবে; নিছক জন্মসূত্রে আহলে কিতাবী, বাস্তবে অধার্মিক হলে চলবে না।

খ) প্রস্তাবিত মেয়েকে সতী হতে হবে। মুসলমানরা ভাল করে খোঁজ নেয় যেন সেই মেয়ের নৈতিক মান ইসলামী নৈতিক মানে মানোত্তীর্ণ হয়। যেমন, অবিবাহিত মেয়ে হলে সে যেন কুমারী (Virgin) হয়।

গ) প্রস্তাবিত মেয়ে যেন এমন জাতির না হয় যারা সক্রিয়ভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত কেননা কুরআন এসব মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করতে সতর্ক করেছে।

ঘ) নিজের বা অন্য মুসলিমদের উপর যেন কোনো নেতিবাচক পরিণতি না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

এমন বিয়ের সম্ভাব্য কিছু ক্ষতিকর দিক :

ক) মুসলিম মেয়েরা যারা শুধু মুসলিম ছেলেকেই বিয়ে করতে পারে তারা যখন দেখবে মুসলিম ছেলেরা অন্য ধর্মের মেয়ে বিয়ে করছে তখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হবে।

খ) পরিবারের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হতে পারে, বিশেষত: যখন পিতা ছেলেমেয়েদের ইসলামী কায়দায় বড় করতে চাইবে আর মা ভিন্ন ধারায় বড় করতে চাইবে।

এধরনের বা অন্য রকমের নেতিবাচক ফলাফলের আশংকা থাকলে এমন বিয়ে করা বৈধ নয়, বিশেষভাবে এমন সমাজে যা এমনিতেই ইসলাম বিরোধী।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আত্মীয়দের মাঝে বিয়ের ফলে জীনবাহিত রোগের আধিপত্যের কথা বিবেচনা করে সমকালের প্রখ্যাত মুসলিম আইনবিদ আল গাযালী কাজিন (Cousin) দের মাঝে বিয়ে না করতে বলেছেন, যদিও কুরআনে তা নিষেধ করেনি।

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ২৪:৩, ৫:৬, ৪:২৫, ২৪:২৬

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ২৪:৩, ২৫:৬৮-৭০,

প্রশ্ন ৫ : আল কুরআন ২:২২১, ৬০:১০

প্রশ্ন ৬ : আল কুরআন ৫:৬

প্রশ্ন ৭ : আল কুরআন ২২:১৭, ৯৮:১

প্রশ্ন ৮ : আল কুরআন ৬০:৮-৯, ৫৮:২২

জি-২৮ ইসলামের বিয়ে সংক্রান্ত আইন (২)

বিয়ের বৈধতা

প্রশ্ন ১. অমুসলিম পুরুষকে মুসলিম নারী বিয়ে করতে পারবে না কুরআনে এমন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

২. মুসলিম মেয়ে আহলে কিতাব পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না কেন?

৩. যারা বলে মুসলিম ছেলে আহলে কিতাবী মেয়ে বিয়ে করলেও সন্তান লালন পালন-এর ক্ষেত্রে একই সমস্যা হতে পারে, তাদের যুক্তির জবাবে কি বলবেন?

৪. যদি একটি অমুসলিম দম্পত্তির একজন ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কি হবে?

৫. মুসলিম বিয়ে চুক্তি কি Sacred অথবা Civil?

৬. বিয়ে চুক্তির বৈধতার শর্ত কি কি?

৭. এর বাইরে আর কোনো শর্ত আছে কি?

৮. অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোনো মুসলিম মেয়ে বিয়ে করতে পারে কি? যদি পারে, তাহলে এর স্বপক্ষে প্রমাণ কি?

উত্তর : ১. মুসলিম মেয়ের অমুসলিম পুরুষ বিয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে

কুরআন স্পষ্টভাবে মুসলিম মেয়েদের অমুসলিম পুরুষ বিয়ে নিষেধ করেছে। এই আয়াত কুরআনে তখন নাযিল হয় যখন মক্কা থেকে অমুসলিম স্বামী/পিতার ঘর ছেড়ে আসা মুসলিম মেয়ের স্রোতে মদীনা ভরে গিয়েছিল। ৬০ নং সূরার ১০ নং আয়াতে রাসূল (সা:)-কে বলা হয় যে, যে মেয়েরা শুধুমাত্র আল্লাহর পথে হিজরত করেছে তাদের অবিশ্বাসীদের কাছে যেন ঠেলে দেয়া না হয়। সেই থেকে মুসলিম মেয়েদের অমুসলিমের সাথে বিয়ে নিষেধ; সেই সাথে আহলে কিতাবের সাথেও মুসলিম মেয়েদের বিয়ে বারণ। কারণ ৫ নং সূরার ৬ নং আয়াতে শুধুমাত্র আহলে কিতাব চরিত্রবান মেয়েদের মুসলিম পুরুষের বৈধ বলা হয়েছে, আহলে কিতাব চরিত্রবান পুরুষদের জন্যে নয়।

উত্তর : ২. আহলে কিতাবের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে নিষিদ্ধ হবার কারণ

প্রথমতো এই নিষেধাজ্ঞা কোনো মানুষ আরোপিত নয়। এটা সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার, যিনি তার আদেশ নিষেধের মাধ্যমে মানব-মানবীর কল্যাণ করেন। এর সম্ভাব্য কারণ সম্ভবত: এই যে, সাধারণত: স্বামীই পরিবারের প্রধান এবং পরিচালক থাকেন। সেক্ষেত্রে একজন আহলে কিতাব স্বামীর পরিচালনায় একজন মুসলিম মেয়ের

ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। পক্ষান্তরে একজন মুসলিম স্বামীর কাছে আহলে কিতাব মেয়ে নিরাপদ। কারণ তার ধর্মগ্রন্থ, তার নবী-রাসূলদের প্রতি মুসলিম স্বামীরও স্বীকৃতি থাকে এবং তার ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সে সজাগ থাকে, প্রভৃতি। অমুসলিম স্বামীর ক্ষেত্রে এসবই অনুপস্থিত থাকতে পারে। ইসলাম শুধু একটি বিশ্বাসই নয় পরিপূর্ণ জীবন বিধান। অমুসলিম স্বামীর সংসারে ইসলামী জীবন পরিচালনায় মুসলিম মেয়ে ব্যর্থ হবারই কথা।

উত্তর : ৩. যারা বলে যে মুসলিম পুরুষের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা হতে পারে

মুসলিম ছেলে আহলে কিতাব মেয়ে বিয়ে করলে তারও নিজের বিশ্বাস বজায় রাখা ও ছেলেমেয়েকে ইসলামী কায়দায় বড় করার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে- এই সত্য ইসলামও স্বীকার করে। সেজন্যেই এমন শংকা থাকলে এ ধরনের বিয়ে ইসলাম নিষেধ করে। বস্তুত: ইসলামে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈহিক পার্টনারশীপ, যা শুধুমাত্র মোমেন-মোমেনার মধ্যেই সফলভাবে সম্ভব। ইসলামের এ অনুমোদন কেবল আহলে কিতাবধারীদের প্রতি সহনশীলতা (tolerance) ও শুভেচ্ছা প্রদর্শনস্বরূপ (goodwill)। কিন্তু এ সুযোগ শর্তমুক্ত নয়। যেখানে অশুভ সম্ভাবনা নেই এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যত ভাল এমন ক্ষেত্রেই ইসলাম আহলে কিতাব বিয়ে অনুমোদন করে। আর শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত বিষয় শর্ত ভংগের সম্ভাবনা থাকলে অননুমোদিত (হারাম) হয়ে যায়। এবং এরকম শর্তযুক্ত বিয়ের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য হবে।

উত্তর : ৪. অমুসলিম দম্পত্তির মধ্যে একজন ইসলাম গ্রহণ করলে

অমুসলিম দম্পত্তির মাঝে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে তার স্ত্রী অমুসলিম (আহলে কিতাব) থাকতে চাইলে অসুবিধে নেই। কিন্তু স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে এবং স্বামী ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। কারণ ইসলাম অমুসলিমের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ের অনুমতি দেয় না। অবশ্য এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে বিয়ে ভাঙার প্রয়োজন নেই, বরং তারা একটি অন্তর্বর্তীকালীন সময় অপেক্ষা করবে যার মধ্যে স্বামীকে পরিবার অটুট রাখতে ইসলাম গ্রহণে সময় দেয়া হবে (ঐ সময় স্বামী স্ত্রীর মাঝে কোনো দৈহিক সম্পর্ক থাকবে না)। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের মধ্যে স্বামী মুসলমান না হলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। আজকাল পশ্চিমা জগতে অনেক নওমুসলিম মেয়েই এই সমস্যায় পড়ছে এবং সেই প্রথম যুগের মুসলিম মেয়েদের মতই দৃঢ়ভাবে ঈমানের পরীক্ষায় জয়ী হচ্ছে।

উত্তর : ৫. ইসলামের বিয়ে চুক্তি Sacred অথবা Civil

ইসলামী আইনে বিয়ে Sacred এবং Mundane অথবা Civil এবং Religious-এই পার্থক্য নেই। সেজন্যে কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের পরিচালনায় এই বিয়ে সম্পন্ন হতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। খ্রিস্টানদের মতো ইসলামে কোনো যাজক নেই। যে কোনো

মুসলমান নামাজ পড়াতে ও বিয়ে পড়াতে পারেন। যদিও ঐতিহ্যগতভাবে ইমাম সাহেব দিয়ে বিয়ে পড়ানো হয়। তবুও এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নয়। মুসলিম বিয়ে এই অর্থে Sacred (পবিত্র) যে এটা আধ্যাত্মিক আইনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত : এটা দু'জন মানুষের পবিত্র বন্ধন ও চুক্তি।

উত্তর : ৬. বিয়ে চুক্তি বৈধতার শর্ত :

ক) বর কনে উভয়ের সজ্ঞান ও স্পষ্টভাবে সম্মতি।

খ) দু'জন আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন (মুসলিম) সাক্ষী। যদি কনে আহলে কিতাব হয়, তবে একজন সাক্ষী তার পক্ষের হতে পারবে বলে ইমাম আবু হানিফা বলেন।

গ) বর কনে অবশ্যই বিয়ে নিষিদ্ধ (মাহরিম) সম্পর্কের হবে না।

৭. আরও যে সব শর্ত প্রযোজ্য

ক) যদি কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির বিয়ে হয় (যা কদাচিৎ দৃষ্ট) তবে তার অভিভাবকের নির্দিষ্ট সম্মতি, অথবা অভিভাবক না থাকলে মুসলিম বিচারকের সম্মতি।

খ) কোনো পক্ষ থেকে রোগ, অক্ষমতা বিষয়ে বা অন্য যে কোনো বিষয়ে কোনো সত্য গোপন করা বা কোনো মিথ্যা তথ্য দেয়া যাবে না। কাবিনে এমন শর্ত যুক্ত থাকতে পারে যে, এমন কোনো তথ্য গোপন করলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

গ) অভিভাবকের অসম্মতিতে কোনো মেয়ে নিজ দায়িত্বে বিয়ে করলে, তার অভিভাবক মেয়ের মঙ্গলার্থে আদালতে এই বিয়ে বাতিলের আবেদন জানাতে পারে। যেমন, আবেগবশতঃ কোনো মেয়ে এমন কাউকে বিয়ে করে বসতে পারে যে ড্রাগ আসক্ত। এমন ক্ষেত্রে কনের সর্বোচ্চ স্বার্থে পিতা বিয়ে রদ করার আবেদন করতে পারে।

উত্তর : ৮. মুসলিম মেয়ের পিতার অমতে বিয়ে

ইমাম আবু হানিফাসহ একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, মুসলিম মেয়ে অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিয়ে করতে পারে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এর বিরুদ্ধে বলেন। তারা রাসূলের (সা:) একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেন যেখানে তিনি বলেন যে, মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিয়ে বাতিল। আর এর বিপক্ষের বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দেন যে, কুরআনের আয়াতে দেখা যায় যে, বিয়ে মেয়ের হাতে। আর যেহেতু মেয়েরা আর্থিক চুক্তিসহ অন্যান্য চুক্তি করার অধিকার রাখে, সেহেতু তারা বিয়েরও অধিকার রাখে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ৬০:১০, ৫:৬

প্রশ্ন ৬ : বিয়েতে মত দেবার একটি প্রচলিত নমুনা হচ্ছে,

মেয়ের পিতা বা উকিল : "আমি আপনার কাছে আমার কন্যা (নাম) কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমাদের মাঝে সম্মত মোহ্‌রানার শর্তে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বিয়ে দিচ্ছি।"

বর অথবা তার অভিভাবক : আমি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সম্মত মোহ্‌রানার শর্তে আপনার কন্যাকে গ্রহণ করছি।

প্রশ্ন ৮ : আল কুরআন ২৪:৩২, ২:২৩২ রাসূল (সা:) বলেন, ".... যদি কোনো নারী তার অভিভাবকের অসম্মতিতে বিয়ে করে, তবে তার বিয়ে বাতিল গণ্য হবে।"

জি-২৯ ইসলামের বিয়ে সংক্রান্ত আইন (৩)
বিয়ে চুক্তি

প্রশ্ন ১. প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার বিয়েতে অভিভাবকের ভূমিকা কি?

২. যেহেতু ইসলামে বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারিত নেই, সেহেতু ইসলামে কি বাল্য বিবাহের অনুমতি আছে?

৩. একজন পুরুষকে স্বামী হিসেবে পছন্দ করা বা সম্মতি দেয়ার অধিকার মুসলিম নারীকে ইসলাম দেয় কি? এক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে এ অধিকারের প্রয়োগ কেমন?

৪. বিয়েতে প্রদত্ত উপহার কি যৌতুকের মত?

৫. মেয়ের প্রাপ্ত মোহরানা কি তার জন্য ফার্নিচার কেনার বা অন্য কাজে তার পরিবার ব্যয় করতে পারে?

৬. মোহরানার সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন সীমা ধার্য করা যায় কি?

উত্তর : ১. প্রাপ্ত বয়স্কার বিয়েতে অভিভাবকের ভূমিকা

এব্যাপারে দু'টো মত রয়েছে। যারা মনে করেন মেয়ের বিয়েতে অভিভাবকের সম্মতি অত্যাবশ্যক তারা এ ব্যাপারে তিনটি যুক্তি দেখান :

ক) কুরআনে যেখানে মেয়েদের বিয়ের কথা বলা হয়েছে তাতে তাদের অভিভাবককে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে মনে হয় মেয়ের বিয়ে অভিভাবকের মধ্যস্থতাতেই হতে হবে।

খ) রাসূলের একটি হাদীসে দেখা যায় যে, তিনি বলেছেন বিয়েতে মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি না থাকলে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়।

গ) মেয়ের দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই বিয়ে চুক্তিতে এমন প্রিয় কারো পরামর্শ নেয়া উচিত, যারা তাকে অত্যন্ত ভালবাসে, যেমন- মা-বাবা/ অভিভাবক।

যারা বলেন মেয়ের বিয়েতে অভিভাবকের সম্মতি অত্যাবশ্যক না তারা যুক্তি দেখান যে :

ক) কুরআনে সূরা বাকারায় ২৩০ এবং ২৩২ নং আয়াতে বিয়ের আলোচনায় মেয়েদের সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে।

খ) ইসলামী আইন মেয়েদের আর্থিক চুক্তিসহ অন্যান্য সিভিল চুক্তি স্বাক্ষর করার

অধিকার দিয়েছে। সেহেতু তাদের বিয়েতেও স্বেচ্ছায় অগ্রসর হবার অধিকার আছে।

গ) তারা বলেন, রাসূল (সা:)-এর অভিভাবকের মত সংক্রান্ত হাদীস কেবল অপ্রাপ্ত বয়স্কার মেয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এ ভিন্ন দু'টি মতের প্রতি কারো দৃষ্টিভঙ্গি যা-ই হোক না কেন, সাধারণভাবে মুসলিম মেয়েরা এটা পছন্দ করে যে, তাদের অভিভাবক তাদের স্বামীর হাতে তুলে দেবেন এবং তাদের হয়ে সম্মতি দেবেন।

উত্তর : ২. অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিয়ে প্রসঙ্গে

কুরআন এবং সুন্নাহ্য় বিয়ের কোনো বয়সসীমা নির্ধারিত নেই। এর কারণ কুরআন কালোত্তীর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এখানে সব জাতির, সব কালের, সব স্থানের, সব মানুষের জন্যই কল্যাণকর বিধান রয়েছে। (বয়স সীমা নির্ধারিত থাকলে অনেক সমাজের জন্যই তা অসুবিধেজনক হত। -অনুবাদক)

আলোচনার স্বার্থে কয়েকটি শব্দের পৃথক অর্থ বুঝা প্রয়োজন- বাল্য বিবাহ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ এবং Consummation of Marriage। সমাজ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, বাল্য বিবাহের প্রচলন ইসলামের অভ্যুদয়ের আগেও ছিল, পরেও আছে; কিন্তু এর মানে এটা ছিল না যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সাথে সাথে শুরু হত। এ বিয়ে চুক্তির কারণ ছিল দু'টি সমাজ ও পরিবারের মধ্যে বড় মিল ও আন্তরিকতা বৃদ্ধির এক প্রতিশ্রুতি। আগে থেকে প্রচলিত এ ব্যবস্থাকে ইসলাম কতগুলো শর্ত প্রয়োগ করে বাস্তবতার কাছে নিয়ে এসেছে। এই শর্তগুলো হল :

ক) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের (বা একজন বিচারকের) পূর্ব সম্মতি আবশ্যক।

খ) বিয়ের পর মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত Consummation of Marriage (স্বামী-স্ত্রীর মিলন) হবে না।

গ) মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা হবার পর স্বামীর সাথে মিলিত হবার আগেই বিয়ের ব্যাপারে তার মতামত দিতে পারবে। যদি তার মত না বাচক হয় তবে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। ইসলামে এটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি যে, মেয়েদের বিয়েতে তাদের মত দেয়ার স্বাধীনতা আছে।

উত্তর : ৩. বিয়েতে মেয়ের পছন্দ-অপছন্দের অধিকার ও মুসলিম সমাজে এর স্বীকৃতি

কুরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক বিয়েতে মেয়ের সম্মতির ও বর পছন্দের অধিকার সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃত। কিন্তু মুসলিম সমাজে এ অধিকার চালু রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশে এ জাতিতে বিভিন্ন অনীহা বিরাজমান। অবস্থা ভেদে 'A' থেকে 'F' মান পর্যন্ত

grade-এ ভাগ করা যায়! এটা নির্ভর করে মুসলমানরা কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান কতটা রাখে ও কতটা পালন করে। যখন কুরআন বিয়েকে আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈহিক পার্টনারশীপ হিসেবে বর্ণনা করে তখন এটা স্পষ্ট যে, দুই পক্ষের সানন্দ সম্মতি ছাড়া এটা সফল হতে পারে না। হাদীসে একাধিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাসূল (সা:)-এর কাছে মহিলারা যখন এই অভিযোগ নিয়ে আসেন যে, বিয়েতে তাদের সম্মতি ছিল না, তখন রাসূল (সা:) বিয়ে বাতিল বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

উত্তর : ৪. বিয়ের উপহার ও যৌতুক-এর পার্থক্য

ইসলামে বিয়ের উপহার যৌতুক (dowry) নয়। যৌতুক সাধারণত মেয়ে পক্ষ বরকে নগদ দেয়। পক্ষান্তরে ইসলামে বরকেই নগদ মোহরানা প্রদান করতে হয় যা কুরআন অনুসারে 'সাদাকা' বা উপহার হিসাবে চিহ্নিত, যা নবজীবনের প্রতি ভালবাসা ও প্রতিশ্রুতির নিদর্শনস্বরূপ। আবার এই মোহরানা কোনো কোনো সমাজে মেয়ে নেবার সময়ে মেয়ের পিতাকে যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তার সমার্থক নয়। কারণ মোহরানা মেয়ের পিতা পায়না এটা নিরঙ্কুশভাবে মেয়ে পায়। এটা কোনো মূল্য নয় বরং উপহার।

উত্তর : ৫. মেয়ে পক্ষের মোহরানা খরচের অধিকার

মোহরানা নিরঙ্কুশভাবে মেয়ের। কাজেই মেয়ের পরিবার কর্তৃক এই টাকা খরচ করা ইসলাম পরিপন্থী। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও আসবাব নিশ্চিত করা স্বামীর দায়িত্ব। তবে মেয়ের অনুমতি নিয়ে কেউ কেউ নতুন সংসার শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় কিছু আসবাব মোহরানার অর্থে কিনে থাকে। এক্ষেত্রে ঐসব আসবাবের মালিকানা স্ত্রীর থাকবে।

উত্তর : ৬. মোহরানার সীমা নির্ধারণ

কুরআন বা হাদীসে মোহরানার কোনো ন্যূনতম বা সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। ইসলাম উভয়ের জন্য বিয়েকে সহজ ও গ্রহণযোগ্য করতে চায়। তাই দেখা যায় রাসূল (সা:) কখনো মোহরানা হিসেবে মাত্র একজোড়া জুতা, বা কুরআনের একটি সূরা তিলাওয়াৎ বা ঈমান আনাকেই অনুমোদন করেছেন। রাসূল (সা:) বলেছেন যে, সবচেয়ে রহমত প্রাপ্ত বিয়ে হবে সেটা, যেটা সহজে হয়েছে অর্থাৎ যেটায় খরচ খুব বেশি হয়নি।

রাসূল (সা:) এর মৃত্যুর পর ওমর (রা:) মোহরানার সীমা নির্ধারণ করতে চাইলে একজন মহিলা কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে তা প্রতিহত করেন যাতে বলা হয়েছে কেউ যদি তার সমস্ত সম্পদও মোহরানা হিসেবে দেয় তাও অনুমোদিত।

ইসলামে এটা নিশ্চিত করে যে, বিয়ে এক পবিত্র বন্ধন। এটা কোনো ব্যবসা নয় যে, মেয়ে পক্ষ ইচ্ছেমত মোহরানা ধার্য করে অর্থ লুটে নেবে। এ হৃদয়ের বন্ধনকে জাগতিক দরকষাকষির উর্ধ্বে রাখতে হবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ২ : Edward Weston-Mark, 'History of Human Marriage'

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ৩০:২১,

বুখারী শরীফে উদ্ধৃত আছে যে, রাসূল (সা:) সেই বিয়ে বাতিল করে দেন যা মেয়ের পিতা মেয়ের অমতে দিয়েছিলো।

রাসূল (সা:) আরও বলেন, যে মহিলার আগে একবার বিয়ে হয়েছে বিয়ের ব্যাপারে তার মতামত অভিভাবকের উর্ধ্বে। আর কুমারী মেয়েরও অনুমতি নিতে হবে, তার নীরবতাই হবে তার অনুমতি।

একবার একজন মহিলা রাসূল (সা:)-এর কাছে এসে যখন বলেন যে, তার অমতে বিয়ে হয়েছে, তখন রাসূল (সা:) সেই বিয়ে বাতিল করে দেন। তখন সেই মহিলা বলেন যে, তিনি পরে বিয়ে মেনে নিয়েছেন; তবু রাসূলের কাছে এসেছেন এটা প্রতিষ্ঠিত করতে যে, মেয়ের অমতে বিয়ে দেবার অধিকার তাদের পিতার নেই।

প্রশ্ন ৪ : আল কুরআন ৪:৪

জি-৩০ ইসলামের বিয়ে সংক্রান্ত আইন (৪)

বিয়ে চুক্তি

প্রশ্ন ১. বিয়ে চুক্তির সময় যদি মোহরানার অংক নির্ধারিত না হয়ে থাকে তাহলে কি বিয়ে বাতিল হয়ে যায়?

২. মোহরানা নির্ধারিত হবার পর বিয়ের সময় যদি তা পুরোপুরি আদায় করা না হয় তাহলে কি হবে?

৩. আইনের দৃষ্টিতে কখন মোহরানা পাওনা হবে?

৪. যদি স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনের আগেই তালাক হয়, তাহলে কি স্ত্রী মোহরানার টাকা পাবে?

৫. মোহরানা ছাড়া অন্যান্য শর্তও কি বিয়ে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত রাখা যায়?

৬. যদি কনে বিয়েতে এমন শর্ত রাখতে চায়, যেমন বিয়ের পর স্বামীকে নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থান করতে হবে, তবে এমন শর্ত কি রাখতে পারবে?

৭. ন্যূনতম আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া বিয়েতে পালনযোগ্য আর কোনো আনুষ্ঠানিকতা আছে কি?

৮. এক সময় ইসলাম অস্থায়ী বিয়ে অনুমোদন করেছিল। তেমন বিয়ে কি এখনও অনুমোদিত?

উত্তর : ১. মোহরানার অংক বিয়ে চুক্তিতে নির্ধারিত না থাকলে

ইসলামী আইনবিদরা একমত যে, বিয়ের সময় মোহরানার পরিমাণ নির্ধারিত 'না' থাকলে বিয়ে বাতিল হয় না। তবে ভবিষ্যৎ ভুল বুঝাবুঝি এড়াবার জন্য বিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ই তা নির্ধারণ করে রাখা উচিৎ। যদিও ইসলাম মতে দু'জন সাক্ষী থাকলে চুক্তি লিখিত না হলেও চলে তবে লিখিত চুক্তিই উত্তম। বিয়ে চুক্তির সময় মোহরানা নির্ধারিত না থাকলে এবং পরে এই নিয়ে বিতর্ক হলে ইসলামী আইনে 'মোহর আল মিসলি'র সুযোগ আছে, যা অনুযায়ী বিচারক মেয়ের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থান অনুযায়ী মোহরানার অংক নির্ধারিত করে দেবেন। এই বিচারকের রায় উভয়ে মানতে বাধ্য থাকবে।

উত্তর : ২. বিয়ের সময় মোহরানার অর্থ পুরোপুরি না দেয়া হলে

ইসলামী আইনমতে বিয়ের সময় মোহরানার পুরো অর্থ না দেয়া হলে বিয়ে ভাঙবে না। ইসলামী আইন এ ব্যাপারে শিথিল করা হয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠানকে সফল ও সহজ করার জন্য। কাজেই মোহরানা বিয়ের সময় পুরোপুরি বা আংশিক দেয়া যেতে পারে এমনকি

পুরোটাই বকেয়া থাকতে পারে। মোহরানার অনাদায়কৃত অংশকে 'মুয়াজ্জিল' বলা হয়। তবে স্বামী স্ত্রীর দৈহিক মিলনের পূর্বেই মোহরানা পুরোপুরি বা আংশিক দেয়া উত্তম। এটা প্রতিশ্রুতি এবং আন্তরিকতার বহি:প্রকাশ।

উত্তর : ৩. পুরো মোহরানা কখন পাওনা হবে

তিন ক্ষেত্রে মোহরানার পুরো অর্থ আইনত পাওনা হয় :

ক) স্বামী স্ত্রীর মিলনের পর পুরো মোহরানাই স্ত্রীর পাওনা হয়ে যায়।

খ) স্বামী স্ত্রীর মিলনের পূর্বে যে কেউ মারা গেলে পুরো মোহরানা পাওনা হয়।

গ) বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর মিলন না হলেও তারা যদি একান্তে বসবাস করে যাতে সামাজিক ভাবে মনে হয় স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়েছে, তাহলেও স্ত্রী পুরো মোহরানা পাওনা হবে।

উত্তর : ৪. স্বামী স্ত্রীর মিলনের পূর্বে তালাক হলে মোহরানা প্রসঙ্গে

ইসলামী আইন মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং কোনো বিবেকবর্জিত মানুষ যেন তাদের প্রতারিত বা বঞ্চিত করতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ। যদি বিয়ের পর দৈহিক মিলনের আগেই তালাক হয় তাহলেও স্ত্রী মোহরানার অর্ধেক অর্থ পাবে। মোহরানার পরিমাণ নির্ধারিত না থাকলে কুরআন অনুসারে স্বামী 'মুতা' বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদানে (consolation gift) বাধ্য থাকবে। অবশ্য যদি মেয়ে পক্ষ কর্তৃক কোনো মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে অথবা কোনো সত্য গোপন করে বিয়ে দেয়া হয় এবং সেজন্যে বিয়ে ভাঙ্গে তবে স্ত্রী মোহরানা পাবে না।

উত্তর : ৫. মোহরানা ছাড়া বিয়ে চুক্তিতে আর শর্ত রাখা যাবে কি?

ইসলামী আইনে মোহরানা ছাড়াও স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ বিয়ে চুক্তিতে অন্য যে কোনো বৈধ ও পারস্পরিক সম্মতিতে করা আইনানুগ শর্ত রাখতে পারেন। রাসূল (সা:) বলেন, এমন শর্ত পালনে উভয়েই বাধ্য থাকবে। কারণ চুক্তি মেনে চলা মুসলমানদের দায়িত্ব। উপরন্তু এটা এমন মহৎ চুক্তি যা একজন মানুষকে আরেক জনের জন্য বৈধ করে। তবে শর্ত আরোপের সময় খেয়াল রাখতে হবে তা যেন আল্লাহ স্বীকৃত কোনো বৈধ অধিকারকে অবৈধ বা অবৈধ অধিকারকে বৈধ না করে।

উত্তর : ৬. এমন শর্ত দেয়া যাবে কিনা যা স্বামীকে নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে যেতে বারণ করবে

এ বিষয়ে ইসলামী আইনবিদরা দু'ধরনের মত ব্যক্ত করেন। শাফায়ী এবং হানাফীরা বলেন যে, এমন শর্ত দেয়া যাবে না যা মানুষের বৈধ/হালালভাবে স্বাধীন চলাফেরার অধিকার কেড়ে নেয়। অন্য আইনবিদরা যেমন ইমাম হামবালী বলেন যে, যদি স্বামী

বিয়ের সময় এমন শর্ত মেনে নেয় তবে সে তা পালন করতে বাধ্য। তারা বলেন এর ফলে স্বামী কেবল একটি বিষয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট দেশ বা স্থান ছেড়ে চলে যেতে পারবে না।

উত্তর : ৭. আইনগত আনুষ্ঠানিকতার বাইরে বিয়েতে অনুমোদিত অনুষ্ঠানাদি

ক) বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় এমন একজনকে উপস্থিত রাখা ভাল যিনি আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসার পর বর-কনে ও সবার উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীসের আলোকে বিয়ের উদ্দেশ্য, দায়িত্ব ও গুরুত্ব আলোচনা করবেন।

খ. সাক্ষীর উপস্থিতিতে বর কর্তৃক বিয়ের প্রস্তাব ও কন্যার প্রস্তাব কবুল করা আনুষ্ঠানিকভাবে হওয়া উচিৎ।

গ) বিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিয়ে পরিচালনাকারী ব্যক্তি বিবাহিতদের সাফল্য কামনা করে সবাইকে নিয়ে দোয়া করতে পারেন এবং বর-কনেকে মোবারকবাদ জানাতে পারেন এই বলে যে, বারাকাল্লাহু ফিকুম (আল্লাহর সন্তুষ্টি আপনাদের জন্যে হোক)।

ঘ) বিয়ের কথা যথাসম্ভব প্রচার করা প্রয়োজন, যাতে সবাই বর কনের আনন্দে শরীক হতে পারে এবং সামাজিকভাবেও তাদের সহাবস্থান স্বীকৃত হয়।

ঙ) বিয়ের দিন অথবা তার পর বর তার আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের ডেকে আপ্যায়ন করাবে (যার নাম ওয়ালিমা)। এই অনুষ্ঠান হওয়া উচিত ইসলামের নৈতিক সীমার মধ্যে এবং সেখানে গরীব ও মিসকীনরাও আমন্ত্রিত থাকবে।

উত্তর : ৮. অস্থায়ী বিয়ে

মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা যে রকম ধাপে ধাপে করা হয়েছে, সে রকমই ইসলাম-পূর্ব আরবের বিশৃঙ্খল ও বাছ বিচারহীন জীবনকে কিছু সময় সহ্য করতে হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ইসলামের সংস্কার প্রতিষ্ঠিত করা গেছে। নবী (সা:) পুরুষদের জন্যে অস্থায়ী বিয়ে বহাল রেখেছেন যারা বড় সময়ের জন্যে (এক রাত নয়, কয়েক মাস) ঘরের বাইরে থাকে (যুদ্ধের প্রয়োজনে)- যাতে তারা নিজেদেরকে ব্যভিচার থেকে দূরে রাখতে পারে। সাধারণ বিয়ের মতই শর্ত এ বিয়েতে থাকত; কেবল এ বিয়ে চিরস্থায়ী সম্পর্কের জন্যে করা হত না। যত সময় যেতে থাকল, মুসলিমরা ঈমানে দৃঢ় হল, তখন মদ্যপান নিষিদ্ধ করার মতই এরকম অস্থায়ী বিয়ের প্রচলন পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। অস্থায়ী বিয়ে নিষিদ্ধ কারণ :

ক) ইসলামে কুরআন অনুযায়ী বিয়ের এক উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা; এবং

খ) রাসূল (সা:) 'শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত' এরকম বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ৪ : আল কুরআন ২:২৩৬-২৩৭

প্রশ্ন ৫ : আল কুরআন ৫:১

বেআইনী শর্তের উদাহরণ হচ্ছে, যেমন কোনো মহিলা যদি কোনো পুরুষকে এই শর্ত দেয় যে, "আমি তোমাকে বিয়ে করব যদি তুমি তোমার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দাও।" রাসূল (সা:) নির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, কোনো পুরুষ প্রথম স্ত্রীকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না।

প্রশ্ন ৭ : বিয়ের কথা বহুল প্রচারের জন্য রাসূল (সা:) বলতেন বিয়ের অনুষ্ঠান মসজিদে করার জন্য।

রাসূল (সা:) বলতেন যে, সবচেয়ে জঘন্য আয়োজন হচ্ছে সেটা যেখানে শুধু ধনীদের দাওয়াত দেয়া এবং গরীবদের অবজ্ঞা করা হয়।

প্রশ্ন ৮ : আল কুরআন ১৬:৭২, ৩০:২১

জি-৩১ বহুবিবাহ ও ইসলাম (১)

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

প্রশ্ন ১. বহু বিবাহ কি?

২. আদর্শ মুসলিম পরিবার কি একাধিক স্ত্রী সম্পন্ন?

৩. বহুবিবাহের ঐতিহাসিক ভিত্তি কি? প্রাচীন সভ্যতা সমূহে এটা কিভাবে চালু ছিল?

৪. বহু বিবাহ সম্পর্কে ইহুদী সভ্যতায় কি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়?

৫. ইহুদী জনগণের মাঝে বহুবিবাহের চর্চা কেমন ছিল?

৬. এটা কি বলা যায় যে খ্রিস্টবাদ সবসময় বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ছিল?

৭. এমন কোনো ঐতিহাসিক উদাহরণ আছে কি যাতে দেখা যায় যে, চার্চ বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছে?

উত্তর : ১. বহুবিবাহ

সাধারণত: 'বহুবিবাহ' বলতে একই স্বামীর একসাথে একাধিক স্ত্রী রাখাকে বুঝায়। অবশ্য দু'একটি প্রাচীন সমাজে একই স্ত্রীর একসাথে একাধিক স্বামীর ঘর করার নজিরও দেখা যায়। তবে তা ইসলামসহ সব একেশ্বরবাদী ধর্মেই নিষেধ।

উত্তর : ২. আদর্শ মুসলিম পরিবার

যদিও ইসলামে বহুবিবাহ নিষেধ করা হয়নি তবুও আদর্শ মুসলিম পরিবার বলতে এক স্বামী এক স্ত্রীর পরিবারকেই বুঝায়। ইসলামে এটা কেবল অনুমোদিত একটা বিষয়। ইসলাম বহুবিবাহের সূচনা করেনি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রথা চলে এসেছে। ইহুদীদের মাঝেও এই প্রথা ছিল। খ্রিস্টানরাও এর উর্ধ্বে নয়। বরং ইসলামই বহুবিবাহ সম্পর্কে খোলাখুলি সরলভাবে আলোচনা করেছে এবং এর উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।

উত্তর : ৩. বহুবিবাহের ঐতিহাসিক ভিত্তি

সমাজবিদ এবং ঐতিহাসিকগণ দেখিয়েছেন যে, মিসর, পারস্য, ভারত, ইউরোপ, প্রাচীন আরব ও শ্লাভ সভ্যতাসহ প্রায় সকল প্রাচীন সভ্যতায় বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। এমনকি যেসব সমাজে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল সেখানেও যারা চাইত তাদের জন্য বহুগামীতার ব্যবস্থা ছিল। যেমন 'কোড অব হামুরাবি'তে যদিও এক স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করার নিয়ম

ছিল কিন্তু সেখানেও উপপত্নী রাখবার ব্যবস্থা ছিল। একইভাবে গ্রীক-রোমান সভ্যতায়ও একক স্ত্রী বিশিষ্ট পরিবার দেখা গেলেও বহুগামিতা ছিল খোলামেলা বিষয়।

উত্তর : ৪. বহু বিবাহ ও ইহুদী সভ্যতা

যদিও সাধারণভাবে মনে করা হয় ইহুদী-খ্রিস্টান আইন বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়। ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখা যায় যে, বহু নারী, রাজা এবং বিচারকের একাধিক স্ত্রী ছিল এবং কোথাও এটাকে নিষিদ্ধ বা অনৈতিক বলা বা ইঙ্গিত দেয়া হয়নি। যেমন, গিডিয়ন (Gideon)-এর অসংখ্য স্ত্রী ছিল এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে যে, তার চরিত্র এত পবিত্র ছিল যে, স্বয়ং খোদার জ্যোতি তার উপর চলে আসত। আবাদন (Abadon) যিনি আট বছর ইসরাইল শাসন করেছেন তাঁর চল্লিশজন পুত্র ছিল এবং অবশ্যই একাধিক স্ত্রী ছিল। ডেভিড-এর একশ স্ত্রী ছিল, Rehoboam-এর ১৮ জন স্ত্রী এবং তিনশত উপপত্নী ছিল এবং আব্রাহাম যাকে একত্ববাদীদের পিতা বলা হয় তাঁরও দু'জন স্ত্রী ছিল।

উত্তর : ৫. ইহুদী জনগণের মাঝে বহুবিবাহের চর্চা

প্রখ্যাত সমাজবিদ এডওয়ার্ড ওয়েস্ট-মার্ক তার 'Short History of Marriage's-এর তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৬ সালে প্রকাশিত) বলেন,

"ইউরোপীয় ইহুদীদের মধ্যে মধ্যযুগ পর্যন্ত বহুবিবাহের চর্চা ছিল এবং আরব বিশ্বের ইহুদীদের মধ্যে আজও এই চর্চা আছে। প্রথমত: জার্মান এবং ফ্রান্সে এর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয় দ্বাদশ শতকে, যার ফলে ইউরোপে ইহুদীদের মাঝে বহুবিবাহ বন্ধ হয়। তবুও ইহুদী বিবাহ আইনে বহু বিবাহের অনেক পথ রয়েছে যা বহুবিবাহ যখন অনুমোদিত ছিল, তা থেকে উৎসারিত।"

যারা বলেন যে, যেসব ইহুদী, মুসলিম সমাজের সংস্পর্শে এসেছে, তারা মুসলমানদের দেখে বহুবিবাহ করেছে, তারা ঠিক বলেন না। কারণ ইসলাম তার আইন কখনই অমুসলিমদের উপর চাপায়নি। মুসলিম এলাকায় বাসরত ইহুদীরা তাদের বহুবিবাহের চর্চা বন্ধ করতে চাইলে যে কোনো সময় আইন করে বন্ধ করতে পারত। অবাক হবার কথা হচ্ছে যে, যখন ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, তখন কিছু ইয়েমেনী ইহুদী দুই বা ততোধিক স্ত্রীসহ ইসরাইলে আগমন করে।

উত্তর : ৬. খ্রিস্টবাদ ও বহু বিবাহ

এটা বহুল প্রচলিত ধারণা যে, খ্রিস্টবাদ কঠোরভাবে বহুবিবাহের বিরোধী। কিন্তু এই ধারণার পক্ষে তাদের ধর্মগ্রন্থে কোনো দলিল পাওয়া যায় না, যদিও এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করা উত্তম- এমন কথা দেখা যায়; কিন্তু বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এমন কোনো আদেশ নেই। ওল্ড টেস্টামেন্ট খ্রিস্টান ঐতিহ্যের অংশ, তাতে দেখা যায় যিশু (আ:) বলেন, "আমি

আমার পূর্ববর্তী নবীদের আইন ধ্বংস করতে আসিনি বরং তাকে পূর্ণতা দিতে এসেছি।" কাজেই আগের নবীদের আমলে বহুবিবাহ অনুমোদিত থাকলে তার আমলে তা নিষিদ্ধ হয়নি। তারপরও খ্রিস্টানদের মধ্যে বহুবিবাহের চর্চা ইহুদীদের তুলনায় কম হবার সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ হচ্ছে :

ক) প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টান যাজকরা এবং সাধারণভাবে সকল খ্রিস্টান বিয়ে ও যৌন সম্পর্কের উপর তীব্র ঘৃণাবোধে ভুগতেন। বিয়েকে তারা শয়তানী কাজ বলে মনে করতেন।

খ) প্রাথমিক যুগের খ্রীস্টানদের মাঝে আত্মাকে পরিশুদ্ধির (Soul-Saving) চেষ্টায় প্রাধান্য দেখা যায়।

গ) খ্রিস্টবাদ প্রথমে গ্রীক-রোমান সভ্যতার এলাকাতে বিস্তার লাভ করে যাদের মধ্যে এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করা চালু ছিল।

ঘ) ওয়েস্ট মার্কের মতে, প্রাথমিকভাবে খ্রিস্টবাদ গরীবদের মাঝেই প্রসার লাভ করে যাদের একাধিক বিয়ের সামর্থ্য ছিল না।

উত্তর : ৭. খ্রিস্টবাদে বহুবিবাহ অনুমোদনের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত

এডওয়ার্ড ওয়েস্টার্ন মার্ক তাঁর History of Human Marriage' গ্রন্থে বলেন, 'যদিও গ্রীক রোমান সমাজে এক বিবাহেই একমাত্র বৈধ ব্যবস্থা ছিল তবুও একথা বলা যাবে না যে, খ্রিস্টানদের জন্য বহু বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল'... এবং যদিও নিউ টেস্টামেন্টে এক বিয়েকেই আদর্শ এবং স্বাভাবিক বলা হয়েছে, তবুও বহু বিবাহকে নিষেধ করে কিছু বলা হয়নি; ব্যতিক্রম শুধু বিশপ বা ডিকন (Deacon)-র ক্ষেত্রে। "(চার্চের) ফাদাররা ইহুদী রাব্বীদের ভোগবাসনা (Sensuality)-র জন্যে অভিযুক্ত করলেও চার্চ কাউন্সিল থেকে বহুবিবাহের বিপক্ষে কিছু বলা হয়নি এবং সেইসব সমাজের রাজারা প্রকৃতিপূজারি যুগের মতই অনেক স্ত্রী রাখার ক্ষেত্রে কোনো বাধার সম্মুখীন হননি।'

এরকম সম্প্রতির কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে :

ক) সপ্তম শতকের মাঝামাঝি আয়ারল্যান্ডের আরমাইক রাজার দু'জন রাণী এবং দু'জন উপপত্নী ছিল।

খ) চার্লস দ্য গ্রেট-এর দুই স্ত্রী এবং অসংখ্য উপপত্নী ছিল এবং তার এক আইনে দেখা যায় যে যাজকরা বহুবিবাহ সম্পর্কে জানতেন।

গ) প্রুশিয়ার রাজা উইলিয়াম- ২ এবং হেস-এর ফিলিপ একাধিক বিয়ে করেন যাজক মার্টিন লুথারের অনুমতি নিয়ে। মার্টিন লুথার বলেন যে, 'খোদা এটা নিষেধ করেন নি।'

ঘ) এনাব্যাপটিস্ট এবং মরমনস সহ কয়েকটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় বহুবিবাহ সমর্থন করে।

ঙ) ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসানের পর (১৬৫০ সালে) নূরেমবার্গে আইন পাশ হয় যে, প্রত্যেক পুরুষ দু'জন নারী বিয়ে করতে পারবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৫ : J. Hastings সম্পাদিত 'The Dictionary of the Bible'-এ বলা হয়েছে, "বহুবিবাহ একটি বাস্তবতা কারণ আব্রাহাম, জেকব, ডেভিড, সলোমন এ চর্চা করেছেন।"

Deut Ch.17. 17-এ রাজাদের সতর্ক করে দেয়া হয় ১৮-এর বেশী বিয়ে না করতে এবং সাধারণের জন্য এ সংখ্যা চার।

প্রশ্ন ৬ : আদম এবং হাওয়া (আ:)-কে এক স্বামী-স্ত্রী দম্পত্তি হিসেবে দেখা যায় আর আল্লাহ নারী-পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় বানিয়েছেন।

"Short History of Marriage," Vol. iii, Edward Weston-Mark, 1926.

"History of Human Marriage," Edward Weston-Mark, 1925.

"The Dictionary of the Bible, J. Hasting সম্পাদিত, 1963 (পৃষ্ঠা ৬২৪)

জি-৩২ বহু বিবাহ ও ইসলাম (২)

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

প্রশ্ন ১. মরমন (Mormon) সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিস্টানরা কি বহুবিবাহ অব্যাহত রেখেছিল?

২. সমগ্র ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন সভ্যতায় ও জাতিতে বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকার কারণ কি?

৩. এটা কি বলা যায় যে, ইসলাম বহুবিবাহ চালু করেনি, এটাকে শুধু স্বীকৃতি দিয়েছে।

৪. কুরআনে বহুবিবাহের অনুমতি সূচক কোনো উদ্ধৃতি আছে কি?

৫. ৪নং সূরার ৩ নং আয়াতের পটভূমি ও ব্যাখ্যা কি?

৬. বহুবিবাহের ক্ষেত্রে সমব্যবহারের অর্থ কি?

উত্তর : ১. মরমন সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিস্টানদের বহুবিবাহ

১৮৪৭ সালে মরমনরা তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে (Promised Land of Utah) বসবাস শুরু করে এবং ব্যাপকভাবে বহুবিবাহের প্রসার ঘটায়। ব্রিগাম ইয়াং-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মরমন চার্চ বহুবিবাহকে আধ্যাত্মিক বিধান হিসেবে প্রচার করত। ১৮৯০ সালে ফেডারেল সরকার বহুবিবাহকে নিষেধ করলেও মরমনদের মাঝে এই চর্চা অব্যাহত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকার কর্তৃক তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়। তাদের সম্পদে ভাটা পড়ায় মরমন চার্চের প্রেসিডেন্ট উইলসন উডরাফ বহুবিবাহ বন্ধ করে বলেন যে, এটাও আধ্যাত্মিক আদেশ এবং এ আধ্যাত্মিক আদেশ আসে চার্চের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার পর! ১৯৬৭ সালে সাময়িকী 'Journal'-এ (June সংখ্যা) বেন মারকন যে, তখনও অন্তত: ত্রিশহাজার মরমন পরিবারে একাধিক স্ত্রী ছিল।

উত্তর : ২. বহুবিবাহ প্রথার কারণ

সমাজ বিজ্ঞানী হামুদাহ্ আবদ আল-আতি সহ অনেকেই মত প্রকাশ করেন যে বহুবিবাহ কোনো সমাজ বিরোধী বা অবিবেচক কাজ ছিল না বরং এক জটিল বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যার বিভিন্নরকম কারণ রয়েছে। তাঁর রচিত 'The Family Structure in Islam' গ্রন্থে তিনি এর কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ চিহ্নিত করেছেন।

ব্যক্তিগত

ক) কোনো বিবাহিত মানুষ অপর মহিলার প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ল যে, তাকে বিয়ে করতে চাইল।

খ) প্রথম স্ত্রীর এমন শারীরিক বা অন্য সমস্যা দেখা দিল যে, সে স্বামীর দৈহিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হল।

গ) সাংস্কৃতিক কারণ, যেমন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের একাধিক স্ত্রী রাখার রীতি অন্য ব্যক্তিদের বহুবিবাহের দিকে প্রভাবিত করতে পারে।

ঘ) কোনো কোনো সমাজে গরীব লোকের প্রথম বা একমাত্র স্ত্রী হবার চেয়ে ধনী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী হতে চাইত।

১. জনসংখ্যাগত

ক) পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা সাম্য ব্যাহত হলে সেসব সমাজে অনেক নারীর বিয়ে না হতে পারে এবং এক্ষেত্রে বহুবিবাহকে তারা উত্তম বিকল্প পথে মনে করতে পারে। (যুদ্ধ বা অন্য কারণে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে- অনুবাদক)

জৈবিক :

ক) পুরুষের যৌন প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে বহুবিবাহের দিকে বেশি।

২. সামাজিক

ক) কোনো কোনো সমাজে বহুবিবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা হয়।

খ) কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী বাড়ির কাজে প্রথম স্ত্রীর জন্য সহায়ক হয়।

গ) যে সব সমাজে শিশু মৃত্যুর হার বেশী তাদের মাঝেও বহু বিবাহের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

আবদ আল-আতি বলেন, 'এসব কারণ পরস্পরে যুক্ত হয়ে অন্যান্য সামাজিক ফ্যাক্টর যেমন- ঐতিহ্য, নৈতিকতা, রীতি ও আইন ইত্যাদির' সাথে মিশে বহু বিবাহকে বাস্তবতা দিয়েছে।

উত্তর : ৩. ইসলাম কি বহুবিবাহকে অনুমতি দিয়েছে

ইসলাম বহুবিবাহ প্রথা উদ্ভাবন বা চালু করেনি। এটা আগে থেকেই চালু ছিল বরং ইসলামই একমাত্র তৌহিদবাদী ধর্ম যা বহুবিবাহকে কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করে সীমাবদ্ধ করেছে। ইসলামে এটা কোনো অত্যাবশ্যকীয় বা নির্দেশিত কাজ নয় শুধু বিশেষ কিছু অবস্থার প্রেক্ষিতে সুযোগ মাত্র।

এখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ইসলামে অনুমোদিত অনেক কাজও ইসলামের অন্য আইন ভংগ হবার প্রেক্ষিতে অননুমোদিত হয়ে যেতে পারে। যেমন কেউ যদি এই মতলবে দ্বিতীয় বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রথম স্ত্রীর সাথে সুব্যবহার করবে না

তবে তার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে অনুমোদিত নয়। (কারণ এখানে অবিচার সম্পৃক্ত) যদিও নীতিগতভাবে বহুবিবাহ অনুমোদিত। (পাঠকদেরকে সর্বদা এসব মৌলিক নীতিমালার আলোকে ইসলামের নীতির বিচার করতে হবে-অনুবাদক)

উত্তর : ৪. বহুবিবাহ প্রসঙ্গে কুরআন

বহুবিবাহ প্রসঙ্গ কুরআনের ৪ নং সূরার ৩ নং আয়াতে এসেছে যা থেকে দেখা যায় :

ক) বহুবিবাহ মুসলমানের জন্য 'আবশ্যক' কিছু নয়।

খ) একের অধিক বিয়ে শর্তযুক্ত (Conditional)।

গ) সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী বিয়ে করার সীমা নির্ধারিত হয়েছে, যদিও এর আগে এর কোনো সীমা ছিল না।

ঘ) উক্ত আয়াতে এক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতেই একাধিক বিয়ের কথা বলা হয়েছে : কোনো মুসলমানের তত্ত্বাবধানে থাকা এতিমের সাথে যথাযথ ব্যবহার প্রসঙ্গে।

উত্তর : ৫. উক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষিত ও ব্যাখ্যা

আয়েশা উক্ত আয়াত নাযিলের পটভূমি প্রসঙ্গে বলেন যে, কয়েকজন এতিম বালিকার তত্ত্বাবধায়ক এক পুরুষকে নির্দেশনা দিতেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতটি নাযিল হয় ওহুদ যুদ্ধের পরক্ষণেই। ওহুদ যুদ্ধে অনেক মুসলমান শহীদ হন। তাঁদের স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। তাদের খাদ্য, আশ্রয় ছাড়া পারিবারিক পরিবেশে থাকাও জরুরী ছিল এবং এ কারণে তাদেরকে বিভিন্ন অভিভাবকের নিকট রাখা হল। এমনি কয়েক এতিম বালিকার তত্ত্বাবধায়ক পুরুষ একটি বালিকাকে তার প্রাপ্য মোহরানার চেয়ে কম দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইল। এই আয়াতে মুসলমানদের সাবধান করে বলল, এতিমের প্রতি ন্যায়বান থাকতে এবং ন্যায্য মোহরানা দিতে না পারলে তাদের বিয়ে না করতে। সর্বোচ্চ চার বিয়ে করার অনুমোদন দেয়া হয়। প্রখ্যাত একজন তাফসীরকারক তাঁর 'আল কাশফ আল তাফসীর' গ্রন্থে বলেন যারা সন্দিহান যে আরেক বিয়ে না করলে তার দ্বারা ব্যভিচার সংগঠিত হতে পারে তাদের জন্যই এ সুযোগ রাখা হয়েছে। কুরআনের কঠোরভাবে সতর্ক করা হয় যে, এতিমদের সাথে অবিচার করা যাবে না এবং অন্যদিকে ব্যভিচারের বিষয়ে ইসলামের শক্ত অবস্থান একজন সত্যিকার মুসলমানকে ভীত করে দেয় এবং তখন বহুবিবাহ এ দু'টির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছিল।

অবশ্য এই আয়াতে এটাও সতর্ক করা হয়েছে যে, যারা দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায় তাদের অবশ্যই উভয় স্ত্রীর সাথে সমব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

উত্তর : ৬. স্ত্রীদের সাথে সমব্যবহার-এর অর্থ

স্ত্রীদের সাথে সমব্যবহার বহুবিবাহের 'অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত'। এছাড়া দ্বিতীয় বিয়ের আশা করা অবান্তর। রাসূল (সা:) বলেন যে, "যে ব্যক্তি দুই স্ত্রীর একজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন, সে হাশরের ময়দানে তার শরীরের এক অংশ নীচু অবস্থায় হাযির হবে।"- এটি একটি সংকেত যে ঐ ব্যক্তি অসাম্য ব্যবহারের জন্যে 'চিহ্নিত' ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হবে হাশরের ময়দানে। যে ব্যক্তি একাধিক বিয়ের চিন্তা করে তার এ দৃঢ়তা ও আস্থা থাকতে হবে যে, সে 'মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুবিচার করতে পারবে। সমব্যবহার বলতে বুঝায় সকল স্ত্রীকে এক মানের খাবার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন, সময় এবং সহানুভূতি দিতে হবে। শুধু এক ক্ষেত্রেই হয়ত সমান থাকা যাবে না তা হচ্ছে ভালবাসা ও আবেগ। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল (সা:) আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন- এভাবে, "হে আল্লাহ! এটাই আমার পক্ষে অপক্ষপাতিত্ব (বা বিভাজন) যা আমার নিয়ন্ত্রণে। অতএব, আমাকে তুমি পাপী করো না যা তোমার নিয়ন্ত্রণে।

সূত্র :

প্রশ্ন ২ : 'The Family Structure of Islam', Hamudah Abd Al Ati,
'Sokomo Law and Custom', H. Cory, New York, 1953. of
'In the Heart of the Bantuland', D. Campbell, London, 1922

প্রশ ৪ : আল কুরআন ৪:৩

প্রশ্ন ৫ : আল কাশাফ তাফসীর', আসগর মাকশারী

প্রশ ৬ : আল কুরআন ৪:১২৯।

জি-৩৩ বহুবিবাহ ও ইসলাম (৩)
কেন অনুমোদিত

প্রশ্ন ১. কেউ কেউ বলে যে, ইসলাম বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে এবং এ ব্যাপারে কুরআনের উদ্ধৃতি দেয়- এ বিষয়ে মন্তব্য করুন।

২. চারজন স্ত্রী- এই সংখ্যা নির্ধারণের কারণ কি?

৩. ইসলামের মৌলিক শিক্ষা যদি এক বিবাহই হয় তবে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হল কেন?

৪. বহুবিবাহের অনুমতি দেবার সামাজিক কারণগুলো কি?

উত্তর : ১. কুরআনে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া

যদিও চতুর্থ সূরার (নিসা) ৩ নং আয়াতে বহুবিবাহের সুযোগ রয়েছে তবুও সব স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহারের পূর্বশর্ত রাখা হয়েছে। একই সূরার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "কিন্তু তোমরা কখনই সমান ব্যবহার করতে পারবে না.."- এই আয়াত থেকেই অনেকে ব্যাখ্যা করেন যে, কুরআনে বহুবিবাহ নিষেধ করা হয়েছে। দু'টি কারণে এই ব্যাখ্যা যুক্তিপূর্ণ নয়-

ক) ৪নং সূরার ৩নং আয়াতে এটা স্পষ্ট যে, একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে পারবে। তাহলে সেই কুরআনেই আবার অন্যত্র এটা নিষিদ্ধ হয় কেমন করে?

খ) এটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, রাসূল (সা:) নিজে এবং তাঁর সাহাবীরা একাধিক বিয়ে করেছিলেন। তাহলে এমন কি মনে হওয়া উচিৎ যে তাঁরা কুরআন অমান্য করেছিলেন? এটা নিশ্চিত যে, কুরআনে আদ্‌ল (Justice) সমব্যবহার বহুবিবাহের পূর্বশর্ত হিসেবে রেখেছে। এই 'সমব্যবহার' বলতে একই মানের খাবার, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন, সময় প্রদান সহ পার্থিব বিষয়াদিতে সমতার কথাই বলা হয়েছে। আর ১২৯ নং আয়াতে যে সমতা সম্ভব নয় বলা হয়েছে তা মূলত: ভালবাসা ও আবেগ প্রসূত আকর্ষণ যাতে সমান বণ্টন মানুষের জন্য কঠিন। কুরআন সমব্যবহারের কথা বলে পুরুষকে সতর্ক করেছে। আরও বলা হয়েছে কেউ যেন প্রথম স্ত্রীর বিনিময়ে (অর্থাৎ তার সুবিধা ও তার প্রতি ভালবাসা বাদ দিয়ে) দ্বিতীয় স্ত্রী না আনে।

উত্তর : ২. সর্বোচ্চ সীমা চারজন স্ত্রী হবার কারণ

চারজনের এই সর্বোচ্চ সংখ্যা স্বয়ং সর্বজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা ন্যায়ের প্রতীক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার করা। যদি এ সংখ্যা তিন, পাঁচ বা অন্যকোনটিও হত, তবুও কারো না

কারো উৎসাহ থাকত তার কারণ জ্ঞাত হবার। নিম্নে এই সংখ্যা চার হবার সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হল–

ক) এটা বলা হয়ে থাকে যে, একজন মেয়ে স্বামী ছাড়া সর্বোচ্চ তিনদিন সুখী থাকতে পারে। যদি একজনের সর্বোচ্চ চার স্ত্রী থাকে এবং সে একদিন পর পর এক একজন স্ত্রীর কাছে থাকে তাহলে প্রতি স্ত্রীর সর্বোচ্চ বিরহকাল হবে তিনদিন।

খ) খুব ধনী ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষেই চারের অধিক স্ত্রী রাখা সম্ভব নয়। অবশ্য এ দুটি ব্যাখ্যার কোনটাই সন্তোষজনক নাও হতে পারে। যার প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহর কাছে। তবে এটা নিশ্চিত যে এই চার সংখ্যা একবিবাহ (Monogamy) এবং বহুগামিতা (Sensuality/ unlimited Plurality)-এর মাঝে একটি সাম্য এবং যুদ্ধসহ বিভিন্ন কারণে নারী পুরুষের সংখ্যাসাম্য বিপর্যস্ত হলে তার সমাধান। যদি স্বামীর পক্ষে চার-এর কম তিন বা দুই স্ত্রী নিয়ে সমস্যার সমাধান হয় তবে আরো ভাল আর এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করাতো সর্বোত্তম।

উত্তর : ৩. বহুবিবাহের অনুমতির সম্ভাব্য কারণ

কুরআনে বহুবিবাহের অনুমতি প্রদানের কারণ (যা কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম সমাধান) আলোচনার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা দরকার। যদিও বহুবিবাহের বিষয়টি অনেকের চোখেই খারাপ লাগে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, এই অনুমোদন কোনো মানুষের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। এ সুযোগ আল্লাহর তরফ থেকে সরাসরি ওহীর মাধ্যমে দেয়া হয়েছে, যিনি নারীও নন, পুরুষও নন। কাজেই এর মাধ্যমে পুরুষকে অতিরিক্ত সুবিধা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ অনুমতির পেছনে কিছু বাস্তব কারণ আছে। এসব বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে আল্লাহ এবং তাঁর জ্ঞানের অসীমত্বের উপর দৃঢ় ঈমান নিয়ে। কারো এমন বললে চলবে না যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত বহুবিবাহের অনুমতির যুক্তিসঙ্গত কারণ না জানা যাবে ততক্ষণ আমি খোদায় বিশ্বাস করবো না।" আরও মনে রাখা দরকার যে, কুরআন হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহর নাযিল করা সর্বশেষ জীবন বিধান। এরপর আর কোনো কিতাব আসবে না। কাজেই পরবর্তী সব সমাজ, জাতি ও সময়ের চাহিদা পূরণের মতো আইনগত সুযোগ এতে রাখা প্রয়োজন ছিল। যদি শুধুমাত্র সপ্তম শতকের মানুষের চাহিদা পূরণের বিধান এতে থাকত বা শুধুমাত্র আরব বিশ্ব বা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার বা কোনো নির্দিষ্ট জাতির সমস্যার সমাধান এতে থাকত, তবে এটা সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন হতো না। নির্দিষ্ট কয়েকটি সমস্যার সমাধান এতে থাকলে এটাকে সব সমস্যার সমাধানের নির্দেশক গ্রন্থ বলা হতো না। বহুবিবাহের যৌক্তিক কারণ অতীতে ছিল। বর্তমানেও থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতেও

তৈরী হতে পারে। এই বিভিন্ন সময় ও অবস্থার বাস্তবতা মোকাবেলার জন্যেই ইসলামে এই সুযোগ রাখা হয়েছে।

উত্তর : ৪. বহুবিবাহের সম্ভাব্য সামাজিক কারণ

ক) কোনো কোনো সমাজে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা বেশী থাকতে পারে। ঐ সমাজে যদি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয় তবে অনেক বিয়ের যোগ্য মেয়ে, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্বামী পাবে না। এমতাবস্থায় এসব মেয়ের সামাজিক জীবন বিপন্ন হতে পারে। তারা বিপথে যেতে পারে।

খ) পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধ জীবনেরই অংশ হিসেবে থেকেছে। সাধারণত: পুরুষরাই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এবং প্রচুর সংখ্যায় নিহত হয়েছে। যার ফলে সমাজে অনেক বিধবার সৃষ্টি হয়েছে। আবার নারীর অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অসংখ্য পুরুষের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে খোদ ইউরোপেও বহুবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা চলে এই অসাম্যকে নিয়ন্ত্রণ করার নিমিত্তে।

গ) যুদ্ধ ছাড়াও পুরুষরা সাধারণত: বিপদজনক কাজে বেশী জড়িত থেকেছে। যেমন, খনি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, শিকার ইত্যাদি কাজে জড়িত পুরুষদের মৃত্যু অনেক মহিলাকে অকালে বিধবা করেছে। যাদের অনেকেরই পুন:বিবাহ প্রয়োজন ছিল পারিবারিক প্রশান্তির জন্যে।

ঘ) বেশী যৌন চাহিদাসম্পন্ন পুরুষ যদি এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট না হয় এমতাবস্থায় তার দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন না থাকলে তার দ্বারা অনৈতিক কাজ হতে পারে। ব্যভিচার এবং বিয়ে বহির্ভূত যৌনাচার শুধু আল্লাহর আইনেরই লংঘন নয় বরং সমাজকেও ধ্বংসের দুয়ারে নিয়ে যায়।

ঙ) কোনো কোনো সভ্যতায় বহুবিবাহ সামাজিক রীতি। আফ্রিকায় কোনো কোনো সম্প্রদায়ে খোদ চার্চ নব্যখ্রিস্টানদের একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে।

উত্তর : ৫. বহু বিবাহের কারণ : ব্যক্তিগত পর্যায়ে

ধরুন বিশেষ একজন সুখী যুবক যার স্ত্রী এবং দুই সন্তান আছে। আকস্মিকভাবে তাঁর স্ত্রী মারাত্মক অসুখে পড়লেন (মানসিক অথবা দৈহিক) অথবা এমন দুর্ঘটনার শিকার হলেন যে স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সামর্থ আর তার থাকল না। এ অবস্থায় ঐ যুবকের সামনে যে কয়েকটি পথ খোলা থাকল তা নিম্নরূপ :

ক) বাকী জীবনের জন্য সে তার জৈবিক কামনাকে দমন করে রাখতে পারে- যা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব।

খ) সে তার স্ত্রীকে রেখে বিয়ে বহির্ভূত যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারে- যা অনৈতিক, অসামাজিক।

গ) সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে পারে- যা অমানবিক।

ঘ) সে আর একজন স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে তার প্রথম স্ত্রীর এবং তার ও ছেলেমেয়েদের সেবা করতে পারে। বস্তুত: এটাই একমাত্র সমাধান যা নৈতিকতা, মানবিকতা ও প্রবৃত্তি এই তিন বিষয়ে সাম্য রক্ষা করে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ৪:১২৯

প্রশ্ন ৩ : ১৯৪৮ সালে মিউনিখে যুদ্ধোত্তর নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক যুবক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মুসলমানদের বহুবিবাহ প্রথার প্রস্তাব প্রথমে সমালোচিত হলেও শেষে যুক্তির বিচারে বহুবিবাহকে একটি সমাধান ধরে সম্মেলনের প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত হয়। তাছাড়া ১৯৪৯ সালে বন-এর জনগণ বহুবিবাহকে সংবিধানে স্বীকৃত করার দাবি জানায়।

জি-৩৪ বহুবিবাহ ও ইসলাম (৪)

প্রেক্ষিত : স্ত্রীর অধিকার

প্রশ্ন ১. ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন্ কোন্ অবস্থায় মানুষের একাধিক বিয়ের প্রয়োজন হতে পারে?

২. দ্বিতীয় স্ত্রী হবার কি কি ঐচ্ছিক বিষয় রয়েছে?

৩. দ্বিতীয় বিবাহে ইচ্ছুক স্বামীর প্রথম স্ত্রীর কি কি সুযোগ থাকে?

৪. যদি বিয়ে চুক্তিতে স্ত্রীর তালাকের অধিকার স্বীকৃত না থাকে তবে প্রথম স্ত্রীর জন্য কোনো পথ খোলা থাকে?

৫. যদি বিচারক প্রথম স্ত্রীর তালাকের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন তখনও কি তার কোনো সুযোগ থাকে?

৬. স্ত্রী স্বামীকে খোলা তালাক দিলে স্বামী তা মানতে বাধ্য কি না?

৭. একজন মহিলা কেন একাধিক স্বামী রাখতে পারে না?

৮. কোনো মহিলার স্বামী গুরুতর অসুস্থ বা বন্ধ্যা হলে সে কি করবে?

উত্তর : ১. যেসব কারণে কোনো ব্যক্তির বহু বিবাহ প্রয়োজন হতে পারে :

ক) বন্ধ্যাত্ব– কারো স্ত্রী সন্তান জন্মদানে অক্ষম হবার পরও যদি তার পিতৃত্বে সখ থাকে তবে তার সামনে যেসব পথ খোলা থাকে :

(i) পিতৃত্বের সখ ত্যাগ করে ধৈর্য ধরা।

(ii) বন্ধ্যা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করা।

(iii) সন্তান পালক নেয়া। অবশ্য পাশ্চাত্যে যেভাবে দত্তক নেয়া হয় ইসলামে সেভাবে দত্তক নেয়ার সুযোগ নেই। তারপরও যদি কারো সন্তান পালন নিয়ে নি:সন্তান দম্পত্তি সুখে থাকে তবে সেটা তো সবচেয়ে উত্তম।

(iv) প্রথম স্ত্রীকে স্বমর্যাদায় রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করা।

খ) যদি স্বামীর দৈহিক চাহিদা পূরণে স্ত্রী অক্ষম হয়। (অবশ্য এটা খুব কমই হবার কথা) এক্ষেত্রে স্বামীর জন্য অনৈতিক কোনো কাজ করা বা স্ত্রীকে তালাক দেবার চেয়ে আর একটি বিয়ে করাই কি শ্রেয় নয়?

উত্তর : ২. দ্বিতীয় স্ত্রী হবার সম্ভাব্য কারণ ও তার অধিকার

ইসলামের বিয়ে সংক্রান্ত আইন যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে তা দ্বিতীয় বা যে কোনো বিয়ের জন্যই অভিন্ন। দ্বিতীয় বিয়ের বৈধতার জন্যও চুক্তি ও কবুলের শর্ত জড়িত। যদি

কোনো মহিলা কারো দ্বিতীয় স্ত্রী হতে না চায় এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দেয়া হয়ে থাকে, তবে সে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। যদিও মনে হতে পারে যে, কোনো মহিলা সতীনের ঘর করতে বা কারো দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী হতে চাইবেন না তবুও এমন বিয়েও অনেক নারীর জন্য উত্তম বিকল্প হিসেবে নিরাপত্তা ও কল্যাণ এনে দিতে পারে। যেমন-

ক) একজন বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যার দুই তিনটি সন্তান আছে: সন্তান ও নিজের জন্য একজন স্বামী তথা পুরুষ অভিভাবক দরকার। এ অবস্থায় কোনো অবিবাহিত পুরুষ তাকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তখন সে অবিবাহিত অবস্থার নিরাপত্তাহীন ও দারিদ্র্যের মধ্যে থাকার চেয়ে কারো দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী হতেও পছন্দ করবে।

খ) যেখানে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশী: সেখানে সকল নারী যদি বৈষ্ণবী অথবা নান (ধর্মীয় সেবিকা) না হয়ে বিবাহিতা হতে চান তখন বহুবিবাহই তো গ্রহণযোগ্য সমাধান, যার মাধ্যমে সে অবৈধ পথে তার দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন পূরণ থেকে বিরত থেকে পরিবারের উষ্ণতা পেতে পারে।

এ দু'টো উদাহরণ তাত্ত্বিক নয় বরং রূঢ় বাস্তব। জীবনের কঠিন বাস্তবতা মোকাবেলা করতে গিয়ে যে, সব মহিলাকে জীবনে নিরাপত্তা সম্মানের জন্য নিত্য সংগ্রাম অথবা অনৈতিক জীবন বেছে নিতে হচ্ছে তাদের দিকে তাকালে আর এসব বিধানকে অবাস্তব মনে হয় না।

উত্তর : ৩. দ্বিতীয় বিবাহে ইচ্ছুক স্বামীর প্রথম স্ত্রীর সুযোগ সমূহ

যদিও কোনো মানুষের দ্বিতীয় বিয়ে করতে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি পূর্বশর্ত করা হয়নি এবং প্রথম স্ত্রীকেও এ ব্যাপারে কোনো ভেটো ক্ষমতা দেয়া হয়নি তবুও এটা 'ইসলামী স্পিরিট নয় যে, কেউ প্রথম স্ত্রীর সাথে কোনো আলাপ না করে তাকে কোনভাবে না বুঝিয়ে তার অজ্ঞাতে দ্বিতীয় বউ ঘরে এনে তাকে অবাক করে দেবে। বস্তুত এটা ভীষণ অভদ্রতা।

এক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর বাধা দেবার অধিকার রয়েছে, যদি সে বিয়ের কাবিনে এই শর্ত আরোপ করে থাকে যে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। সব আইনবিদ একমত যে, যদি স্বামী বিয়ের কাবিননামায় এমন শর্ত স্বাক্ষর করে তবে সে প্রথম স্ত্রীর অসম্মতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। এক্ষেত্রে অবশ্য তাকে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। প্রথম স্ত্রীর আরেকটি সুযোগ হচ্ছে, বিয়ের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেবার একতরফা অধিকার দিয়ে দিবে এবং যখন ঐ স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করল এবং প্রথম স্ত্রী এতে সন্তুষ্ট নয়, তখন প্রথম স্ত্রী তালাকের জন্যে আদালতে যেতে পারে। এ

অধিকারকে বলে 'আইসিমা (aisima)- বা বিচ্ছিন্ন হবার দায়িত্ব অর্পণ করা। (Delegated Repudiation)।

উত্তর : ৪. যদি বিয়ে চুক্তিতে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে নিষেধাজ্ঞা বা স্ত্রীর তালাকের অধিকার সম্পর্কে লিখা না থাকে সে ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর সুযোগ প্রসঙ্গে

কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে অসুখী হয় এবং বিয়ে চুক্তিতে লিখা না থাকায় আগে বর্ণিত ব্যবস্থাও নিতে না পারে তবুও সে স্বামীকে তালাকের উদ্যোগ নিতে পারবে। সে কাজীর কাছে গিয়ে স্বামীর বিয়েতে তার স্বার্থ, অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবার অভিযোগ তুলে তালাক চাইতে পারে।

উত্তর : ৫. যদি কাজী তালাকের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে

কাজী তালাকের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেও ইসলামী আইনমতে স্ত্রী স্বামীকে 'খোলা' তালাক দিতে পারে। এটা হচ্ছে যে কোনো অবস্থায় নি:শর্ত তালাক। স্ত্রী শুধু বলবে যে আমার পক্ষে তার ঘর করা অসম্ভব। অবশ্য খোলা তালাকে সে মোহরানা দাবী করতে পারবে না বা ফিরিয়ে দিবে।

উত্তর : ৬. স্ত্রীর খোলা তালাক স্বামী মানতে বাধ্য কিনা

স্ত্রী স্বামীকে খোলা তালাক দিলে উক্ত স্ত্রীকে বিয়ে বন্ধন থেকে অব্যাহতি দিতে স্বামী বাধ্য এবং এ বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

উত্তর : ৭. মেয়েদের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কেন

মেয়েদের বহুবিবাহ পৃথিবীতে খুবই বিরল। ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মে তো নেইই, এমনকি গোটা ইতিহাসে এমন উদাহরণ হাতে গোনা। বহুবিবাহে ছেলেদের অধিকারের বিষয়টি কুরআনে স্পষ্ট। (এতে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নই উঠে না- অনুবাদক)

মেয়েদের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হবার সম্ভাব্য কারণ :

ক) একজন পুরুষ একই সাথে অসংখ্য মহিলার গর্ভে সন্তান দিতে পারে, কিন্তু একজন মহিলা বছরে মাত্র একটি সন্তানেরই জন্ম দিতে পারে। জীবজগতের এটাই বাস্তবতা। প্রতি সন্তানেরই পিতার প্রতি আকর্ষণ বা পিতৃপরিচয় জানার অধিকার আছে। একাধিক স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে সন্তানকে পিতৃপরিচয় স্পষ্ট করে দেয়া কঠিন।

খ) সাধারণত: প্রায় সব সভ্য জাতিতেই স্বামীই পরিবার প্রধান হয়ে থাকেন। যদি কোনো মহিলার একাধিক স্বামী থাকেন তবে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হবে পরিবার প্রধানের পদ নিয়ে।

গ) নারীর মনোদৈহিক গঠন থেকে এটাই দেখা যায় যে, নারীরা সাধারণত: সেক্সকে দৈহিক বিষয়ের চেয়ে মানসিক (emotional) অনুভূতির দিকে গণ্য করে এবং এজন্য তারা সাধারণত: এককেন্দ্রিক। যে কারণে বলা যায় যে, বহুগামীতা আসলেই নারীর স্বভাব বিরুদ্ধ। নারী মূলত: একজনকেই ভালবাসে, তাকে ঘিরেই তার স্বপ্ন ও কল্পনা আবর্তিত হয়।

উত্তর : ৮. রুগ্ন বা বন্ধ্যা স্বামীর স্ত্রীর করণীয়

এ ব্যাপারে বন্ধ্যা বা রুগ্ন নারীর স্বামীর যা যা সুযোগ আছে তার সবই নারীর আছে, শুধু বহুবিবাহের সুযোগ নেই। তার সুযোগসমূহ হচ্ছে–

ক) সে ধৈর্য্যের সাথে রুগ্ন স্বামীর সেবা করেই ঘর করতে পারে।

খ) রুগ্ন স্বামীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে পারে (এ ক্ষেত্রে নারীর তালাকের পূর্ণ অধিকার আছে)।

সূত্র :

প্রশ্ন ৭ : আল কুরআন ৪:৩, ৪:১২৯

জি-৩৫ বহুবিবাহ ও ইসলাম (৫)

নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ

প্রশ্ন ১. বহুবিবাহের অসুবিধাগুলো কি?

২. বহুবিবাহের ক্ষতিকর ও কল্যাণকর দিকগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩. মুসলিম বিশ্বে বহুবিবাহের প্রচলন কেমন?

৪. বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৫. বহুবিবাহের সুযোগের অপব্যবহার রোধে এর চর্চার ওপর আরো বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় কি?

৬. অমুসলিম সমাজে কি বহুবিবাহ প্রয়োজনীয় এবং চালু হতে পারে?

৭. এমন কোনো পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ আছেন কি যারা বহুবিবাহ প্রথা সমর্থন করেন?

উত্তর : ১. বহুবিবাহের অসুবিধাগুলো

ক) হিংসা-বিদ্বেষ : কোনো মেয়েই তার স্বামীর ভালবাসা, আকর্ষণ ও সম্পদে আর একজনের ভাগ বসানো সহজে মেনে নিতে পারে না। ফলে হিংসা বিদ্বেষের জন্ম হতে পারে।

খ) অসমতা : ইসলাম কঠোরভাবে স্ত্রীদের মধ্যে 'সমব্যবহার' করার কথা বলেছে। এই সমতা রক্ষা করতে আর্থিক এবং অন্যান্য দিকে পুরুষ ভীষণ বেকায়দায় পড়ে এবং অনেকেই শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করতে পারে না।

গ) অশান্তি : একই বাড়ীতে একাধিক স্ত্রীর উপস্থিতি স্ত্রীদের মাঝে এবং স্বামী-স্ত্রীতে নিত্য নানান ঝগড়ার জন্ম দেয়। এসব ঝগড়াঝাটি বিভিন্ন স্ত্রীর সন্তানদেরকেও আক্রান্ত করে।

কিছু সমস্যা সমাধানে ইসলাম সীমিত আকারে বহুবিবাহকে অনুমতি দেয়। এতে সন্দেহ নেই আর সব সুযোগের মতো এরও অপব্যবহার হতে পারে। এসব অসুবিধে সত্ত্বেও কিছু বাস্তব সমস্যার সমাধান বহুবিবাহে পাওয়া যায়।

উত্তর : ২. বহুবিবাহের ক্ষতিকর ও কল্যাণকর দিকগুলোর তুলনামূলক আলোচনা

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ সমাজগুলোতে এ সুযোগ না থাকায় যেসব অপরাধ ও সমস্যা হচ্ছে ইসলামী সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকায় তার চাইতে অনেক কম সমস্যা হচ্ছে। এর আগে বহুবিবাহের যেসব কারণগুলো আলোচনা করা হল তাতে দেখা যায় বহুবিবাহের

যে সব বিকল্প আছে তার সবই মানুষকে হয় চরম কষ্ট নয়তো পাপের পথে ঠেলে দেয়। সেসব সমাজে ক্রমান্বয়ে নৈতিকতার অবাধ লঙ্ঘন শেষ পর্যন্ত পরিবার নামক ইনস্টিটিউটকেই বিপর্যস্ত ও বিলুপ্ত করে। মুসলমানরা একবিবাহের নামে এক স্ত্রী ঘরে রেখে আর অসংখ্য অবৈধ সম্পর্ক গড়ার চেয়ে বৈধভাবে স্ত্রীর স্বীকৃতি, অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে আর একজনকে ঘরে আনাই শ্রেয় মনে করে। কোনো ধার্মিক মুসলিম মহিলাও স্বামীর পাপে জড়িত হবার চেয়ে দ্বিতীয় বিয়েকেই কম অপছন্দ করবে।

ইসলাম বহুবিবাহকে সবার জন্য সাধারণ বিষয় বলে ঘোষণা দেয়নি বরং কিছু সমস্যার নিরসনে একসাথে বাস্তবতা, নৈতিকতা ও মানবিকতার সমন্বয়ে সমাধান হিসেবে দেখিয়েছে।

উত্তর : ৩. মুসলিম বিশ্বে বহুবিবাহের বর্তমান অবস্থা

পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রচারণায় মনে হয় মুসলিম সমাজ মানেই বহুবিবাহযুক্ত সমাজ, মুসলিম পরিবার মানেই চার স্ত্রীর সমাহার। এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা একভাগেরও কম বহুবিবাহের সুযোগ নিচ্ছে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, এই সুযোগের এমন কোনো যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে না যার জন্য এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে।

উত্তর : ৪. বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা

দু'একজন মুসলিম বিশেষজ্ঞ বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার কথা বলেছেন। তাদের এই প্রস্তাবনা দেখে মনে হয় পাশ্চাত্যের বহুবিবাহ ও ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণায় তারা অস্থির হয়ে আল্লাহর দেয়া আইন সম্পর্কে এই আপোষকামী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। যে সব বাস্তব কারণে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়, তা হচ্ছে :

ক) ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো মানুষ সরাসরি আল্লাহর দেয়া আইনকে বাতিল বা স্থগিত করতে পারে না। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ মানুষের গোটা জীবনের সব কিছু বিবেচনা করেই মানুষের জন্য এই সুযোগ উন্মুক্ত রেখেছেন। পাশ্চাত্যের প্রচারণায় লজ্জিত হয়ে এটা থেকে মুখ ফেরানো উচিত হবে না। আল্লাহ জানেন যে, তালাক বা ব্যভিচারের চেয়ে এটা উত্তম।

খ) দুনিয়ার এক শতাংশেরও কম মুসলমানের মধ্যে বহুবিবাহ দেখা যায়। কাজেই এটা এমন কোনো বিপদজনক সমস্যা নয় যার মোকাবেলায় এত কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

গ) বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হবে এক নেতিবাচক সিদ্ধান্ত। কারণ যেসব সমস্যার কারণে এই প্রথা চালু এটা নিষিদ্ধ হলে সেসব সমাধানে কোনো বৈধ বা মানবিক পন্থা অবশিষ্ট থাকবে না। এভাবে নিষিদ্ধ করলে যেসব মানুষ এ

ব্যবস্থায় সংযত থাকত তারা আর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে না। আর সমাজের এক অংশের পাপ ও ব্যভিচার ক্রমে গোটা সমাজকেই গ্রাস করবে।

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় মাত্র একটি 'মুসলিম' দেশে বহুবিবাহ নিষেধ করা হয়েছে। এদেশের শাসক পাশ্চাত্যের এমন ধামাধরা যে সেখান থেকে যে বিধানই আসে তাই অবিকল অনুকরণ করে। এই নিষেধাজ্ঞার পরিণতি হয়েছে এই যে, কেউ বৈধভাবে দ্বিতীয় বিয়ে করলে তার জেল হয় আর একই আদালতে কেউ ঘরে স্ত্রী রেখে হাজারো মহিলার সাথে ব্যভিচার করলেও বেকসুর খালাস পায়।

উত্তর : ৫. বহুবিবাহের সুযোগের উপর বিধি নিষেধ আরোপ প্রসঙ্গে

মানুষের স্বভাবের প্রতি এক দয়া হিসেবে ইসলাম বহুবিবাহের সুযোগ দিয়েছে। আর সব সুযোগের মতো বিবেকবর্জিত মানুষদের দ্বারা এর অপব্যবহার হতে পারে। এই সুযোগের অপব্যবহার রোধে ইসলামের সীমার মধ্যে আইনকে আরো কঠোর করতে ইসলামে কোনো বাধা নেই। বস্তুত ইসলামই বহুবিবাহ প্রথার উপর কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করেছিল। যা হচ্ছে একাধিক স্ত্রীর ভরণপোষণের আর্থিক সামর্থ্য এবং সকল স্ত্রীর প্রতি সমব্যবহার। ইসলামের সীমার মধ্যে বহুবিবাহের অপব্যবহার রোধে আরও কঠোর শর্ত আরোপে কোনো নিষেধ নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন মানুষকে কোনভাবে ব্যভিচারে উৎসাহী না করে। অনেক বিশেষজ্ঞ ও আইনবিদ এর অপব্যবহার রোধে উদ্যোগী হয়েছেন। কেউ কেউ এমন সংশোধনী এনেছে যা দ্বিতীয় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ব্যক্তির কাছ থেকে ছিনিয়ে বিচারকের কাছে দিয়েছে। তবে অন্য বিশেষজ্ঞরা (যেমন, শায়খ মুহাম্মদ আবু জাহরা) এই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ব্যক্তির বিবেচনায় রাখারই পক্ষপাতী।

উত্তর : ৬. অমুসলিম সমাজে বহুবিবাহ চালু প্রসঙ্গে

যদিও অমুসলিমরা ইসলামে বহুবিবাহ প্রথার তুখোড় সমালোচক তবুও এই প্রথা তাদের সমাজের বহু নোংরামী, পাশবিকতা ও বিবাহ বিচ্ছেদকে কমাতে পারে। যেহেতু সব মানুষই একই প্রকৃতির একই প্রবৃত্তির এবং ইসলামের আইনও সবার জন্যেই সেহেতু এটা নৈতিকতা সংক্রান্ত সমস্যার বিশ্বজনীন সমাধান হতে পারে।

উত্তর : ৭. বহুবিবাহের পক্ষের পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ

অনেক বিশিষ্ট পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী বহুবিবাহের পক্ষে বলেছেন। Annie Bessant বলেছেন, পাশ্চাত্যে বাহ্যিকভাবে এক বিবাহ চালু থাকলেও নেপথ্যে আছে দায়িত্বহীন বহুবিবাহের চর্চা (বহুগামীতা)। প্রফেসর Von Ernfeldt) প্রফেসর Havelog Ellis এবং R. landorff প্রমুখ বলেছেন বহুবিবাহকে অবশ্যই বৈধ ও স্বাভাবিক হিসেবে নিতে হবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ২ : যেখানে স্বামীর একাধিক বিয়ের কোনো সুযোগ নেই অথচ আরও এক বিয়ে প্রয়োজন তখন সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হতভাগা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়।

প্রশ্ন ৫ : উনবিংশ শতকের শুরুতে প্রখ্যাত আলেম শেখ মোহাম্মদ আবদুহ ও তাঁর ছাত্র রশীদ রিযা বহুবিবাহের অপব্যবহারের সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন।

শেখ মোহাম্মদ আবু জাহেরের চিন্তার প্রতিফলন হচ্ছে এরূপ: ১৯৫৩ সালে সিরিয়ায় আইন করা হয় যে, বিচারক ইচ্ছে করলে কোনো ব্যক্তিকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি নাও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি ঐ ব্যক্তি আদালতের আদেশ অমান্য করে দ্বিতীয় বিয়ে করে তবে বিয়ে বৈধ থাকবে কিন্তু উক্ত ব্যক্তির আর্থিক জরিমানা হবে। এভাবে দ্বিতীয় বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির হাতেই থাকে।

জি-৩৬ দাম্পত্য সম্পর্ক (১)
স্ত্রীর অধিকার

প্রশ্ন ১. বিয়ের মাধ্যমে মানুষ কি কি অধিকার ও দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়?

২. ইসলামে বিয়ের ধর্মীয় ভিত্তি কি?

৩. ইসলামে স্ত্রীর অধিকার কি কি?

৪. ভরণপোষণ বলতে কি বুঝায় এবং এর কুরআন ও হাদীসের ভিত্তি কি?

৫. ভরণপোষণের আইনে স্ত্রীর জন্য স্বামীকে কি কি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে?

৬. ভরণপোষণের মধ্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবাও কি আসে?

৭. যদি স্বামী চাকুরীচ্যুতি বা ব্যবসায় লোকসানের কারণে স্ত্রীকে আগের মানে ভরণপোষণ না করতে পারে তবে কি হবে?

৮. কোনো স্বামী কৃপণ হলে তার স্ত্রী কি তার অজ্ঞাতে তার সম্পদ থেকে কিছু নিতে পারবে?

৯. কোন কোন পরিস্থিতিতে স্ত্রী স্বামীর ভরণপোষণের অধিকার হারায়?

উত্তর : ১. বিয়ে থেকে উদ্ভূত অধিকার ও দায়িত্ব

বিয়ের ফলশ্রুতিতে–

ক) বিয়ের পর স্ত্রীর মোহরানা পাওনা হয়।

খ) বিয়ের কাবিননামায় উল্লিখিত যে কোনো শর্ত স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে মেনে চলতে বাধ্য।

গ) বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে যায়।

ঘ) স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ ভরণপোষণ পাওনা হয়।

ঙ) স্বামী-স্ত্রীর থেকে জন্মপ্রাপ্ত সকল সন্তান বৈধ সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়।

চ) বিয়ের পর স্ত্রীর মা এবং একই ধরনের আত্মীয়রা স্বামীর জন্য মাহরিম হয়ে যায়।

এসব বিষয় ছাড়াও যা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে বিয়ের পরও স্ত্রীর পৃথক ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বহাল থাকে। তার নাম পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন হয় না। সে যদি ইহুদি বা খ্রিস্টান হয় তবে তার ধর্ম পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়না। সে যদি

স্বামীর মাযহাব থেকে ভিন্ন মাযহাবের হয় তাহলে তার মাযহাব পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন হয় না। তার পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা থাকে। সে যে কোনো আর্থিক চুক্তি বা অন্য যে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতে এবং সম্পদের অধিকারী হতে পারে।

উত্তর : ২. ইসলামে বিয়ের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি

বিয়ের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর উপর যেসব দায়িত্ব এসে পড়ে ইসলামে তার শুধু আইনগত ভিত্তিই নয় বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিও আছে। এসব আইন আল্লাহর প্রতি ঈমান থেকেই উৎসারিত। এই নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস বলে :

ক) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহর দাসত্বের কথা সর্বাগ্রে মনে রাখবে। পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনই তাদের মূল দায়িত্ব। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্যই নারী পুরুষ একে অপরকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। বিয়ে বন্ধন বিশেষভাবে দু'জন মানুষকে এই সহযোগিতার সুযোগ এনে দেয়। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে চলতে সাহায্য ও সমর্থন করবে। কুরআন নির্দিষ্ট ভাবেই বলেছে যে, মোমেন মোমেনা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ও সাহায্যকারী।

খ) কুরআনে বিয়েকে এক পবিত্র বন্ধন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই কেউই যেন এই বন্ধনকে হালকা ভাবে না দেখে।

গ) কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিয়েকে আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে এটা এমন এক বন্ধন যা ভালবাসা, সহানুভূতি আর সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। যেমন সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের জন্য পোশাক'। এখানে এক সুন্দর উপমার মাধ্যমে বিবাহিত জীবনের মহত্ব বর্ণিত হয়েছে। পোশাক যেমন মানুষকে সুন্দর করে তেমনি বিয়ে মানুষের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়ে তাকে সুন্দর করে। বিয়ে মানুষকে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দেয় যেমন পোশাক মানুষকে শীত থেকে গরম করে প্রশান্তি দেয়। পরনের পোশাক যেমন মানুষের সবচে কাছের তেমনি পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সবচেয়ে কাছের। বিয়ে মানুষকে অবৈধ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে যেমন পোশাক আশপাশের ধুলো-ময়লা থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে। পোশাক যেমন শরীরের যে কোনো দাগকে আড়াল করে রাখে তেমনি বিয়ে স্বামী স্ত্রীর দোষ ত্রুটিকে আড়াল করে রাখে।

রাসূল (সা:) কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ কি, তখন তার উত্তরে তিনি বললেন, "পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ এমন জিহ্বা

যা আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে, এমন হৃদয় যা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে এবং বিশ্বাসী ধার্মিক স্ত্রী যে তার স্বামীকে ঈমান রক্ষা করতে সাহায্য করে"।

উত্তর : ৩. স্ত্রীর অধিকার

আইনবিদরা স্ত্রীর অধিকারকে দু'ভাগে ভাগ করেছে–

ক) আর্থিক অধিকার- ভরণপোষণ ও অন্যান্য;

খ) ব্যবহারিক অধিকার- স্বামীর কাছ থেকে সুব্যবহার ও সহানুভূতি।

উত্তর : ৪. কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে ভরণপোষণ

এটা ইসলামের মূলনীতি যে, স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক তার পূর্ণ ভরণপোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর। কুরআন ও হাদীসে এই মূলনীতিই ঘোষিত হয়েছে। স্ত্রী ও সন্তানের পূর্ণ ভরণপোষণ স্বামীর জন্য কোনো দয়া দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়; এটা তার দায়িত্ব। ইসলামী আইন মতে সংসারে স্বামী-স্ত্রী সকল বিষয়ে পরস্পরকে সহায়তা করবে কিন্তু আর্থিক দায়িত্বটা পুরুষের একারই, তবে স্ত্রী চাইলে সে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে পারে।

উত্তর : ৫. ভরণপোষণের আওতায় যে সব বিষয় আসে :

ক) **আবাস :** স্বামী তার সামর্থ্যের মধ্যে স্ত্রীর জন্য উপযুক্ত আবাসের ব্যবস্থা করবে। এমন বাসস্থানের ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, সেটা স্ত্রীর জন্য নিরাপদ, আরামদায়ক হবে এবং তাতে তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকবে। স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের অনুমতি ছাড়া তার কোনো আত্মীয়কে বাড়িতে রাখতে পারবে না। স্বামী এমন কোনো আত্মীয়কে রাখতে পারবে না যে তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয়।

খ) **খাদ্য :** স্বামী সমাজে প্রচলিত মানের খাবার স্ত্রীর জন্য নিশ্চিত করবে।

গ) **পোশাক :** এ ব্যাপারে ন্যায়সংগত পোশাকের বর্ণনা সূত্রে উল্লিখিত আছে।

ঘ) **সাহায্যকারী :** এ ব্যাপারে অনেক আইনবিদ একমত যে, সংসারের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য স্বামী কোনো লোক রাখবে; বিশেষত: স্ত্রী যদি এ কাজে অনভ্যাসবশত: অথবা অসুস্থতার জন্য অপারগ হয়।

উত্তর : ৬. স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা

স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসাও ভরণপোষণের মধ্যে পড়ে। কারণ এটাকে বাদ দিয়ে ভরণপোষণ পূর্ণ হয় না। কুরআন বা হাদীসে এমন কোনো উদ্ধৃতি নেই যাতে মনে হয় এ দু'টো ভরণপোষণের মাঝে পড়ে না।

উত্তর : ৭. স্বামী ভরণপোষণে অক্ষম হলে স্ত্রীর করণীয়

এমন অবস্থায় স্ত্রী দু'টো কাজের যে কোনো একটি করতে পারে : হয় সে স্বামীর সাথে

থেকে তার দারিদ্র্যকে ভাগ করে নেবে; না হয় সে তালাক চাইবে। এর বাইরে হানাফী আইনবিদরা বলেন যে, এসময় স্ত্রী তার অভিভাবক বা নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে সাময়িকভাবে তার ভরণপোষণ নিতে পারে। অথবা সে তাদের কাছ থেকে টাকা ধার এনে স্বামীকে সাহায্য করতে পারে। এই ধার পরে স্বামীকে শোধ করতে হবে।

জাহিরি মতবাদের আইনবিদরা বলেন, এমন অবস্থায় স্ত্রী তার সম্পদ থেকে স্বামীকে সাহায্য করবে, কারণ তালাকের চেয়ে এটা উত্তম। তারা আরও বলেন যে, এ ক্ষেত্রে স্বামীর ঐ সাহায্য ফেরৎ দেবার প্রয়োজন নেই।

যদি স্বামী বিয়ের সময় তার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা করে বাড়িয়ে বলে এবং স্ত্রীর চাহিদা সম্পর্কে উদাসীন থাকে তবে স্ত্রী তালাক চাইতে পারে।

উত্তর : ৮. কোনো স্ত্রীর স্বামী কৃপণ হলে

রাসূল (সা:)-এর কাছে একবার আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা এসে অভিযোগ করল যে, তার স্বামী পরিবার চালাতে পর্যাপ্ত অর্থ দেয় না। এ অবস্থায় সে 'আবু সুফিয়ানের তহবিল থেকে গোপনে টাকা খরচ করে, তখন রাসূল (সা:) হিন্দাকে এভাবে টাকা সরাবার অনুমতি দিয়ে বলেন যে, সে যেন তার বৈধ প্রয়োজনের বেশী না নেয়। রাসূলের এই অনুমোদন ইসলামের এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কেউ তার বৈধ পাওনা আদায়ে নিজ হাতে ব্যবস্থা নিতে পারে। এছাড়া কারো কৃপণ স্বামীকে পথে না আনা গেলে স্ত্রী আদালতে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আদালত স্ত্রীর ভরণপোষণের পরিমাণ সাব্যস্ত করে দেবে।

উত্তর : ৯. যে সব অবস্থায় স্ত্রী ভরণপোষণের অধিকার হারায়

এ ব্যাপারে আইনবিদরা একমত যে, যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য বা বিদ্রোহী হয় তবে সে ভরণপোষণের অধিকার হারাবে; বিশেষভাবে যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া গৃহত্যাগ করে অন্যত্র থাকে, অথবা তার অজ্ঞাতে কোথাও বেড়িয়ে এসে তার খরচ বহন করতে বলে।

এমন সব প্রেক্ষিত ছাড়া আর সব অবস্থাতেই স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে স্বামী বাধ্য।

সূত্র :

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ৯:৭১, ৪:২১, ১৬:৭২, ৭:১৮৯, ৩০:২১, ২:১৮৭
রাসূল (সা:) বলেন, "জীবনে কিছু সুখ আছে, তবে সবচে বড় সুখ হল ভাল এবং ধার্মিক স্ত্রী"।

প্রশ্ন ৪ : আল কুরআন ৪:৩৪

প্রশ্ন ৫ : আল কুরআন ৬৫:৬
ইসলামী আইন স্ত্রীকে ন্যায়সঙ্গত ভরণপোষণ দিতে বলে। কেউ যদি ধনী হয় তবে তার স্ত্রীকে রেশমী পোশাক দেয়া তার দায়িত্ব আর গরীব হলে সূতী বস্ত্র দিলেও তার দায়িত্ব পূর্ণ হয়।

জি-৩৭ দাম্পত্য সম্পর্ক (২)
স্ত্রীর অধিকার

প্রশ্ন ১. আর্থিক অধিকারের বাইরে স্ত্রীর আর কি কি অধিকার আছে?

২. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খুব ভাল না হলেও স্ত্রীর এসব অধিকার বহাল থাকে কি?

৩. হিংসা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৪. মুসলিম স্ত্রীর অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে বলুন?

৫. উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তরের আলোকে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন?

উত্তর : ১. আর্থিক অধিকার ছাড়া স্ত্রীর অন্যান্য অধিকার

ইসলামে আর্থিক অধিকারের চেয়েও ব্যবহারিক ও অন্যান্য অধিকার বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যে কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে সকল আর্থিক সুবিধা দিয়ে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে চলবে না। স্ত্রীকে সম্পত্তির মত বিবেচনা করা যাবে না, তার মানবিক দিক দেখতে হবে। ইসলামী মতে বিয়ে শুধু খাদ্য পানীয়ের পার্টনারশীপ নয়, এটা এমন এক পার্টনারশীপ যাতে অনুভূতি, আবেগ, সুখ, দু:খ, ভালবাসা- সব ভাগ করে নিতে হয়। কুরআন এবং হাদীসে এর পক্ষেই প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল (সা:) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বড় ঈমানদার যার চরিত্র ব্যবহার ভাল এবং তোমাদের মাঝে সেই শ্রেষ্ঠ যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম"। তাঁর নিজের জীবনে স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে তাদের সকল অধিকার নিশ্চিত করে রাসূল (সা:) বিশ্বজনীন অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর জীবনের সব সুখ তাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন। সব সময় তাদের প্রতি কোমল ছিলেন, কখনও তাদের আঘাত দিয়ে কিছু বলেননি। "যখন তুমি খাবে তখন তাদেরও একই খাবার খাওয়াবে, তুমি যেমন পোশাক পড়বে তেমন পোশাক দেবে, তাদের কখনও অপমান করবে না, তাদের অপবাদ দেবে না এবং তাদের কাছ থেকে দূরে যাবে না...।"

উত্তর : ২. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্ক না থাকলে স্ত্রী অধিকার প্রসঙ্গ

স্ত্রীর পাওনা ব্যবহারিক অধিকার বলতে ইসলাম এক মানদণ্ড দেয় যা অর্জন করার জন্য প্রত্যেক মুসলমান সর্বোচ্চ সাধ্য প্রয়োগ করবে। যদি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপও হয় তবু স্ত্রীর এসব পাওনা নিশ্চিত করতে স্বামীর চেষ্টা করা উচিৎ, কারণ :

ক) এটা ইসলামের এক মৌলিক শিক্ষা যে ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগার অনুভূতির উর্ধে সকল মানুষের মধ্যে ন্যায়নীতি ও সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এই আইন আরও জোরালো ভাবে কার্যকর।

খ) কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। কাজেই কোনো স্বামীরই স্ত্রীর ভুলত্রুটির ব্যাপারে বেশী খুঁতখুঁতে না হয়ে নিজের ভুলের দিকে দেখা উচিৎ।

গ) রাসূল (সা:) বলেন, "কোনো মুমীন যেন তার স্ত্রীকে ঘৃণা না করে, যদি তার কোনো কাজ তার (স্বামীর) অপছন্দ হয় তখন সে যেন তার (স্ত্রীর) ভাল কাজের কথা মনে করে"। ইসলাম এ শিক্ষাও দেয় যে, মুসলিম নারী-পুরুষ যেন তাদের ভবিষ্যৎ স্বামী বা স্ত্রীকে 'স্বপ্নের মানুষ' হিসেবে ভুলের উর্ধ্বে মনে না করে: জীবন সাথী সম্পর্কে অতি বড় আশা করে থাকলে স্বামী বা স্ত্রী কেউই তার সাথীর গ্রহণযোগ্য ভুলত্রুটিকেও ক্ষমা করবে না; এটা সঠিক নয়।

ঘ) যদিও সিনেমা, নাটক ও উপন্যাসে বিয়েকে বেশী রোমান্টিক ও খুব সহজ বলে মনে হয়, বাস্তবে সুখের সংসার করতে হলে রোমান্সের চেয়ে পরস্পরকে সদয় ভাবে বুঝা ও মানিয়ে চলার অভ্যাস বেশী জরুরী।

উত্তর : ৩. সন্দেহ প্রবণতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

সন্দেহপ্রবণতার মানে যদি এই হয় যে, স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ তার জীবনসাথীকে কারো সাথে অসৎ সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত রাখে তবে সেই অর্থে এটা ভাল। আর যদি এর মানে এই হয় যে, একে অপরের প্রতি বেশী অধিকারবোধ খাটাচ্ছে তবে তা বর্জনীয়। প্রথম ধরনের সতর্কতার ব্যাপারে রাসূল (সা:) বলেন যে, তিন ধরনের লোক বেহেশতে যাবে না তার মধ্যে একজন হচ্ছে যে তার স্ত্রীর (বা স্বামীর) সাথে অপরের অবাধে মেলামেশা সম্পর্কে উদাসীন।

আবার একই সাথে রাসূল (সা:) সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ চান শালীনতার বিষয়ে সবাই তার স্ত্রী (বা স্বামীর) সম্পর্কে সচেতন থাকবে। কিন্তু তাই বলে আল্লাহ স্ত্রীর প্রতি সন্দেহপ্রবণ পুরুষকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন যারা ঘর থেকে দূরে থাকে তারা যেন স্ত্রীদের সন্দেহ না করে।

উত্তর : ৪. মুসলিম স্ত্রীর অন্যান্য অধিকার

দৈহিক মিলনের সময় স্বামীর কাছ থেকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভের অধিকারও সব মহিলার আছে। আইনবিদরা এ ব্যাপারে একমত যে, এখানেও স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব স্বামীর রয়েছে। রাসূল (সা:) এবং তাঁর সাহাবারা এ বিষয়ে কোনো কুসংস্কারে ভোগেননি। এসব বিষয়কে আলোচনা বহির্ভূত বা গোপনীয় বা লজ্জার বলে এড়িয়ে যাননি। যার একটি উদাহরণ পাওয়া যায় ওমর (রা:)-এর জীবনে। রাতে তিনি নাগরিকদের অবস্থা দেখতে বেরুতেন। এক রাতে এক বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি দেখলেন একজন মহিলা তার একাকীত্বের জন্য কাঁদছেন। তিনি তদন্ত করে জানলেন যে, মহিলার স্বামী যুদ্ধে যাবার কারণে অনেক মাস অনুপস্থিত। ওমর (রা:) তাঁর কন্যা হাফসা (রা:)-

এর কাছ থেকে জানলেন যে, একজন মহিলা সর্বোচ্চ চার মাস স্বামী সংগ ছাড়া ভাল থাকতে পারেন। অত:পর ওমর (রা:) আইন জারী করলেন যে, যুদ্ধ বা ব্যবসা যে কোনো উদ্দেশ্যেই কেউ বাড়ী থেকে চার মাসের বেশী অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।
আরেকবার একজন মহিলা ওমর (রা:)-এর কাছে নালিশ করেন যে, তাঁর স্বামী এত ধার্মিক যে, প্রতিদিন রোযা রাখেন এবং সারারাত নফল নামাজ পড়েন। এদিকে স্ত্রীকে ঘনিষ্ঠ সঙ্গ থেকে বঞ্চিত রাখেন। ওমর (রা:)-এর সাথী কাব আল আসাদ (রা:) মহিলার সমস্যা বুঝলেন। তিনি মহিলার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন সর্বোচ্চ পর পর তিনদিন এরূপ এবাদত করার জন্য এবং চতুর্থ দিনটি অবশ্যই স্ত্রীর জন্য সংরক্ষিত রাখতে।

উত্তর : ৫. এসব ঘটনার আলোকে দাম্পত্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

এসব ঘটনা এই উদাহরণই দেয় যে, দাম্পত্য মিলন সংক্রান্ত বিষয়াদি ইসলামের দৃষ্টিতে আলোচনার বাইরের কোনো বিষয় নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক মানসিক, দৈহিক সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর নেয়ামত। এই কারণেই রাসূল (সা:) বলেন যে, স্বামী স্ত্রী উভয়েই প্রতিবার মিলনের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে। কারণ তারা আল্লাহ নির্ধারিত পন্থায় আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করছে। তিনি আরও কিছু ভদ্রতা শিক্ষা দেন যা এটাকে আরও সফল ও অন্তরঙ্গ করে। তিনি বলেন, স্বামীরা কোমলতার সাথে স্ত্রীদের কাছে যাবে, আল্লাহর কাছে দোয়া করবে যে তাদের মিলনে যদি কোনো সন্তান জন্ম হয় তা যেন সে শয়তান থেকে রেহাই পায় এবং স্ত্রীর পরিতৃপ্তির দিকেও খেয়াল রাখবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ৪:১৯

রাসূল (সা:) বলেন, "আমি তোমাদের নারীদের প্রতি দয়ালু ও বিবেচক হতে আদেশ করি।" তিনি আরও বলেন, "উত্তম চরিত্রের সেই যে মেয়েদের প্রতি ভাল, আর মন্দ লোকেরাই তাদের অপমান করে।" তার নিজের জীবনে দেখা যায় তিনি কত স্বাভাবিকভাবে বিবেচনার সাথে তাঁর স্ত্রীদের সাথে ব্যবহার করতেন। একবার বিবি আয়েশাকে তাঁর বান্ধবিদের সাথে পুতুল খেলতে দেখে তিনি নিজেও তা আনন্দের সাথে উপভোগ করলেন। আরেকবার তিনি আয়েশা (রা:)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন।

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ৫:৯

রাসূল (সা:) মুসলমানদের তাদের স্ত্রীদের রাগ-বিরাগ সম্পর্কে সহনশীল হতে বলেন। শক্তি প্রয়োগে তাদের পরিবর্তনের চেষ্টা করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, "মেয়েরা পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মত, অতএব তাদের প্রতি দয়ালু ও বিবেচক হও।" (অর্থাৎ মেয়েরা এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির এবং তা অযাচিতভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করলে বাঁকা হাড়কে শক্তি প্রয়োগে যেমন ভেঙে যাবে- সেরকম ক্ষতি হতে পারে নারীর ব্যক্তিত্বে। এতে নারীদের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন- তা আমাদের অনুধাবন করা উচিত- অনুবাদক)।

জি-৩৮ দাম্পত্য সম্পর্ক (৩)

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ১. যদি কোনো স্বামী স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক না রাখে বা রাখতে অক্ষম হয় সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর কি অধিকার থাকে?

২. জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৩. কোনো সব ক্ষেত্রে ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণকে বৈধ করে?

৪. গর্ভপাতের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৫. টেস্টটিউব সন্তান এবং গর্ভভাড়া প্রদান (Surrogate Motherhood) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

ক) যদি কোনো নারীর ফেলোপিয়ান টিউবে সমস্যার কারণে জরায়ুতে ডিম্ব প্রবেশ করতে না পারে তবে সে কোনো কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে কি?

খ) স্পার্ম ব্যাংক থেকে স্পার্ম নিয়ে কোনো দম্পতি সন্তান নিতে পারে কি?

গ) Surrogate Motherhood (অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণ) ইসলাম অনুমোদন করে কি?

উত্তর : ১. যদি কোনো স্বামী স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক না রাখে বা রাখতে অক্ষম হয়

নারীর প্রবৃত্তিগত চাহিদা পূরণ তার ইসলাম স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। কোনো স্বামী স্ত্রীর এ অধিকার পূরণ না করলে ইসলাম কঠোর ভূমিকা দেয়। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবে 'ইলা' নামে এক রীতি প্রচলিত ছিল, তাতে স্ত্রীকে শাস্তি দেয়ার জন্য স্বামী তার সাথে দৈহিক মিলন না করার প্রতিজ্ঞা করত। এভাবে মাসের পর মাস এমন কি কয়েক বছর চলে যেত। স্ত্রী তালাকের অধিকারও পেত না। ইসলাম এই প্রথা রদ করে। ইসলাম বলে যে কেউ কোনো কারণে সর্বোচ্চ চারমাস স্ত্রীকে সঙ্গ বঞ্চিত রাখতে পারবে। এর বেশী সময় হলে স্ত্রী তালাক নিতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন চার মাসের পরও স্বামী স্ত্রীকে সঙ্গ না দিলে অথবা তালাকের সুযোগ না দিলে তাকে জেলসহ অন্যান্য শাস্তি দিতে হবে।

উত্তর : ২. ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণ কথাটি আজকাল বেশ চালু। মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মানুষের জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। জন্মনিয়ন্ত্রণের সব ব্যবস্থা নেবার পরও অনেকসময়

কন্ট্রাসেপ্টিভ ফেইলিউর এটারই প্রমাণ দেয়। সাধারণভাবে ইসলাম জন্মে উৎসাহই দেয়। রাসূল (সা:) বলেন যে, মুসলিমরা 'বিয়ে করবে এবং সন্তান জন্ম দেবে'। ম্যালথাস-এর মতবাদ উদ্ভুত ভীতি যে, মানুষের অত্যধিক জন্ম এক সময় পৃথিবীতে মানুষের দাঁড়াবার জায়গাও কেড়ে নেবে। এমনটি ইসলামী চিন্তাবিদগণ মনে করেন না। আল্লাহ মুমিনদের নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি সবার রিযিক (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, জীবিকা) দেবেন। এজন্যে রাষ্ট্রীয় পলিসি হিসেবে জন্মনিয়ন্ত্রণকে নেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এর সংগত ব্যবহারকে অনুমতি দেয়। রাসূল (সা:)-এর সময় প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে তিনি নিষেধ করেননি। অবশ্য রাসূল (সা:) বলেছিলেন যে কেয়ামত পর্যন্ত যাদের জন্ম হবার তা হবেই। কেউ তা প্রতিহত করতে পারবে না।

অল্পসংখ্যক, যারা ঢালাওভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বলেন তারা দু'টো যুক্তি দেন- ক) তারা একে দায়িত্বজ্ঞানহীন, অযৌক্তিক কাজ মনে করেন এবং খ. তারা একে শিশু হত্যার মতই মনে করেন। তাদের প্রথম যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় এজন্যে যে অনেক পরিস্থিতিতে অনেক দম্পতির জন্য এটা আবশ্যক হতে পারে। কাজেই এর সুযোগ বন্ধ করা ঠিক না। দ্বিতীয় যুক্তি এজন্যে গ্রহণযোগ্য নয় যে জন্মনিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য, ডিম্ব নিষিক্তকরণ (Conception) বন্ধ করা। কাজেই এখানে 'হত্যার' প্রশ্ন আসে না। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব পদ্ধতি নিষিক্ত ডিম্ব (জাইগোট)-এর অপসারণ ঘটায় তার সবই হারাম (যেমন এম, আর)। যেসব পদ্ধতি ডিম্ব উৎপন্ন হতে দেয় না (যেমন- পিল), অথবা ডিম্বানু ও শুক্রানুর মিলন হতে দেয় না (যেমন- কনডম), ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

উত্তর : ৩. যে সব ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ সঙ্গত

ক) মায়ের জীবন রক্ষার্থে- যদি গর্ভধারণে মহিলার মৃত্যুর শংকা থাকে তবে তার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ অনুমোদিত।

খ) যদি সম্ভাব্য শিশুর বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী হিসেবে জন্মের নিশ্চিত আশঙ্কা থাকে।

গ) রাসূল (সা:)-এর ভাষ্যমতে কোনো স্তনদানরত মহিলার বাচ্চার দুধপানের বয়স শেষ না করে সন্তান ধারণ না করাই শ্রেয়। এবং ইসলামে এ সময়কে দুই বছর বলে মতো রয়েছে।

ঘ) দারিদ্র্য এবং অনটন। যদিও আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি সবার রিযিক দেবেন। এই ছাড় শুধু তাদের জন্য যাদের ইতোমধ্যে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের ভরনপোষণই দু:সাধ্য হচ্ছে।

ঙ) আরও কিছু ব্যক্তিগত কারণ- যেমন স্ত্রী মা হবার পূর্বে লেখাপড়া শেষ করতে চাইছে বা এমন কিছু।
সর্বোপরি এটা প্রত্যেকের বিবেকের সাথে সমঝোতার বিষয়। আর এটা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যৌথ সিদ্ধান্ত হতে হবে।

উত্তর : ৪. গর্ভপাত প্রসঙ্গে ইসলাম

গর্ভপাত ইসলামে হারাম; তবে শুধু যেখানে মায়ের জীবন বিপন্ন হবার শংকা থাকে সেখানে এই আইন শিথিলযোগ্য। বর্তমানের কয়েকজন আইনবিদ আরও বলেন যদি আসন্ন সন্তান বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী হবার আশংকা থাকে তাহলেও গর্ভপাত অনুমোদিত যদিও এটা বেশিরভাগের মত নয়। এমন কিছু করতে হলে তা অবশ্যই ১২০ দিন পুরো হবার আগে করতে হবে। কারণ ১২০ দিনের পর গর্ভপাত স্পষ্টভাবে হারাম। সব ক্ষেত্রেই গর্ভপাত ঘৃণ্য বিষয়। কারণ জীবনের শুরু ডিম্ব নিষিক্তকরণ থেকেই। (যদিও বলা হয় যে ১২০ দিন পর রূহ সঞ্চার হয়।)

উত্তর : ৫. টেস্ট টিউব সন্তান ও অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণ

তিন ধরনের সমস্যায় টেস্ট টিউব সন্তান ও অন্যের গর্ভে সন্তান নেয়া হয়। সমস্যা তিনটি এবং তা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা যাক।

ক) স্বামী স্ত্রী উভয়েই শুক্র ও ডিম্ব উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু কোনো কারণে স্বাভাবিক নিয়মে তা নিষিক্ত হচ্ছে না। এ অবস্থায় উভয়ের জনন কোষ সংগ্রহ করে টেস্ট টিউবে নিষিক্ত করে তা আবার স্ত্রীর গর্ভে স্থাপন করা হয়।

খ) স্বামীর বন্ধ্যাত্বের কারণে স্পার্ম ব্যাংক থেকে অন্যের শুক্র নিয়ে স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার করা হয়।

গ) স্ত্রীর জরায়ু সন্তান ধারণে (Implantation) অক্ষম হলে স্বামী-স্ত্রীর নিষিক্তকৃত ডিম্ব অন্য কোনো মহিলার জরায়ুতে স্থাপন করে বাচ্চা জন্ম পর্যন্ত বড় করা হয়।

সমস্যা-ক) এক্ষেত্রে আইনবিদরা বলেন যেহেতু স্বামী এবং স্ত্রীর জনন কোষের মিলনে সন্তান জন্ম হচ্ছে সেহেতু এটা ইসলাম সম্মত।

সমস্যা-খ) অধিকাংশ আইনবিদ এটাকে অনৈসলামী বলেন। কারণ প্রথমত: এটা প্রায় ব্যভিচারের কাছাকাছি; এবং দ্বিতীয়ত: সন্তানের পিতৃত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন।

সমস্যা-গ) এটা খুব বিতর্কিত বিষয়। আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী এটাকে অনৈসলামিক বলেছেন নিম্নলিখিত কারণে–

i) এটা মাতৃত্বের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও অর্থকে নষ্ট করে। মায়ের গর্ভে সন্তানের বড় হওয়া, তার পুষ্টি থেকে পুষ্টি নেয়া, তীব্র কষ্ট নিয়ে সন্তান জন্ম দেয়া- এসবই মাতৃত্বকে মর্যাদা দেয়। আর এটাই এখানে উপেক্ষিত।

ii) আইনত: ইসলামে সন্তানের মা সে যে জন্ম দেয় ও স্তন্য দেয়।

iii) এটা বাচ্চা গর্ভে নেয়াকে ব্যবসায় পরিণত করবে।

iv) যদি গর্ভদানকারী মহিলা বাচ্চার মাতৃত্ব দাবি করে তবে তীব্র আইনগত এবং মানবিক সমস্যা দেখা দিবে। তার কাছ থেকে সন্তানকে দূরে নেয়া অমানবিক হবে।

(সম্প্রতি বৃটিশ কোর্ট এমন মামলার রায়ে সন্তান গর্ভধারণকারিণীকে সন্তানের মা বলে রায় দিয়েছেন- অনুবাদক)।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ২:২২৬

প্রশ্ন ২ : সহীহ্ হাদীসে দেখা যায় যে, সাহাবারা রাসূলের কাছে আযলের (একটি বিশেষ ধরনের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি) অনুমতি চান। তিনি তাদের নিষেধ করেননি তবে বলেন যে, "আল্লাহ্ যাকে জন্ম দিতে চান তার জন্ম হবেই।"

প্রশ্ন ৩ : আল গাযালী বলেন, সব গর্ভপাতই অন্যায়। যখন একটি ভ্রূণ মাংসপিন্ডের মতো তখনও, তারচেয়েও বড় অন্যান্য যখন ১২০ দিনের। আর জন্মের সময় শিশু হত্যা তো মহাপাপ।

প্রশ্ন ৪ : 'Contemporary Versicts; আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী।

জি-৩৯ দাম্পত্য সম্পর্ক (৪)

স্বামীর অধিকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ১. এমন কোনো অবস্থা আছে কি যে অবস্থায় Surrogate Motherhood গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে?

২. যদি পছন্দমত ছেলে বা মেয়ে সন্তান নেয়া যায় সে ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো বিধি নিষেধ থাকবে কি?

৩. ইসলামী আইনে স্বামীর অধিকার কি কি?

৪. কিসের ভিত্তিতে স্বামীকে স্ত্রীর সম্মান করা উচিৎ?

৫. চতুর্থ সূরার ৩৪ নং আয়াতের অনুবাদে 'কাওয়ামুন' শব্দের অর্থ কি 'উত্তম' বা 'শ্রেষ্ঠ' করা যায়'?

উত্তর : ১. জরায়ু ভাড়া প্রদান বা অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণ (Surrogate Motherhood)

যারা মনে করেন যে, কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণের অনুমোদন ইসলামে রয়েছে তারা ইউসুফ আল কারযাভীর একটি উদ্ধৃতি দেন। তারা বলেন Contemporary Verdicts গ্রন্থে আল্লামা ইউসূফ অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণের কতগুলো পূর্বশর্ত দিয়েছেন। তারা ভুলে যান যে, যদি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এটা চালু হয়ে যায় তবে তার ক্ষতিকর দিক কমাতে তিনি এসব পূর্বশর্ত দিয়েছেন। এসব পূর্বশর্ত নিম্নরূপ :

ক) অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণকারী মহিলা বিবাহিতা হতে হবে। অন্যথায় তার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে (তার বিয়ের সম্ভাবনা নষ্ট হতে পারে– অনুবাদক)

খ) অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণের ব্যাপারে তার স্বামীর অনুমোদন লাগবে, কারণ এতে তাদের পারিবারিক জীবন ব্যাহত হতে পারে।

গ) বন্ধ্যা দম্পতির ভ্রূণ গর্ভ স্থাপনের পূর্বে তাকে তিন মাস নিজের স্বামীর সঙ্গ বর্জন করতে হবে, যাতে গর্ভের সন্তানের পিতৃত্বের ব্যাপারে নি:সন্দেহ থাকা যায়।

ঘ) পুরো গর্ভকালীন সময় ভ্রূণ-এর পিতা গর্ভধারণকারী মহিলার পুরো ভরণপোষণ করবে।

৬) এমন কারো গর্ভে সন্তান রাখা যাবে না যারা ভ্রূণ-এর পিতার মাহরিম আত্মীয়া। আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী মুসলমানদের এ ধরনের চর্চায় জড়িত না হতে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন এটা ইসলাম সম্মত নয় এবং পরিত্যাজ্য।

উত্তর : ২. ইচ্ছেমত ছেলে বা মেয়ে সন্তান নেয়া

বিজ্ঞানীরা পশুর উপর পরীক্ষা চালাচ্ছেন নির্দিষ্ট লিঙ্গের ভ্রূণ তৈরির জন্য। এখনও মানুষের উপর এর পরীক্ষা হয়নি। তত্ত্বগতভাবে এটা সম্ভব যে, বিজ্ঞানীরা X বা Y ক্রোমজোমবাহী বা স্পার্মকে চিহ্নিত করে সেটিকে দিয়েই ডিম্বানু নিষিক্ত করে ছেলে সন্তানের বা মেয়ে সন্তানের জন্ম দেয়া। এক্ষেত্রে মুসলমানদের জবাব হবে যে, এভাবে ভ্রূণ-এর লিঙ্গ নির্দিষ্টকরণের চেষ্টায় 'আল্লাহর একক সৃষ্টি ক্ষমতার' কোনো হ্রাস পাচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা কোনো কিছু সৃষ্টি করছেন না। কুরআন তো বলেই দিয়েছে যে, কেউ এককভাবে কোনো মশা, মাছিও তৈরি করতে পারবে না। কুরআন আরও বলেছে যে, আল্লাহ কাউকে শুধু কন্যা দান করেন, কাউকে শুধু পুত্র আবার কাউকে পুত্র কন্যা দু'টোই অথবা কাউকে নি:সন্তান রাখেন।

কাজেই বিজ্ঞানীদের এসব কাজে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কোনো ক্ষয় হচ্ছে না। এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। অনেকে বলেন গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা করা যাবে না। তারা ঐ আয়াতের উদ্ধৃতি দেন যেখানে বলা হয়েছে যে, 'একমাত্র আল্লাহই জানেন গর্ভের ভেতরে কি আছে'। এখানে বুঝা দরকার যে, মানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বড়জোর গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ এবং অন্যান্য কিছু শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। আল্লাহ তো জানেন সেই ভ্রূণের ভাগ্য, চরিত্র, কবে কি অবস্থায় সে মারা যাবে, ইত্যাদি সব। কাজেই সন্তানের লিঙ্গ নির্ণয়ের চেষ্টাও অনৈসলামী বলার যুক্তি নেই।

উত্তম এসব বিষয়ে অহেতুক উৎকণ্ঠিত না হয়ে ছেলে বা মেয়ে যাই আল্লাহর উপহার হিসেবে আসে তার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

উত্তর : ৩. ইসলামে স্বামীর অধিকার

স্ত্রীর কাছে পাওনা স্বামীর অধিকার রাসূলের (সা:) এই হাদীসে পাওয়া যায়, "সবচে উত্তম নারী সেই স্ত্রীলোক যার দিকে তাকালে তোমার নয়ন জুড়ায়, তাকে কিছু করতে বললে সে তা করে এবং যখন তুমি দূরে যাও তখন সে তার সতীত্ব ও স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করে।" এ হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে স্বামীর যেমন স্ত্রীর প্রতি কোমল হতে হবে, সম্মান ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে, তেমনি স্ত্রীরও স্বামীর প্রতি তাকে একনিষ্ঠ হতে হবে। তাকে সেভাবে ভালবাসতে হবে। তার কল্যাণ ও সুখের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য সুখ ও প্রশান্তি অর্জন সেহেতু স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজেদের

পরস্পরের কাছে আকর্ষণীয় ও সুন্দর করে তুলবে। বিশেষভাবে স্ত্রী নিজেকে (ইসলামের সীমার মধ্যে) সুন্দরভাবে স্বামীর কাছে পেশ করবে। ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, স্বামীকেও স্ত্রীর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে হবে। কারণ স্ত্রীরও সেই অধিকার আছে, যা স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে আশা করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য চর্চার মূল উদ্দেশ্য স্বামী বা স্ত্রীকে পরস্পরের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য করা। এজন্যে ইসলাম মেয়েদের ঘরে সাজ-গোজ করতে বলে। আর পাশ্চাত্য বলে বাইরে যাবার সময় সবচেয়ে সুন্দরী সেজে যেতে, আর ঘরে কুৎসিতরূপে থাকতে– ইসলাম এটা সমর্থন করে না।

উত্তর : ৪. স্বামীর আনুগত্য পাওয়ার ভিত্তি

'আনুগত্য' (obedience) শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন। কারো কাছে এর অর্থ পুরোপুরি আত্মসমর্পণ। কারো মতে এর অর্থ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মান। এজন্যে কুরআনে 'আনুগত্য' বলতে কি বুঝানো হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। চতুর্থ সূরার ৩৪নং আয়াতে ধার্মিক মেয়েদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাদের সতীত্ব এবং তাদের স্বামীর অধিকার হেফাজত করে ইত্যাদি। এই বর্ণনার ঠিক আগে আর একটি কথা এসেছে যাতে স্বামীদের 'কাওয়ামুন' বলা হয়েছে। এই 'কাওয়ামুন' অর্থ ভরনপোষণকারী (maintainers) অথবা রক্ষক (protectors)। (যদিও কেউ কেউ ভুলক্রমে এর ব্যাখ্যা করে বলেন, নারীর উপর পুরুষ ক্ষমতাবান)। কাজেই স্বামীর আনুগত্যের বিষয়টি এখান থেকেই এসেছে যে, তারা নারীকে রক্ষা করবে, ভরণপোষণ করবে এবং সংসারের পুরো দায়িত্বে থাকবে। এই হিসেবে তাদের সম্মান করা স্ত্রীর কর্তব্য।

উত্তর : ৫. কাওয়ামুন শব্দের অর্থ

কাওয়ামুন শব্দের অর্থ 'শ্রেষ্ঠ বা ক্ষমতাবান' করা মারাত্মক ভুল। কুরআনের কোথাও এমন কথা নেই যে, নারীর উপর পুরুষ শ্রেষ্ঠ। চতুর্থ সূরার ৩৪নং আয়াতও এর ব্যতিক্রম নয়। রাসূলের কোনো হাদীসেও এমন ধারণা পাওয়া যায় না। কাজেই ঐ আয়াতের অর্থ হিসেবে পুরুষরা নারীদের রক্ষা ও ভরণপোষণকারী এটাই সবচাইতে গ্রহণযোগ্য।

অনুবাদের দোষের কারণে অমুসলিমদের মাঝে এ নিয়ে ভুল ধারণার জন্ম হচ্ছে। পুরুষকে কেন রক্ষকের (protector) দায়িত্ব দেয়া হল এই প্রশ্নও অনেকের। এই প্রশ্নের উত্তরে কুরআন ব্যাখ্যা দিয়েছে– 'তাদের মধ্যে কাউকে অন্যদের উপর কর্তৃত্ববান করা হয়েছে'। এখানে অমুসলিমরা এই 'কাউকে'-এর ব্যাখ্যা করেন পুরুষ এবং 'অন্যদের' ব্যাখ্যা করে নারী হিসেবে এবং দাবি করেন নারীর উপর পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব

দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটাও অসার যুক্তি। কারণ :

ক) ব্যাকরণগত– যদিও ঐ আয়াতে ব্যবহৃত আরবী সর্বনাম পুরুষবাচক (masculine pronoun), কিন্তু কুরআনে অনেক জায়গাতেই নারী-পুরুষকে এক সম্বোধনেই ডাকা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ মতে পুরুষবাচক সর্বনাম দিয়ে মেয়েদেরও সম্বোধন করা যায় কাজেই ঐ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তাদের মধ্যে কাউকে (কোনো কোনো নারী এবং পুরুষ) অন্যদের (নারী এবং পুরুষ) উপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে।

খ) নেতৃত্ব প্রশ্নে : আয়াতটি পরিবার সংক্রান্ত বিষয়ে নাযিল হয়েছে। পরিবারের ভরণপোষণ সহ সার্বিক দায়িত্ব ইসলামে স্বামীর উপর ন্যস্ত, তাই স্বামীকে পরিবারে কিছুটা preference দেয়া হয়েছে। এটা কোনভাবেই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয়।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ২৫:৭৪, ২:২২৮

প্রশ্ন ৪ : আল কুরআন ২:২২৮, ৪:৩৪

প্রশ্ন ৫ : আল কুরআন ২:২২৮, ৪:৩৪

চতুর্থ সূরার-৩৪ নং আয়াতে 'ফাদল' শব্দটি আছে, যা কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহর রহমত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা একটা নিরপেক্ষ অর্থবাচক শব্দ। এখানে এর ব্যবহার এটাই প্রমাণ করে যে, নারীদের ভরনপোষণ ও রক্ষার সামর্থ্য পুরুষকে দিয়ে আল্লাহ তাদের রহমত করেছেন এর মানে এই নয় যে পুরুষ নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। Contemporary Verdicts, আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী।

জি-৪০ দাম্পত্য সম্পর্ক (৫)
স্বামী অধিকার

প্রশ্ন ১. রাসূলের (সা:) এমন কোনো হাদীস আছে কি যাতে স্বামীকে মান্য করার জন্য স্ত্রীকে আদেশ করা হয়েছে?

২. পরিবারের নেতৃত্ব স্বামীকে দেয়ার মাধ্যমে কি পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে?

৩. উপরের প্রশ্নের জবাবে মুসলমানরা কি বলবে?

৪. মেয়েরা কেন পরিবারের নেতা হতে পারবে না?

৫. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যের সীমা কতদূর?

উত্তর : ১. রাসূল (সা:) এর ভাষ্যমতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য

রাসূল (সা:)-এর কয়েকটি হাদীসে স্বামীকে স্বামীর আনুগত্য করতে আদেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে এটা করলে বিনিময়ে বেহেশত পাবে। এক সহীহ হাদীসে তিনি বলেন, যদি কোনো নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তবে হাশরের ময়দানে তাকে বলা হবে বেহেশতের যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তিনি আরও বলেন যে, স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় কোনো স্বামী মারা গেলে স্ত্রী বেহেশত পাবে। আবার যদি কোনো স্বামী স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট অবস্থায় মারা যায় তবে তার (স্ত্রীর) নামাজ কবুল হবে না। যখন মুসলিম নারীদের পক্ষে একজন নারী রাসূল (সা:)-কে বললেন যে, যেহেতু মেয়েদের সম্মুখ যুদ্ধে যাবার প্রয়োজন হচ্ছে না, সেহেতু তারা পুরুষদের মতো শহীদ হয়ে মর্যাদাবান হতে পারছেন না। তখন রাসূল (সা:) তাঁকে বললেন সব মেয়েদের বলে দাও যে, তাদের স্বামীর আনুগত্য এবং তাদের সন্তুষ্টি মেয়েদের জন্য শাহাদাতের সমান। রাসূল (সা:) বলেন, আমি যদি কোনো মানুষকে অন্য আর একজন মানুষকে সেজদা করতে বলতাম তবে আমি স্ত্রীদের তাদের স্বামীদের সেজদা করতে বলতাম। এই হাদীসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

ক) রাসূল (সা:) উপমার ছলে একথা বলেছেন। কারণ ইসলামে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সেজদা করার কোনো সুযোগ নেই। কাজেই রাসূলের এই উক্তির সাথে মেয়েদের পুরুষের তুলনায় খাটো হবার কারণ নেই। বরং পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয় ও বুঝাপড়ার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করার ইংগিতই রয়েছে। বুদ্ধিমতী মায়েরা মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠাবার সময় বলে, 'তোমার স্বামীর দাসীর মতো হয়ে যাও, দেখবে সেও তোমার দাস হয়ে

গিয়েছে।' এর মানে পুরুষকে যে ভালবাসা, আকর্ষণ সহযোগিতা ও আনুগত্য দেয়া হবে সেও তাই দেবে।

খ) এই উক্তি পরিবারের ভিতরে সহযোগিতাকেই গুরুত্ব দিচ্ছে।

উত্তর : ২. যেসব কারণে মানুষ মনে করে যে, ইসলামে নারীকে পুরুষের নীচে স্থান দেয়া হয়েছে

যারা এমন কথা বলেন তারা তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমত: তারা বলেন সম্পদে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক, কাজেই নারীর মর্যাদাও পুরুষের অর্ধেক। দ্বিতীয়ত: তারা বলেন আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মোকদ্দমায় নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক। তৃতীয়ত: তারা বলেন যে, কুরআন পরিবারের নেতৃত্ব পুরুষের হাতে দিয়ে নারীকে তার আনুগত্য করতে বলেছে। পক্ষান্তরে নারীর হাতে নেতৃত্ব দেয়নি। তার আনুগত্য করতে পুরুষকে বলেনি। এসবই প্রমাণ করে যে, ইসলামে নারীর স্থান পুরুষের নীচে।

এই ধারণা সাধারণত: অমুসলিম বুদ্ধিজীবীরাই প্রচার করেন, যারা সামগ্রিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না কুরআন প্রদত্ত মানব-মানবীর পারস্পরিক মর্যাদা দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত নন। (কিছু মুসলমান যারা কুরআনের শিক্ষা যথাযথভাবে বুঝেন না তারাও এমন ধারণা পোষণ করেন। –অনুবাদক)

উত্তর : ৩. উপরের প্রশ্নের জবাব

উপরের প্রশ্নের আলোচনায় ইসলামে নারীর মর্যাদার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি পাওয়া যায় তার জবাব নিম্নরূপ :

ক) কুরআন স্পষ্টভাবে বলে যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া (খোদাভীতি)। নারী বা পুরুষ হবার মাঝে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

খ) কুরআন আরও বলে যে, নারী এবং পুরুষ উভয়ে 'এক আত্মা' থেকে তৈরি। কাজেই সৃষ্টির ভিত্তিতেই উভয়ে সমান। কেউ কারো 'অর্ধেক' হবার প্রশ্নই উঠে না।

গ) উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ বন্টনের প্রশ্নে ইসলাম মানুষের উপর প্রদত্ত দায়িত্বের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিয়েছে। এখানে লিঙ্গভেদে কাউকে খাটো করার প্রশ্ন অবান্তর। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 'জি-১৫'-এ দেখুন)

ঘ) আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মোকদ্দমার ক্ষেত্রেও মেয়েদের খাটো করা হয়নি। এটা শুধু এ জন্যেই যে, মেয়েরা এসব কাজে সাধারণত: যুক্ত থাকত না। চুক্তির জটিল ধারা যাতে একজন অপরজনকে মনে করিয়ে দিতে পারে তাই

এ ব্যবস্থা। যাতে নারীর উপর বেশি চাপ না পড়ে। (এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা জি-১৮ অধ্যায়ে)।

ঙ) কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে সমাজের প্রত্যেকটা অংশে কাজ এবং দায়িত্বের বিভাজন ও বন্টন হওয়া উচিৎ। ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীকে কিছু দায়িত্ব আলাদা করে দিয়েছে। যেহেতু নারীর ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সার্বিক দায়িত্ব পুরুষের সেহেতু পরিবারের নেতৃত্বও তাকে দেয়া হয়েছে। ইসলামে নেতৃত্ব মানে কর্তৃত্ব নয়।

উত্তর : ৪. মেয়েরা কেন পরিবারের প্রধান হতে পারবেন না

মেয়েরা কেন পরিবারের প্রধান হতে পারবেন না এই প্রশ্ন উঠার পেছনে কয়েকটি বিভ্রান্তি কাজ করেছে, যথা :

ক) স্বামীর হাতে পরিবার প্রধানের দায়িত্ব আসায় পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব হয়েছে।

খ) পরিবার প্রধানের দায়িত্ব পুরুষের উপর দিয়ে তাকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে।

গ) ইসলামে নারীকে স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে তার আনুগত্য করতে বলেছে। এটা নারীর ব্যক্তিত্ব ও পরিচয় ক্ষুন্ন করছে।

বাস্তবে এই তিনটি ধারণাই ভুল। প্রথমত: স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দায়িত্ব ও অধিকার বন্টন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ, যিনি নারী বা পুরুষ কোনটাই নন। কাজেই কারো প্রতি পক্ষপাতিত্বের ধারণা অমূলক। তিনি মানুষকে একটি সুষম সুখী পরিবার গঠনের নির্দেশনা দেন।

দ্বিতীয়ত: পুরুষের হাতে পরিবারের নেতৃত্ব নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কোনো নিদর্শন নয়। ইসলামকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এটা সর্বস্তরেই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এখানে নামাজে একজনকে নেতৃত্ব দিতে হয়। যখন তিন বা ততোধিক লোক সফরে যায় তখন একজনকে নেতা বানাতে রাসূল (সা:) আদেশ করেন। রাসূল (সা:) বলেন যে, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল (মেষচালক)। সমাজবিদরা গবেষণা করে দেখছেন মানুষের গোটা ইতিহাসে দু'ধরনের পারিবারিক নেতৃত্ব আছে। একটা বহির্জগতের (instrumental) সাথে সম্পৃক্ত যার নেতৃত্বে থাকেন সাধারণত: পুরুষ। আর ঘরের অভ্যন্তরে চাবিকাঠি থাকে নারীর হাতে (expressive leadership)। ইসলামে এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি।

তৃতীয়ত: স্বামীর হাতে নেতৃত্ব থাকায় স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব খর্ব হবার কোনো ভয় নেই। বিয়ের মাধ্যমে নারীর স্বতন্ত্র পরিচয় ও ব্যক্তিত্ব বিলীন হয় না। ইসলাম শুধু এটুকুই বলে যে,

যেহেতু স্বামীকেই পরিবারের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তা বিধান করতে হবে সেহেতু পরিবার প্রধানের দায়িত্ব তার। বিয়ে এমন একটা সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর যার ভিত্তি। স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেই (শুরা) স্বামীর কাজ করা উচিৎ।

উত্তর : ৫. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যের সীমা

ইসলামে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য প্রশ্নাতীত ও নিরংকুশ নয়। একমাত্র আল্লাহই প্রশ্নাতীত ও নিরংকুশ আনুগত্য প্রাপ্য যিনি সারা জাহানের পালনকর্তা, আর সবার প্রতি আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সীমার মধ্যে। রাসূল (সা:) বলেন, "কেউ যদি আল্লাহর আদেশের পরিপন্থি কোনো আদেশ করে তবে তা যেন কেউ না মানে।" অন্ধ-নির্বিচার আনুগত্য ইসলাম বিরোধী। কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ইসলামসম্মত পোশাক পরতে নিষেধ করে তবে আনুগত্য করা যাবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীকে মদ খেতে বা ইসলামী পোশাক না পতে আদেশ করে, তখন আনুগত্য করা যাবে না। বরং এসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহই শ্রেয়। ইসলাম আরও শিক্ষা দেয় যে, স্বামী শুধু বৈধ বিষয়েই স্ত্রীর আনুগত্য পাবে। যেমন, কেউ তার স্ত্রীকে তার সম্পত্তি দেবার নির্দেশ দিতে পারবে না। সে যা আদেশ করবে তা হতে হবে সামাজিক, ন্যায্য, যৌক্তিক এবং সুন্দর। কোনো স্বামী স্বৈরাচারীভাবে স্ত্রীর সাথে ব্যবহার করতে পারবে না। শুরা (পারস্পরিক পরামর্শ) একটা অত্যাবশ্যকীয় ইসলামী বিষয়। সমাজ ও পরিবারের সকল স্তরে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ৪৯:১৩, ৪:১

প্রশ্ন ৪ : 'The Hand book of Modern Sociology' by Zeldith

প্রশ্ন ৫ : কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিশ্বাস (Faith) গ্রহণ করার আদেশ করতে পারবে না।

প্রশ্ন ৬ : আল কুরআন ৬০:১২, ২:২৩২

জি-৪১ দাম্পত্য সম্পর্ক ও
সন্তানের অধিকার

প্রশ্ন ১. ইসলামী মতে মুসলিম দম্পতি কিভাবে স্বামীর উপর অর্পিত অধিকার ও দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করবে?

২. স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে তার সাথে মিলিত হতে স্ত্রী বাধ্য কি না?

৩. ইসলাম কি নারীকে ঘর গৃহস্থালীর সকল কাজ করতে বলে?

৪. শিশুর অধিকারের বিভিন্ন দিকগুলো কি?

৫. শিশুর জীবনের অধিকার বলতে কি বুঝায়?

৬. শিশুর পিতৃ পরিচয় জানবার অধিকার বলতে কি বুঝায়?

৭. শিশুর সযত্নে বড় হবার অধিকার বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : ১. স্বামীর অধিকার ও দায়িত্বের বাস্তব প্রয়োগ

ইসলাম নব বিবাহিত দম্পতিকে স্বামীর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও অধিকার যৌথভাবে পালনের শিক্ষা দেয়। যেমন :

ক) স্ত্রীকে পরিবার ভরণপোষণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার সাথে স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে সমতা কায়েম করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, স্বামীর অজ্ঞাতে অথবা অনুমতি ছাড়া তার ঘর ত্যাগ করা উচিৎ নয়। এই দায়িত্ব থেকে পরিবারের ভেতরে কিছু শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী সব সময়ে জানতে পারে তার স্ত্রী কোথায় আছে।

অবশ্য এটা এমন কোনো বিধি নিষেধ নয় যা যৌক্তিক প্রয়োজনে স্ত্রীকে ঘরের বাইরে যেতে দেবে না। ইসলাম প্রয়োজনে নারীকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাবার সুযোগ দিয়েছে। যেমন - ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য, আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য, সামাজিক প্রতিরক্ষায় অংশ নেবার জন্য ইত্যাদি। এ ছাড়া যে সব নিয়মিত কাজে একবার অনুমতি নিলেই চলে সেখানে প্রতিবার অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই। যেমন– চাকরির উদ্দেশ্যে অফিসে যাওয়া, বাজারে যাওয়া, অসুস্থ আত্মীয়-স্বজনের সেবায় যাওয়া ইত্যাদি।

খ) রাসূল (সা:)-এর মতে স্ত্রীর উপর সব চেয়ে বেশি অধিকার স্বামীর। কাজেই বিয়ের পর যদিও তার পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায়

থাকবে তবুও যদি এমন পরিস্থিতি আসে যে স্বামীর প্রতি দায়িত্ব ও পিতা মাতার প্রতি দায়িত্বের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় তখন স্বামীর প্রতি দায়িত্বই তার কাছে অগ্রাধিকার পাবে।

গ) যদি স্বামীকে ব্যবসায়িক বা চাকরির প্রয়োজনে কোথাও ভ্রমণে যেতে হয় তখন স্বামীর প্রয়োজনে স্ত্রীকেও সাথে যেতে হবে। কিন্তু যদি বিয়ে চুক্তির সময় স্ত্রী এমন শর্ত লিখিয়ে নেয় যে, স্বামী নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে পারবে না। অথবা স্ত্রী নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে বাধ্য নয় এবং স্বামী যদি এই চুক্তিতে সম্মত থাকে তবে সে তার সাথে ভ্রমণে যেতে স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারবে না। যদি স্ত্রীর জন্য ভাড়া করা বা নির্মাণ করা বাড়ি ইসলাম বর্ণিত ন্যূনতম মানের না হয় তবে স্ত্রী সে বাড়িতে থাকতে অস্বীকার করতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে নাজেহাল করার ইচ্ছায় বাসা বদল করতে পারবে না।

ঘ) যদি স্ত্রীর চাকরি করা পরিবারের স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর হয় তবে স্বামী স্ত্রীকে চাকরি ছাড়তে অনুরোধ করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, যদি বিয়ে চুক্তির সময় স্ত্রীর চাকরী করার শর্তে স্বামীর সম্মতি থাকে তবে স্বামী স্ত্রীকে চাকরী ছাড়তে বলতে পারবে না।

ঙ) স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের মেহমানদের সমাদর স্ত্রী করতে পারবে না।

চ) স্বামীর অনুমোদন ছাড়া তার কোনো সম্পত্তি স্ত্রী বিক্রি করতে বা দান করতে পারবে না। অবশ্য স্বামী যদি কৃপণ হয় তবে তার সম্পত্তি থেকে তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় অর্থ স্ত্রী খরচ করতে পারবে।

ছ) যৌক্তিক কারণ ছাড়া স্বামীর বৈধ যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণে স্ত্রী অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না।

উত্তর : ২. স্বামীর যৌন মিলনের ইচ্ছা পূরণে স্ত্রীর দায়িত্ব

প্রায় সব ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'জন নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ককে বৈধতা দেয়া। সেই সাথে অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব পালন। কাজেই স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের জন্যই তার সাথীর মিলনের ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান অভদ্রতা। স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পূরণে মুসলিম স্বামী যেমন বাধ্য তেমনি স্বামীর যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণে স্ত্রীরও দায়িত্ববান থাকা প্রয়োজন। রাসূল (সা:)-এর একাধিক হাদিসে এ বিষয়ে বলা আছে। কোনো মুসলিম স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখতে বা নফল হজ্বে যেতে পারবে না। এই সব নফল এবাদত যেন তাদের অন্ত:রঙ্গ সম্পর্কের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

অবশ্য দৈহিক মিলনে স্ত্রীর বাধ্যবাধকতা স্বামীকে এই সুযোগ দেয় না যে, সে তার ক্লান্তি বা অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনবে না। তা ছাড়াও রোজার সময়, মাসিক

ঋতুর সময়, সন্তান জন্মের পর স্ত্রী স্বামীকে মিলনে বিরত রাখবে। ইসলাম ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচারকে কাঠোরভাবে বিরোধিতা করে। কাজেই এটা স্বাভাবিক যে, বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈধ যৌন অধিকার প্রয়োগে কোনো বাধা থাকা উচিৎ নয়। তাহলে পরিবারের বন্ধন দুর্বল হবে, স্বামী অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ হতে পারে।

উত্তর : ৩. ঘর গৃহস্থালীর কাজ ও নারী

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফীসহ অধিকাংশ আইনবিদ বলেন যে, ঘরের কাজ করতে স্ত্রী বাধ্য নয়। তারা এ ব্যাপারে দ্বিতীয় সূরার ২২৮ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেন, সেখানে বলা হয়েছে যে, স্বামীদের তাদের স্ত্রীদের উপর যা যা অধিকার আছে স্ত্রীদেরও তাদের স্বামীদের উপর একই রকম অধিকার আছে। এই আইনবিদগণ বলেন যে, ঘর গৃহস্থালীর কাজ বিয়ে চুক্তির অংশ নয়। কাজেই স্বামী এ ব্যাপারে স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারে না। ইমাম আহম্মদসহ অন্য আইনবিদরা এর বিরুদ্ধে বলেন। তারা বলেন দ্বিতীয় সূরার ২২৮ নং আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের উপর সমান অধিকার রাখেন। কিন্তু যেহেতু স্ত্রী ও গোটা পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব এককভাবে স্বামীর সেহেতু এর সাথে সমতা রক্ষা করার জন্যই ঘর গৃহস্থালীর কাজ স্ত্রীর। এতে স্ত্রীর মর্যাদা ও সমতা ক্ষুন্ন হয় না। তারা এর পক্ষে রাসূল (সা:)-এর একটি ঘটনা বলেন, যেখানে তার কন্যা ফাতিমা (রা:) তাঁর কাছে ঘরের কাজের কঠোর পরিশ্রমের কথা বলে একজন কাজের লোক চেয়েছিলেন। তখন রাসূল (সা:) তাকে তা দেননি। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মেয়েদের ঘর গৃহস্থালীর কাজ করাকে রাসূল (সা:) অসঙ্গত মনে করেননি। তবে এ কাজ মেয়েদের বাধ্যবাধকতা নাকি ঐচ্ছিক সেই প্রশ্ন কিন্তু থেকে যাচ্ছে। এই প্রশ্নের উত্তর যা-ই হউক ইসলামে বিয়ে বন্ধনের লক্ষ্য হচ্ছে যে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে সব বিষয়ে সহযোগিতা করবে। এটা স্ত্রীর জন্য অন্যায় হবে যে, কর্মক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরে স্বামী ঘরের কাজ করবে। আর স্বামীর জন্য এটা অন্যায় হবে যদি সে ঘরের সব কাজ স্ত্রীর উপর চাপিয়ে নিজে অলস বসে থাকবে।

উত্তর : ৪. সন্তানের অধিকারকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায় :

ক) জীবনের অধিকার

খ) পিতৃ পরিচয়ের অধিকার

গ) সযত্নে বেড়ে উঠার অধিকার

উত্তর : ৫. শিশুর জীবনের অধিকার

মানুষের জীবন আল্লাহর কাছ থেকে আসে। কাজেই কোনো পিতা-মাতার এই ভাবার সুযোগ নেই যে, তাদের ইচ্ছামত সন্তান আসে। অনাগত সন্তানের জীবন নষ্টের অধিকার কারো নেই। সে জন্য ইসলামে দারিদ্র্য বা সন্তান ছেলে না মেয়ে এসব অযুহাতে গর্ভপাত, এম. আর. ও শিশুহত্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

উত্তর : ৬. পিতৃ পরিচয়ের অধিকার

এ অধিকার শিশুকে নিজের পরিচয় জানার ও রক্ষা করার সুযোগ দেয়। তার জানার অধিকার আছে কে তার পিতা। যদি পিতৃ পরিচয় পাওয়া না যায় তবে মায়ের সূত্রে সে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

যাদের পিতা মাতা কারোরই পরিচয় জানা যায় না। (কুরআন তাদের) "তোমাদের ভাই" এবং "তোমাদের পোষ্য" এইভাবে ঘোষণা করে। এমন সন্তানদের যারা পালন করবে তারা তার পরিচয় গোপন করতে বা অন্য পরিচয় দিতে পারবে না। পাশ্চাত্যে প্রচলিত সন্তান দত্তক নেবার নামে মানুষের পরিচয় নষ্ট করার সুযোগ ইসলামে নেই।

উত্তর : ৭. সযত্নে বেড়ে উঠার অধিকার

পুত্র কন্যা নির্বিশেষে যে কোনো সন্তানের জন্মকে পিতা মাতা আনন্দের সাথে বরণ করবে। কারণ এটা আল্লাহর উপহার। দ্বিতীয়ত: ইসলাম এও বলে যে, আল্লাহর উপহারের জন্য আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শিশুর বয়স এক বা দু'সপ্তাহ হলে আত্মীয় পরিজনের সমাবেশ (আকীকা) করতে। এই আকীকা অনুষ্ঠানে সন্তানের নাম রাখা হয়। তার চুল কেটে চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপার মূল্য দান করা যেতে পারে। এছাড়া বাচ্চা জন্মের পর যথাশীঘ্র খাসি বা দুম্বা বা ভেড়া জবাই করে আত্মীয় ও গরীবদের খাওয়ানো রাসূলের অন্যতম সুন্নত।

শিশু যখন বড় হতে থাকবে তখন পিতা মাতার পক্ষ থেকে দৈহিক, মানসিক ও বস্তুগত সকল যত্নের সে অধিকারী। যদি শিশুর নিজের সম্পত্তি থাকে অথচ পিতা মাতা গরীব সে ক্ষেত্রে তার ভরণপোষণের জন্য তার সম্পদ তারা ব্যবহার করতে পারবে। ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে জানার অধিকার তার আছে। তাকে নামাজ সহ অন্যান্য এবাদত শেখাতে হবে। ধর্মীয় পরিবেশে বড় করতে হবে। অবিশ্বাসীদের কবল থেকে দূরে রাখতে হবে। সমান ব্যবহার পাওয়া সব শিশুর অধিকার। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : স্বামীর কথায় স্ত্রীর চাকরী ত্যাগের বাধ্যবাধকতার একটি ব্যতিক্রম আছে। হানাফী মতে যদি মহিলা কোনো ফরজে কেফায়ার দায়িত্বে (যেমন ধাত্রী, ডাক্তার ইত্যাদি) নিয়োজিত থাকে তবে সে স্বামীর কথায় কাজ নাও ছাড়তে পারে।

প্রশ্ন ৩ : আল কুরআন ২:২২৮

প্রশ্ন ৫ : E. Westonmark, 'The Origin and Development of Moral Ideas' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, বাইবেলের সময় সন্তানের জীবনের উপর পিতার অধিকার ছিল। অর্থাৎ তিনি চাইলে তাদের হত্যা করতে পারতেন।

জি-৪২ পিতা মাতার অধিকার

প্রশ্ন ১. পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন কি বলে?

২. পিতা মাতার অধিকার সম্পর্কে রাসূল (সা:) কি বলেছেন?

৩. পিতা মাতার প্রতি ভাল ব্যবহার বলতে কি বুঝায়?

৪. কোনো অবস্থায় পিতা মাতার ভরণপোষণ সন্তানের দায়িত্ব? এটা কি নৈতিক দায়িত্ব নাকি আইনগত বাধ্যবাধকতা?

৫. যদি কারো পিতা মাতা মুসলমান না হয় তবুও কি তাদের ভরণপোষণ করতে হবে?

৬. যদি পিতা মাতা সন্তানের প্রতি দয়ালু না হয়, তবুও কি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে।

উত্তর : ১. পিতা মাতার সাথে ব্যবহার সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা

কুরআন বেশ কয়েক জায়গায় পিতা মাতার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হতে বলা হয়েছে। প্রায় সব জায়গাতেই আল্লাহর এবাদতের পরেই পিতা মাতার সেবার কথা বলা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, ইসলামে মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহারের গুরুত্ব কত বেশি। একটি আয়াতে (১৭:২৩-২৪) অত্যন্ত সুন্দরভাবে পিতা মাতার প্রতি কর্তব্যের কথা এসেছে। বলা হয়েছে তাদের প্রতি দয়ালু হতে, এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ না করতে যা তাদের কষ্টের কারণ হয়। তাদের প্রতি কোনো রকম অধৈর্য্য বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করতে। আরও বলা হয়েছে তাদের প্রতি সাহায্যের ডানা বাড়িয়ে দিতে (Lower the wing of humility)। এখানে 'ডানা' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পাখি তার সন্তানকে আদর করতে তার পাখা নীচু করে দেয়। তেমনি পিতা মাতা বিশেষভাবে মা সন্তানকে সযত্নে লালন করেন। বার্ধক্যে তাদেরকে একইভাবে লালন সন্তানের দায়িত্ব।

উত্তর : ২. পিতা মাতার অধিকার সম্পর্কে রাসূল (সা:)

পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার সম্পর্কে রাসূলের শিক্ষা কুরআনের শিক্ষারই বিস্তৃতি। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল আল্লাহর দৃষ্টিতে উত্তম কাজ কি, উত্তরে তিনি বলেন, "সময় মতো নামাজ পড়া, পিতা মাতার প্রতি ভাল এবং দয়ালু হওয়া এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" কাজেই দেখা যাচ্ছে পিতা মাতার প্রতি সদয় হওয়ার বিষয়টি নামাজ এবং জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মাঝে অবস্থিত। পিতা মাতার প্রতি ভাল ব্যবহারের পুরস্কার সম্পর্কে অনেক জায়গায় তিনি বলেছেন- যেমন এক হাদিসে তিনি বলেন যে,

যারা পিতা-মাতা ও আল্লাহর অনুগত তারা বেহেস্তের সর্বোচ্চ জায়গায় থাকবে। আরেক জায়গায় পিতা মাতার প্রতি দয়াকে জিহাদের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন যারা তাদের সেবা করবে তারা হজ্জের অথবা জিহাদের সমান পুরস্কার পাবে। তিনি আরো বলেছেন যে, পিতা মাতার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নিহিত। যারা তাদের পিতা মাতার প্রতি সদয় আল্লাহ তাদের প্রতি সদয়। পিতা মাতার সন্তুষ্টি অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যদি পিতা মাতা সন্তানের জন্য আগ্রহের সাথে দোয়া করে অথবা তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে নালিশ করে তবে আল্লাহ তার জবাব দেন। সর্বশেষে তিনি বলেন, "তোমাদের পিতা মাতার প্রতি দয়ালু হও তা হলে আল্লাহ তোমাদের বার্ধক্যে তোমাদের সন্তানদের তোমাদের প্রতি দয়ালু বানাবেন। আর তোমরা চরিত্রবান হও তাহলে তোমাদের স্ত্রীরাও চরিত্রবান হবে।"

উত্তর : ৩. পিতা মাতার প্রতি ভাল ব্যবহারের পন্থা

কুরআন এবং হাদিসে পিতা মাতার প্রতি ব্যবহারের আলোচনায় আরবী শব্দ 'বীর' ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে ভাল ব্যবহার; এটি একটি অসম্পূর্ণ অনুবাদ। 'বীর' শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক। দয়া, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, আনুগত্য, ধৈর্য্য, সততা এই সবই বীর শব্দের প্রতিশব্দ, মুসলমানরা পিতা মাতার সাথে ব্যবহারে এই সব গুণের প্রয়োগ ঘটাবে। রাসূল (সা:) বলেন যে, যারা পিতা মাতার দায়সারাভাবে সেবা করে, তারা 'বীর'-এর মতো সেবা করছে না। সব সময় ভালবাসার সাথে ব্যবহার করতে হবে এবং কখনও তাদের সাথে উঁচু গলায় কথা বলা যাবে না।

রাসূল (সা:)-এর কন্যা বিবি ফাতিমা (রা:) সব সময় রাসূল (সা:)-এর সাথে শিশুর মতো সরল ব্যবহার করতেন। যখনই রাসূল (সা:) তাকে দেখতে যেতেন তখনই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে চুমো দিতেন এবং শ্রদ্ধার সাথে নিজের আসনে তাকে বসতে দিতেন। রাসূল (সা:) ও একইভাবে তার সন্তানকে স্নেহ করতেন।

উত্তর : ৪. পিতা মাতার ভরণপোষণ

তিনটি অবস্থায় পিতা মাতার ভরণপোষণ সন্তানের দায়িত্ব :

ক) পিতা মাতা অক্ষম হলে এবং তাদের জীবন ধারনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকলে।

খ) তাদের চলার মত জীবিকা তারা উপার্জন করতে না পারলে।

গ) তাদের ভরন পোষণের সামর্থ্য সন্তানের থাকলে। তার একদিন ও একরাতের পরিমাণ খাদ্য ঘরে অতিরিক্ত থাকলেই যে সামর্থবান বলে ধরা হবে।

যদি পিতা মাতা অভাবী হয় এবং তাদের ভরণপোষণের সামর্থ সন্তানের থাকে তখন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সহ তাদের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব তার। এমন কি

তাদের পিতা মাতার সেবা যত্নে নিয়োজিত কাজের লোকের ভরণপোষণের দায়িত্বও তারই। এই দায়িত্ব নৈতিক এবং আইনগত দু'টোই। একবার রাসূল (সা:) এর কাছে এসে একজন বলল যে, তার পিতা তার কিছু সম্পত্তি নিয়ে নিতে চায়। তখন রাসূল (সা:) বলেন তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার। কাজেই কোনো মুসলিম তাদের পিতা মাতা অথবা দাদা দাদীর সেবা যত্নে যেন কার্পণ্য না করে। যদি সে এই দায়িত্ব পালন না করে তবে আইন প্রয়োগ করে তাকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে হবে।

উত্তর : ৫. অমুসলিম পিতা মাতার ভরণপোষণ

মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল পিতা মাতা সন্তানের কাছ থেকে ভাল ব্যবহারের অধিকার রাখে। রাসূল (সা:) এর সময় অনেক মুসলমানের পিতা মাতাই অমুসলিম ছিলেন। তবুও রাসূল (সা:) তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের আনুগত্য করতে বলেছেন। শুধু যখন তারা আল্লাহর বিধান এর পরিপন্থি আদেশ করবে তখন আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন। ৩১ নং সূরার ১৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে মুসলিমরা তাদের অমুসলিম পিতা মাতার সাথে কেমন ব্যবহার করবে। সেখানে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থি বিষয় ছাড়া আর সব বিষয়ে পিতা মাতার অনুগত থাকতে হবে। কুরআন তাদের নিন্দা করে যারা অন্ধভাবে পিতৃ-পিতামহের বিশ্বাস আঁকড়ে থেকে ঈমান গ্রহণে অস্বীকার করে। "সেই দিনের ব্যাপারে সতর্ক থাকো যেদিন কোনো পিতা তার সন্তানের, আর কোনো সন্তান তার পিতার জন্য কোনো অনুরোধ করতে পারবে না।" কুরআন আরও বলে যে, অমুসলিম পিতা মাতাকে সদয় সঙ্গ দিবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকায় না যায়।

উত্তর : ৬. পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি দয়ালু না হলে

একবার রাসূল (সা:) পিতা মাতার প্রতি সদয় হবার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার নেবার কথা বলছিলেন। তিনি বলেন, যারা পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে তাদের জন্য দোজখের দুই দরজাই খোলা থাকবে। এ সময় একজন রাসূলকে জিজ্ঞাসা করল, "হে রাসূল (সা:) যদি তারা আমাদের প্রতি অন্যায় ও অন্যায্য আচরণ করেন, তবুও" রাসূল (সা:) বললেন, "তারা মন্দ হলেও তাদের প্রতি সদয় থাক।" (তিনি এ কথা তিনবার বলেন)।

এটাও মনে রাখা দরকার যে, বার্ধক্যের স্বাস্থ্যহানির কারণে পিতা-মাতা অধৈর্য ও খিটখিটে হতে পারেন। তাদের সহ্য ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। অল্পতেই রাগতে পারেন। কাজেই মুসলমানরা ধৈর্যের সাথে তাদের যত্ন করবে। তাঁদের প্রতি কোনো কড়া শব্দ উচ্চারণ করবে না। রাসূল (সা:) পিতা মাতার সাথে খারাপ ব্যবহারকারীকে 'খুনির' সমপর্যায়ের বলেছেন। তিনি আরও বলেন, পিতা মাতার প্রতি নির্দয় ব্যক্তির আমল বিফলে যাবে এবং বেহেশত থেকে সে বঞ্চিত হবে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ৪:৩৬, ৬:১৫১, ২:৮৩, ১৯:১৪, ১৯:৩২

পিতা মাতার প্রতি সদয় আচরণের উদাহরণ হিসেবে যিশুর এবং জনের (ইয়াহিয়া) নাম এসেছে।

প্রশ্ন ২ : রাসূল (সা:) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, "আমি আল্লাহর পথে জেহাদ করতে চাই। সত্যের জন্য জীবন দিতে চাই। কিন্তু তা করতে পারছি না।" রাসূল (সা:) জানতে চান যে, তার পিতা মাতা জীবিত আছেন কিনা। ঐ ব্যক্তি জানান তার মা জীবিত আছেন। তখন রাসূল (সা:) বলেন, "যাও তাঁর সেবা করো, তুমি তাদের সমান পুরস্কার পাবে যারা হজ্ব করে ও জেহাদ করে।" অন্য হাদীসে তিনি বলেন, "মায়ের পায়ের দিকে খেয়াল রাখবে যাতে তাঁর সেবা করতে পারো।" আরেক হাদীসে তিনি বলেন, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত।

প্রশ্ন ৫ : আল কুরআন ৩১:১৫ এই আয়াতে বলা হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাতা-পিতার আনুগত্য করা যাবে না। এই আয়াত তখন নাযিল হয় যখন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা:)-র মুশরিক মা ঘোষণা দেন যে, তাঁর ছেলে ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি আমরণ অনশন করবেন।

আসমা বিনতে আবু বকর (রা:) রাসূল (সা:)-এর কাছে জানতে চান যে, তিনি তাঁর অমুসলিম মাকে সাহায্য করে যাবেন কিনা। জবাবে রাসূল (সা:) বলেন, তুমি তাঁর প্রতি দয়ালু থাকবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে কারণ কুরআন কোনো মুসলমানকে তাঁর অমুসলিম পিতা মাতার প্রতি সদয় হতে বারণ করেননি যদি না তারা মুসলমানদের প্রতি আগ্রাসী ও শত্রুভাবাপন্ন হন।

জি-৪৩ আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

প্রশ্ন ১. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি কি দায়িত্ব থাকে?

২. দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মীয়দের (Second degree relative) (অর্থাৎ স্ত্রী-স্বামী, মাতা-পিতা এবং সন্তান ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন) প্রতি মুসলমানদের কি দায়িত্ব আছে?

৩. যদি ঐ আত্মীয়রা তার প্রতি দয়ালু না হয় তাহলেও কি এসব দায়িত্ব বহাল থাকে?

৪. এসব কি শুধু নৈতিক দায়িত্ব নাকি এর আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে?

৫. কোনো কোনো অবস্থায় একজন মুসলমানের দ্বিতীয় পর্যায়ে আত্মীয়দের আর্থিক ভরণপোষণ করতে হয়?

৬. বিয়ে বিচ্ছেদ (তালাক) সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কি?

৭. এটা কি সত্য যে, ইসলামে তালাক অতি সহজ বিষয়?

৮. তালাকের অধিকারের অপব্যবহার রোধে কোনো ব্যবস্থা কি ইসলামে আছে?

উত্তর : ১. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি দায়িত্ব

রাসূল (সা:) বলেন যে, যদি পিতা-মাতার অসমাপ্ত কাজ সন্তান করে দেয় তবে আল্লাহ তাদের (পিতা-মাতা) মাফ করে দিতে পারেন। সন্তানরা মৃত পিতা-মাতার জন্য যা করতে পারে :

ক) তাদের অসমাপ্ত ওয়াদা রক্ষা করা।

খ) তাদের ঋণ পরিশোধ করা।

গ) জনগণ যেন তাদের পিতা-মাতার উপর কোনো রাগ বা ক্ষোভ না রাখে তার ব্যবস্থা করা (অর্থাৎ পিতা-মাতার পক্ষ থেকে তাদের কাছে মাফ চাওয়া)।

মাঝে মাঝে পিতা-মাতার কবর জেয়ারত করা এবং তাদের জন্য নিয়মিত দোয়া করা উচিৎ। রাসূল (সা:) বলেন মৃত্যুর পর মানুষের নতুন নেকির পথ বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি ছাড়া, যথা :

i) যে কোনো সদকায়ে জারিয়া যা থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে।

ii) তার বিতরণ করা জ্ঞান থেকে যদি মানুষ উপকৃত হতে থাকে।

iii) ধার্মিক ছেলেমেয়ে যারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে।

উত্তর : ২. দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মীয়দের প্রতি মুসলমানদের দায়িত্ব

কুরআন এবং হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের প্রতি সদয় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

উত্তর : ৩. আত্মীয়রা সুসম্পর্ক না রাখতে চাইলেও তাদের প্রতি সদয় হতে হবে কি?

পিতা-মাতার সাথে আচরণের মতই আত্মীয়রা খারাপ ব্যবহার করলেও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। রাসূল (সা:) আলী (রা:) কে বলেন, "আলী, আমি কি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের মহৎ কাজের কথা বলব? তা হচ্ছে আত্মীয়দের অথবা যে কেউ তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার সাথে সদয় ব্যবহার কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান কর। যে তোমাকে কষ্ট দেয় তাকে মাফ কর।"

উত্তর : ৪. আত্মীয়দের অধিকার নৈতিক দায়িত্ব নাকি আইনগত বাধ্যবাধকতা?

আত্মীয়দের অধিকারের নৈতিক ও ধর্মীয় ভিত্তির বিষয়ে আইনবিদরা একমত। তাদের প্রতি আর্থিক দায়িত্ব আছে কিনা এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। শাফেয়ী, মালেকী এবং জাফরী মাযহাব মতে আত্মীয়দের কল্যাণ করা নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। তবে প্রয়োজনে আর্থিকভাবে তাদের ভরণপোষণ করতে মুসলমানরা আইনগতভাবে বাধ্য নয়। বরং এমন দরিদ্র ব্যক্তির দায়িত্ব গোটা সমাজের। হানাফী এবং হাম্বলী মতে গরীব আত্মীয়দের আর্থিক সাহায্য করা মুসলমানদের আইনগত দায়িত্ব। এ দায়িত্বের পরিমাণ নির্ভর করবে আত্মীয়দের মধ্যে সম্পদের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কের ভিত্তিতে।

উত্তর : ৫. যেসব অবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ দায়িত্ব

আর্থিক সাহায্য পাওয়ার শর্ত ও অবস্থা নিম্নরূপ :

ক) সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্যকারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বিদ্যমান থাকতে হবে।

খ) সাহায্যপ্রার্থী আত্মীয়কে যথেষ্ট দরিদ্র (Needy) হতে হবে।

গ) যৌক্তিক কারণে উপার্জনে অক্ষম হতে হবে।

ঘ) মুসলিম হতে হবে। অবশ্য প্রথম ধারার (First degree) আত্মীয়দের আর্থিক সুবিধা পেতে মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। আর সাধারণভাবে মুসলিম অমুসলিম সব দরিদ্রকেই সাহায্য করা উচিৎ। মুসলমানরা তাদের অবিবাহিতা কন্যা উপার্জনক্ষম হলেও তার ভরণপোষণ করতে বাধ্য।

উত্তর : ৬. বিয়ে বিচ্ছেদ (তালাক) সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা

সমাজবিদরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় সব সমাজ ও সভ্যতার ব্যর্থ বিয়ের সমাপ্তি দেবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এই নিয়ম বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে

চালু ছিল। কোনো কোনো সমাজে স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু ভিন্ন ব্যর্থ বিয়ের বর বা কনের মুক্তির পথ ছিল না। তালাকের পর দম্পতির পুনর্মিলনের কোনো সুযোগও ছিল না। আবার কোনো কোনো সভ্যতায় তালাক ছিল অতি সহজ বিষয়। এ বিষয়ে কোনো বাধা ছিল না। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবরা কথায় কথায় স্ত্রী তালাক দিত। বর্তমানে এই ধারা যেন আবার ফিরে এসেছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে এক দিনের মধ্যেই কোনো ব্যক্তির পক্ষে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করে আবার তালাক দেয়া সম্ভব।

এই দুই চরম পন্থার কোনটাই বৈবাহিক সমস্যার সমাধান নয়। বরং এগুলো নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে। শুধু তালাকের পদ্ধতি অতি কঠিন করেই যে বিবাহ বন্ধনকে দৃঢ় করা যাবে তাও ঠিক নয়। তাহলে মানুষের মধ্যে আইন ভঙ্গের প্রবণতা আসবে। আবার এটাকে একেবারে সহজ করে দিলে পরিবার নামক ইনস্টিটিউটের অস্তিত্বই বিপর্যস্ত হবে। এ দুই চরমপন্থার মাঝে ইসলাম মধ্যপন্থা দেয়।

ইসলাম বিয়ে বন্ধনের পবিত্রতা ও গুরুত্ব ঘোষণা করে। সেটাকে স্থায়ী এবং স্থিতিশীল করতে চায়। তারপর ইসলাম এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে যে, সব বিয়েই যে স্থায়ী হবে এমন নয়। ঘরের মধ্যে নিত্য দ্বন্দ্ব বজায় রেখে উভয়ের মানসিক শান্তি ও ভারসাম্য নষ্ট করার চেয়ে এর বিচ্ছেদ শ্রেয়। ইসলাম তাই তালাককে শেষ প্রচেষ্টা হিসেবেই অনুমতি দেয়; যদিও ইসলাম এটাকে নিরুৎসাহিত করেছে। রাসূল (সা:) বলেন যে, "আল্লাহর অনুমোদিত কাজের মধ্যে তালাকই সবচাইতে অপ্রিয়।" অবশ্য তাঁর এই কথা সঙ্গত কারণে যারা তালাক দেয় তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। বস্তুত: বৈবাহিক সম্পর্ককে স্থায়ী করবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারপরই ইসলামে তালাক অনুমোদিত।

উত্তর : ৭. ইসলামে তালাক কি সহজ?

কবুল বলার মাধ্যমে মানুষ বিয়ে করে কিন্তু তার মানে কি এই যে শুধু এই একটি শব্দ উচ্চারণই বিয়ের সব আনুষ্ঠানিকতা। বরং বিয়ের জন্য কত প্রস্তুতি কত আয়োজন করবার পর তার সমাপ্তি হয় কবুল উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। তেমনি 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম।' এই বাক্যও প্রযুক্ত হবে বিয়েকে টিকাবার সব প্রাণান্ত প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর। এটাই ইসলামী নিয়ম। যদিও কিছু মুসলমান ইসলামের শিক্ষা না জেনে অথবা অমান্য করে তালাকের অপব্যবহার করছে। এসব অপব্যবহারের ঘটনাই অমুসলিমদের কাছে ইসলামী তালাক বলে মনে হয়। ফলে এই নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামের উপর কটাক্ষ করা হয়।

যদিও ইসলামে বিয়ে এবং তালাক কোনটাকেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ফেলা হয়নি। মানুষের ভালর জন্যই তাদের আয়ত্বের মধ্যে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ইসলাম এ দু'টোর কোনটাকেই হালকাভাবে নেয়নি।

উত্তর : ৮. তালাকের সম্ভাবনা কমানোর জন্য ইসলামে গৃহীত ব্যবস্থা

ইসলাম এমন কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে তালাকের প্রেক্ষিত তৈরি না হয়। এর মধ্যে আছে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্ধারণের কিছু নির্দেশনা। স্বামী-স্ত্রীতে অমিল দেখা গেলে তা অতিক্রম করার উপদেশ। স্ত্রী বা স্বামী যে কোনো একজনের ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা। সর্বোপরি তালাক বলার পর এটা পুরো কার্যকরী হবার আগে অন্তর্বর্তীকালীন সময় (ইদ্দত) দেয়া, যে সময়ে হয়তো স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হতে পারে।

সূত্র :

প্রশ্ন ১ : আল কুরআন ১৪:৪০-১

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ৪:১, ৪৭:২২

রাসূল (সা:) বলেন, "যারা আল্লাহ্ এবং কেয়ামতে বিশ্বাস করে তারা যেন মেহমানের প্রতি আন্তরিক ও সহাস্য হয়, নীরব থাকে অথবা কথা বললে উত্তম কথা বলে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে।"

প্রশ্ন ৩ : রাসূল (সা:) বলেন, "আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয় যে তাদের আচরণের প্রতিক্রিয়া দেখায় বরং সেই যে আত্মীয়রা সম্পর্ক না রাখতে চাইলেও তা রক্ষা করে।"

প্রশ্ন ৬ : আল কুরআন ৪:২১

উদাহরণ স্বরূপ, স্বামী বা স্ত্রীর কেউ যদি ধর্মীয় দায়িত্ব অবহেলা বা অমান্য করতে থাকে তখন যদি এমন হয় যে, এই অবহেলা সন্তানদের ঈমানও নষ্ট করতে পারে, তবে তালাকের বিষয় ভাবা যেতে পারে। ইসলামে তালাককে নিরুৎসাহিত করলেও অনুমতি দেয়া হয়েছে। এক হাদীসে রাসূল (সা:) বলেন, "যে নারী স্বামীকে তালাক দিতে প্ররোচিত করে, সে বেহেশতের সুবাস পাবে না।" আরেক হাদীসে তিনি বলেন, "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে কোনো স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন নষ্ট করার চেষ্টা করে।"

জি-৪৪ বৈবাহিক সমস্যা

প্রশ্ন ১. তালাক প্রতিরোধ করার জন্য ইসলামে কি কি ব্যবস্থা আছে?

২. স্ত্রী দোষী হলে স্বামী তাকে সংশোধনের জন্য কি করতে পারে?

৩. স্ত্রীকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রহার (Chastisement) করার স্বামীর অধিকারে কি কি বিধি নিষেধ আছে?

৪. তালাক এবং Chastisement-এর মাঝে তুলনা করুন?

৫. স্বামী অপরাধ করলে স্ত্রী তাকে প্রহার করতে পারে কি?

৬. স্বামী স্ত্রী উভয়ে দোষ করলে কি করা হবে?

উত্তর : ১. তালাক প্রতিরোধে এবং তালাকের সম্ভাবনা কমাতে ইসলাম কতগুলো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে

ক) পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় ধর্মীয় অনুভূতি, চরিত্র এবং পরস্পরের জন্য গ্রহণযোগ্যতা যথাযথভাবে যাচাই।

খ) স্বামী স্ত্রী উভয় তাদের পরিবারের প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশিত পন্থায় পালন করবে।

গ) যদি পরস্পরের প্রতি কোনো বিষয়ে অপছন্দ জন্ম নেয় তখন কেউ কারো ব্যাপারে কোনো চরম সিদ্ধান্ত দ্রুত নিতে পারবে না।

উত্তর : ২. স্ত্রী দোষী হলে স্বামীর সংশোধনের অধিকার

যদি স্ত্রী কোনো বড় রকমের অপরাধ করে (যা কোনভাবেই হালকা করে দেখা যায় না বা ক্ষমা করা যায় না), এমন অপরাধ যা দু'জনের সম্পর্ক নষ্ট করে, পরিবারের স্থিতিশীলতাকে বিপর্যস্ত করে– ইসলামের পরিভাষায় এসব অপরাধকে 'নুশুজ' বলে। নুশুজ-এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নৈতিক পদস্খলন, বিদ্রোহ, অবিবেচনাপ্রসূত কাজ, অসহযোগিতা ইত্যাদি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে চতুর্থ সূরার ৩৪ নং আয়াতে স্ত্রীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণে আনতে স্বামীকে কতগুলো ব্যবস্থা নেবার অধিকার দেয়া হয়েছে। এগুলো হল :

ক) কোমলভাবে বুঝানো— নিজের ভালবাসা ও আবেগ ব্যক্ত করে স্ত্রীকে পরিবার ভাঙার মত পরিস্থিতি থেকে সরে আসার আহ্বান জানানো। তাকে আল্লাহর ভয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার দায়িত্ববোধ জাগানোর চেষ্টা।

খ) বিছানা পৃথক করা— যদি স্ত্রী প্রথম পর্যায়ের ব্যবস্থায় সাড়া না দেয়। (শুধু অযৌক্তিক স্বভাবের মেয়েরাই তা করবে), তবে কুরআন স্ত্রীকে দৈহিক সম্পর্ক থেকে সাময়িক ভাবে বঞ্চিত রাখতে স্বামীকে বলে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান ভালবাসা ও আকর্ষণ পরখ করা। আলাদা থাকার মাধ্যমে স্ত্রী পরিস্থিতি বুঝতে সক্ষম হবে। এতে তার গর্ব অহংকার দূর হয়ে তার মধ্যে অনুশোচনা জাগতে পারে।

গ) সৎ উদ্দেশ্যে আঘাত (Chastisement)— স্ত্রীকে সংশোধন করার শেষ চেষ্টা হিসাবে তাকে প্রতীকী প্রহার করার অনুমতি স্বামীর আছে। তবে এর কিছু নিয়ম ও বিধি নিষেধ আছে। এই ব্যবস্থা নেয়া যাবে যখন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সংশোধনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই শেষ চেষ্টার সুযোগ কঠোর নিয়ম দিয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে যাতে স্বামী এর কোনো অপব্যবহার করতে না পারে।

উত্তর : ৩. সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে প্রহারের ব্যাপারে বিধি নিষেধ

প্রথমত: এ ধরনের প্রহার সত্যিকার যৌক্তিক কারণ ছাড়া করা যাবে না। স্ত্রীর মারাত্মক কোনো অন্যায়ের ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থা অনুমোদিত। এই সুযোগ যে কোনো রাগের বশে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলার অধিকার স্বামীকে দেয় না। সংশোধনের প্রথম দু'টো ব্যবস্থা না নিয়ে এ কাজ করা যাবে না। তার উপর রাসূল (সা:)-এর হাদিসের ভিত্তিতে আইনবিদরা এ কাজের উপর কিছু কঠোর শর্ত দিয়েছেন যথা :

ক) রাসূল (সা:)-এর মতে, কোনো মুসলমান অপরের মুখে আঘাত করতে পারবে না।

খ) যদি শৃঙ্খলার মারাত্মক লংঘনও হয় তবুও কোনো মুসলমান অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে এর জবাব দিতে পারবে না।

গ) স্ত্রীকে এমন ভাবে প্রহার করতে হবে যাতে তার গায়ে কোনো দাগ না পড়ে অথবা কোনো জখম না হয়।

এসব বিধি নিষেধ শুনে রাসূলের সাহাবী আতা (রা:) জিজ্ঞাসা করলেন যে, স্ত্রীকে কি দিয়ে আঘাত করতে হবে। জবাবে রাসূল (সা:) বললেন, "মেছওয়াক দিয়ে।" মেছওয়াক হচ্ছে দাঁত মাজায় ব্যবহৃত কাঠি যা টুথব্রাসের সমান আকারের। এই হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, স্ত্রীকে প্রহারের বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রতীকী। এর উদ্দেশ্য স্ত্রীকে সচেতন করা যে সে অবিলম্বে সংশোধন না হলে তালাক অনিবার্য। এছাড়াও প্রায় সব আইনবিদ একমত যে, এই প্রহার বাদ দেয়াই উত্তম। বিশেষভাবে যেখানে এর বিরূপ ফল হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশোধনের এ প্রক্রিয়ার ফল ভাল হতে পারে। এ

প্রক্রিয়ায় স্ত্রী সুপথে আসলে কুরআন স্বামীকে আদেশ করে স্ত্রীকে ক্ষমা করে দিতে এবং তার এই ভুলের কোনো ভবিষ্যতে খোঁটা না দিতে।

উত্তর : ৪. তালাক এবং সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রহারের তুলনা

তালাক এবং প্রহার দু'টোকেই ইসলামে প্রথম নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। একেবারে উপায়হীন হলে অগত্যা অনুমোদন দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা:) মুসলমানদের আদেশ করেন স্ত্রীদের প্রতি সদয় হতে। তিনি বলেন, "স্ত্রীরা হচ্ছে স্বামীর কাছে আল্লাহর আমানত, তারা যেন এই আমানতের কোনো ক্ষতি না করে।" একবার কয়েকজন মহিলা তার কাছে এই নালিশ নিয়ে এল যে, তাদের স্বামীরা তাদের প্রহার করে। তখন রাসূল (সা:) বললেন যে, "এই স্বামীরা আমাদের মাঝে উত্তম নয়।" তিনি আরও বলেন, "তোমাদের মাঝে সেই উত্তম যে পরিবারের প্রতি উত্তম আর আমি আমার পরিবারের প্রতি উত্তম।" বস্তুত রাসূল (সা:) তাঁর গোটা জীবনে কখনও তাঁর স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলেননি।

উত্তর : ৫. স্বামী অন্যায় করলে স্ত্রীর অধিকার

বাস্তবে স্বামীরা শারীরিকভাবে স্ত্রীদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। ফলে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে প্রহার করার সুযোগ বাস্তবিকই নেই। তাছাড়া যেহেতু স্বামী পরিবার প্রধানের দায়িত্বে সেহেতু সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্ত্রী তাকে প্রহার করলে উল্টো তালাকের সম্ভাবনাই বাড়বে। এতে প্রহারের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে। তারপরও যদি স্বামী সত্যিই অন্যায় করে এবং স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর হয় তবে তার বিষয়ে স্ত্রী নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে পারবে :

ক) সে তাকে কোমলভাবে যুক্তির মাধ্যমে বুঝাতে পারবে।

খ) তার প্রতি স্বামীর বিরাগ এবং নিষ্ঠুরতার কারণ খুঁজে তা দূর করতে পারে। এক্ষেত্রে দু'পক্ষই ছাড় দিয়ে আপোষে আসতে পারে।

গ) সে বিচারকের কাছে নালিশ করতে পারে। বিচারক (মালেকী মতে) স্বামীকে সংশোধন হতে আদেশ করবে। স্বামী সংশোধিত না হলে বিচারক সাময়িকভাবে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে। এতেও স্বামী পথে না আসলে তাকে জেল বা দৈহিক শাস্তি দিতে পারে।

ঘ) সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেবার প্রক্রিয়া করতে পারে।

উত্তর : ৬. স্বামী স্ত্রী দু'জনেই অন্যায় করলে

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই পরস্পরের বিরুদ্ধে অন্যায় করার অভিযোগ তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে চতুর্থ সূরার ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে তারা দু'জনে তাদের পরিবার থেকে অথবা

বন্ধুদের থেকে বিচারের জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করবে। হানাফী এবং শাফেয়ী আইনবিদরা বলেন যে, মধ্যস্থতাকারীরা শুধু সমঝোতার প্রস্তাব দিতে পারবে। আর ইবনে আব্বাস বলেন যে, তারা যদি সমঝোতার কোনো পথ না দেখেন তবে বিয়ে ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। যেহেতু ঐ আয়াতে বিয়ে ভাঙ্গার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি সেহেতু বুঝা যায় যে, মধ্যস্থতাকারীরা শুধু সুপারিশ করতে পারবেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ২ : আল কুরআন ৪:৩৪-৩৫

প্রশ্ন ৪ : রাসূল (সা:) স্ত্রীদের প্রহার করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা কি এতে লজ্জা বোধ কর না, যে তোমরা দিনে স্ত্রীদের প্রহার করে রাতে তাদের সাথে মিলিত হতে চাও!"

প্রশ্ন ৫ : আল কুরআন ৯:৭১ এই আয়াতে নারী পুরুষকে পরস্পরের সাহায্যকারী হিসেবে বলা হয়েছে। তারা সৎকাজে পরস্পরকে উৎসাহিত করবে।

আল কুরআন ৪:১২৮।

প্রশ্ন ৬ : যদিও কুরআন বলেছে এই মধ্যস্থতাকারী উভয়ের পরিবার থেকে আসবে তবুও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও একাজে লাগানো যাবে। কুরআন পরিবারের সদস্যদের কথা এজন্যে বলেছে যে, তারা এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হবে এবং সমস্যা সম্পর্ক ভাল জ্ঞান রাখবে।

জি-৪৫ বিয়ে বিচ্ছেদ তালাক (১)

প্রশ্ন ১. সাধারণত এটা ধারণা করা হয় যে ইসলামে তালাকের একমাত্র অধিকার স্বামীর- এটা কি ঠিক?

২. কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে স্ত্রী এককভাবে স্বামীকে তালাক দিতে পারে?

৩. কোন্ কোন্ প্রেক্ষিতে একজন মুসলিম স্ত্রী কোর্টের মাধ্যমে স্বামীর কাছে তালাক চাইতে পারে?

৪. কখন স্বামী স্ত্রী যৌথ সম্মতিতে তালাক দিতে পারে?

৫. মুসলিম স্ত্রীদের স্বামীর মতো তালাকের একক ও একচ্ছত্র অধিকার নেই কেন?

৬. ইসলামী আইনে স্বামী বা স্ত্রী কারোরই কোর্টের মাধ্যমে তালাক নেবার বাধ্যবাধকতা নেই কেন?

৭. কোন্ কোন্ অবস্থায় তালাক কার্যকরী হয়?

৮. কোন্ কোন্ রাগত অবস্থায় স্বামী কর্তৃক উচ্চারিত তালাক শব্দ কার্যকর হয় না?

৯. কোন্ সময় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না?

উত্তর : ১. তালাকের অধিকার

ইসলামে স্বামীর তালাকের একক অধিকারকে কয়েকটি প্রেক্ষিতে স্ত্রীকে তালাক পাওয়ার একক অধিকার দিয়ে সমতা কায়েম করা হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী আদালতের মাধ্যমেও তালাক প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। তাছাড়া স্বামী স্ত্রী পরস্পর সম্মতিতেও পৃথক হতে পারে।

কাজেই অসুখী বিয়ে সম্পর্ক তালাকের মাধ্যমে শেষ করার কার্যত সমান অধিকারই স্ত্রীর আছে।

উত্তর : ২. যেসব অবস্থায় স্ত্রী এককভাবে স্বামীকে তালাক দিতে পারে

ক) আইসিমা— বিয়ের সময় বা তারপর স্বামী তার তালাকের একক অধিকার স্ত্রীকে দিয়ে দেবার নাম আইসিমা।

খ) শর্তযুক্ত অধিকার— এ ক্ষেত্রে কাবিননামা স্বাক্ষরের সময় স্ত্রী কিছু শর্ত আরোপ করতে পারে যা ভঙ্গ হলে সে তালাক দিতে পারবে।

উত্তর : ৩. যেসব প্রেক্ষিতে স্ত্রী কোর্টের মাধ্যমে তালাক চাইতে পারে

ক) স্ত্রীকে ভরণপোষণ অক্ষম হলে অথবা অস্বীকার করলে (স্ত্রী যদি ধনী হয় তবুও তাকে পূর্ণ ভরণপোষণ দিতে স্বামী বাধ্য)।

খ) দুর্ব্যবহার (যার অন্তর্ভুক্ত আছে প্রহার করা, গালি গালাজ করা, অথবা তাকে অন্যায় কাজ করতে চাপ দেওয়া)।

গ) স্বামী পুরুষত্বহীন হলে (স্ত্রীর বৈধ যৌন চাহিদা পূরণে অক্ষম হলে)।

ঘ) স্বামী উন্মাদ হলে অথবা তার দূরারোগ্য/ ছোঁয়াচে রোগ হলে

ঙ) দীর্ঘ অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে :

(i) যদি স্বামীর অবস্থান জানা যায়, তবে তালাক কার্যকরী হবার পূর্বে তাকে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়।

(ii) যদি স্বামীর ঠিকানা জানা না থাকে, তবে স্ত্রীকে ৬ মাস থেকে ১ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে স্বামী ফিরে না আসলে সে স্বামী থেকে তালাক হয়ে যাবে।

চ) স্বামীর দীর্ঘ দিনের জন্য জেল হলে।

ছ) বিয়ের সময় স্বামী নিজের সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিলে অথবা নিজের কোনো দুর্বলতা গোপন করলে।

উত্তর : ৪. পারস্পরিক সম্মতিতে তালাক

১. পারস্পরিক সম্মতিতে তালাকের দু'টো পদ্ধতি আছে :

ক) মোবাররা— যেখানে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক ছিন্ন করতে পরস্পর সম্মত হয়। আর্থিক এবং অন্যান্য বিষয়ে তারা একমত হয়।

খ) খোলা তালাক (একতরফা তালাক)— যেখানে স্বামীর ব্যবহারে স্ত্রী অসুখী থাকে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে সে ভীত হয়। এ অবস্থায় স্ত্রী একতরফাভাবে স্বামীকে মোহরানার অর্থ ফেরৎ দিয়ে তালাক নিতে পারে।

খোলা তালাকের শর্ত :

(i) এই তালাক চাওয়ার যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে।

(ii) স্বামী এ তালাক মানতে বাধ্য।

(iii) কোনো স্বামী মোহরানার টাকা ফেরৎ পাওয়ার লোভে স্ত্রীকে খোলা তালাক নিতে চাপ দিতে পারবে না।

(iv) এই তালাক যে কোনো সময় নেয়া যাবে।

উত্তর : ৫. মুসলিম স্ত্রীদের একচ্ছত্র ও একক তালাকের অধিকার নেই কেন

ইসলামী আইন স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ব্যর্থ বৈবাহিক সম্পর্ক অবসানে তালাক নেবার সুযোগ দিয়েছে। এই সুযোগের পদ্ধতিতে উভয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম স্ত্রীকে তালাকের নি:শর্ত ও একক অধিকার দেয়নি কারণ এর কিছু ক্ষতিকর প্রভাব তার এবং পরিবারের উপর পড়তে পারে। যেমন :

ক) বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থায়ীত্ব। স্বামীরা যেমন স্ত্রীদের আবেগ তাড়িত হয়ে তালাক দিতে পারে, মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ভুলের আশঙ্কা আরও বেশি। কাজেই যদি স্ত্রীর তালাকের একক অধিকার থাকত তবে আবেগের বশে সে তালাক দিয়ে পরে হয়ত আফসোস করত।

খ) স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তালাকের প্রতিক্রিয়ায় কষ্ট পায় (বিশেষ করে মানসিকভাবে)। তবে স্বামীকে এ কষ্টের অতিরিক্ত আর্থিক খরচের বোঝাও বইতে হয়। মোহরানার সমস্ত টাকা তাকে পরিশোধ করতে হয়। ইদ্দতকালীন সময়ে (যা তিন মাস থেকে ৯ মাস পর্যন্ত হতে পারে) স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে হয়। ছোট সন্তান যদি স্ত্রীর কাছে থাকে তবে তাদের ভরণপোষণ করতে হয়। কোনো কোনো আইনবিদের মতে স্ত্রীকে আরও এক বছরের (ক্ষতিপূরণ) ভরণপোষণ দিতে হয়। স্বামীর উপর এত আর্থিক লোকসানের বোঝা তার দ্বারা স্ত্রীকে তালাক দেয়ার বিরুদ্ধে একটি নিবারক (Deterrant) হিসেবে কাজ করে। যেহেতু মেয়েদের এমন আর্থিক লোকসানের আশংকা নেই সেহেতু তাদের নি:শর্ত তালাকের সুযোগ দিলে এর অপব্যবহার হতে পারত। একক তালাকের অধিকার না থাকাটা মেয়েদের তালাক পাওয়ার সুযোগ কেড়ে নেয়নি। যৌক্তিক যে কোনো প্রয়োজনে সে তালাক নিতে পারে।

উত্তর : ৬ আদালতের মাধ্যমে তালাক

যদি স্বামী স্ত্রী দু'জনেই তালাকের ব্যাপারে সম্মত থাকে (যেমন, মুবাররা) তবে এ বিষয়ে আদালতের কিছুই করার নেই। ইসলামী আইন তালাক প্রক্রিয়াকে আদালতের আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতায় ফেলতে চায় না। আদালতের আর একটা অসুবিধে হচ্ছে যখনই কোনো তালাকের বিষয় মোকদ্দমায় গড়ায় তখনই স্বামী-স্ত্রী দুই পক্ষ হয়ে যায়। তখন তর্কের খাতিরে তর্ক ও বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা উভয়ের সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে পুনর্মিলনের সকল সুযোগ দূর করে দেয়। তালাক প্রক্রিয়ায় আইনগত বিষয় জড়িত হলে অবশ্যই আদালতে যেতে হবে। তবে সাধারণত: তালাক একটি ব্যক্তিগত বিষয়। যার সমাধান স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে

হওয়াই উত্তম। না হলে পরিবারের সাথে জড়িত অনেক অপ্রিয় গোপন কথাও আদালতের মাধ্যমে চারিদিকে প্রচারিত হবে।

উত্তর : ৭. তালাক কার্যকর হবার শর্ত

ক) স্বামী কর্তৃক তালাক শব্দের উচ্চারণ হতে হবে অত্যন্ত সচেতন ও সুস্থ মস্তিষ্কে। কেউ তাকে এ কাজে প্ররোচিত বা বাধ্য করলে চলবে না।

খ) মৌখিক, লিখিত অথবা দূত মারফত যেভাবেই তালাক দেয়া হোক তালাকের বিষয়টি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লিখিত হতে হবে।

গ) কতগুলো অবস্থায় তালাকের কথা উচ্চারণ করা যায় না। তালাক মৌখিকভাবে দিলেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তা অকার্যকর হয় :

(i) স্বামী মদ বা ওষুধের প্রভাবে তালাক দিলে।

(ii) স্বামী যদি এ স্বভাবের হয় যে প্রায়ই স্ত্রীকে এ ধরনের কথা বলে যা সে আসলে বুঝায় না। তবে এ ধরনের স্বামী তালাকের কথা বললে তার কাফফারা হিসেবে ১০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে অথবা তিনদিন রোযা রাখতে হবে।

(iii) চরম আবেগ তাড়িত বা শোকাহত অবস্থায় যখন মানুষ বুঝে না যে সে কি বলছে।

উত্তর : ৮. যে সব রাগান্বিত অবস্থায় তালাক হয় না

প্রখ্যাত আইনবিদ ইবনে আল কাইউম রাগান্বিত অবস্থার শ্রেণী বিভাগ করেছেন এভাবে :

ক) চরম রাগের মুহূর্তে যখন মানুষ অর্থহীন কথা বলে বা সে জানে না তার উচ্চারিত কথার অর্থ ও উদ্দেশ্য। এসব সময়ে তালাকের কথা উচ্চারণ করলেও তা কার্যকর হবে না।

খ) মাঝারি ধরনের রাগ— সাধারণত: মানুষ রাগের সময়ই তালাক দেয়। তবে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়া তালাকের কথা রাগত অবস্থায় উচ্চারণ করলে তালাক হবে।

গ) আর এক ধরনের রাগত অবস্থার কথা বলা হয়েছে যার বিষয়ে কিছুটা দ্বিমত আছে। তা হচ্ছে যখন স্বামী রাগের মাথায় তালাক দেয়ার পর অনুতপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে আইনবিদরা তালাককে অকার্যকর বলেন। কারণ–

(ii) রাসূলের একটি হাদিস আছে যে, মানুষ রাগের মাথায় তালাক দিলে তালাক হয় না।

(iii) এটা কুরআনের এক মূলনীতি যে, আল্লাহ মানুষকে অনিচ্ছাকৃত কোনো উচ্চারণের জন্য দোষী করবেন না।

(iii) এই মাঝারি ধরনের রাগকে মাদকাসক্ত অবস্থার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

(iv) ইসলামের বিয়ের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্ককে স্থায়ী করা। কাজেই এটা টিকিয়ে রাখার সব সুযোগ দম্পতিকে দিতে হবে।

৯. যে সব সময় তালাক দেয়া যায় না

মানুষ নিম্নলিখিত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না :

ক) যখন স্ত্রীর মাসিক ঋতুস্রাব চলতে থাকে (যদিও এ সময় স্ত্রী খোলা তালাক দিতে পারেন)।

খ) মাসিক ঋতুস্রাব শেষে স্বামী যদি তার সাথে মিলিত হয়। এ অবস্থায় পরবর্তী মাসিক না হওয়া পর্যন্ত তাকে তালাক দেয়া যাবে না।

গ) সন্তান জন্মের অব্যবহিত পর (সাধারণত: সন্তান জন্মের পর একমাস)

এসব সময়ে তালাক দেয়া সুন্নাহ বিরোধী। আইনবিদরা এসব সময়ের তালাককে নাকচ করে দেন।

সূত্র :

প্রশ্ন ৪ : আল কুরআন ২:২২৯, ৪:১৯

রাসূল (সা:) সাবিত ইবনে কায়েসকে তাঁর স্ত্রীর মোহরানার অর্থ ফেরত নিয়ে তাকে বিবাহ বন্ধন মুক্ত করে দিতে নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন ৮ : হাদিস, "শুধুমাত্র সচেতন ঐচ্ছিকভাবে দেয়া তালাকই তালাক।"

জি-৪৬ বিয়ে বিচ্ছেদ তালাক (২)

প্রশ্ন ১. কয়েকটি অবস্থায় তালাক নিষেধ কেন?

২. তালাক শব্দ উচ্চারণের সব পূর্বশর্ত মেনে তালাক দেয়া হলে তা কি সাথে সাথে কার্যকর হবে?

৩. তালাক এর পরে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে (ইদ্দত) স্ত্রী কোথায় থাকবে এবং কে তার ভরণপোষণ করবে?

৪. তালাকের পর স্ত্রী কি পুনর্বিবাহ করতে পারে?

৫. একই স্বামী তৃতীয়বারের মতো স্ত্রীকে তালাক দিলে তাদের পুনর্মিলনের আর কোনো সুযোগ কি থাকে না?

৬. তালাকের পর স্ত্রীর আর্থিক অধিকার ও সন্তানকে নিজের কাছে রাখার ইচ্ছার কোনো স্বীকৃতি ইসলামে আছে কি?

উত্তর : ১. কয়েকটি অবস্থায় তালাক নিষেধ কেন

মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাবের সময় তাদের তালাক দেয়া নিষেধ কয়েকটি কারণে–

ক) কুরআন মতে মেয়েরা এ সময় এমনিতেই একটু কষ্টের মধ্যে থাকে। এ অবস্থায় তাদের উৎকণ্ঠা ও দু:খ আরও বাড়ানো হবে অমানবিক।

খ) এ সময় স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারে না। অন্তরঙ্গ মিলনের সুযোগ না থাকার কারণেও স্বামীর মাথায় তালাকের মতো চিন্তা আসতে পারে। তাই এই সুযোগ রদ করা হয়েছে।

এ সময়ের স্বামীর তালাকের ইচ্ছা ব্যক্ত করাও নিষিদ্ধ। সন্তান জন্মের অব্যবহিত পর তালাক দেয়াও একই কারণে নিষিদ্ধ। তাছাড়া এ সময় একজন নারী এবং তার শিশুর দৈহিক ও মানসিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এ সময়েও স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারে না।

মাসিক ঋতুস্রাবের পর স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে এই মিলনের ফলে সন্তান জন্মের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পরবর্তী ঋতুস্রাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তালাক নিষেধ। স্ত্রী গর্ভবতী হবার বিষয়টি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে আরও সহজ করে দিতে পারে। তাছাড়া সন্তানের পিতৃ পরিচয়ও নিশ্চিত করা এর উদ্দেশ্য। গর্ভাবস্থায়ও কোনো মহিলাকে তালাক দেয়া যাবে না। যদিও এ সময় তালাকের পরিকল্পনার কথা তাকে জানানো যাবে।

ইসলামী আইনে শুধু মাসিক ঋতুস্রাবের পর নির্মল সতেজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন না করে তালাক দেয়া যাবে।

উত্তর : ২. তালাকের পর অপেক্ষার সময় (ইদ্দত)

তালাক শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথেই তা কার্যকর হয়ে যায় না। এর পর ইদ্দত নামক অপেক্ষার সময় থাকে। এটা হচ্ছে মহিলাদের তিনটি মাসিক ঋতুস্রাবের সমান সময় (তিন মাস) যদি এই তিন মাসে নারীর সন্তান ধারণের বিষয়টি ধরা পড়ে তবে এটা নয় মাস পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। খোলা তালাকের ক্ষেত্রে অথবা মাসিক ঋতুস্রাবের পর পরই স্বামী স্ত্রীর মিলনের পূর্বেই যদি তালাক দেয়া হয় তবে কোনো ইদ্দত পালন করতে হয় না। এই ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামী স্ত্রীর দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি এমন কিছু হয়ে যায় তবে তালাক বাতিল হয়ে যায় এবং স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তর : ৩. ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর আবাসন ও ভরণপোষণ

কুরআন মতে এটা নিশ্চিত যে, তালাকের পর ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রী তার পূর্বের বাড়িতেই অবস্থান করতে পারবে। তাকে জোর করে ঘর থেকে বের করা যাবে না। এমনকি তার নিজের পক্ষেও অহেতুক ঘর ছাড়া ঠিক নয়; এই সময় সে স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ ভরণপোষণ ও ভাল ব্যবহার প্রাপ্য। তালাকের পর স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে থাকার সুযোগ এবং স্বামীর কাছ থেকে তার ভরণপোষণ দেয়ার ইসলামের লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- ক) অপেক্ষার এই সময়টি স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার এক পরীক্ষা এবং এটা হয়ত তাদের পুনর্মিলন ঘটাতে পারে। যদি স্বেচ্ছায় এমন পুনর্মিলন ঘটে তবে স্বামী স্ত্রীকে নতুন করে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে না বা আদালতে কোনো আবেদন করতে হবে না। যদিও এই পুনর্মিলনকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করাই উত্তম।
- খ) এই অপেক্ষার সময়ে স্ত্রীর সন্তান ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়।
- গ) সর্বশেষে এই অপেক্ষার সময়টি একটি অন্তর্বর্তীকালীন সময় হিসাবে কাজ করে যা স্বামী স্ত্রীকে পৃথকভাবে নতুন জীবন শুরু করবার পূর্বে দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের সময় দেয়।

উল্লেখ্য যে, এই অপেক্ষার সময় দম্পতি পরস্পরের স্বামী স্ত্রী হিসাবেই আইনত গণ্য হবেন। যদি এর মধ্যে দু'জনের যে কোনো একজন মারা যান তবে অপরজন তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবেন।

উত্তর : ৪. তালাকের পর পুন:বিবাহ

তালাকের পর ইদ্দত শেষ হলে ইসলাম নতুন করে বিয়ের অনুমতি দেয়। ইসলাম তালাক প্রাপ্ত ব্যক্তির বিয়ের ব্যাপারে কোনো কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয় না। যদিও অনেক

সমাজেই এটাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। বরং ইসলাম প্রত্যেককে বিয়ে করে (অন্য ব্যক্তিকে অথবা আগের সাথীকে) নতুন জীবন শুরু করবার সুযোগ দেয়। যদি আগের স্বামীর সাথেই বিয়ে হয় তবে নতুন করে বিয়ে চুক্তি করতে হবে এবং মোহরানা দিতে হবে। এভাবে যে কোনো দম্পতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার এ ধরনের পুনর্বিবাহের সুযোগ পাবে। ইসলাম যে কোনো মূল্যে স্বামী স্ত্রীকে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে চায়। সে জন্য স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলনের এত সুযোগ এখানে রাখা হয়েছে।

উত্তর : ৫. স্থায়ী তালাক

যদি কোনো মহিলা তার স্বামী কর্তৃক তিনবার তালাক প্রাপ্ত হয় তবে তা হবে এক জটিল সমস্যা। এটা তখন স্পষ্ট হয় যে, এই দম্পতির পুনর্মিলনের সুযোগ নেই অথবা তাদের যে কেউ বিয়েকে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে না। এ অবস্থায় তালাকের মর্যাদা রক্ষার্থেই স্বামী স্ত্রীর এই সম্পর্ক স্থায়ীভাবে শেষ হবে। তারা আর পুনরায় নিজেদের মধ্যে বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে না। যদি উক্ত স্ত্রী অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয় এবং নতুন স্বামী যৌক্তিক ভাবে স্ত্রীকে তালাক দেন অথবা মারা যান তবে উক্ত মহিলা নতুন করে তার প্রথম স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহে মিলিত হতে পারবেন।

উত্তর : ৬. তালাকের পর স্ত্রীর আর্থিক অধিকার ও সন্তানকে নিজের কাছে রাখা

বিয়ে হয়েছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন হয়নি– এমতাবস্থায় যদি তালাক হয়ে যায়, তবে স্ত্রী মোহরানার অর্ধেক পাবে। অন্যথায় স্ত্রীর অধিকার হচ্ছে :

ক) মোহরানার পূর্ণ অংশ পাবে।

খ) বাগদান ও বিয়ের সময়ে প্রাপ্ত সকল উপহারাদি স্ত্রীর।

গ) ইদ্দতের সময়ে (৩ বা ৯ মাস) ভরণপোষণ পাবে।

ঘ) সন্তানকে স্তন্যপান করানোর সময়ে সন্তানের বাবা থেকে আর্থিক অধিকার পাবে।

ঙ) কিছু সান্ত্বনা উপহার (কারো মতে তা দিলে উত্তম, কিন্তু অন্যেরা বলেন যে, এটা বাধ্যতামূলক)।

ইসলামী আইনে ছোট সন্তানের (সাধারণত: সাত বছরের কম বয়স হলে) তত্ত্বাবধান/হেফাজত (Custody)-র দায়িত্ব মায়ের দিকে বেশি ঝুঁকে। কন্যাদের বা বিয়ে পূর্ব পর্যন্ত কন্যাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মায়ের হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত, যাতে মা তাকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে। তবে দু'টি শর্ত রয়েছে যথা :

ক) মায়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যোগ্যতা ও ভাল সুনাম থাকা এবং

খ) মা অবিবাহিতা থাকা। এ শর্তটি এসেছে রাসূল (সা:)-এর একটি হাদিস থেকে, সেখানে তিনি মায়ের বিবাহিতা হওয়া ও সন্তানের স্বার্থবিষয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন।

নির্ঘণ্ট

প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

ক. অর্থনীতি ও ব্যবসা প্রশাসন

এম. উমর চাপড়া

ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ২৫০/-

ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৬০/-

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে: অর্থশাস্ত্রের বভিষ্যৎ ৩০০/-

প্রফেসর খুরশিদ আহমদ

উন্নয়ন ও ইসলাম ৩৫/-

এম আকরাম খান এবং এম রকিবুজ জামান

ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ ৭০/-

এম. রুহুল আমিন অনূদিত

ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা - সামাজিক প্রেক্ষাপট ১০০/-

কাজী মোরতুজা আলী

ইসলামি জীবন বীমা: বর্তমান প্রেক্ষিত ১৭৫/-

ড. মাহমুদ আহমদ *পিএইচডি*

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ: তত্ত্ব ও প্রয়োগ ৬০/-

Prof. M. Raihan Sharif

Guidelines to Islamic Economics: Nature, Concept and Principles ৩০০/-

M. Zohurul Islam

Accounting Philosophy Ethics and Principles: The Islamic Perspective ২০০/-

Al-Zakah: A Hand book of Zakah Administration ২০০/-

An Analysis of the Development of Socio-Economic Development ১০০/-

M. Kabir Hasan *PhD*

On Openness, Integration and Economic Growth ২০০/-

Globalization and the Muslim World ৪০০/-

M. Azizul Huq

Profits Payout to Mudaraba Depositors (Bangladesh Perspective) ১০০/-

Masudul Alam Chowdhury

A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islamic Countries ৩০০/-

Professor Dr. Muhammad Luqman (Edited)

Islamic Management: Islamic Perspective ২০০/-

Md. Golam Mohiuddin *PhD* & Afroza Bulbul
Islamization and Standardization of Knowledge --------- ১৩০/-

খ. সামাজিক বিজ্ঞান

আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান
ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ ৬০/-
ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ২৫০/-

আকরাম জিয়া আল উমরী *পিএইচডি*
রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খন্ড) ১৫০/-
রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খন্ড) ১৭০/-

আবদুর রশিদ মোতেন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান: ইসলামি প্রেক্ষিত ১৫০/-

তাহির আমিন
জাতীয়তাবাদ ও আর্ন্তজাতিকতাবাদ: উদারতাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম ১০০/-

মোহাম্মদ হাশিম কামালি
ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ২৫০/-

মুহাম্মদ আল ব্যুরে *এইচডি*
প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামি প্রেক্ষিত ৩০০/-

জাফর ইকবাল
শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামি প্রেক্ষিত ১৫০/-

প্রফেসর আবদুন নুর
লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা ২৬০/-

অধ্যাপক জয়নুল আবেদিন মজুমদার (সম্পাদনা)
আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ ৬০/-

এম আবদুল আযিয *সম্পাদিত*
গণতন্ত্র ও ইসলাম ১০০/-
সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম ৮০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান *এইচডি* **ও প্রফেসর জেফরি লাং** *এইচডি*
বৈবাহিক সমস্যা ও কোরআনের সমাধান ৩০/-

আল্লামা খররুম জাহ্ মুরাদ
সুবহে সাদিক: আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের নির্দেশনা ১২০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসোলায়মান *পিএইচডি*

জ্ঞানের ইসলামায়ন ৩০/-

ইসলামের দন্ডবিধি ২০/-

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী *পিএইচডি*

ইসলামে দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট ২০০/-

জ্ঞান ইসলামীকরণ: স্বরূপ ও প্রয়োগ, প্রফেসর ৩০/-

প্রফেসর ইয়াসার কানদেমীর *পিএইচডি*

শিশুতোষ ৪০ হাদিস ১২০/-

প্রফেসর বেলাল হোসেন *পিএইচডি*

তাইসীরুত তাফসীর (সূরাহ্ আল-হুজরাত) ২৫০/-

Professor Md. Athar Ali ***PhD***

Shah Wali Allah's concept of Ijtihad and Taqlid ২৫০/-

Editorial Board

Selections From Akram Khan's Tafsirul Qur'an ১৭৫/-

Prof. Muin-ud-Din Ahmad Khan

Islamic Revivalism ২৫০/-

Edited by: Abdun Noor & Mamtaj Uddin Ahmed

Classification and Integration of Knowledge in Islamic Epistemology ৩০০/-

Professor Israr Ahmad Khan ***PhD***

Qur'anic and Hadith Studies Critical Reflection on Some Issues ২৩০/-

ঘ. Journal (Half yearly)

Bangladesh Journal of Islamic Thought (BJIT)
$ 20.00 Individual $ 30.00 Institution, Tk. 150/-

প্রকাশের অপেক্ষায়

জামাল আল বাদাবী এবং মুস্তফা তাজদীন

সৃজনশীল চিন্তা: ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত

ইউসুফ আল কারাযাবী

সুন্নাহর অনুগমন

জাস্টিস মোহাম্মদ তাকি ওসমানি

সুন্নাহ্র আইনগত মর্যাদা

রফিক ইসা বিকুন
ইসলামি ব্যবসায় নৈতিকতা

তারিক রমাদান
ইউরোপে মুসলিম জীবনধারা

ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী *পিএইচডি*
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম

মোহাম্মদ হাশিম কামালী
ইসলামি আইনের মূলনীতি

ইউসুফ হামিদ আল আলিম
ইসলামি শরিয়তের সাধারণ উদ্দেশ্য (১ম খণ্ড)

প্রফেসর ত্বাহা জাবির আলাওয়ানী *পিএইচডি*
আল কোরআন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়ন

খুররম জাহ্ মুরাদ
ইসলামি নেতৃত্ব ও মূল্যবোধ

প্রফেসর ত্বাহা জাবির আলাওয়ানী *পিএইচডি* **এবং জামাল আল বাদাবী** *পিএইচডি*
জ্ঞানের ইসলামিকরণ

ইব্রাহিম আহমদ উমর *পিএইচডি*
ইলম ও ঈমান

প্রফেসর ত্বাহা জাবির আলাওয়ানী *পিএইচডি*
সমকালীন ইসলামি চিন্তা-দর্শনের বিবেচ্য বিষয়

ইউসুফ আল-কারদাভী *পিএইচডি*
ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনা

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার
বিচারিক মন ও মনন

সালিহ্ ইবন ফাওযান ইবন আবদুল আল-ফাওযান *পিএইচডি*
তাওহীদের মৌলিক শিক্ষা

Prof. U. A. B. Razia Akter Banu *PhD*
Islam in Bangladesh

মারওয়ান ইবরাহীম আল-কায়সি *পিএইচডি*
ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ : ইসলামি আদবের দিকনির্দেশনা ১২০/-

Syed Sajjad Husain ***PhD***
Civilization and Society ৩০০/-
A Young Muslim's Guide to Religions in the World ২০০/-

Shah Abdul Hannan
Social Laws of Islam ৪০/-

Md. Moniruzzaman
The Islamic Theory of Jihad and International System ২০০/-

M. Anisuzzaman ***PhD*** **& Prof. Zainul Abedin Majumder**
Leadership: Western and Islamic ৭০/-

M. Zohurul Islam ***FCA*** **(Editor)**
Islamization of Academic Discipline ২০০/-

ঘ. ইতিহাস - ঐতিহ্য

আব্দুলহামীদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*
মুসলিম মানসে সংকট ১৫০/-
মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট ২২৫/-

তারিক রমাদান
মুসলিমের ইউরোপ ১৫০/-

ঙ. বিজ্ঞান ও সভ্যতা

এম এ কে লোদী সম্পাদীত
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন ১৫০/-

Muin-Ud-din Ahmad Khan ***PhD***
Origin and Development of Experimental Science ১২০/-

Major Md. Zakaria Kamal
Man and Universe ২০০/-

Prof. Omer Hasan Kasuli, Sr. ***PhD***
Medical Education: Islamic Perspective ২০০/-
Medical Ethics ৫০/-
মেডিকেল এথিক্স: ইসলামি দৃষ্টিকোণ ৬০/-

চ. সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মালিক বদরী *পিএইচডি*
অভিচিন্তন : অনুভবের দৃশ্যময়তা ৫০/-

আব্দুলহামীদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*
নির্মাতাদের দ্বীপ ১২০/-
নির্মাতাদের দ্বীপের গুপ্তধন ১২৫/-

আইআইআইটি স্টাইলশীট
লেখক, অনুবাদক ও কপি সম্পাদক গাইড ৫০/-

Poet Farruk Ahmed
Islam in Bengali Verse ১০০/-

ছ. নারী বিষয়ক

বি. আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন
ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ৫০/-

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ
রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড ২৫০/-
রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ২য় খণ্ড (সাদা ২৫০) অফসেট ⇨ ৩০০/-
রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৩য় খণ্ড ২০০/-
রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৪র্থ খণ্ড (সাদা ২৫০) অফসেট ⇨ ৩০০/-

জামাল আল বাদাবি *পিএইচডি*
মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক ২৫/-

জ. ধর্মতত্ত্ব

জামাল আল বাদাবী *পিএইচডি*
ইসলামি শিক্ষা সিরিজ (একত্রে ৩ খণ্ড) ৩০০/-

ত্বাহা জাবির আল্ আলওয়ানী *পিএইচডি*
উসূলুল ফিক্হ ৭০/-
কোরআন ও সুন্নাহ: স্থান-কাল-প্রেক্ষিত ৫০/-
ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি ১৪০/-

ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী *পিএইচডি*
আত-তাওহীদ: চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য ২০০/-

প্রফেসর রশীদ আহমদ জালন্ধরী *পিএইচডি*
তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক ১০০/-

BIIT AT A GLANCE

Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) was founded in 1989 as a non-government research organization to conduct research and in-depth studies, among others, to identify the Islamic perspective of different disciplines specially in higher education and to popularize the 'islamization of knowledge' program among students, teachers and researchers in Bangladesh In order to achieve its objectives, the organization undertakes the following activities:

- **Research**: In order to identify the Islamic approach in different disciplines of higher education, BIIT sponsors research programs under the supervision of senior faculties of public and private universities.
- **Translation**: In order to publicize the ideas and thoughts of major scholars of the world, BIIT takes initiative to translate the major books of prominent scholars written in Arabic and English into Bangla.
- **Publication**: BIIT publishes the original writings, research works, translation work and seminar proceedings which are used as reference for teachers, students, researchers and thinkers.
- **Library Service**: BIIT maintains a library which has a good number of rare books and journals including the publications of IIIT, USA. These books and journals are issued to professionals, university teachers, students and researchers on request.
- **Supply of Materials**: One of the major programs of BIIT is to collect and supply study materials on national, international and ummatic issues.
- **Series of Seminars & Lectures**: BIIT organizes seminars, symposiums, workshops, study circles, discussion meetings on contemporary issues related to thoughts on education, culture and religion.
- **Exchange Program**: To exchange information, ideas and views, BIIT organizes partnership programs with related organizations and individuals at home and abroad.
- **Distribution of Publications**: In order to disseminate knowledge, BIIT distributes the publications of IIIT and BIIT to concerned organizations and individuals.
- **Training Program**: BIIT conducts different types of training programs on various topics such as research methodology, English and Arabic language courses etc to improve the skills and efficiency of human resources.
- **Dialogue & Roundtable Discussion**: Dialogues on national and international issues particularly inter-faith issue, socio-economic issue are arranged by BIIT.

লেখক পরিচিতি

সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ড. জামাল আল বাদাবী বর্তমানে কানাডার হ্যালিফ্যাক্স-এর সেন্ট মেরী'স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের ভিজিটিং প্রফেসর। মিসরে জন্মগ্রহণকারী এই মনীষী তরুণ বয়স থেকেই ইসলামী আন্দোলনের মূলধারার সাথে যুক্ত। ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের নাগরিকদের নানামুখী প্রশ্নের সহজ-সরল জবাব প্রদানে জামাল বাদাবী'র পারদর্শিতা অনেক অমুসলিমকেও মুগ্ধ করে। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর হাত ধরে বিপুল সংখ্যক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মনোজ্ঞ উপস্থাপনায় জটিল ফিকহী বিষয়ও সাধারণের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠে। ইসলাম ধর্মের কালোত্তীর্ণ, বিশ্বজনীন ও মানবিক আবেদন তাঁর কথা ও লেখনীতে উঠে আসে। আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ তাঁর জবানীতে পায় যুগ জিজ্ঞাসার সুন্দরতম সমাধান।

ISBN : 984-8203-44-X